Contents

মুক্তিযুদ্ধ ঃ আমার কথা ৫

পাকিস্তান: স্বপ্ন-দুঃস্বপ্ন ৬

মহাবিদ্যালয়ের জীবন ৭

চাকরি জীবন এবং বোধোদয় ১২

ছাত্রলীগের রাজনীতিতে মুজিব-আতাউর রহমান দ্বন্দ্ব ১৪

পয়ষট্টির ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ এবং শেখ মুজিবের বিস্ময়কর উত্থান ১৬

৬-দফা নিয়মতান্ত্রিক পথে পূর্ব বাংলার স্বাধীনতার অনন্যফর্মুলা ২০

আমরা বাঙালি ছিলাম ২১

আন্দোলনের কাল ২২

প্রকাশ্য মঞ্চে: পার্কে উত্তপ্ত জনসভা ২৮

২১ ফেব্রুয়ারি '৬৯:ড্রাগনের মত এক অচিন্তনীয় মিছিল ৩২

দেশের রাজনীতিতে দৃশ্যপট পরিবর্তন ৩৫

আন্ডার গ্রাউন্ডের চার নেতা হুলিয়া মুক্ত হলেন ৩৬

জেনারেল ইয়াহিয়ার আবির্ভাব: অবাধ নির্বাচনের ঘোষণা এবং এলএফও'র নিগড় ৩৭

এলএফও প্রসঙ্গ এবং বঙ্গবন্ধু ৩৮

পূর্ব বাংলায় রাজনীতিতেপোলারাইজেশন ৩৯

১২ নভেম্বরের ঘূর্ণিঝড় নিরব জনতাকে ৬-দফার দিকে টেনে নিয়ে গেল ৪১

ভাসানীর দলে ভাঙ্গন ৪৩

ইয়াহিয়ার নিরপেক্ষ নির্বাচনের ঘোষণাকে রাও ফরমানের বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখালেন ৪৩

নির্বাচন নিয়ে নানা অপপ্রচার ও ধর্মীয় ভাওতা ৪৫

১৯৭০-এর নির্বাচন ৪৬

নির্বাচনী প্রচারে বিচিত্র অভিজ্ঞতা ৫০

চুকনগরের এক হৃদয়বান মানুষ ৫৭

তালায় চেয়ারম্যানের পক্ষ বদল ৫৯

ভূমিধ্বস বিজয়, ঈশান কোণে ধূসর ছায়া ৬০

রাও ফরমানের ক্ষোভ এবং হতাশা ৬১

বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের কালজয়ী ভাষণ ৬৪

ইয়াহিয়ার শঠতামূলক আলোচনা, পাকিস্তানিদের শক্তিবৃদ্ধির চেষ্টা ৬৬

প্রতিরোধের কাল ৬৯

বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণা: পিটিআই মোড়ে ব্যরিকেড ৭১

কাঁধে রাইফেল ঝুলিয়ে নুর নেওয়াজ ও বাবলু আমাদের বাড়িতে এলো ৭৭

ইয়াজদানী সাহেব ফিরলেন ৭৮

অধ্যাপক খালেদ রশীদ গুরু (২০ মার্চ, ১৯৭১) ৮১

নকশালবাড়ির ঢেউ ৮৪
ঘটনা প্রবাহ আমাকে টেনে নিয়ে চলল ৮৫
২৮ মার্চ হযবরল অবস্থার আবর্তে খুলনা শহর ৮৮
শহীদ মুক্তিযোদ্ধা রাশেদ আলম ৯২
তারা বিহারীদের উপর প্রতিশোধ নিতে কালি সাধন করে এসেছিল ৯৪
বয়রা: শহরের শেষ প্রতিরোধ ৯৪
হিড্ডি প্রমুখ ৯৫
নয়াবাটির মুন্সিবাড়িতে গণহত্যা ৯৫
খালিশপুরের মনসুর ভাই ৯৬
ল্যান্স নায়েক সিদ্দিক ও তার সহযোদ্ধারা ৯৯
মা-বোনের চোখের জলে সিক্ত হল যোদ্ধাদের ডাল-রুটি ১০০
ওরা গর্ত থেকে একপা-দুপা করে বেরিয়ে এলো ১০১
আলতাপ গলির গণহত্যা ১০২
বেতার কেন্দ্র আক্রমণ ১০৫
নয়াবাটি মুন্সিবাড়ির গণহত্যা ১০৯
মনসুর ভাইকষ্টের ঘরবাড়ি ছেড়ে পালিয়ে এলেন ১১০
খাবার পানি ১১৩
বাবার সামান্য কটা টাকাও হাত-সাফাই করল আর্মিরা ১১৩
পেয়েও হারালাম ডাবলুদের ১১৫
ক্যাপ্টেন, পামিস্ট এবং কালের স্বাক্ষী এক অশ্বথ গাছ ১১৮
মঞ্জু ভাইকে বাড়ি ছাড়তে হল ১২০
অফিসে ডেমোক্লিসের তরবারির নিচে ১২১
মুক্তিযোদ্ধার মুখ ১২৪
একপেশে এক ফ্যাকচুয়াল রিপোর্ট! ১২৫
আনোয়ার করাচি গেল জীবন হাতের মুঠোয় নিয়ে ১২৮
ওষুধ সংগ্রহ ১২৯
বাসিত চাচা, আমি এবং বাবলু ১৩১
এক পথের কুকুর, মহিউদ্দিন ও তার সহযাত্রীরা ১৩৩
লোকটা জাসুস ছিল! ১৩৫
কালিপদ ১৩৭
হাটবি তো হাট নইলে ফেলে যাবো ১৩৮
চুকনগর গণহত্যা ১৩৮
জব্বার সাহেব হারিয়ে গেলেন ১৩৯
জহুর আমার বন্ধু ছিল ১৪০
স্বর্ণালী ১৪১

জুট অফিসার ১৪৩
বড় মাপের একজন মানুষ ১৪৪
মওলানার বক্তৃতা ১৪৬
কে যায়? ১৪৬
সভার এক সিদ্ধান্ত হায়দারের পথ বদলে দিল ১৪৭
তাজউদ্দিন মোসলমান না ১৪৮
এসকেন্দার কবির বাচ্চু ১৪৮
কাফেলা ১৪৯
ইন্ট্রোগেশন ১৪৯
পিকচার প্যালেস মোড় ১৫০
বাবা চলে গেলেন ১৫২
যমদূতের মত নসরুল্লা অফিসের দোরগোড়ায় এসে দাঁড়াল ১৫২
ফারুক ড্রাইভার ১৫৪
ফয়জুল হক ১৫৫
রজব আলী ফকির ১৫৭
দেবী ১৫৯
শাহীন হোটেল ১৫৯
মোলাহাটের ঘটনা ১৬১
নকশাল মারতা হ্যায়সেপ্টেম্বর,৭১ ..... ১৬৪
চেয়ারম্যান মনসুর সাহেব-৬১ ..... ১৬৬
শফিক রাজাকার হল ১৬৭
আব্দুর রউফ, বাবা এবং জজ সাহেব ১৬৮
বিপদ কখনো একা আসেনা ১৭১
শেখ মুজিবের বিচার ১৭২
বিপন্ন সময় ১৭২
মন্টু ভাই, দায়িত্ব দিলেন ১৭২
কপোতাক্ষা নদের পথ ১৭২
মানসিক চাপ ও আতংকেরমধ্যে আঠারো ঘন্টার রেলযাত্রা ১৭৪
রাজাকার কমান্ডারের শব মিছিলে আমরা কিছুক্ষণ ১৭৬
হৃৎপিন্ড খামচে ধরা এক বিমান ছিনতাইয়ের ঘটনা ১৭৭
শেখ মুজিবের বিচার প্রহসন ১৮০
নুরু এবং তার কোরানে হাফেজ মা ১৮০
পাটকেলঘাটা ব্রীজ ১৮২
গোশের কেজী আট আনা ১৮৪
শহীদ ইলিয়াস আহমদ ১৮৫

ওরা নূর মোহম্মদকে উঠিয়ে নিয়েগেল ১৮৭
পাড়ায় মিলিশিয়া রাজাকার ক্যাম্প ১৯১
বেলায়েত সাহেব, মোস্তাক এবং আজমল আলী ১৯১
প্লাটিনাম গেটে তল্লাশি ১৯৪
রবিউল সাহেব ও তার থ্রি ব্যান্ড রেডিও ১৯৫
ট্রেঞ্চে নগ্ন নারী, জুট অফিসার ইকবাল ফাহমি দেশ ছাড়লেন ১৯৭
গোয়ালপাড়া-৪ ..... ২০০
ফেরিঘাট মোড়ে আর্মি পোস্ট আমাদের চমকে দিল ২০০
দীর্ঘ পশ্চাদপসরণ ২০২
ঘটনাবহুল ১০ ডিসেম্বর ২০২
আত্মঘাতী বিমান হামলা: রূপসায় ভয়াবহ গানবোট বিস্ফোরণ ২০৬
সারেন্ডার ২০৮
তমিজউদ্দিন মওলবী ২০৯
আফজাল ২০৯
প্রত্যক্ষদর্শী ২১০
তিনি আত্মসমর্পণ করলেন ২১৩
ড্রেনে পোতা লাশ ২১৭

উৎসর্গ: একাত্তরের শহীদ, লাঞ্ছিত নির্যাতীত নারী পুরুষ ও ছিন্নমূল মানুষ যাদের সর্বোচ্চ ত্যাগে প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ

মুক্তিযুদ্ধ ঃ আমার কথা

১৯৭১ শুধুমাত্র একটি সাল নয়, এর ব্যাপ্তি তিনশত পয়ষট্টি দিনের গন্ডিতেও সীমাবদ্ধ নয়। ১৯৭১ বলতে যা বুঝায় তা একটি মহান জাতীয় চেতনাবোধ এবং একটি মহা সংগ্রামের গাথা। সরলভাবে বললে এর উদ্ভব ১৯৪৬-৪৭ সালে যখন বাঙালিদের দাবী উপেক্ষা করে ভারতের ব্রিটিশ বড়লাট ও উত্তর-পশ্চিম ভারতীয় নেতৃবৃন্দের চক্রান্তে বঙ্গভঙ্গের মত বিয়োগান্ত ঘটনার সুত্রপাত ঘটে

আমরা সেইসব বিরল সৌভাগ্যবানদের মধ্যে পড়ি যারা ১৯৭১ অতিক্রম করে এসেছি। কোন জাতির জীবনে একাত্তরের মত কালজয়ী সময়কাল কমই আসে। যদি আসে সে জাতি অবশ্যই সৌভাগ্যবান এবং যারা সেই যুগসন্ধিক্ষণে সব ভয় ভীতি পিছুটান উপেক্ষা করে সরাসরি ঘটনা প্রবাহে সংপৃক্ত হয় তারা পরম সৌভাগ্যবান, তারা জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান, বীরশ্রেষ্ঠ। দুর্ভাগ্যক্রমে আমি সেই দলে পড়ি না। ঐ ভীতি পিছুটান আমি উপেক্ষা করতে পারিনি। আমি দেশে ছিলাম। নিরস্ত্র অসহায় একজন মানুষ, অথচ ঘটনা প্রবাহ থেকে নিজেকে দূরে রাখতে অক্ষম। এ এক কঠিন পরিস্থিতি, পদে পদে যা তখন অবশ্যম্ভাবী ছিল, তার সম্মুখে পড়ে দিনে দিনে শুধু নিঃশ্বেষ হওয়া, দজ্জালের কাছে অনিশ্চিত আত্মসমর্পণ, অথবা করুণাময়ের উপর নির্ভরশীলতার সান্তনা।

আমাদের '৭১ এত অশ্রু রক্ত ঘাম এবং ক্লেদে সিক্ত যার তুলনা কেবল মাত্র দুটি মহাযুদ্ধের যন্ত্রণার মধ্যেই পাওয়া সম্ভব, অন্য কোথাও নয়। অথচ আজো '৭১ নিয়ে কালজয়ী কোন রচনা সম্ভাব হয় নি। তবে কেউ বলবে না, সময় ফুরিয়ে গেছে। পৃথিবীর অনেক কালজয়ী রচনাই ঘটনা প্রবাহের অনেক অনেক এমনকি অর্ধশতাব্দী পরও প্রকাশিত হয়েছে। আমরা তাই আশায় আশায় আছি আমাদের লব্ধপ্রতিষ্ঠ কথা সাহিত্যিক অথবা অকস্মাৎ অজ্ঞাত অখ্যাত কেউ একজন আমাদের ৭ রত্ন ত্যাগও মহানুভাবতার একাত্তর নিয়ে অবশ্যই লিখবেন মহোত্তর কোন উপন্যাস।এর অজস্র উপাদান এবং উপজীব্য তো আমাদের ৫৪ হাজার বর্গমাইলের দেশ জুড়ে কৃষ্ণচুড়ার পাপড়ির মত ছড়িয়ে আছে।

এমনই অজস্র ঘটনা আমাদের অনেকেই যে যে ভাবে পেরেছেন তাদের ক্ষুদ্র বৃহৎ প্রচেষ্টায় তুলে ধরেছেন। এখন অপেক্ষা এক-একাধিক কালজয়ী উপন্যাসের।

'৭১ আমাকে অনুপ্রাণিত করেছিল কিছু লেখার জন্য। আমি নিজে বহু ঘটনার স্বাক্ষী। আবার অনেকের অনেক বেদনাবিধুর অভিজ্ঞতা শোনার সুযোগ আমার হয়েছিল। আমি তখন স্টার জুট মিলের হিসাব বিভাগে চাকরিরত ছিলাম। সরকারের নির্দেশে, শান্তিকমিটি ও তাদের লেঠেলদের উৎপীড়নে অথবা নিছক পেটের তাগিদে একে একে চাকরিতে ফিরে আসছে শ্রমিক কর্মচারিরা। তারা আসছে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে। কিভাবে যেন রটে গেল আমি তাদের অভিজ্ঞতার কথা জানতে চাই। তারা টিফিন পিরিওডে চুপিসাড়ে আমার অফিসে এসে ফিসফিস করে শুনিয়ে যেত নানা কাহিনী– তার মধ্যে যেমন ছিল হানাদার পাকিস্তানি সৈন্য, শান্তিকমিটি ও রাজাকারদের নির্মম নৃশংসতার কথা তেমনই ছিল অকুতোভয় প্রায় নিরস্ত্র বাঙালিদের মহান বীরত্বব্যাঞ্জক প্রতিরোধ যুদ্ধের কথা। তবে এই স্বাক্ষাতকারের ঘটনা বেশী দিন চলেনি। আমাদের মধ্যে দু চারজন অঘোষিত রাজাকার তো ছিলই। তারা এই ধরণের ঘটনা আঁচ করে আমার জন্য প্রায় বিপদজনক একটা পরিস্থিতি সৃষ্টি করে। তবে সেই দুঃসময়ে আমাকে বেঁচে থাকতে সাহায্য করেন আমাদের বিভাগীয় প্রধান এস আই খান এবং অবিশ্বাস্য একব্যক্তি– খয়রাত হোসেন, মিলের অবাঙ্গালী সিকিউরিটি অফিসার। তার সাথে, মাঝে মাঝে সামনা সামনি হলে, সালাম বিনিময় ছাড়া আমার কোন হৃদ্যতা ছিলনা। তিনি সময়মত পালিয়ে যাননি। হয়তো লোকজনের নজরদারীর মধ্যে ছিলেন, তবে তার বিরাট আশা ছিল শেষ মুহূর্তে নেভি গানবোট তাকে উদ্ধার করবে। তার দুর্ভাগ্য নৌ কমান্ডার গুলজেরিন খান এসব তুচ্ছ বিহারী খেদমতগাদের মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে ৬ তারিখেই গানবোট নিয়ে পালিয়ে গিয়েছিলেন।

আমি আগে কখনো ডাইরী লিখিনি। '৭১ আমাকে ডাইরী লেখার জন্য অনুপ্রাণিত করে। আমার দুঃখ হয় ডাইরীতে আমি কেবল আমাদের মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে বিশ্বের বিভিন্ন বেতার কেন্দ্রের খবরা খবর ও ভাষ্য লিপিবদ্ধ করেছি। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা লিখিনি। সে সব লেখা ছিল ছোট ছোট আলগা শিটে। সন্ধ্যার পর হেরিকেনের টিমটিমে আলোয় আমাকে অনেক সময় ধরে লিখতে দেখে আব্বা একদিন জানতে

চেয়েছিলেন, এতকি লিখছি। তাকে জানালে তিনি ভয়ার্ত কণ্ঠে বলেন, ধরা পড়লে এটাতো বিপদজনক হবে, তুমি ঘটনাগুলো মনে রাখো এবং সুদিন আসলে তখন লিখো। তবু লেখা বন্ধ করিনি, হৃৎপিন্ড খামচে ধরা জীবন্ত ঘটনাগুলো জীবন্তভাবেই নোট করতে চেয়েছিলাম। যদিও তখন লেখালেখিতে আমি নিতান্তই নবিশ এবং মনের ভাবটি সঠিকভাবে ফুটিয়ে তুলতে অক্ষম। একত্রিশ জুলাই পর্যন্ত আমি খোলা কাগজেছোট ছোট চার বান্ডিল নোট লিখেছিলাম। সেলোফেন কাগজে মুড়ে বান্ডিলগুলো ঘরের চালে এবং ইটের পাঁজার ফাঁকে রেখেছিলাম। তখন নরম পলিথিন কাগজ পাওয়া যেতনা এবং শক্ত সেলোফেন বর্ষার পানি রিরোধে যথেষ্ট ছিলনা। এক আগস্ট বাবা মারা গেলেন, ৩ আগস্ট আমাকে বাড়ি ছেড়ে পালাতে হল। ১৫ দিন পর ক্লিয়ারেন্স পেয়ে বাড়িতে ফিরেছি। স্বাধীনতার পর জায়গাগলো অনুসন্ধান করে একটি মাত্র বৃষ্টিভেজা ছোট বান্ডেল পাই, বাকি তিনটের হদিস নেই।

অনেকদিন থেকেই ভাবছি লিখবো। কিন্তু ভাষা পাচ্ছিনা। তার উপর সীমাহীন আলস্য। এভাবে তিন যুগ কেটে গেল। এদিকে ভিতরে ভাঙ্গনের টান অনুভাব করছি। আল্লাহর কাছে সব সময় প্রার্থনা কিছু আয়ুসকালের জন্য। যেন লেখাটা শেষ করতে পারি। এখন ভাষার কথা ভাবি না। ভাবি ঘটনাগুলো বাঁচিয়ে রাখার কথা। নতুন প্রজন্মের জন্য। একদিন না একদিন তারা কেউ ভাষা দেবে।

পাকিস্তানঃ স্বপ্ন-দুঃস্বপ্ন

১৯৪৭ সালেস্বাধীনতার আবরণে গভীর সাম্প্রদায়িক সংকটের মধ্যে বঙ্গভঙ্গ ঘটে গেল। বেশ কিছু শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের অখণ্ডস্বাধীন বাংলা রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠার শেষ প্রচেষ্টাও সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধিতে ফানুষের মত মিলিয়ে গেল।দ্বিখণ্ডিত বাংলার পশ্চিমাংশ ভারত এবং পূর্বাংশ হাজার মাইল দূরের পাকিস্তানের সাথে সংযুক্ত হল। তবু মানুষের আশা ছিল অতঃপর সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির অবসান হবে এবং হিন্দু মুসলমান যে যে দেশেই থাকুক নিজ বাসভূমে সম্প্রীতি ও সৌহার্দের মধ্যে বসবাস করবে। কিন্তু পঞ্চাশের দাঙ্গায় সে আশা নিরাশার বালুচরে বিলীন হয়ে গেল। ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাধারাবাহিকভাবে উভয় দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়তে থাকল এবং পূর্ববঙ্গের হিন্দু ও পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানকে ব্যাপকভাবে ভিটেমাটি ছাড়া করল। নিয়তি আমাদেরকে এই লক্ষ লক্ষ ছিন্নমূল মানুষের কাফেলায় সামিল করেছিল এবংসাজানো বাড়িঘর ও আজন্মের ঠিকানা ফেলে ঘোর অনিশ্চয়তার মধ্যে অচেনা পূর্ববঙ্গের পথে ঠেলে দিল।

বসিরহাটের বাড়িঘর ফেলে ইছামতি পার হয়ে আমরা প্রথমে দেবহাটা, পরে সাতক্ষীরা-সেনহাটি হয়ে খুলনায় এলাম '৫২ সালের মাঝামাঝিতে। আরো চার বছর শহরের নানা ভাড়া বাড়িতে যাযাবরের মত জীবন কাটিয়ে '৫৬ সালের শেষে শহরের দক্ষিণ উপকণ্ঠে মিয়াপাড়ায় আবার নিজেদের স্বপ্নের বাড়িতে উঠি। বিরল বসতির ছোট্ট গ্রামটির শেষপ্রান্তেবিলের মাঝে পুকুর কেটে মাটি ভরাট করা এক খন্ড উচু জমিতে মাটির পোতা, মুলিবাঁশের বেড়া এবং গোলপাতার ছাউনির কাঁচা ঘর– আমাদের স্বর্গভূমি। গ্রামটি ছিল চাষী ও গাড়োয়ান সম্প্রদায় অধুষিত, আমাদের মত 'ভদ্রজনের' অগ্রসনে যারা বর্গাচাষের জমি হারিয়ে ক্রমাগত আরো দক্ষিণে সরে যাচ্ছিল। তখন আমাদের অনেকেরই দৃষ্টিভঙ্গী ছিল যে আমরা সেই চোদ্দশতাধিক বছর আগেরমহানবীর সাথে মদীনায় হিজরতকারী মোহাজিরের মতই সম্মানীয় এবং স্থানীয়রা সেভাবেই আমাদের দেখবেন। কিন্তু অধিকাংশ স্থানীয়দের কাছে আমরা ছিলাম উড়ে এসে জুড়ে বসা রিফুজি বিশেষ। রিফুজি শব্দটি ধীরে ধীরে কখন যে গালির পর্যায়ে চলে গেছে তা বুঝতে আমাদের অনেক সময় লেগেছিল।

অবস্থা যাই হোক আমরা আমাদের নতুন দেশ পাকিস্তানকে ভালবেসেছিলাম, না বেসে উপায়ও ছিল না।ঘরপোড়া গরুর মত সিঁন্দুরে মেঘকে আমাদের সদা ভয়। প্রায়ই এমন শঙ্কায় থাকতাম যে পায়ের তলার এই মাটিটুকু হারালে 'হিন্দুস্থান' পরিবৃত বৈরী ভূখণ্ডে কোথাও আমাদের দাঁড়াবার জায়গা থাকছে না।

১৯৫৮ সালে আমি তখন খুলনা সেন্ট যোসেফস্ হাই স্কুলের দশম শ্রেণীর ছাত্র, দেশে আইয়ুব খাঁর সামরিক শাসন জারি হল। আমি কাগজে স্মার্ট, স্ফীতবক্ষ আমাদের সেনা প্রধানের হাফবার্স্ট ছবি দেখে অশেষ পুলকিত হলাম এবং ভাবলাম পাকিস্তান এযাত্রা বেঁচে গেল। এর আগে দেশে ঘনঘন মন্ত্রীসভার পরিবর্তনে সবাই অত্যন্ত মুষড়ে পড়েছিল। আমি বন্ধুদের সামনে উচ্ছাস প্রকাশ করতে বিলম্ব করিনি।

আহসান আমাদের মধ্যে সুপুরুষ বলে প্রশংসিত ছিল। তবে খুব কম ছেলেই তাকে আহসান নামে চিনত। সে ডাক্তার নামেই অধিক পরিচিত ছিল। স্কুল জীবনে এই দুর্লভ খেতাবটি সে অর্জন করেছিল ফেজটুপি পরিহিত আমাদের উর্দু স্যারের কল্যাণে। সামনের বেঞ্চের সহপাটির পশ্চাদ্দেশে সুচালো পেন্সিল ঢুকিয়ে সে কিছুক্ষণের জন্য তার অনুভূতি অসাড় করে দিয়েছিল। উর্দু স্যার তার ক্ষুদ্র হাতে আহসানের বলিষ্ট গর্দান চেপে ধরে বলেছিলেন– 'কেয়া বাচ্চো, ডাক্তার বন গিয়া আউর সুচ ভি দে দিয়া!' স্যারকে আর কিছু করতে হয়নি, আহসানকে আমরাই ডাক্তার বানিয়ে ছাড়লাম।

আহসান সম্ভবত কোন রাজনীতি সচেতন পরিবার থেকে এসেছিল এবং আমার কথা কেড়ে নিয়ে তির্যক মন্তব্য করল– তোমাদের চিন্তার গভীরতা কম, সামনে নির্বাচন ছিল, অথচ আমরা এখন আর্মি বুটের তলায় পড়লাম। বৃটিশ বুটের তলা থেকে পাঞ্জাবী বুটের তলায়।কথাটা আমার বুকে শেলের মত বিধল। সম্ভবত অন্যদের মধ্যেও একই প্রতিক্রিয়া হয়েছিল। তারা আহসান কে চেপে ধরল, এ কথার অর্থ কি?

– অত-শত জানিনা, তবে কথাটি ঠিক।তার হাতে পূর্ববঙ্গের উপর পশ্চিম পাকিস্তানীদের শোষণ বঞ্চনার অনেক অকাট্য প্রমাণ ছিল। কিন্তু আমি কেবল আমাদের জন্য সুদিনের আশাটুকুই ব্যক্ত করতে সমর্থ হলাম।

আমাদের বাংলা শিক্ষক ছিলেন হাবিবুর রহমান। আমাদের ভালবাসতেন। সে সময় স্কুলের কয়েকজন শিক্ষক ছিলেন খুবই সমীহ জাগানো। তিনি ছিলেন তাদের একজন। ফকির বাড়ি লেনে থাকতেন। ক্লাসে ঢুকতেই আমিজিজ্ঞাসা করে বসলাম– স্যার একথা কি ঠিক যে আমরা বাঙালিরা এখন পাঞ্জাবী বুটের তলায় পড়েছি।

স্যার থমকে গেলেন, কে বলেছে এসব?

– ডাক্তার বলেছে স্যার।

স্যার আহসানের দিকে ফিরে বললেন, এসব ভাবনা চিন্তার জন্য তোমরা যথেষ্ট বড় হওনি। যেখান থেকেই শুনে থাকো এ নিয়ে আর কখনো আলোচনা করতে যেও না। তোমাদের অভিভাবকদের জন্য সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে। যাহোক, ভালহল না মন্দহল ভবিষ্যতেই তা জানা যাবে। তবে পূর্ব বাংলার জন্য খুব যে একটা ভাল হয়েছে তা বোধহয়ঠিকনা। আমাদের নেতারা সবাই খারাপ ছিলেন না এবং যারা ক্ষমতা নিল তারা সবাই ভাল এমন গ্যারান্টিও নেই। যাকগে, যা হবার তা হবে, বই খোলো।

এর মাত্র কয়েকদিন পর পার্কে ব্যাডমিন্টন কোর্ট কাটতে যেয়ে আমরা প্রথম ধাক্কা খেলাম। অনেক দিন থেকে সেখানে রঙবেরঙের পট্টি লাগানোজামা-পাজামা ও গালিব টুপি পরাএক লোক 'মসল্লামুড়ি' বিক্রি করত এবং খদ্দের আকর্ষণের জন্য থেকে থেকে 'ম-স-ল্লা মুড়ি' বলে চিৎকার দিত। খুবই মুখরোচক মুড়ি, তার বহনযোগ্য ছোট্ট টেবিলের সামনে ভিড় লেগেই থাকত। একদিন দুই জোয়ান কাঁধে রাইফেল ঝুলিয়ে আয়েসি মুডে পার্কে প্রবেশ করল। মুড়িওয়ালার সঙের মত জামা-কাপড় তাদের নির্দোষ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু হঠাৎ 'ম-স-ল্লা মুড়ি' বলে চিৎকারে তারা প্রথমে বিস্মিত হল। খুব দ্রুত ক্রোধে তাদের চেহারাবিকৃত হয়ে গেল এবং সবেগে ধেয়ে এসে তারা মুড়িওয়ালার কলার খামছে ধরে চেঁচিয়ে উঠল– শালে বহিনচোত্, তু মার্শাললকো ইনসাল্ট কিয়া!

এক ভদ্রলোক অদূরে দাঁড়িয়ে আমাদের কোর্ট কাটা দেখছিলেন। সম্ভবত আমার মত তারও আমাদের 'বীর সীপাহীদের' উপর গভীর আস্থা, মুড়িওয়ালার উদ্ধারে এগিয়ে এসে বললেন–'হুজুর, ইয়ে গরিব নাদান হর কিসিমকা মসল্লা, আই মিন স্পাইস মিলাকে টেস্টি মুড়ি বানাতা হ্যায়। উসকো 'মসল্লা মুড়ি' কাঁহাতা হ্যায়। উনহে মার্শাল'লকো বারে মে বুরা কুছ বোলা নেহি, ইনসাল্ট ভি কিয়া নেহি। উসকো ছোড় দিজিয়ে হুজুর।'

আর্মিরা সম্ভবত ইতস্তত করছিল, ভদ্রলোক হতভম্ভ মুড়িওয়ালাকে বললেন– 'মাপ চা বেটা, জানিস না এখন সময়টা কত খারাপ।' তার শেষ কথাটা অগ্নিকুণ্ডে ঘৃতাহুতির অবস্থা ঘটাল। সৈন্যটা এটুকু বাংলা বুঝতে সমর্থ ছিল, গর্জে উঠল–'কিয়া কাঁহা তোম!' আমরা সবেগে আর একটা হাত ছুটে যেতে দেখলাম, সেটা ভদ্রলোকের কলার চেপে ধরল। সময়ের ভাল-মন্দ নিয়ে ভিড়ের মানুষগুলো ঠেকে শিখেছে, কেউ আর টু শব্দ পর্যন্ত করলো না। মার্শাল'ল চলছে! বাদী, বিচারক, সাজা প্রয়োগকারী পক্ষ অভিন্ন। টেনে হিচড়ে দুজন বিবাদীকে পাশাপাশি দাঁড় করানো হয়েছে, পঁচাশ দফে উঠবোসের দন্ড ঘোষিত হয়েছে- আনুসাঙ্গিক বিষয়টাও যুক্ত আছে। আমি বোকার মত দাঁড়িয়ে ছিলাম, আহসান অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাল।

তবে নিজেদের শেষ আশ্রয় বিবেচনায় আমার মনে কোন দ্বিধা ছিল না যে পাকিস্তান আমাদের একমাত্র চয়েস। এমন কি আহসানও বিকল্প কিছু ভাবত না। আসলে তখন স্বাধীন বাংলাদেশ পর্যন্ত দৃষ্টিসীমা প্রসারিত করার সামর্থ আমাদের ছিলনা। পাশাপাশি আমরা নিরবচ্ছিন্ন পাকিস্তানি প্রপাগান্ডার কারণে উঠতে বসতে 'হিন্দুস্থানের' আগ্রাসন নিয়ে দুঃশ্চিন্তায় ভুগতাম এবং আমাদের পশ্চিম পাকিস্তানি দৈত্যাকৃতির ভাইদের ইখতিয়ার উদ্দিন মোহম্মদ বিন বখতিয়ার খলজির মত আজানুলম্বিত বাহু শক্তির উপর পরম ভরসা করতাম।

মহাবিদ্যালয়ের জীবন

বিজ্ঞান বিষয়ে আমার আগ্রহ ছিল না। আমাকে টানতো ইতিহাস, ভূগোল, বাংলা সাহিত্য এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞান। কিন্তু ম্যাট্রিকে ফার্স্ট ডিভিশন পাওয়া একটা ছেলেকে কোন্ অভিভাবক এসব 'ছাইপাশ' পড়তে দিতে পারেন, যেখানে অন্ন সংস্থানের নিশ্চয়তা নেই। এদিকে আমাদের

সকলেরই সাতচল্লিশ পরবর্তী উদ্বাস্তু জীবনের কঠিন অভাব অনটন দ্রুত নিরসনের প্রবল তেষ্টা। ফলে নিশ্চিত চাকরি ও উচ্চ বেতনের সম্ভবনায় ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার স্বপ্নে আমি দৌলতপুর কলেজেবিজ্ঞান শাখায় ভর্তী হয়ে গেলাম।

আমি তখন প্রথম বর্ষের ছাত্র, পড়াশুনা অপেক্ষা স্বভাবতই এক্সট্রা কারিকুলামের দিকে বেশী ঝোঁক। ছাত্র সংসদের নির্বাচনে দাড়িয়ে পত্রিকা বিভাগেপ্রতিনিধি নির্বাচিত হলাম। একদিন ক্লাসে নোটিশ জারি হল, কলেজের ইউওটিসিতে (ইউনিভার্সিটি অফিসারস ট্রেনিং কোর) ভর্তী শুরু হচ্ছে। দেশ রক্ষার জন্য সামরিক বাহিনীতে যাওয়ার চিন্তা অনেক দিন থেকেই আমার মাথায় ছিল। তবে এটা বন্ধুদের কাছে বলার উপায় ছিলনা, তাহলে পরামর্শের ছলে ক্ষেপানোর সুযোগটা তারা কখনোই হাতছাড়া করত না– আগে তুই বরং যথেষ্ট লম্বা হওয়ার জন্য গলায় দড়ি বেঁধে ঘরের আড়ার সাথে ঝোলাঝুলি শুরু কর। আমি দায়িত্বপ্রাপ্ত স্যারের সাথে কথা বলে নিশ্চত হলাম উচ্চতা কোন ফ্যাক্টর নয়, আমি দ্রুত নাম রেজিস্ট্রি করে এলাম। বাবা এসব ব্যাপারে উৎসাহী ছিলেন।

তখন যদিও খুলনায় স্থায়ীভাবে আমাদের মাথা গোজার ঠাই হয়েছে, কিন্তু উদ্বাস্তু জীবনের ভয়াবহ দৈন্য আমাদের গোটা পরিবারকে জেরবার করে রেখেছে। আমি দুটো সার্ট, দুটো পাজামা সম্বল করে ছাত্রজীবন কাটিয়েছিলাম। ফলে ইউওটিসি ট্রেনিংয়ের জন্য সাদা প্যান্ট কেডস বেল্ট ইত্যাদি সংগ্রহ করা বেশ দুঃসাধ্য হল। এজন্য আমার মত অনেক ছাত্রকে প্রায়দিনই সুবেদার মেজরের বকাঝকা খেতে হত। তার জিহ্বা অসম্ভব ধারালো ছিল এবং সামান্য ভুলের কারণে আমাদের বাঙালিয়ানার চোদ্দগুষ্টি উদ্ধার করত। সে সম্ভবত তার সামরিক জীবনের শেষ দিকে অর্জিত পারফেকশান ট্রেনিং পর্বের শুরুতেই আমাদের কাছ থেকে আদায় করতে বদ্ধপরিকর ছিল।

এর মধ্যে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব একবার খুলনা ভিজিটে এলেন, সম্ভবত পূর্ব পাকিস্তানের উন্নয়নে তার মহান কীর্তি ঢাকা-খুলনা কংক্রিট রোড উদ্বোধনের লক্ষ্যে। বিশ্ব ব্যাংক এই হাইওয়ে নির্মাণে অর্থ যুগিয়েছিল, তাদের প্রতিনিধিও সম্ভবত এসেছিলেন। আমরা ইউওটিসির সদস্যবৃন্দ ইউনিফর্ম পরে কলেজের সামনে ওল্ড যশোর রোডে দাঁড়িয়ে প্রেসিডেন্টকে খোশআমদেদ জানানোর সুযোগ পেলাম। ছাত্র এবং স্থানীয় লোকজনও পথের পাশে ভিড় করে দাঁড়িয়ে ছিল। আমাদের বলা হয়েছিল তিনি এখানে থেমে সংক্ষিপ্ত ভাষণ দেবেন। দুর্ভাগ্যক্রমে, তার গাড়িবহরদ্রুত আমাদের অতিক্রম করে গেল। আমরা কেউ একপলক তার সুরত দেখার সুযোগ পেয়েছিলাম, কেউ শুধু হাত নাড়া দেখেই সন্তুষ্ট ছিল এবং কেউ কেউ ছিল যারা কোনটা আউয়ুব খান তা নিয়ে ঘোর দ্বিধা-দ্বন্ধে ছিল। পরে আমরা শুনেছিলাম, মাত্র আট ফুট প্রশস্ত ত্যাড়া-বাঁকা নিম্নমানেরকংক্রিটের হাইওয়েটি বিশ্ব ব্যাংক প্রতিনিধি দলের ভ্রুকুঞ্চনের কারণ ঘটিয়ে ছিল এবং এরনির্মাণ শৈলীরযাবতীয়ত্রুটি-বিচ্যুতিরদায়ভার হতভাগ্য পূর্ববঙ্গের ললাটেই বিদ্ধ হয়েছিল। তখন সত্য জানা সহজ ছিলনা, তবে জোর গুজব ছিল অদক্ষতাজনিত কারণে বিশ্ব ব্যাংকপূর্ববঙ্গের উন্নয়ন সহযোগিতা আপাতত স্থগিত করেছে।

ইউওটিসির সদস্যদের মধ্যে খর্বাকৃতি হওয়ায়আমি প্রায়ই লাইনের সামনে দাঁড়ানের সুযোগ পেতাম। একদিন মার্চ করে যাওয়ার সময় সামনে কাদাপানি দেখে লাইনটা সামান্য ঘুরিয়ে নিয়েছিলাম। আমাদের পাঁচ মাইল দূরে খুলনায় ফিরতে হবে, জামা-কাপড় ভেজানোর ইচ্ছা ছিল না। এই ক্ষুদ্র বিচক্ষণতা দেখানোর ফলাফল আমার জন্য শুভ হয়নি, নিয়ম ভঙ্গের দায়ে আমি সুবেদার মেজরের হিটলারি আক্রেশের মুখে পড়লাম। সে আমাকে আর্মি রুল শিখিয়ে ছাড়ল যে, সামনে যাই পড়ুক না কেন সোজা যেতে হবে। এদের উন্মত্ত মেজাজ যে কোথায় যেতে পারে আমার তখনও ধারণা ছিলনা। একবার তার এক দেশোয়ালি ভাই মাঠে তার সাথে মোলাকাত করতে এল। আমরা ফরোয়ার্ড মার্চ করে এগিয়ে যাচ্ছিলাম। সে গল্পে মশগুল ছিল এবং থেকে থেকে শুধু 'লেফট রাইট লেফট' শব্দগুলিউচ্চারণ করছিল। আমার মাথায় দুষ্টবুদ্ধি চাপলো। মাঠের মধ্যে প্যারেড সীমাবদ্ধ রাখার সাধারণ নির্দেশ উপেক্ষা করে দ্রুততার সাথে রাস্তা অতিক্রম করলাম। আমি চাচ্ছিলাম অফিস বিল্ডিংয়ের সিঁড়িতে না ওঠা পর্যন্ত সে যেন এদিকে না তাকায়। কিন্তু সেটা হলনা, লাইন থেকে খিক খিক শব্দে হাসির রোল উঠল। এবার তার হুশ ফিরল এবং সমস্ত রাগ এসে পড়ল আমার উপর। সে বুনো শুয়ারের মত ঘোঁৎ ঘোঁৎ করতে করতে তেড়ে এলো।

আমি তাকে যতই বলার চেষ্টা করি যে তিনিতো তখনো পর্যন্তটার্ণ নেয়ার হুকুম দেন নি, ফলে তার কমান্ড মত আমি সোজা মার্চ করে গেছি, ততই তার রাগ চড়তে থাকে। সে একইভাবে রাগারাগি এবং গালিগালাজ চালিয়ে গেল যতক্ষণ না তার দেশোয়ালি ভাই বিষয়টাতে হস্তক্ষেপ করল।

যাহোক পুরো ঘটনার প্রতিক্রিয়া আমার জন্য শুভ হলনা। আমাকে এবং আরো দু-চারজনকে ইউওটিসি ছাড়তে হল। এভাবে আমার পাকিস্তানের হেফাজতে জান কোরবান করার মহান ব্রতঅকালেই মাঠে মারা গেল।

বিজ্ঞান বিষয়ের প্রতি অনাগ্রহ আমাকে ছাত্ররাজনীতির দিকে ঠেলে দিয়েছিল। এর আগে দুবছর দৌলতপুর কলেজে ছাত্ররাজনীতি নিষিদ্ধ ছিল এবং কোন ছাত্র সংসদ ছিলনা। খুলনা থেকে কলেজে যাতায়াত করতে হত ট্রেনে। ছাত্রদের মাসিক টিকিট কাটা ছিল। তবে ছাত্ররা ট্রেনে চড়ার সময় ক্লাশ বাছবিচার করত না। এমন কিছু ফপিশ টাইপের ছাত্র ছিল যারা প্রথম শ্রেণীতে উঠতে পছন্দ করত। একদিন এক আর্মি অফিসার তার সুন্দরী স্ত্রীকে নিয়ে প্রথম শ্রেণীতে ভ্রমণ করছিলেন। তিনি কম্পার্টমেন্ট থেকে ছাত্রদের নেমে যেতে জোরকরলে বিপত্তি বাধে। শেষপর্যন্তভদ্রমহিলা নেকাব খুলে ছাত্রদের অনুরোধ জানিয়ে পরিস্থিতি সামাল দেন। পরে যশোর ক্যান্টমেন্ট থেকে ভ্যান বোঝাইসৈন্য এসে ছাত্রদের বেধড়ক পিটিয়ে একশেষ করে।তখন কলেজ ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন আজকের কথা সাহিত্যিক হাসান আজিজুল

হক। তার ট্রেন ব্যবহারের প্রশ্ন ছিলনা। দায়িত্ববোধ থেকে নিরীহ ছাত্রদের বাঁচাতে যেয়ে তিনিও বেফজুল আর্মি নিগ্রহের শিকার হন। তাকে বেশ কিছুদিন হাসপাতালের বেডে কাটাতে হয়। সেই থেকে কলেজে ছাত্ররাজনীতি থমকে গিয়েছিল। এর সুযোগে কলেজ কর্তৃপক্ষ ছাত্রদের উপর নানা অযৌক্তিক সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেন। আমরা এর বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করি।আমি ছাত্রলীগ করতাম।কলেজের কিছু সংখ্যক শিক্ষকের মধ্যে ডান ও বামপন্থার পোলারাইজেশনের তীব্রতা সম্পর্কে তেমন ধারণা ছিলনা। ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষার সময় আমি এর শিকারে পরিণত হলাম এবং আমার দৌলতপুর কলেজের পাঠ চুকলো।

পাকিস্তান সম্পর্কে আমার বিশ্বাসে চির ধরল হামুদুর রহমান শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট প্রকাশের পর। ছাত্ররা সর্বত্র প্রতিবাদে ফুঁসে উঠল। তখন খুলনায় ছাত্র ইউনিয়ন ছিল শক্তিশালী দল। ছাত্রলীগের ইউনুস ভাই, মুসতাহিদ ভাই, করিম ভাই, লুৎফর ভাই, হাসান রুমি ভাইসহ আমাদের অগ্রজরা আন্দোলনে সামিল ছিলেন। আমি তাতে যোগ দিলাম, যদিও তখন আমি কোন কলেজের সাথে যুক্ত ছিলাম না। আমাকে উৎসাহ দিয়েছিলেন আমার রাজনৈতিক গুরু পাবনার কুদ্দুসভাই। তিনি এবং আরো কয়েকজন সিনিয়র ছাত্র তখন পাঁচ বছরের জন্য কলেজ থেকে বহিষ্কৃত হয়ে খুবই কষ্টের মধ্যে ছিলেন। উৎসাহদাতাদের আর একজন ছিল আমার সহপাটি বন্ধু ও আন্দোলনের সহকর্মী আতিউল ইসলাম। সে কমুনিস্ট ভাবধারায় প্রভাবিত ছিল। এই আন্দোলন খুবই তীব্র ছিল, প্রতিদিনই ছাত্রদের বিশাল বিশাল মিছিল-সমাবেশ হত। আইয়ুব খান শেষপর্যন্ত হামুদুর রহমান কমিশন রিপোর্ট বাতিল করতে বাধ্য হন। ফলে আন্দোলন স্তিমিত হয়, কিন্তু আমি ছাত্ররাজনীতির মাঠ ছাড়তে সমর্থ হইনি।

ছাত্র রাজনীতিতে জড়িয়ে আমি দৌলতপুর কলেজের পড়াশুনা বরবাদ করেছিলাম। আমাদের গরীবের সংসার। ছোট চাকরি এবং বৃহৎ পরিবার নিয়ে বাবা হিমসিম খাচ্ছিলেন। আমি পিপলস জুট মিলে চাকরি নিলাম। কেরানির চাকরি, ভোর সাতটায় বাড়ি থেকে বেরোতে হয়, ফিরি সন্ধ্যে ছটা সাড়ে ছটায়। পাশাপাশি কমার্স কলেজে নৈশ শাখায় ভর্তি হলাম ঠিকমত পড়াশুনা করব বলে। কথায় বলে 'ম্যান প্রপোজেস্, গড ডিসপোজেস।' কলেজে প্রথম ছাত্রসংসদ গঠিত হতে যাচ্ছে, গঠনতন্ত্র প্রণয়নের জন্য ছাত্র প্রতিনিধি নির্বাচিত হবে। আমার দাঁড়ানোর প্রশ্ন ছিল না এবং নৈশ শাখার অধিকাংশ বয়স্ক চাকরিজীবী ছাত্রের মাঝে আমার পরিচিত কেউ ছিল না। তথাপি শুনতে পেলাম একপাশ থেকে এক অতি ভরাট কণ্ঠপ্রতিনিধি হিসাবে কোন এক মনোয়ার আলীর নাম প্রস্তাব করছে। পরমুহূর্তে ক্লাসশুদ্ধ সবাইকে প্রচুর আনন্দে ভাসিয়ে আর এক পাশ থেকে অতি চিকন মেয়েলি কণ্ঠ সে প্রস্তাব সমর্থন করছে। আমি তাদের কাউকে চিনিনা এবং একই নামের 'প্রস্তাবিত মনোয়ার আলীর' সন্ধানে এদিক ওদিক তাকালাম। দেখলাম তারা আমাকেই উঠে দাঁড়াতে ইশারা করছেন। সম্ভবত এটা বাষট্টির ছাত্র আন্দোলনের প্রভাব, আমি না চিনলেও অনেকেই আমাকেচিনত। তারা দুজন- বিনয় ভূষণ চট্টোপাধ্যায় ও মোহম্মদ ইউসুফ অচিরেই আমার লেখাপড়া সংক্রান্ত ভবিতব্যের নিয়ামক হয়ে দাঁড়াল। তাদের সাংগঠনিক সামর্থ অসাধারণ ছিল।শীঘ্রই আমরা ঘনিষ্ঠ বন্ধুতে পরিণত হলাম।

দুটো কারণে আবারআমার পড়াশুনা সিকেয় ওঠার উপক্রম হল।আমার জানা ছিলনা নাজিম মাহমুদ স্যার এখানে ইংরাজি পড়ান। বেটে খাটো হওয়ায় সামনের বেঞ্চে বসতাম, কিন্তু ইংরেজি ক্লাসে নিজেকে লুকিয়ে রাখার চেষ্টায়চলে যেতাম একেবারে পেছনে। স্যারের সাথে সরাসরি পরিচয় না থাকলেও একটা বিশেষ কারণে আমি খানিকটা অপরাধ বোধে ভুগতাম। একদিন ক্লাসে ঢুকে স্যার জিজ্ঞাসা করলেন–হাউ ডু ইউ ডু?

অনেকে জবাব দিল, তবে ঠিকমত দিল না। আমি চুপচাপ ছিলাম। আমরা নৈশ শাখায় পড়তাম, প্রায় সবাই ছিল বয়স্ক এবং চাকরিজীবী। স্যার কটাক্ষ করলেন– সবাই তো দেখি সাহেবের মত ফিটফাট, অথচ একজনও এই সাধারণ প্রশ্নের উত্তর জাননা! আমি মাথা নিচু রেখে হাত তুললাম।

ওয়েল, ওখানে একজন হাত তুলেছে। কে তুমি দাড়াও দেখি।

দাঁড়াতে হল। ওহ্! ইটস ইউ! তিনি আমাকে শ্রেফ উপেক্ষা করলেন, তাহলে তোমরা এত গুলো ছাত্র, অথচ ক্লাসের একজনেরও এই সাধারণ জ্ঞানটুকুও রাখোনা।

আমি আবার উঠে দঁড়ালাম, বললাম– আমি তো উত্তরটা জানি স্যার।

তোমাকে জিজ্ঞসা করিনি। আই নো ইউ ওয়েল- ওল্ড ওয়াইন ইন এ নিউ বটল!

মাথায় রাজনীতির রক্ত চনমন করে উঠল, মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল– অ্যান্ড ইট ইজ ভেরি প্রেসাস স্যার।

স্যার কঠিনভাবে তাকালেন– দাঁতে দাঁত চেপে বললেন এত দামী ছাত্রদের ক্লাশ নেয়ার তোপ্রয়োজন দেখিনা এবং আমি কিছু বলার আগেই ক্রুদ্ধভাবে হাজিরা খাতা, ডাস্টার ফেলে বেরিয়ে গেলেন। ছেলেরা হতভম্ভ, তারপরআমাকে নিয়ে পড়ল- আপনি এসব কি বললেন! উনি তো আপনাকে চেনেন, কি হয়েছে আপনার সাথে? যাই হোক আপনি যান, মাপটাপ চেয়ে যেভাবেই হোক ওনাকে ক্লাশে ফিরিয়ে আনেন।

বললাম আমি স্যারকে চিনি, যা বলেন তা করবেনই। আপনারা দুতিনজন স্যারের সাথে দেখা করে বলুন আপনারা তো দোষ করেন নি। তিনি যেন আপনাদের ক্লাশ নেন, তাকে বলুন, আমি ক্লাশে যাচ্ছি না।

তারা বলল, এটা কিভাবে বলা সম্ভব?

অবশ্যই বলবেন। বিদ্যাদেবীর সাথে আমার একটা ঝামেলা আছে, কবে মিটবে বলা কঠিন।

দ্বিতীয় কারণ, আমি আবার নতুন করে ছাত্র রাজনীতিতে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে গেলাম।ছাত্র সংসদের গঠনতন্ত্র প্রণয়ন কমিটিতে নির্বাচিত হয়েছিলাম। কমিটির লিষ্ট হাতে পেয়ে হতাশ হতে হল, কমিটির প্রধান হিসাবে নাজিম মাহমুদ স্যারের নাম! সভার আগে অফিস রুমের বাইরে দাঁড়িয়ে ছিলাম। অল্পক্ষণের মধ্যে স্যার এলেন, বললেন– এখানে দাঁড়িয়ে কেন, কেউ আসেনি?

– সবাই এসেছে স্যার, আমি দাড়িয়ে আছি সভায় ঢুকতে পারব কিনা সেটা জানতে, পাছে আপনি আবার আমাকে বের করে দেন।

– আরে না না, তুমি তো নির্বাচিত হয়ে এসেছ। মহান ছাত্রনেতা! আমি তোমাকে কিভাবে অস্বীকার করি? যাও ভেতরে যাও। কথার ভিতর হূল থাকলেও সম্ভবত এটা ছিল অচলায়তন কাটার শুভ সূচনা।

আমাদের সঙ্গবদ্ধ প্রচেষ্টায় শীঘ্রই আজম খান কমার্স কলেজ ছাত্রলীগের শক্ত ঘাটি হয়ে উঠল। মাত্র চার-পাঁচ মিনিটের দূরত্বে অনন্ত বাবুর সুইটহাউজ- ছাত্রলীগের আনঅফিসিয়াল অফিস। এখানেসবসময় ছাত্রলীগ কর্মীদের ভিড় লেগে থাকত। তারা আন্দোলন ও সাংগঠনিক কাজের পাশাপাশি সাধারণ মানুষের ছোটখাটো সমস্যা, অভিযোগ ইত্যাদির ব্যাপারেউৎসাহ দেখাতো। ফলে সুইটহাউজ তখন ব্যাপকভাবে পরিচিতি পেয়েছিল, বিশেষকরে অধিকার বঞ্চিত মানুষের কাছে। একবারছাত্র ইউনিয়ন, মেনন গ্রুপের সভাপতি রাশেদ খান মেনন খুলনায় এসেছিলেন। সেকালে ছাত্র সংগঠনগুলোর নিজস্ব কোন অফিস ছিল না, তারা তাদের কোন শুভাকাঙ্খীর রেস্তরা, প্রেস, বাড়ি, হোস্টেল বা এধরনের কোন স্থান বেছে নিয়ে সাংগঠনিক কাজ পরিচালনা করত। মেনন সাহেব সম্ভবত বিনা নোটিশে এসে পড়েছিলেন। তবে খুলনা ছোট শহর এবং ছাত্ররা কোথায় বসে রিকশাচালকের তা জানার কথা– এই বিশ্বাসে মেনন সাহেব ছাত্র ইউনিয়নের অফিসে যাওয়ার কথা বলে রিকশায় উঠে বসেন। রিকশাওয়ালা দ্বিরুক্তিনা করে মূল্যবান অতিথিকে নিয়ে তার সুপরিচিত সুইটহাউজে চলে আসে। সেখানে তখন আজম খান কমার্স কলেজ ছাত্র সংসদের ভিপি এম এ ইউসুফ উপস্থিত ছিলেন। তিনি তাকে যথারীতি আপ্যায়ন করে নিজে কমার্স কলেজের ছাত্র ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দের কাছে পৌঁছে দেন। মেনন সাহেব উদারমনা মানুষ ছিলেন, মুক্তকণ্ঠে খুলনা ছাত্রলীগের সুপরিচিতি ও সাংগঠনিক শক্তির প্রশংসা করেন।

এই ইউসুফ ছিলেন একজন দক্ষ সংগঠক। তিনি পিপলস জুট মিলে চাকরি করতেন এবং কমার্স কলেজে নৈশ শাখায় পড়তেন। তাকে না দেখে শুধুমাত্র কণ্ঠস্বর শুনলে যে কেউ ধরে নিত একজন অগ্নিকন্যা কথা বলছেন। একবার এক বেঁটেখাটো প্রবীন ছাত্র এর ওর ফাঁক দিয়ে ঈপ্সিত বক্তাকে দেখতে ব্যর্থ হয়ে সম্মুখবর্তীকে জিজ্ঞাসা করলেন– কে কথা বলছেন ভাই?

কেন, ইউসুফ সাহেব!

রসিক ভদ্রলোক সাথে সাথে বললেন– ও, আমি ভেবেছিলাম জোলেখা-টোলেখা কেউ একজন হবেন হয়তো।

ইউসুফ সাহেবের বোঝানোর ক্ষমতা অসাধারণ ছিল। কমার্স কলেজের ভিপি ক্যান্ডিডেট হিসাবে তাকে প্রস্তুত করার জন্য চাকরি থেকে ছাড়িয়ে আনা হয়। আমি আমাদের মিলের হিসাব বিভাগের প্রভাবশালী জুনিয়ার অফিসার রায়হান মামাকে বলে-কয়ে ইউসুফের জায়গায় রশীদের চাকরির ব্যবস্থা করে দিয়েছিলাম। কথা ছিল রশিদ তার বেতন থেকে ইউসুফের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করবে। রশিদকে অবশ্য ভাইভা ফেস করতে হয়েছিল গুজরাটি অ্যাকাউন্ট্যান্টের কাছে। সে ভাল করেছিল এবং তার বেতন এক ধাপ উর্ধ্বে নির্ধারিত হয়। রশীদ যাতে নিয়মিত ইউসুফকে টাকা দেয় সেজন্য নির্বাচনে জয়লাভের পর তাকে ছাত্র সংসদের সাধারন সম্পাদক করা হয়। সব কিছুই আমাদের পরিকল্পনা মাফিক সম্পন্ন হয়েছিল। এরপর তির-চার মাস গত হয়েছে, একদিন জাহিদ হঠাৎ বলল ইউসুফ কিভাবে চলে তা কখনো খোঁজ নিয়ে দেখেছ?

– বললাম কেন, রশিদের তো তাকে প্রতিমাসে টাকা দেয়ার কথা, দেয়না নাকি?

– কিছুই দেয় না। ইউসুফ প্রায় প্রতিদিন দুপুরে মেসে ফেরার আগে আমার কাছ থেকে দু আনা চেয়ে নেয়। ভেবেছি চা-টা খায় বোধহয়। একদিন বাড়ি ফেরার পথে দেখি দোকান থেকে ডিম কিনছে। কৌতুহল হল, কিছুক্ষণ পর হাফিজকে নিয়ে ওর ঘরে যেয়ে দেখি, শুধু ডিম ভাজি দিয়ে ভাত খাচ্ছে। আমাদের দেখে হেসে ফেলল, বলল– রাধুনি বুড়িটা আজ আসেনিতো তাই। আমরা চাপাচাপি করলে হাসতে

হাসতে বলল রশিদ কেবল একমাস টাকা দিয়েছে। তার পর থেকে একটা প্রাইভেট টিউশানি করে তার দিন চলছে, একটা বুড়ি দুটো ভাত রেঁধে দিয়ে যায়, আর ডিম তো..., তার নাকি দিব্যি চলে যাচ্ছে।

ইউসুফের একটা অদ্ভুৎ গুন ছিল, 'জাহান্নামের আগুনে বসেও' সে বোধহয় অমলিন হাসতে পারতো।

ইউসুফের সাথে দেখা হতে বললাম– রশিদ যে টাকা দেয় না তা তো কখনো বলেননি।

– দূর ছাড়েন তো, এসব কি বলার মত কথা! আর বললেই বা কি হত, জাহিদরা তো কম বলেনি। কিন্তু ওর সাফ জবাব নিজের কামাই অন্যকে দিতে যাবে কেন। ও নাকি ওর যোগ্যতা বলে চাকরিটা পেয়েছে।

– তাই! কিন্তু আমরা না বললে আর মামা ব্যবস্থা না করলে ইন্টারভিউ তো দূরের কথা ও তো ফিদাই সাহেবের টিকিরও নাগাল পেত না।

শান্তিধামের মোড় থেকে আমরা অফিসের গাড়ি ধরতাম। পরদিন অফিসে যাওয়ার পর রশিদকে বললাম– ঝামেলায় পড়েছি, অফিসে তিনশ টাকা জমা দিতে হবে, জরুরি দরকার, দেখুন তো দিতে পারেন কিনা।

রশিদের সাথে আমার ভদ্রলোকের সম্পর্ক, তবুও সন্দিগ্ধভাবে তাকালো– টাকাটা কি আপনার দরকার, না কি পার্টির জন্য? কবে ফেরত পেতে পারি?

– আজই, সন্ধ্যায় সুইট হাউজে পেয়ে যাবেন। টাকাটা বাড়িতে ফেলে এসেছি।

সুইট হাউজে নেতৃস্থানীয় অনেকেই ছিল। ইউসুফকে টাকাগুলো দিয়ে বললাম– রশিদ সাহেব গত তিন মাসের টাকা আপনাকে দিচ্ছেন। এখন থেকে প্রতি মাসে ঠিক মতই টাকা দিয়ে যাবে, নইলে জিএস পদ থেকে তাকে ইমপিচ করার ব্যবস্থা নেয়া হবে। টুকু আমাকে থামিয়ে কঠিনভাবে বলল– রশিদ সাহেব, শুধু ইমপিচেই ব্যাপারটা শেষ হবে না, এটা মনে রাখলে ভাল করবেন। কামরুজ্জামান টুকু তখন সম্ভবত কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের সহ সভাপতি ছিল। আমাদের মধ্যে দৃঢ় এবং মেজাজী বলে পরিচিত ছিল।

রশিদ বলল– তখনই খটকা লেগেছিল যে আপনি আমার সাথে ফেরেববাজি করতে যাচ্ছেন, কিন্তু যে সরলভাবে কথাগুলো বললেন বিশ্বাস না করে পারিনি।

– ঠিকই, যারা পার্টির সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে আমরাও তাদের সাথে একই ব্যবহার করি।

পরে শুনেছিলাম রশিদ প্রতি মাসে পঞ্চাশ টাকা করে দেয়। অল্পে তুষ্ট ইউসুফ ওতেই সন্তুষ্ট ছিল। এই ঘটনা আজকের ছাত্রদের বিশ্বাস করানো কঠিন। অথচ ষাটের দশকে ইউসুফের মত ছেলেরা দুর্লভ চাকরি ছাড়ার মত ত্যাগ স্বীকার করেছিল, আধাপেটা খেয়ে না খেয়ে সংগঠনের পিছনে শ্রম দিয়েছিল বলেই পূর্ববঙ্গে মহা পরিবর্তনের ভিত সুগঠিত হতে পেরেছিল। ষাটের দশকের বিভিন্ন সময়ে এ ধরনের ঘটনা আরো ঘটেছিল। দৌলতপুর কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পাশের পর পাইকগাছার মেধাবী ছাত্র বাবর আলী পড়তে গিয়েছিল রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে। অথচ দৌলতপুর ব্রজলাল কলেজে ভিপি পদে লড়ার জন্য তাকে প্রয়োজন। বাবর আলী ভার্সিটির ভিসি মহোদয়কে বিস্মিত করে ট্রান্সফার নিয়ে দৌলতপুর কলেজে চলে এলো। তালার আব্দুস সালাম পড়ত দৌলতপুর কলেজে, পার্টির প্রয়োজনে সে যেয়ে ভর্তী হল বাগেরহাটের আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র কলেজে। অভিভাবকরা এ সবের বিন্দুবিসর্গও জানতেন না। আব্দুস সালামের বাবা টিনভর্তী মুড়ি মুড়কি নিয়ে দৌলতপুর কলেজ হোস্টেলে যেয়ে অবাক বিস্ময়ে জানতে পারেন তার পুত্রধন চলে গেছে বাগেরহাট আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র কলেজে ছাত্র রাজনীতি করতে। বলা প্রয়োজন তারা পার্টি এবং পড়াশুনা কোনটিকেই হতাশ করেনি। একাত্তরের রণাঙ্গনেটুকু, জাহিদ, বাবর আলী, সালাম মোড়ল, রশিদ- এরা সবাই ছিল অকুতোভয় মুক্তিযোদ্ধা।

দুর্ভাগ্যক্রমে,ইউসুফ সে সময়কার বিষম পরিস্থিতির শিকারে পরিণত হয়। কামাল তার ক্যাবিনেটের ক্রীড়া সম্পাদক ছিল। হালকা পাতলা, কিন্তু সাহসী। সে সাথে থাকলে প্রতিপক্ষ ছাত্র সংগঠনের হামলার মুখে ছাত্রলীগের ছেলেরা অনেকটা নিরাপদ বোধ করত। ছাত্রইউনিয়ন ও ছাত্রলীগের মধ্যে তখন মাঝে মাঝে এ ধরনের সংঘর্ষ বেধে যেত এবং আমরা ছিলাম দুর্বল পক্ষ। তবে আমাদের উপর আক্রমণটা এলো ভিন্ন দিক থেকে। গভর্নর মোনেম খানের পেটোয়া বাহিনী এনএসএফ খুলনায় কখনো শক্তিশালী ছিলনা। হঠাৎকরে এ সময় তারা খুলনায় শক্তি বৃদ্ধির জন্য সচেষ্ট হয়। সম্ভবত সরকারি কোন বাহিনী প্রথমে কামালকে পাকড়াও করে। আমরা জানতাম না যে সে কিছুটা মাদকাসক্ত ছিল। কামালের মাধ্যমে তারা ইউসুফকে টার্গেট করে। এটা সহজ কাজ ছিলনা। কিন্তু এক সকালে ইউসুফ অপহৃত হয়। দুদিন পর উদ্‌ভ্রান্ত অবস্থায় তাকে পথে পাওয়া যায়। সে শুধু বলতে পেরেছিল রিকশায় বসে কামাল তাকে সিগারেট অফার করেছিল, সে ঠিক জানেনা তারপর কি ঘটেছিল। তাকে একটা ভাঙ্গাচোরা ঘরে আঁটকে রাখা হয়। আজ ভোররাতে দুজন লোক তাকে ঘরের পিছনে সংকীর্ণ ব্যালকনিতে নিয়ে

যায়। তারা তাকে কিছু নির্দেশ দিয়ে বলেছিল অন্যথা করলে তাকে নিচে ঝুলিয়ে ইট-পাটকেলের উপর ফেলে মাথা থেতলে দেয়া হবে। ইউসুফ ভোলা থেকে এসেছিল এবং সাহস হারিয়ে ফেলেছিল।

আমাদের ছেলেরা ইউসুফকে তার মেসে সর্বক্ষণ পাহারা দিয়ে রেখেছিল। কিন্তু ঘুম থেকে উঠে ইউসুফ কিছুক্ষণ পর আসছে বলে একরূপ জোর করেই তাদেরকে বিদায় করে দেয়। আমাদের আশঙ্কাঠিক ছিল, বেশ রাতকরে ইউসুফ এলো সুইট হাউজে, মুখে মলিন হাসি। সাথে কমার্স কলেজের বর্তমান ভিপি আব্দুস সোবহান ও জিএস .. বৈদ্য। তারা অধোবদন হয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিল। কথা বলল ইউসুফ– স্বেচ্ছায় সজ্ঞানে তারা এনএসএফ-এ যোগ দিয়েছে, এর বেশি কিছু তাদের বলার নেই।তবে রাজনীতি যাই করুক বন্ধুত্ব যেন ঠিক থাকে, এটাই তাদের কামনা।

ছাত্রলীগ তার ক্ষতি কাটিয়ে উঠেছিল, কিন্তু যুগসন্ধিক্ষণের মুহূর্তে ছাত্ররাজনীতি থেকে হারিয়ে গেল সম্ভাবনাময় তিন তরুণ।

চাকরি জীবন এবং বোধোদয়

'৬৫ সালে আমার ছোটভাই আনোয়ার আজম খান কমার্স কলেজে দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র ছিল। সে সুদর্শণ এবং স্বাস্থ্যবান ছিল। তবে তার জন্য প্রয়োজনীয় খাবার যোগানো আমাদের ভারি সংসারে কষ্টকর ছিল। বাজারের মোটা চালের ভাত এবং ভিটায় ফলানো ডাঁটাশাক, ঢেড়স ও কাঁচকলা আমাদের নিত্যকার খবার ছিল। আমাদের ব্যাজার মুখ দেখে দাদি রসিকতা করে বলতেন– কেনরে, তিন ভাগই তো আছে 'থোড়-বড়ি-খাড়া, খাড়া-বড়ি-থোড়।'ত্যাক্তবিরক্ত আনোয়ার একদিন আমাদের রাঙ্গির গলার দড়ি খুলে শাকের ক্ষেতে ছেড়ে দিয়ে বাবার দারুণ মনোকষ্টের কারণ ঘটিয়েছিল।

১৯৬৩ সালে আমার চাকরি হল পিপলস জুট মিলের হিসাব বিভাগে।আমি দ্রুত অফিসের কাজগুলো বুঝে নিলাম। আমার দুই মামা ছিলেন জুনিয়র অফিসার, তারা সহযোগিতা করলেন। নইলে সে কালে হীনমন্যতাবশে কেউ কাউকে সহজে কাজ শিখাতে চাইতেন না। এটা আমাকে বিস্মিত করত। কর্তৃপক্ষের নির্দেশে সহকর্মীদের শুধু কাজ বুঝিয়ে দেয়াই নয়, প্রায় সময়ই তাদের পেন্ডিং কাজও আমাকে করে দিতে হত। কিন্তু বিস্ময়ের ব্যাপার স্টাফদের জন্য বরাদ্দ প্রমোশন, স্পেশাল ইনক্রিমেন্ট ও বোনাস অবাঙালি এবং জো-হুকুম কিছু বাঙালি স্টাফ বাগিয়ে নিত। পিপলস জুট মিলের সাড়ে চার বছরের চাকরি জীবনে আমি কেবল কেরানি থেকে অফিস সহকারী হতে পেরেছিলাম, তাও এই পদের সর্বনিম্ন বেতনে।

চাকরির পাশাপাশি আমি আজম খান কর্মাস কলেজের নৈশ শাখায় ভর্তি হয়েছিলাম এবংপড়াশুনার শপথ নিয়েছিলাম। কিন্তু বিধি বাম। কলেজে ভর্তী হওয়া বরং আমার ছাত্ররাজনীতির পথটা আবার ভালভাবে খুলে দিয়েছিল। পিপলস জুট মিলে ছুটি নেয়ার একটা ভাল নিয়ম ছিল, আধা দিন ছুটি নেওয়া যেত। চার বছরের চাকরি জীবনে আমি সম্ভবত ১৫-২০ ভাগ কর্ম দিবসে দ্বিতীয় অর্ধে নানা অজুহাতে ছুটি কাটিয়েছি। তারা আপত্তি করত না কেননা দাপ্তরিক কাজের ব্যাপারে তারা আমার উপর সন্তুষ্ট ছিল। আমি এই সময়টা দিয়ে ছিলাম ছাত্রলীগের সাংগঠনিক কাজে।

আমার ছাত্র রাজনীতিতে যুক্ত থাকার কথা মিল কর্তৃপক্ষ জেনে গিয়েছিল। একজন বাঙালি স্টাফ সম্ভবত কর্তৃপক্ষের কান ভারি করেছিল। তারা আদপেই বাঙালিদের দু'চোখে দেখতে পারতো না, সচেতন বাঙালি তো নয়ই। এরমধ্যে এক ঘটনা অহেতুকভাবে আমাকে তার শিকারে পরিণত করল। সে সময় সৈয়দ সোহরাব আলী খুলনা থেকে অতি সাধারণ মানের এক সাপ্তাহিক কাগজ প্রকাশ করতেন। তার সাথে আমার পরিচয় আমরা কমার্স কলেজ নৈশ শাখায় একসাথে ইন্টারমিডিয়েট ক্লাসে পড়েছি এবং তিনি ছাত্র সংসদের গঠনতন্ত্র প্রণয়ন ও কলেজ বার্ষিকীর সদস্য পদের জন্য আমার বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। তার কাগজের আয়ের উৎসএবং মান প্রশ্নবিদ্ধ ছিল। একদিন হঠাৎকরে তার কাগজের কোয়ার্টার পৃষ্ঠা জুড়ে পিপলস জুট মিলের উপর বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হল। হকাররা এই কাগজ বিলি করত না। মিল কতৃপক্ষ বিজ্ঞাপন বিলসহ কাগজের কপি পেয়ে বিস্মিত হলেন এবং সম্পাদকের সাথে যোগাযোগ করলেন। সম্পাদকের উত্তর ছিল চমৎকার– আমরা মিল সম্পর্কে রিপোর্ট পেয়েছি, সেটা না ছাপিয়ে বিজ্ঞাপন ছাপিয়ে বরং মিলেরই উপকার করেছি।

এসবের কিছুই আমার জানা ছিল না। আমি জানতাম না সোহরাব সাহেবকখন মিলে এসেছেন, কেনই বা এসেছেন। জানলাম, যখন তিনি থমথমে মুখে আমার টেবিলে এসে সামনের চেয়ারটা দখলকরে বসলেন। আমি আমার রাগ এবং হতাশা চেপে ভদ্রতার খাতিরে তাকে এক কাপ চা দিয়ে আপ্যায়ন করলাম। কয়েকজন অবাঙ্গালী অফিসার একে একে বক্র দৃষ্টিতে সোহরাব সাহেব এবং আমার 'হৃদ্যতার'বিষয়টা অবলোকন করে গেল। আধঘন্টা পর তিনি যখন চেক নিয়ে উঠলেন। বললাম– ঠিক বুঝতে পারছিনা বোকামো করলেন, না কলেজের নির্বাচনে পরাজয়ের প্রতিশোধ নিলেন!

– মিল কর্তৃপক্ষ এবার আমাকে নিয়ে পড়লেন–ইট সিমস্ ইউ নো মি. সোহরাব, ইজ হি ইউর ব্রাদার?

– নো স্যার।

– নাম তো বরাবর হ্যায়, আগার কোই রিশতা নেহি তো ইয়ে ক্যায়সা হো সাকতা?

– আই ডোন্ট নো স্যার, বাট উসকা সাথ হামারা কোই রিশতা নেহি।উও হামারা ক্লাস-মেট থা। দিস ইজ হোয়াই উই নো ইচ আদার।

– ইউ সি, ইউ আর্ন ইওর লিভিং ফ্রম দিস মিল, বাট স্টিল ইউ সেন্ড সাচ এ বোগাস রিপোর্ট টু দ্যাট ব্লাডি ব্লাকমেলার!

– আই ডিড্'ন্ট সেন্ড এনি রিপোর্ট টু এনিবডি স্যার।

– বাট ওনলি ইউ নো হিম ইন দিস অফিস।

– মে বি স্যার। বাট ইফ আই রিপোর্ট, আই থিংক হি ওন্ট কাম টু মাই টেবিল অ্যাট অল।

– ঠিক হ্যায়, আপ যাইয়ে।

সেই থেকে একজন অফিসার খুব স্থুলভাবে আমার উপর নজর রাখা শুরু করলেন। এই ভদ্রলোক যখন তখন আমার টেবিলে হানা দিতেন এবংএকদিন আচমকা আমার হাত থেকে একটা চিঠি কেড়ে নিয়ে গেলেন। তিনি বাংলা পড়তে সমর্থ ছিলেন না,চিঠিটা যাকে পড়তে দিলেন তিনি একজন বাঙালি অফিসার- আমার মামা। ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় সভাপতি ফেরদৌস কোরেশিকে খুলনায় আসার আমন্ত্রণ জানিয়ে আমি চিঠিটা লিখেছিলাম। মামা জানিয়ে দিলেন–এ সিম্পল লেটার। চিঠিটা আমাকে ফেরত দিয়ে মৃদু স্বরে বললেন- এগুলো বাড়িতে বসে করলে হয়না।

হারেস সাহেব সম্ভবত মামার জবাবে সন্তুষ্ট হতে পারেন নি, থমথমে মুখে অ্যাকাউন্টস ইনচার্জ ফিদাই সাহেবের চেম্বারে ঢুকে গেলেন। অফিসে আমার আর এক আত্মীয় ছিলেন অফিসার, স্বাধীনচেতা মানুষ। তিনিও সম্পর্কে আমার মামা ছিলেন। হিসাব বিভাগের যাবতীয় কাজের উপর একছত্র নিয়ন্ত্রণ থাকায় কেউ তাকে ঘাটাকে সাহস পেত না। তিনিই আমাকে এই চাকরিটা জোগাড় করে দিয়েছিলেন, দ্রুত উঠে এসেবললেন–'ইউ ক্লেম টু বি কনসাস্. হোয়াই ইউ অ্যালাউড হারেসটু স্নাচ ইওর লেটার, হি হ্যাজ নো রাইট অ্যাট অল? হাওএভার ইউ নো ইওর জব ওয়েল এণ্ড দেয়ার আর সো মেনিজুট মিলস ইন খুলনা!'

আমি পিপলস জুট মিলের চাকরি ছেড়ে দিলাম। এভাবে সাথে সাথে চাকরি ছেড়ে দেয়ায় হারেস সাহেব বিস্মিত হল আবার খুশিও হল। আসলে তখন চাকরি পাওয়া খুবই কঠিন ছিল। তবে মামার কাছ থেকে চিঠি নিয়ে কয়েক দিনের মধ্যে আমি স্টার জুট মিলের হিসাব বিভাগে যোগ দিলাম। তখন স্টার জুট মিল ছিল একমাত্র মিল যেখানে হিসাব বিভাগের সবাই ছিল বাঙালি। বিভাগীয় প্রধান সিরাজুল ইসলাম খান দৃঢ়চেতা মানুষ ছিলেন, সিরাজগঞ্জে বাড়ি। কিছুদিনের মধ্যে অবশ্য বিভাগের নির্ভেজাল বাঙালিয়ানা ক্ষুন্ন হল, ছোটখাটো নিরীহ প্রকৃতির এক আগাখানি ভদ্রলোক –সাব্বির, যোগ দিলেন কেরানি পদে।

আমি একদিন টিফিনের আগে ছুটির দরখাস্ত নিয়ে স্যারের টেবিলের সামনে যেয়ে দাড়ালাম। আমি মাসিক হিসাবের কাজ শেষ করেছিলাম। সেটা জানিয়ে বললাম আমার আজ ছুটির বিশেষ প্রয়োজন স্যার। স্টার জুট মিলে হাফ ডে ছুটির বিধান ছিল না। তিনি অবাক হয়ে বললেন, আজ তো তুমি অর্ধেক বেলা অফিস করেই ফেলেছ। তাকে একটা জরুরী কারণ দেখাতে গেলাম, থামিয়ে দিয়ে বললেন– 'থাক তোমার মামা আমাকে বলেছেন। শোনো খুলনায় তুমি কি করো না করো তা নিয়ে আমার মাথা ব্যাথা নেই। আমার সময় মত কাজ পেলেই হল, কেননা এ ব্যাপারে আমাকে ঢাকার হেড অফিসে জবাবদিহি করতে হয়। তোমার ছাত্র রাজনীতির কনেকশন মিল কর্তৃপক্ষ না জানলেই ভাল। আর মিলে শ্রমিক রাজনীতি না করলে কেউ মাথা ঘামাবে না।' এর পর প্রায় মাঝে মাঝে ছুটির দরখাস্ত রেখে টিফিনের সময় চলে যেতাম, পরদিন সেই দরখাস্ত স্যারের ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটে চলে যেত।

বলা বাহুল্য আমার ছুটির দিনগুলো এবং এভাবে সংগ্রহীত আধাবেলা ছুটি ছাত্রলীগ ও সন্দীপন সাংস্কৃতিক সম্প্রদায়ের সাংগঠনিক কাজ, আন্দোলন-সংগ্রাম, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং আড্ডার পেছনে ব্যয় হত। আমার মনে পড়েনা ষাটের দশকে আমি কখনো রাত বারোটা-একটার আগে বাড়ি ফিরেছি। এর ফলে আমাকে একবার ছোট ভাই-বোনের গৃহ শিক্ষকের সাথে টক্কর খেতে হয়। তার নিযুক্তির বিষয় আমার জানা ছিল না, জানার সুযোগও ছিলনা। এক রাতে সকাল সকাল বাড়ি ফেরার অপরাধে আমাকে তার বাঁধার মুখে পড়তে হল– কাকে চান?

বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম– তুমি কে?

সেও কম বিস্মিত নয়– আশ্চর্য তো! এত রাতে গটগট করে বাসায় ঢুকছেন,বলবেন না আপনি কে? কাকে চান?

মা দরজায় এসে দাঁড়ালেন, বললেন– ঠিক কাজটাই হয়েছে এবার! তারপর গৃহ শিক্ষককে বললেন– ওর পথ ছাড়ো বাবা, ও এ বাড়ির বড় ছেলে, নিশাচর তো! মহামহিম কি সব কাজে ভোর ছ'টায় বেরিয়ে যান, রাত বারোটা-একটার আগেফিরতে পারেন না, বাড়ির লোকজনের সাথে দেখা স্বাক্ষাৎ হবে কখন!

ছাত্রলীগের রাজনীতিতে মুজিব-আতাউর রহমান দ্বন্দ্ব

১৯৬৩ সালেবৈরুতে হোসেন শহীদসোহরাওয়ার্দীর মৃত্যু আমাদেও চিন্তিত করেছিল।রাজনীতিকদের সাথে আমার যোগাযোগ ছিল না, তবেআওয়ামী লীগের প্রতি একটা প্রচ্ছন্ন সমর্থন ছিল। ঊনষাট সালে দৌলতপুর বিএল কলেজে ভর্তীর পর থেকেই আমিছাত্রলীগের সক্রিয় কর্মী।ছাত্রলীগের বেশ কিছু নেতা-কর্মীভিতরে ভিতরে এই দলের সাথে সংপৃক্ত ছিল।তবে আমার মত অধিকাংশ কর্মীই ছিল জাতীয় রাজনীতির সংশ্রবমুক্ত। শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যুর পর অনেকেই মনে করেছিলেন যে আওয়ামী লীগ একটা বড় ধাক্কা খেল।সাদা চোখে আমরাও দেখছিলাম দলেআশা জাগানোর মতকোনরাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব নেই।কেন্দ্রীয়নেতানওয়াবজাদা নসরুল্লাহ খানবাঙালিদের কাছের মানুষ ছিলেন না। মওলানা তর্কবাগীশ,আতাউর রহমানখান বা আবুল মনসুর আহমদের মত নেতৃবৃন্দের পরিচিতি, জনপ্রিয়তা ও সাংগঠনিক প্রতিভা ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির মওলানা ভাসানী এবং কৃষক শ্রমিকপার্টির শেরেবাংলা ফজলুল হকেরতুলনায় খুবই নিস্প্রভ ছিল। উচু মানের সাংগঠনিক দক্ষতা কেবল শেখ মুজিবেরই ছিল। তিনি পরিশ্রমী ছিলেন। ভাল বক্তা ছিলেন, সহজেসাধারণ মানুষের সাথে মিশে যেতে এবং সহজ ভাষায়তাদেরকে বুঝিয়ে সপক্ষে টেনে নিতে সমর্থ ছিলেন। বিশেষকরে তার মধ্যে বাঙালি জাতীয়তাবোধ, আত্মমর্যাদা এবংঅবিচল দৃঢ়তার মত এমন কিছু বিষয় ছিল যা তাকে আলাদা মাত্রা দিয়েছিল। ফলেপ্রতিপক্ষরা তো বটেই, নিজদলের অনেকেইতার প্রতি সন্দিগ্ধ ও ঈর্ষাতুর ছিলেন। তারা তাকে প্রজ্ঞাহীন, বাকসর্বস্ব ভাবতে অভ্যস্ত ছিলেন যা সে সময় আমাদেরকেও যথেষ্ট প্রভাবিত করেছিল।

তবে পশ্চিম পাকিস্তানিরা শেখ মুজিবের বৈশিষ্টগুলোঠিকই চিহ্নিত করেছিল। না করার কারণ ছিলনা। বাঙালিদের তুচ্ছ করে কেউ কোন কথা বললে বা আচরণ করলে তিনি ছেড়ে দিতেন না, সে যেই হোক। একবার গণপরিষদের লাউঞ্জে সোফায় বসে কথা বলছিলেনপূর্ববঙ্গ আওয়ামী লীগেরতিন এমএলএ। (কে কে ছিলেন বই দেখতে হবে)।পাঞ্জাব মুসলিম লীগের দীর্ঘদেহী সদস্যমিয়া মমতাজ দৌলতনা ফলের জুসে সিপ দিতে দিতেএগিয়ে আসেন এবং নির্বিকার চিত্তেসোফার উপর চকচকে জুতোসমেত পা তুলে দিয়ে কিছু একটা বলতে চেষ্টা করেন। এই অভব্য আচরণে সবাইহতবাক, সহসা করণীয় বুঝে উঠতে পারছেন না। তবে ভিন্ন ধাতুতে গড়াশেখ মুজিবের মুহূর্তমাত্র বিলম্ব করেন নি,সটান দাঁড়িয়েজুতোসমেত পা সোফার হাতলের উপর তুলে দিয়ে বললেন–বল দৌলতানা, কিবলছিলে। থমথমে মসীবর্ণ মুখে দৌলতানা পিছু হটেন।*এই ছিলেন শেখ মুজিব–মাথা নোয়াবার নন।

বাঙালি শক্তির উপরঅনমনীয় বিশ্বাস তাকে পশ্চিম পাকিস্তানিদের বিরাগভাজন করেছিল। তারা শুরু থেকেই তাকে হেয়প্রতিপন্ন করার কাজে উঠেপড়ে লাগে।দুর্ভাগ্যক্রমে, তাদের এ জাতীয় প্রপাগান্ডায় কিছু কিছু গোঁড়া বাম ও দক্ষিণপন্থীবাঙালি নেতৃবৃন্দসামিল ছিলেন। তাকেস্থুলবুদ্ধি, এজিটেটর, দেশদ্রোহী, ভারত-মার্কিনস্বার্থের সেবাদাস ইত্যাদি হিসাবে চিহ্নিত করা হয়।তার বিরুদ্ধেদুর্নীতি, গুন্ডামী, শাহেদ আলী হত্যার অপবাদ দেয়া হয়, তাকে উপর্যুপরি কারারুদ্ধ করা হয় এবংশেষপর্যন্ত ১৯৫৮ সালে দেশেসামরিকশাসনজারিকরে গণতন্ত্রের ক্ষিণধারাটিও নস্যাৎকরাহয়।শেখ মুজিব ও আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের উপর নির্যাতনের খড়গ নেমে আসে। এসব অভিযোগ ছিল মিথ্যা এবং আদালতে কোন অভিযোগই টেকে নি। ইতিহাস তার স্বাক্ষী। তা সত্ত্বেও অনেক বিদগ্ধ ব্যক্তি, সম্ভবত ব্যক্তিগত ঈর্ষা অথবা সংকীর্ণ দলীয় রাজনীতি থেকে,পশ্চিমা কোটারীর এ জাতীয় অপবাদ-অভিযোগের সাথেকণ্ঠ মিলিয়ে শেখ মুজিবকে টেনে নামানোরনিরন্তর চেষ্টা করেছেন। বিস্ময়কর যে ফাটা রেকর্ডগুলো এখনো একঘেয়েভাবে বাজানো হয়। এসব কথা বলতে হল, কেননা পঞ্চাশ ও ষাটের দশক জুড়ে বিশেষভাবে বামপন্থীদেরএমন প্রচার-প্রপাগান্ডার ঝড়ে আমরা অনেকেই তখন শেখ মুজিব সম্পর্কেখুবই বিভ্রান্ত ছিলাম।

এ প্রসঙ্গে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে শেখ মুজিবের ভূমিকা সম্পর্কে বাম বুদ্ধিজীবী অধ্যাপক বদরুদ্দিন উমরের কিছু মন্তব্য তুলে ধরা যায়। ভাষা আন্দোলন প্রসঙ্গে লিখতে যেয়ে জনাব উমর শেখ মুজিবকে হাস্যাস্পদ প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেছেন। তিনি লিখেছেন–১৯৪৮ সালে ভাষা আন্দোলন কালে ১৬ মার্চ দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গনে সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। নির্ধারিত সময়ের আগে কালো শেরওয়ানী ও জিন্না টুপি পরিহিত হয়ে শেখ মুজিব একটি হাতলবিহীন চেয়ারে সভাপতির আসন অধিকার করে বসেন। সভায় তার সভাপতিত্ব করার কথা ছিলনা, কারণ ঢাকার তৎকালীন ছাত্র আন্দোলনে তার ভূমিকা ছিল নিতান্ত নগণ্য।... সভায় শেখ মুজিব অন্য কাউকে বক্তৃতার সুযোগ না দিয়ে

নিজেই বক্তৃতা শুরু করেন। সেই এলোপাথাড়ী বক্তৃতার সারমর্ম কিছুই ছিলনা। বক্তৃতা শেষে তিনি হঠাৎ 'চলো চলো অ্যাসেমব্লি চলো' বলে শ্লোগান দিয়ে সবাইকে নিয়ে মিছিল করে বেরিয়ে যান, যদিও এদিন মিছিলের কোন প্রোগ্রাম ছিল না (পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি-প্রথম খণ্ড, নভেম্বর ১৯৭০: বদরুদ্দীন উমর, পৃষ্ঠা- ৯৮-৯৯)।

বদরুদ্দিন উমর তার এ হেন গবেষণা কর্মের তথ্যসূত্রে তৎকালীন ছাত্রনেতা মোহম্মদ তোয়াহা ও সৈয়দ নজরুল ইসলামের সাক্ষাৎকার এবং তাজউদ্দীন আহমদের ডায়েরী ও সাক্ষাৎকারের কথা উল্লেখ করেছেন। তবে জনাব তাজউদ্দিন তার ডায়েরীতে শেখ মুজিব সম্পর্কে এমন কোন কথা লেখেননি বলে জানান। বস্তুত ডায়রীতে এ ধরনের কোন কথা লেখা নেই। সৈয়দ নজরুল ইসলামও তার সাক্ষাৎকারে শেখ মুজিব সম্পর্কে এমন কোন কথা বলেননি বলে জানান। তিনি বরং বলেন– মোহম্মদ তোয়াহা এই সভায় সভাপতিত্ব করতে চেয়েছিলেন এবং সভাপতির চেয়ারের পাশে এসে দাঁড়িয়ে ছিলেন, এ নিয়ে কিছু বাদানুবাদও হয়।তখন তিনি (সৈয়দ নজরুল ইসলাম) বলেছিলেন আলোচনা অনুযায়ী সভায় শেখ মুজিবের সভাপতিত্ব করার কথা, সেটা মানতে হবে।

এই বক্তব্যের পর বদরুদ্দীন উমর তার ভুল স্বীকার করেন। তবে তিনি জনাব তাজউদ্দিন আহমদ ও সৈয়দ নজরুল ইসলামের আওয়ামী লীগ কনেকশন নিয়ে কটাক্ষ করতেও ছাড়েননি। বিস্মিত হতে হয়, বদরুদ্দীন উমর যখন বলেন যে, পরবর্তী সংস্করণে তিনিঘটনাটি বাদ দেবেন না,ঘটনাটি উল্লেখ করবেন মোহম্মদ তোয়াহার সাক্ষাৎকারের সূত্রে(ভাষা আন্দোলন ও অন্যান্য প্রসঙ্গ: বদরুদ্দীন উমর, পৃষ্ঠা- ৪৩, ৪৪ ও ৪৬)। অর্থাৎ বদরুদ্দিন উমর জনাব তোয়াহার একতরফা বক্তব্যের উপরেই সিদ্ধান্ত টানবেন। পাঠক লক্ষ্য করুন মোহম্মদ তোয়াহা এখানে একটি পক্ষ।

প্রসঙ্গক্রমে বলা যায়, ষাটের দশকে মুজিব বিরোধী এ ধরনের প্রপাগান্ডা ছিল তুঙ্গে। অথচ আমরা কমই জানতাম যে, বাস্তব চিত্র ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত। রাজধানী কলকাতার তুখোড় ছাত্রনেতা শেখ মুজিব দেশভাগের পর ঢাকায় এসে মোটেও 'নিতান্ত নগন্য' হয়ে যাননি। ১৯৪৮ সালের জানুয়ারিতে তিনি এবং অন্যান্য ছাত্র নেতৃবৃন্দ পূর্ববঙ্গে 'পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ' গড়ে তোলেন। শীঘ্রই সংগঠনটি দেশব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে এবং ভাষা আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। ১৯৪৮ সালের ১১ মার্চ রাষ্ট্রভাষার দাবীতে প্রথম যে ধর্মঘট পালিত হয় তাতেও শেখ মুজিব, গোলাম মাহবুব, শামসুল হক, শওকত আলী, অলী আহাদ প্রমুখ ছাত্র নেতৃবৃন্দ পিকেটিং কালে বন্দী হন। ১৫ মার্চ সন্ধ্যায় তারা মুক্তি পান। পর দিন ১৬ মার্চ দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ে আমতলার আলোচ্য সভায় শেখ মুজিব সভাপতিত্ব করেন এবং শুধু শেখ মুজিব নন, সে সভায় অনেকেই বক্তৃতা করেছিলেন। ছাত্র আন্দোলনের কারণে এবংবিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারি আন্দোলনের প্রেক্ষিতে মুচলেকা দিতে রাজি না হওয়ায় কর্তৃপক্ষ তার বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রত্ব পর্যন্ত বাতিল করেন। তাকে ১৯৪৯ সালে আরো দু'বার এবং ১৯৫০ সালের জানুয়ারি থেকে একাদিক্রমে দু'বছরেরও অধিককাল কারাগারেই কাটাতে হয়। তথাপি বদরুদ্দিন উমরের ভাষায়তৎকালীন ছাত্র আন্দোলনে শেখ মুজিবের ভূমিকা ছিল নিতান্ত নগন্য!(পৃষ্টা- ৯৬-অসমাপ্ত)

সে সময়আমরা ভিতরের খবর কমই জানতে পারতাম এবং এজাতীয় নানাবিধ প্রপাগান্ডার কারণে শেখ মুজিব সম্পর্কে যথেষ্ট বিভ্রান্ত ছিলাম। এ অবস্থায়১৯৬৪ সালের জানুয়ারিতে শেখ মুজিব হঠাৎআওয়ামী লীগেরআতাউর রহমান খান, আবুল মনসুর আহমদ প্রমুখ বিদগ্ধ নেতৃবৃন্দের প্রবল আপত্তির মুখে মওলানা আব্দুর রশীদ তর্কবাগীশকে সঙ্গে নিয়েআওয়ামী লীগ রিভাইভ করেন।

পার্টি রিভাইভের একটা প্রতিক্রিয়া আমরা শীঘ্রই ছাত্রলীগের মধ্যে দেখতে পেলাম। সাউথ সেন্ট্রাল রোডের এক ভাঙ্গাচোরা দ্বিতল অট্টালিকা ছিল আজম খান কমার্স কলেজ হোস্টেল।সভা উপলক্ষে দোতলার এক রুমে আমরা মাঝেমাঝেবসতাম। খুলনা ছাত্রলীগ তখন দীর্ঘ দিনের খরা কাটিয়েবেশ ভালভাবেইসুসংগঠিত।এ সময় এক সাংগঠনিক সভা ডাকা হয়েছিল। কিন্তুঅপ্রত্যাশিতভাবে সভায় রাজনীতি উঠে এল।ফিরোজ নূন প্রবীন রাজনিতিক আতাউর রহমানের পক্ষ নিয়ে শেখ মুজিবকে কদর্য ভাষায় আক্রমণ করে বসল। সাথে সাথেআলী তারেক শেখ মুজিবের পক্ষ নিয়েআতাউর রহমানকেগাধা-বোট বলে অভিহিত করল এবং মন্ত্রিত্বের লোভে সিফিলিসগ্রস্তকুচক্রী গভর্নর জেনারেল গোলাম মোহম্মদকে মাল্যভূষিত করার দায়ে অভিযুক্ত করল।তর্ক পাল্টাতর্ক গালিগালাজ লাথি কিল ঘুষির মধ্যে পরিস্থিতি মুহূর্তে নিয়ন্ত্রণেরবাইরে চলে গেল।

একজন হোমিওপ্যাথ ডাক্তার কমার্স কলেজে নৈশ শাখায় পড়তেন,কলেজ ছাত্রলীগ কমিটির সিনিয়র সদস্য ছিলেন। দ্রুত উঠে দরজায় পিঠ ঠেকিয়ে খিলটা হাতে তুলে নিয়ে গর্জেউঠলেন–আপনারা সবাই আমার ছোট, তবু নেতা হিসাবে আপনাদেরমানি।এরপর কেউ একটা বাজে কথা উচ্চারণ করলে আমি তার হাড় গুড়ো গুড়ো করে দেব। মুহূর্তে ঘরের ভিতর নৈঃশব্দ নেমে এল। ডাক্তার আমার দিকে তাকিয়ে বললেন–ভাই আপনি বলুন এসব প্রসঙ্গ কেন উঠল? আর মুজিব ভাই, আতাউর রহমান সাহেব সম্পর্কে এসব কথা কি ঠিক? অথচ প্রায়ই এমন সমালোচনা শুনতে হয়। আগে ছাত্র ইউনিয়ন, এনএসএফ-এর ছেলেরা বলত, এখন তো দেখছি আমরাও বলা শুরু করেছি।আমাকে জিজ্ঞাসা করার কারণ, আমি এ ধরনের বিতর্ক প্রায়ই এড়িয়ে চলতাম এবং পার্টির মধ্যে আমার কিছু পড়াশুনা ছিল,তবে এত বেশী নয় যে আমি তাৎক্ষণিকভাবে জবাব দিতে সমর্থ ছিলাম। আমি সময় চেয়ে নিলাম।

আমি মতিভাইকে খুঁজে বের করি। মতি ভাই আমাদের অনেক সিনিয়র ছিলেন। রাজনীতি সচেতন, যদিও কি রাজনীতি করতেন কখনো জানা হয়নি। ছিপছিপে মানুষ, পাজামা-পাঞ্জাবির উপর সাদা খদ্দরের চাদর পরতেন।আমরা তারকাছ থেকে দেশ বিদেশের রাজনীতি ও ইতিহাসের নানা কাহিনী শুনতাম। আমি তাকে বিষয়টি বললাম এবং প্রকৃত ইতিহাস জানতে চাইলাম। বিকালে আমরা কয়েকজন পিটিআই-এর ভিতরে পুকুর পাড়ে বসেছিলাম। প্রকৃতির ফুরফুরে বাতাস, মতিভাইয়ের গল্প ও বাদামের লোভে আমরা মাঝে মাঝে এখানে বসতাম। মতিভাই বললেন–যে যাই বলুক, আতাউর রহমান সাহেব ভাল মানুষ। গভর্নর জেনারেলকে মাল্যদান নিয়ে তার এবং শেরেবাংলা ফজলুল হকের মধ্যে যে অপ্রীতিকর প্রতিযোগিতা ঘটেছিল তা অনেকটাই পার্টির সিদ্ধান্ত এবং গভর্নর জেনারেলের শঠতার কারণেই ঘটেছিল। তার পূর্ব বাংলা সফরের প্রাক্কালে এমন ধারণা সৃষ্টি করা হয়েছিল যে তিনি ৯২(ক) ধারা তুলে নিয়ে পার্লামেন্টের ক্ষমতা পুনর্বহাল করবেন এবং মন্ত্রীসভা গঠনের সুযোগ দেবেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য কিছুই করা হয়নি।

আর শেখ মুজিবের কথা যদি বল, তার বিরুদ্ধে সমালোচনা এত বেশি যে বিভ্রান্ত হতেই হয়। তোমরা বরং বই পড়ে তার সম্পর্কে নিজেরাই জানতে চেষ্টা কর। আমি তোমাদের এটুকুই বলতে পারি যে, তার দৃঢ়তা ও সাংগঠনিক ক্ষমতা অনেক বেশি, তাকে ড্যামেজ করার জন্য প্রতিপক্ষরা সমালোচনাও করে বেশি। এর বেশিরভাগই সত্য বলে মনে হয় না। পূর্ববঙ্গ পার্লামেন্টে ডেপুটি স্পিকার শাহেদ আলী হত্যার জন্য (২৫-৯-৫৮) তাকে দায়ী করা হয় এবং ঘটনার মাত্র বারো দিনের মাথায় ৭-১০-৫৮ তারিখে দেশে আইয়ুবের সামরিকশাসন জারি করাহয়, শেখ মুজিব ও আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দকে গ্রেফতার করা হয়, অথচ বিচার সম্পন্ন করা হয়না। স্পিকার আব্দুল হাকিম মারা পড়লে বুঝতাম শেখ মুজিব দায়ী, কিন্তু ডেপুটি স্পিকার শাহেদ আলী আওয়ামী লীগের মোশনের পক্ষে ছিলেন। মুজিব তাকে মারতে যাবেন কেন? এই হত্যাকান্ডের জন্য বরং পশ্চিম পাকিস্তানি নেতৃবৃন্দ, আমলা, জেনারেল ও ব্যবসায়ী-শিল্পপতিদের কোটারি দায়ী যারা চায়নি পূর্ববঙ্গে কোন শক্ত ও স্থিতিশীল সরকার থাকুক। মুজিবের বিরুদ্ধে একের পর এক দুর্নীতির মামলাও দায়ের করা হয়, কিন্তু তা মিথ্যা প্রমাণিত হয়। এতে পশ্চিম পাকিস্তানিদের উদ্দেশ্য অনেকটাই পরিস্কার হয়ে যায়। আসলে দরাজকণ্ঠ, সুস্পষ্ট বক্তব্য এবং সরল ভাষায় জনগণকে তা বুঝানোর ক্ষমতা এবং অবিচল দৃঢ়তা শেখ মুজিবকে ভিন্নতা দিয়েছিল। তাকে প্রতিপক্ষের ভয় পাওয়া এবং ড্যামেজ করার জন্য তার বিরুদ্ধে বাজে প্রচার বেশি হওয়ারই কথা।

পয়ষট্টির ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ এবং শেখ মুজিবের বিস্ময়কর উত্থান

১৯৬৫ সালে কাশ্মীর নিয়ে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ বেধে যায়। রেডিওতে প্রেসিডেন্টের ভরাট গলা–'বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম, উই আরঅ্যাটওয়ার নাও' আমাকে শিহরিত করে। পাকিস্তানের প্রতি খানিকটা মোহভঙ্গ সত্ত্বেও আমরা একবাক্যে পাকিস্তানের পক্ষে দাঁড়িয়ে গেলাম। আসলে তখনো আমরা পাকিস্তানের বিকল্প খুঁজছিলাম না, খুঁজছিলাম আইয়ুবশাহীর বিকল্প। কিন্তুযুদ্ধে তারই লাভ হল সবচেয়ে বেশি। তিনি তার সাত বছরের টুটা-ফাটা ভাবমূর্তি কিছুটা হলেও জোড়াতালি দেয়ার সুযোগ পেলেন, তবে তার ভাগ্যে স্বস্তি জুটল না।

অনেক আগে থেকেই দেশে সেনাবাহিনী সম্পর্কেনানা ধরনের মিথ প্রচলিত ছিল। এসময় সেপ্রচার আরো ব্যাপক হল। আমরা মোহাবিষ্টের মত বিশ্বাস করতাম যে,একজন পাকিস্তানি জোয়ান অনায়াসে তিনজন ভারতীয় সৈন্যের মোকাবেলা করতে সক্ষম। সবচেয়ে বেশি বিশ্বাস করা হত যুদ্ধেসফেদ ফেরেস্তারা নাঙ্গা তলোয়ার হাতেআমাদের সৈন্যদের সাহায্যে আসমান থেকে নেমে আসেন। মিথগুলো মুখে মুখে ছড়াতো। যারা বলতেন যেন 'প্রত্যক্ষদর্শীর' অভিজ্ঞতা থেকেই বলতেন, তাদের চারপাশে ভিড় জমে যেত। আধ্যাত্মবিশ্বাসের পাশাপাশি পরাশক্তি আমেরিকার সাথে আমাদের 'সিয়াটো''সেন্টো' জাতীয় সামরিক গাটছড়াগুলি ছিল। আমরা বিজয় সম্পর্কে নিশ্চিত ছিলাম।

যুদ্ধকালে আমাকে রাত জেগে পাড়ায় টহল দিতে হত। এই কাজটা ছিল অশেষ বিরক্তিকর। ভূতের বাড়ি আনসার ক্যাম্প এবং মুসলিম লীগ কর্মীদের চাপে পাড়ার যুবকদের সপ্তাহে দু তিন রাতদুঘণ্টা করে পাহারা দেয়া বাধ্যতামূলক ছিল। আমাদের গ্রুপের দলপতি ছিলেন একজন মাঝবয়সীআনসার। ভদ্রলোক নিজেরক্ষমতা জাহিরে অতিমাত্রায় যত্নবান ছিলেন এবং আমাদের অস্বস্তিকর হেলমেটপরিয়ে ছাড়তেন, হাতে মোটা লাঠিও ধরিয়েদিতেন।

একদিন জিজ্ঞাসা করেছিলাম, আসলে কি পাহারা দিচ্ছি আমরা। তারজলদ-গম্ভীর উচ্চারণ ছিল–'আসমানের দিকে নজর রাখো, রাতে হিন্দুস্থানী ছত্রীসেনা নামতে পারে, তাদের মাথার উপর ছাতার মত প্যারাসুট থাকবেএবং নিচে থেকে কেউ টর্চ জ্বেলে তাদের ইশারা দেবে। এরা পঞ্চম বাহিনী, দেশের শত্রু। আমাদের কাজ এদের ধরা।' এর ফল হয়েছিল মারাত্মক। এক সকালেপাড়ার হরেন বাবুর বাড়ির সামনেহৈচৈ শুনে আমরা ছুটে গেলাম। তার দোতালা বাড়ি ঘিরে বেশ কিছু উত্তেজিত লোকের জটলা। তারা তাকে উচ্চস্বরে পঞ্চম বাহিনী, ভারতীয় চরইত্যাদি বলে চিহ্নিত করছে। তিনি নাকি রাতে আকাশে টর্চ মেরে হিন্দুস্থানি ছত্রীসেনাদের সংকেত দিয়েছেন। তিনি যতই বলেন, টর্চ মেরেছেন পিছনের গলিতে খুটখাট আওয়াজ শুনে, ততই হৈচৈ বাড়ে। টর্চ মারার বিষয়টি স্বীকৃত, এখনটর্চের ফোকাসটা কোন রকমে

মাটি থেকে আকাশে তুলতে পারলেই ষোলকলা পূর্ণ হয়। এইটগবগ করে ফুটতে থাকামবের উপর হঠাৎ একরাশ ঠাণ্ডা পানি ছুড়ে দিলেন পাড়ার প্রৌঢ়বিচিত্র-চরিত্র দেনাতুল্লা সেখ।

হরেন বাবুর বাড়ির দক্ষিণের একবাড়ি পর মোড়ের মাথায় ভাঙ্গাচোরা পৈতৃক দোতালা বাড়িতে দেনাতুল্লার বসবাস। তারা পাড়ার আদি বাসিন্দা। অন্ধ, প্রখর শ্রবণশক্তি ও বাঁজখাই গলার অধিকারী দেনাতুল্লারপ্রতিটি বাক্য উচ্চারিত হয় অশ্রাব্য গালিগালাজের সাথে। হৈ চৈ-এর মধ্যেতার বাঁজখাই গলাহঠাৎ সবাইকে চমকে দেয়–'ঐ হালারপুতরা, রাইতে যেএত চিল্লাই,দ্যাখ কিয়ের শব্দ, চোরায় আইল নাকি দ্যাখ। তহন কই আছিলি তোরা,অহন চিল্লাইয়া মরিস! হইছেটা কি?'

তাহলে সত্যই চোর এসেছিল! এক লহমায়সব হৈচৈ থেমে যায়। প্রায় জমে ওঠা খেল হঠাৎ এভাবে খতম হওয়ায়লোকজনহতাশহয়েএকে একে ঘটনাস্থল ছাড়ে।হরেন বাবুর কাছে দুঃখ প্রকাশওকরে কেউ কেউ। তবে তিনিদীর্ঘদিনের প্রতিবেশীদের উপর আস্থা হারিয়ে ফেলেন এবংতার পুত্র অরুনকে প্রথম সুযোগই ভারতে পাঠিয়ে দেন। কিশোর ছেলেটাখুবই হাসিখুশিভদ্র ও নম্রস্বভাবের ছিল।

যুদ্ধকালে পার্কে সর্বদলীয় জনসভা হল। দারুণ সব বক্তৃতা! বয়সের ভারে চিমসে যাওয়া শিরাতেও রক্ত যেন চনমন করে ছুটছে, পাশে দাঁড়ানো এক বৃদ্ধের তড়পানি দেখে তেমনই মনে হয়েছিল আমার। আশেপাশের লোকজন মজাও পাচ্ছিল বেশ, সমানে তাকে উৎসাহ দিয়ে যাচ্ছিল।খুলনার সুপরিচিত রাজনীতিবিদ অ্যাডভোকেট আব্দুল জলিল স্বভাবসুলভভঙ্গীতে বললেন–'ওহে ভারত, যদি প্রাণে বাঁচিতে চাও খবরদার তোমরা আমাগের পূর্ববঙ্গে ঢুকিতে চেষ্টা করিও না, করিলে আমার হাতে এই যে লাঠি দেখিতেছনা, ইহার দ্বারা তোমাদের ভুঁড়ি ফুটা করিয়া দিব।' বারি ভাইয়ের পাশে দাঁড়িয়ে আমি এসব জ্বালাময়ী ভাষণ শুনছিলাম। তিনি আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। জিজ্ঞাসা করলাম ভাই, আসলে আমাদের অবস্থা কি?

ঐ যে, তোমাদের এক্স প্রেসিডেন্টের কথা শুনলে না। ওরা কামান-বন্দুক নিয়ে হামলা করলে আমাদের লাঠি, বটি, ছাতা এসব নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে! এরা আবার পশ্চিম বাংলার কলাইকান্দা না কোথায় কোথায় যেন বোমা মেরে এসেছে। ও ব্যাটারা এখনদাদ তুলতে না এলেই বাঁচি!

তাশখন্দ শান্তি চুক্তির দ্বারা সবে যুদ্ধের অবসান ঘটেছে।যুদ্ধেপশ্চিম রণাঙ্গনের বেশ কিছু ঘটনা আমাদের জন্য প্রেরণাদায়ক ছিল।বাঙালি স্কোয়ড্রন লিডার আলম সারগোদার আকাশে এক বিমানযুদ্ধে একাই পাঁচটি ভারতীয় বিমান ধ্বংস করে বাঙালিদের কাছে আইডলে পরিণত হয়েছিলেন। বেঙ্গল রেজিমেন্ট খেমখারান সেক্টরেও বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করে ভারতীয় ট্যাঙ্ক বাহিনীকে ব্রীজের গোড়ায় আটকে দিয়ে লাহোর রক্ষা করেছিল এবং ভারতীয় জেনারেলের অপরাহ্নে সালিমার গার্ডেনে কফিপানের খায়েশ মিটিয়ে দিয়েছিল। এসব কাহিনী তখন মুখেমুখে ফিরত। সে সময় কাগজে যুদ্ধের অলৌকিক কিছু কাহিনীও সাড়ম্বরে প্রকাশিত হয়। বাবা বাড়িতে ইত্তেফাক রাখতেন। সিন্ধু নদের তীরে কোন এক এলাকায় মুসল্লিরা ভোরের নামাজ আদায় করতে যেয়ে দেখেন ভারতীয় বিমান থেকে নিক্ষিপ্ত ভারী ভারী গোলাগুলো শুভ্র অবয়বের অলৌকিক উদ্ধারকারীরা আলোকে লুফে নিয়ে বালিয়াড়ির উপর রেখেদিচ্ছেন। কে অস্বীকার করবে! খবরের শিরোনামের উপরবিরাট এক গোলার ছবি। যুদ্ধে অবিস্ফোরিত বোমার পরিমাণ কম থাকে না। তবে ফেরেশতা কাহিনীতে আমাদের ব্যাপকবিশ্বাস তো ছিলই। তদুপরি সে সময় ইসলামের নিশানবরদার পাকিস্তানি সেপাইদের কাঁধেকাঁধ মিলিয়ে ফেরেশতারা যুদ্ধ করছেন–এই বিশ্বাসের সাথে যাওয়া বুদ্ধিমানের কাজ ছিল। এ নিয়ে সংশয় প্রকাশ খুবই রিস্কি ছিল। দু'চারটে দাঁত, কিছু রক্ত এবং সাধের জামা বিসর্জন দিয়ে পালিয়ে আসতে পারলে ভাল, নইলে হিন্দুস্থানি চর বিবেচনায় যথেচ্ছা মলেস্টেশনের পর দু'চার ঘণ্টার জন্য হাজতবাস উপহার দেয়ার মত লোকের অভাব ছিল না।

তবে সেনাবাহিনীর সাফল্যের উপর এসব চিত্তাকর্ষক মিথের প্রলেপ, ফেরেশতা কাহিনী, পাকিস্তানের সাফল্য, হিন্দুস্থানের হতদ্দশা নিয়ে আমাদের বিশ্বাসের দেয়ালে চির চির ফাটলগুলো খুব দ্রুত স্পষ্ট হয়ে উঠল,প্রশ্ন উঠল এমন বিজয়সত্ত্বেও তাশখন্দ চুক্তি কেন? তথাপি বীরবন্দনা চলছিলই। শেখ মুজিব হঠাৎই বেসুরো গাইলেন, বললেন–এই যুদ্ধে প্রমাণ হয়ে গেছেআমাদের পূর্ব বাংলায় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা বলতে কিছুই নেই,ভারত ইচ্ছা করলে যে কোন মুহূর্তেঅনায়াসে আমাদের দেশ দখল করে নিতে পারত। আমরা উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার মধ্যে তাদের দয়ার উপর নির্ভর করে টিকে ছিলাম।

আইয়ুবের পররাষ্ট্র মন্ত্রী জুলফিকার আলী ভুট্টো নিজেকেবুদ্ধিমান বলে জাহির করে আত্মপ্রসাদ লাভ করতেন।মোসাহেবরাও ইমানদারের মত তা বিশ্বাস করত।ভুট্টো তাসখন্দ চুক্তিতে তেমন একটা সন্তুষ্ট হননি, তখনো বিজয়ের সামর্থে ও স্বপ্নে মশগুল ছিলেন।মুজিবের বক্তব্যেরজবাবে বললেন–ভারতের দয়া নয়, আমাদের বন্ধুরাষ্ট্র চীনের হুমকিতে ভীত হয়ে ভারতপূর্ব পাকিস্তান আক্রমণ করতে সাহস করেনি।আয়ুবেরনির্বোধ পররাষ্ট্রমন্ত্রী বুঝতেই পারেন নি যে তার বক্তব্য শেখ মুজিবের বক্তব্যকেইপ্রতিষ্ঠিত করেছে।পরিস্কার হয়ে গেল যে পূর্ব পাকিস্তানের নিরাপত্তা ব্যবস্থা পাকিস্তানের হাতে নেই, আছে বিদেশীদের হাতে–হয় ভারতের দয়া, না হয়চীনের হুমকি।

একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্টিরনিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে এমন বালখিল্যতার কঠোর জবাব দিলেন শেখ মুজিব–আমরা চীন বা ভারতের দয়া নয়, নিজেদের পায়ের উপর দাঁড়তে চাই, নিজেদের শক্তিতে বাঁচতে চাই। শুধু মুখেই বললেন না, অনন্য এক ফরমুলাও দিলেন– ৬-দফা। সহসাই যেন যাদুর কাঠির স্পর্শে ঘুম ভেঙ্গে গেল বাঙালিদের।

'৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধ পূর্ব বাংলার নাজুক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার বিষয়টা স্থুলভাবে উন্মোচিত হয়ে গিয়েছিল। উসকানী সত্ত্বেও ভারত পূর্ব বাংলা আক্রমণ করেনি, তবে ইচ্ছা করলে তারা ছেলের হাতের মোয়ার মত আমাদের দেশটা কেড়ে নিতে পারত। একসময় মতিভাইয়ের কাছে শুনেছিলাম, পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ও প্রধান সেনাপতি জেনারেল আইয়ুব নাকি বলেছিলেন– 'পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা পশ্চিম পাকিস্তানের উপর নির্ভরশীল। পূর্ব পাকিস্তানের আয়তন ক্ষুদ্র হওয়ায় এর ডেপথ কম, ফলে সহজ ভেদ্য। এখানে পৃথক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা ফলপ্রসু হবেনা এবং দেশের সামরিক শক্তিকে বিভক্ত করাও যুক্তিযুক্ত হবেনা। পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা কেন্দ্রীভূত রাখা হবে পশ্চিম পাকিস্তানে, ভারত পূর্ব বাংলা আক্রমণ করলে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে ঝটিকা অভিযান চালিয়ে পূর্ববঙ্গ উদ্ধার করা হবে।'

অনেক পরে যখন আমি আবুল মনসুর আহমদের 'আমার দেখা রাজনীতির ৫০ বছর' বইটা পড়ি, সেখানেও বিষয়টার উল্লেখ দেখি। তিনি এ বিষয়ে পাকিস্তানের প্রধান সেনাপতি ও প্রতিরক্ষামন্ত্রী জেনারেল আইয়ুবকে প্রশ্নও করেছিলেন। জেনারেলের ভাষ্য শুনে তিনি হতবাক হন, অবিকল সেই ভাষ্য যা একদা কলকাতার বস্তিবাসী মুসলমানদের মুখে শোনা যেত– 'ভারত পূর্ব পাকিস্তান আক্রমণ করলে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে ঝটিকা আক্রমণ চালিয়ে দিল্লি দখল করে নেয়া হবে। হিন্দুস্থান তখন দিল্লি ফিরে পাওয়ার জন্য পূর্ব পাকিস্তান ছেড়ে দিতে বাধ্য হবে।' আপন শক্তি- সামর্থের উপর আস্থাহীন কিছু উম্মি মানুষ ভারত বেষ্টিত পূর্ব বাংলা কিভাবে টিকে থাকবে এই দুঃশ্চিন্তায় সান্তনা হিসাবে তত্ত্বটি উদ্ভাবন করেছিল। বিস্ময়ের ব্যাপার পাকিস্তানের তথাকথিত 'মিনিস্ট্রি অব ট্যালেন্টেস'-এর প্রতিরক্ষামন্ত্রী ও প্রধান সেনাপতি সেই বালখিল্য তত্ত্বকে ধ্রুবজ্ঞান করে পূর্ববঙ্গের প্রতিরক্ষা নীতি সাজিয়েছেন। এই নির্বোধ জেনারেলের কাছে দিল্লী দখল যেন তুড়ি মারার মত ব্যাপার– ইচ্ছা হল, দখল করে নিলাম। উষ্মা প্রকাশ করে আবুল মনসুর আহমেদ জানতে চেয়েছিলেন–যতদিন পশ্চিম পাকিস্তানি ভাইরা এই তরিকায় দিল্লি দখল করে তার বিনিময়ে আমাদের উদ্ধার না করবে, ততদিন ভারতীয় সৈন্যদের দখলে এতদাঞ্চলের মানুষের জীবন, মান-সম্মান, ধর্ম-কৃষ্টি, মা-বোনের ইজ্জত-সম্ভ্রমের কি হাল হবে? জেনারেল আইয়ুবের নিরুদ্বেগ জবাব ছিল, সামরিক বিশেষজ্ঞ হিসাবে তিনি সত্য কথাই বলেছেন, সত্য গোপন করে কর্তব্যে ত্রুটি করেন নি।

আমি তখনো একজন ভাল পাকিস্তানি ছিলাম। মতিভাইয়ের ভাষ্য পুরোপুরি বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয়নি। কিভাবে বিশ্বাস করি যে আমাদের জীবন, মা-বোনের ইজ্জত-সম্ভ্রম, আমাদের সহায়-সম্পদ পশ্চিম পাকিস্তানি ভাইদের কাছে খোলামকুচি তুল্য! নির্বোধ বিশ্বাস থেকে ভাবতাম ভাল প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা নিশ্চয় আছে, মিলিটারি সিক্রেট, প্রধান সেনাপতি সবাইকে জানাবেন কেন! পয়ষট্টির যুদ্ধের পর শেখ মুজিবের ভাষ্য আমার পুরাতন সব বিশ্বাস আস্থা এক লহমায় বেনো জলের মুখে খড়-কুটোর মত ভাসিয়ে নিয়ে গেল।

যুদ্ধের কিছুদিন পর ঢাকা থেকে সিরাজ ভাই, রাজ্জাক ভাই সহ ছাত্রলীগের কয়েকজন কেন্দ্রীয় নেতা খুলনায় এলেন সাংগঠনিক কাজে। আমাদের কয়েকজনকে বললেন–প্রস্তুত থাকো, কিছু দিনের মধ্যে নতুন কর্মসূচী আসছে, অন্য রকম কিছু। পশ্চিম পাকিস্তানের কায়েমি শক্তি হয়ত মানতে চাইবে না, প্রচণ্ড বাধা দেবে। কিন্তু ওটাই বাঙালির মুক্তি সনদ।

– জিজ্ঞাসা করলাম, আমরা কি তবে স্বাধীনতা দাবী করতে যাচ্ছি? আমার যতদূর মনে পড়ে কিছু দিন থেকে এ ধরনের একটি ভাসা ভাসা কথা আমরা শুনতে পাচ্ছিলাম।

নেতৃবৃন্দ আশ্বস্ত করলেন– আরে না না, সে রকম কিছু না, বলতে পারিস পূর্ব বাংলার জন্য বড় ধরনের স্বায়ত্ত্বশাসন। শ্লোগানসর্বস্ব না, প্রকৃত অর্থেই স্বায়ত্ত্বশাসন। ফলে অনেকেই একে স্বাধীনতার বিকল্প ভাবতে পারে এবং হৈচৈ বাধাতে পারে।

শেখ মুজিব গণতন্ত্র ও পূর্ব বাংলার জন্য স্বায়ত্বশাসনের এক ঋজু ফর্মুলা–'৬-দফা' উপস্থাপন করে সহসাই লাইমলাইটে চলে এলেন। বললেন এটা আমাদের বাঁচা-মরার দাবী। ৬-দফা আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগের রাজনীতিতে সহসাই অভাবিত গতি সঞ্চার করল। তবে এর বাইরে সে সময় ৬-দফার পক্ষে সক্রিয় বন্ধু পাওয়া কঠিন ছিল। প্রেসিডেন্ট আইয়ুব সাথে সাথে ক্রুদ্ধ প্রতিক্রিয়া দেখালেন– শেখ মুজিব দেশকেবিচ্ছিন্ন করতে চাচ্ছেন, এটাতারই ফর্মুলা। তিনি অস্ত্রের ভাষায় ৬-দফা মোকাবেলার ঘোষণা দিলেন। বিস্ময়ের ব্যাপাররাষ্ট্রপতি হয়েও আইনিপ্রক্রিয়ায়না যেয়ে বলপ্রয়োগে ৬-দফা মোকাবেলার হুমকি দিয়ে তিনি নিজেই নিশ্চিত করলেন যে ৬-দফা বে-আইনি কিছু নয়। পরিস্কার হয়ে গেল এই দাবী তাদের কায়েমী স্বার্থের প্রতি হুমকি সৃষ্টি করেছে, তিনি এটাকে গায়ের জোরে নস্যাৎ করবেন।

তার এই ঘোষণা মুজিব বিরোধীদের উৎসাহিত করল। দক্ষিণপন্থী দলগুলো৬-দফার প্রতিটি দফার মধ্যে ইসলাম ও পাকিস্তানধ্বংসের বীজ আবিস্কার করে ৬-দফার বিরুদ্ধে নিরন্তরগলাবাজি করে গলদ্ঘর্ম হতে থাকলো।পিপলস পার্টি প্রধান জুলফিকার আলী ভুট্টো ৬-দফা প্রশ্নে শেখ মুজিবের প্রতি বাহাসের চ্যালেঞ্জ পর্যন্ত ছুড়ে দিলেন। কিন্তু শেখমুজিব চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করা মাত্রই তিনি পিছু হটলেন। শেখ মুজিবের 'আমাদের বাঁচার দাবী৬-দফা' পুস্তিকাটিহাতে আসার আগেই আমি ৬-দফার তীব্র সমালোচনা করে লেখা জামাতে ইসলামির কথিত তাত্ত্বিক

নেতা গোলাম আজমের ‘যুক্তির কষ্টিপাথরে ৬-দফা’ পুস্তিকাটি হাতে পেলাম। এতে৬-দফা বুঝতে ও বিশ্বাস করতে আমার অশেষ সুবিধা হল।

ন্যাপ নেতা মওলানা ভাসানী সহ চীনপন্থী বামদলগুলোও ৬-দফাকেবিন্দুমাত্র ছাড় দিলেন না। তারা এই ফর্মুলাকেভারত ও সিআইএ প্রণীত বুর্জোয়া ফর্মুলা বলে চিহ্নিত করলেন এবং এতেসমাজতন্ত্র ও সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তির কথা নেই, এটাপশ্চিম পাকিস্তানিবুর্জোয়ার বদলে বাঙালি বুর্জোয়ার জন্ম দেবে– এমন সব অভিযোগএনে ৬-দফার বিরুদ্ধে তীব্র প্রপাগান্ডায় নেমে পড়লেন। তারা যদিও জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের পর্যায়ে ক্ষুদ্র ও মাঝারী বুর্জোয়াদের সাথে কৌশলগত ঐক্য গড়ার কমুনিষ্ট ফর্মুলার কথা বলতেন,দুর্ভাগ্যক্রমে বাংলাদেশের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের প্রশ্নে সে তত্ত্ব বেমালুম বিস্মৃত হলেন।

৬-দফা ঘোষণার পর আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগের উপর আইয়ুব সরকারের তীব্রদমন পীড়ন নেমে এলো।একদিকে নির্যাতন ভীতি, অন্যদিকে পাকিস্তানের অখণ্ডতার প্রশ্নে সংশয়ের কারণে সংগঠনের অভ্যন্তরেওবিরোধপ্রকট হয়ে দেখাদিল। কেউ কেউ বলা শুরু করলেন ৬-দফা দেয়া হয়েছে, কিন্তু এটা বেদ-উপনিষদ নয়। এখানে গিভ এন্ড টেকের ব্যাপার আছে, কিছু পাবো, কিছু ছাড়তে হবে। কিন্তু অন্যরা একাগ্রতার সাথে ৬-দফার পক্ষে দাঁড়িয়ে গেলেন।

১৯৬৬সালেছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ইঞ্জিনিয়ার্স ইনষ্টিটিউটে। তখন একটা বন্ধ্যা সময় চলছে। আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ সবাই প্রায় জেলে। যারা বাইরে আছেন তাদের মধ্যে ৬-দফা নিয়ে টানাপোড়েন। তাদের এক বড় অংশসমন্বয়ের কথা বেশি ভাবেন। ছাত্রলীগ সম্মেলনে আমন্ত্রিত বক্তাদের মধ্যে সমন্বয়পন্থীদেরই প্রধান্য। ফলে সম্মেলন ফেলে বিক্ষিপ্ত ভাবে ঘোরাঘুরি করছে গোটা দেশ থেকে আগত ছাত্র প্রতিনিধিরা। হলের চেয়ে বাইরে ঢের বেশী ছাত্র। তারা এভাবে তৎকালীন প্রভাবশালী ছাত্রনেতাফেরদৌস আহমদ কোরেশিদের সমন্বয় মার্কা তত্ত্বের প্রতি ঘোর অনাস্থাপ্রকাশ করলেন।

ইত্তেফাক সম্পাদকের উপর আমাদের বিরাট আস্থা। তার সুরও ভিন্ন, বললেন–‘৬-দফা দেয়া হয়েছে। কর্মসূচী যখন দেয়া হয় দেয়া-নেয়ার প্রশ্ন থাকে, আলোচনার অবকাশ থাকে। সব দাবী পূরণ হতে হবে এমন নয়।তবে মূল দাবীগুলির প্রতি আমাদের দৃঢ় থাকতে হবে।’ ফেরদৌস কোরেশির নেতৃত্বে মুষ্টিমেয় ছাত্রেরকরতালি সবার কানে বেসুরো ঠেকলো। আমরা বরং আশ্বান্বিত হলাম অবজারভার সম্পাদক আব্দুস সালামের বক্তৃতায়। সব শেষে প্রাক্তন ছাত্রলীগ সভাপতি শাহ মোয়াজ্জেম হোসেনের নাম ঘোষণা করা হল। তার নাম তখনো ছাত্রলীগ কর্মীদের মাঝে হ্যামিলনের বাঁশির মত কাজ করে। আমরা হতাশ হয়ে বাইরে দাঁড়িয়েছিলাম। তার নাম ঘোষণা হতেই চারপাশথেকে ছাত্ররা মন্ত্রমুগ্ধের মত হলমুখী হল। কখন যে সে স্রোতে মিশে গেছি জানিনা। যখন হলে ঢুকলাম সব চেয়ার ভর্তী, প্যাকড্আপ হলে ভীড় করে দাঁড়ানো ছাত্রদের পিছনে কোন মতে স্থান করে নিতে হল। জলদগম্ভীর স্বরে মোয়াজ্জেম ভাই বললেন– ওনারা বিদগ্ধজন, অনেক ভেবে চিন্তে কথা বলেন, সিদ্ধান্ত নেন এবং সিদ্ধান্ত দেন। তাদের কথা শোনা ভাল, বিপদের আশংকা থাকেনা। তবে সবসময় ওনাদের কথা মানতে নেই। তাহলে সামনে এগিয়ে চলার গতি থমকে যায়। এক পা এগোলে দুপা পিছিয়ে যেতে হয়। তারুণ্যের ধর্মই হচ্ছে এগিয়ে চলা, তোমাদের এগিয়ে যেতে হবে অকুতোভয়ে, ঝুঁকি নিয়ে। নইলে বাঙালির মুক্তি সুদূর পরাহত। ৬-দফা আলোচনার টেবিলে তুলে দেয়া হয়নি। প্রতিটি দফাই আমাদের চাই, প্রতিটি দফাই পেতে হবে, হুবহু পেতে হবে, নইলে পূর্ব বাংলার স্বায়ত্ত্বশাসন আগের মতই অস্বচ্ছ অর্থহীন দফায় পরিণত হবে।

এতক্ষণেঝিমিয়ে পড়া দেহগুলো চাঙ্গা হয়ে উঠল, ম্রিয়মানচোখগুলোতে জলন্ত দৃষ্টি ফিরে এলো, মনে হল আমরা সত্যই ছাত্রলীগ সম্মেলন থেকে বেরিয়ে এলাম। আমি অনেক পরে এরশাদ আমলের মন্ত্রীমোয়াজ্জেম ভাইয়ের আরও এক বক্তৃতা শুনেছিলাম, সম্ভবত টিভিতে–‘দুই মহিলার মিলনে....।’ আমি মোয়াজ্জেম ভাইকে কিছুতেই মিলাতে পারছিলাম না!

৬-দফা নিয়মতান্ত্রিক পথে পূর্ব বাংলার স্বাধীনতার অনন্যফর্মুলা

শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৬৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে গণতন্ত্র এবং পূর্ব বাংলার স্বায়ত্তশাসনের সুনির্দিষ্ট রূপরেখা সম্বলিত ৬-দফা প্রস্তাব উত্থাপন করেন। ১৯৬৫ সালে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধে পূর্ব বাংলার চরম নিরাপত্তাহীন অবস্থার প্রেক্ষিতে এই অঞ্চলের মানুষের আত্মনির্ভরশীল হওয়ার তাগিদ তীব্রভাবে সামনে চলে আসে এবং ৬-দফার মত চোখা দাবীর উদ্ভব হয়। ১৯৬৬ সালের এপ্রিল মাসে শেখ মুজিব খুলনার জনসভায় জ্বালাময়ী ভাষায় প্রস্তাবগুলির ব্যাখ্যা সর্বপ্রথম জনসমক্ষে তুলে ধরেন এবং বলেন যে ৬-দফা পূর্ব বাংলার মানুষের বাঁচার দাবী, যে কোন মূল্যে এ দাবী আদায় করা হবে।

স্বভাবতই ৬-দফা সম্পর্কে পশ্চিম পাকিস্তানি বিশেষকরে পাঞ্জাবী কায়েমী শোষক গোষ্ঠীর প্রতিক্রিয়া ভয়াবহ হয়। প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান ৬-দফাকে দেশ ভাঙ্গার ষড়যন্ত্র বলে অভিহিত করে 'অস্ত্রের ভাষায়' এর মোকাবেলা করার ঘোষণা দেন। রাষ্ট্রপতির এ ধরনের অসংবিধানিক পথ বেছে নেয়া ছাড়া বিকল্প ছিলনা কেননা আইনের দৃষ্টিতে ৬-দফা কোন রাষ্ট্রদ্রোহিতামূলক প্রস্তাব ছিলনা। তবে রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে ৬-দফা প্রস্তাব ছিল শেখ মুজিব এবং তার সহকর্মীদের অসাধারণ রাজনৈতিক প্রজ্ঞাপ্রসূত এমন এক দাবীনামা, যা বাস্তবায়িত হলে আঞ্চলিক শাসন-শোষণ বন্ধের পাশাপাশিঅদূর ভবিষ্যতে পূর্ব বাংলার স্বাধীনতা বাঙালিদের ইচ্ছাধীন ও অনায়াসসাপেক্ষ হয়ে যেত। বস্তুতপাকিস্তানের বুকে ৬-দফা ছিলএমন একটি আইনসম্মত আন্দোলন যানিকট ভবিষ্যতেপূর্ববাংলার স্বাধীনতানিশ্চিত করতে সমর্থ ছিল। আইয়ুবগংদের যত ক্রোধ এখানেই।

পাকিস্তানের প্রারম্ভ থেকেই ৫৬ ভাগজনসংখ্যা অধ্যুষিত পূর্ব বাংলার প্রতিরক্ষায় মাত্র ১ ডিভিশন সৈন্য, এক স্কোয়াড্রন এফ-৮৬ ফাইটার প্লেন এবং কয়েকটি মাত্র গানবোট মোতায়েন ছিল। সামরিক খাতে যেহেতু সর্বাধিক অর্থ ব্যয় হয় সেজন্য পূর্ববঙ্গে নেভাল হেড কোয়ার্টারসহসামরিক শক্তি বৃদ্ধির দাবীজনপ্রিয় দাবী ছিল। বিস্ময়করভাবে শেখ মুজিব এসব দাবী থেকে সরে আসেন। তিনিদূরদর্শী ছিলেন এবং বাংলার বুকে পাঞ্জাবি, পাঠান ও বেলুচ অধ্যুষিতসেনাবাহিনীর শক্তি বৃদ্ধি চাননি। পরিবর্তে ৬-দফায় সম্পূর্ণ বাঙালিদের নিয়ে হালকাঅত্যাধুনিক অস্ত্রসজ্জিত প্যারামিলিটারি বাহিনী গঠনের প্রস্তাব দেন। বস্তুত এই দাবী অর্জিত হলে প্যারা মিলিটারিদের দ্বারা গুটিকয়েক ক্যান্টনমেন্ট অবরুদ্ধ করা সহজ ছিল। এর ফলেসম্ভবতসর্বোচ্চ দু'বছরের মধ্যেই পূর্ব বাংলার স্বাধীনতা এখানকার জনগণের ইচ্ছাধীন হয়ে যেত। শেখ মুজিব আপাদমস্তক গণতন্ত্রী ছিলেন,গণতান্ত্রিক পথেই স্বাধীনতা আন্দোলনের স্বপ্ন দেখেছিলেন। ৬-দফা ছিলতারই অনবদ্য ফর্মুলা–একটি দেশের মাটিতে বসে নিয়মতান্ত্রিক পথে সে দেশের একাংশের ভবিষ্যৎ স্বাধীনতা সংগ্রামেরএক অনন্য দলিল।

৬-দফা সম্পর্কে সাধারণমানুষও আমাদের কাছে প্রশ্নকরত– এটা ডশসত্যি যে ৬-দফা অর্জিত হলে পাকিস্তান ভেঙ্গে যাবে? বস্তুত কোন কিছুতে অভ্যস্ত হয়ে যাওয়ামানুষের সাধারণ প্রবণতা। দু'দশকে আমরা পাকিস্তানে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছি। দু'অঞ্চলের মধ্যে হাজার মাইল ব্যবধান।দু'অঞ্চলেরভূপ্রকৃতি, আবহাওয়া, ভাষা, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, মানুষের মন-মানসিকতা, পোষাক-পরিচ্ছদ, খাদ্যাভাস- সব কিছুতে যোজন যোজন পার্থক্য। ধর্ম ও সংহতির নামে লুটপাট চালিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানিরা আমাদের প্রতিনিয়ত ছিবড়ে করে ছাড়ছে। তথাপি পাকিস্তানে অভ্যস্ত হয়ে যাওয়ায় আমরা বিচ্ছিন্ন হতে অনিচ্ছুক, তার চেয়ে বেশি, ভীত-কি হবে ভবিষ্যতে! ভয় বৈরিভারতকে নিয়ে। পাকিস্তান থেকে বেরিয়ে এলে আমারা কি ভারতের থাবায়পড়ে যাব! যেন নিজেদের উপর কোন আস্থানেই, নিজেদের পায়ে দাঁড়ানোর ক্ষমতা নেই–লতাগুল্মের মত মেরুদণ্ডহীন এক পরগাছা প্রজাতি। বৃটেন, আমেরিকা,ভারত, চীন বা পাকিস্তানের ঠেক ছাড়া যেন আমরা দাঁড়াতেই অক্ষম। আমাদের কর্মীরাও মাঝে মাঝেএমন সংশয়ের কথা বলে।তবে ভিন্ন ধাতুতে গড়াশেখ মুজিবই প্রথমআমাদের দেখিয়ে দিলেন, বাঙালিরা মেরুদণ্ডহীন নয়,তারাও নিজেদের শক্তিতে শক্ত হয়ে দাঁড়াতে পারে।

শেখ মুজিব ৬-দফায়স্বায়ত্তশাসনের সুনির্দিষ্ট রূপরেখা তুলে ধরেন–স্বায়ত্তশাসনের সর্বোচ্চরূপ যা পূর্ববঙ্গের ওপর দেড় যুগ ধরে চলে আসা শোষণের রন্ধ্রগুলো সীলড্ করে দেয়ার জন্য যথেষ্ট ছিল। স্বভাবতই পশ্চিম পাকিস্তানি শোষক কোটারি যার মধ্যে আর্মি, আমলা, ব্যবসায়ী, শিল্পপতি ও রাজনীতিকরা সামিল ছিল, ভয়ংকরভাবেক্ষিপ্তহয়। তাদের কাছে এটা ছিল 'জন্মগতভাবে কালো, হতদরিদ্র, অবনত মস্তক' বাঙালিদের সীমাহীনধৃষ্টতা।

৬-দফা দাবীকে তারা অভিহিত করেছিল কনফেডারেশনের দাবী বলে যা সত্য ছিল না। কেননা পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানদুটোপৃথক স্বাধীন রাষ্ট্র ছিলনা এবং তারা বিশেষ কোন লক্ষ্য সামনে রেখে ঐক্যবদ্ধ হতে যায়নি। বরং তারা ছিল একই রাষ্ট্রের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ যারা এক কেন্দ্রিক শাসন ব্যবস্থার নিগড় থেকে বেরিয়ে ফেডারেল ধরনের শাসন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে চেয়েছিল। সেখানে কেন্দ্রের হাতে কতগুলি কমন বিষয় রেখে অন্য সকল বিষয়ে ক্ষমতা প্রদেশের হাতে রাখার কথা বলা হয়েছিল। বস্তুত হাজার মাইল দূরত্বে অবস্থিত দেশের দু অংশের মধ্যে কমন বিষয় কমই থাকে। ৬-দফায় দেশরক্ষা ও পররাষ্ট্রনীতি (রাজনৈতিক) কেন্দ্রের হাতে রাখার প্রস্তাব দেয়া হয়। এবং বৈদেশিক বাণিজ্য,কর ও মুদ্রানীতি, যোগাযোগএবং হালকা অস্ত্র সজ্জিত আধাসামরিক বাহিনী প্রদেশের হাতে রাখার কথা বলা হয়।

তবে পাকিস্তানিরা ঠিকই বুঝেছিল বাঙালিরা ৬-দফা আদায় করতে পারলে পূর্ববঙ্গের স্বাধীনতা তাদের ইচ্ছাধীন হয়ে যাবে। বস্তুত এমন ধারণা মোটেও অমূলক ছিলনা। ৬-দফা বলে বৈদেশিক বাণিজ্যের উপর পূর্ব বাংলার নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হত, অর্থ পাচারের পথ রুদ্ধ হওয়ায় পূর্ববঙ্গের অর্থনীতি শক্তিশালী হত, দক্ষ জনশক্তি ও বাঙালিদের সমন্বয়ে শক্তিশালী প্যারামিলিটারি গড়ে উঠত। ধারণা করা হয় সর্বোচ্চ দুবছরের মধ্যেই এই প্যারা মিলিটারি বাহিনী পাকিস্তানি সামরিক ছাউনিগুলি ঘেরাও ও সার্বিকভাবে বিচ্ছিন্ন করে পাকিস্তানি সৈন্যদের অস্ত্র সংবরণ ও দেশে ফিরে যেতে বাধ্য করতে পারত। ৬-দফার প্রতি পাকিস্তানিদের যত আক্রোশ মূলত কারণেই।

আমরা বাঙালি ছিলাম

একদিন রশিদকে এস আই খান সাহেবের টেবিলের সামনে বসা দেখে বিস্মিত হলাম, চেম্বার থেকে বেরোনোর পর জিজ্ঞাসা করলাম, কি ব্যাপার আপনি এখানে!

সে হাসতে হাসতে বলল– যেখানে আপনি চাকরি করতে পারেন নি, আমি পারব কিভাবে? আমিও বাঙালি। হারেস সাহেব কিভাবে যেন জেনে গিয়েছিল আমি কমার্স কলেজ ছাত্র সংসদের জেনারেল সেক্রেটারি। ব্যাস সেই থেকে পদে পদে সন্দেহ। স্টাফ ইউনিয়ন কোন দাবী উত্থাপন করলে তার পিছনে সে আমার হাত আবিস্কার করে। কোন একটা কাজ দিয়ে পনের মিনিটও যেতে পারেনা, তাগাদা দিতে থাকে। কিছু বলতেও পারছিলাম না, চাকরি কনফার্ম হয়নি, ব্যাটারা খালি তিন মাস তিন মাস করে সময় বাড়াচ্ছে। একদিন মেজাজ খারাপ হয়ে গেল, ফাইলপত্র নিয়েঝপাত করে তার টেবিলের উপর ফেললাম, বললাম বুঝতে পারছি না, বুঝিয়ে দিন। তার কাজের দৌড় তো আপনি জানেন। সে অভাবটা পুরণ করল আমার উপর ঝাল ঝেড়ে।আমি রহিমুল্লার মোরেলগঞ্জের পোলা, কঠিনভাবে বললাম ল্যাঙ্গুয়েজ প্লিজ, ফার্স্ট ইউ লার্ন দি জব এন্ডগাইড মি, দেন আই শ্যাল ডু ইট। তারপর হন হন করে আমার টেবিলে চলে এলাম। সে চোখ মুখ লাল করেগুম হয়ে কিছুক্ষণ বসে থাকল, তারপর উঠে ফিদাই সাহেবের চেম্বারে ঢুকে গেল। আমি জানতাম কি হতে যাচ্ছে। ঘন্টা খানেক পর ডেসপ্যাচ পিত্তন এসে বিমর্ষভাবে আমার হাতে একটা খাম ধরিয়ে দিয়ে পিওনবুকে সই নিয়ে চলে গেল।

সে সময় এ ধরনের চিঠি বাঙালি স্টাফদের কাছে 'লাভ লেটার' নামে পরিচিত ছিল এবং তারা তা পেতে অভ্যস্ত ছিল– কিছুদিন আগে যে দুর্লভ চাকরিটারশিদ পেয়েছিল'অনিবার্য কারণবশত' মিল কর্তৃপক্ষ দুঃখের সাথে তা বাতিল করছেন। ভবিষ্যতে প্রয়োজন হলে তার সাথে যোগাযোগ করা হবে।

রশিদ বলল– আমি আগেই জিনিষপত্র গুছিয়ে নিয়েছিলাম। চিঠিটি নিয়ে হারেস সাহেবের টেবিলে চলে এলাম, কুচিকুচি করে ছিড়ে টুকরোগুলো তার টেবিলের উপর ছড়িয়ে দিয়ে বললাম– আই স্পিট অন ইওর জব।

হারেস এতক্ষণ একটা কথাও বলেনি, পাছে আবার কোন কড়া কথা শুনতে হয়। তবেআমি চোখের আড়াল হওয়া মাত্র সেনাকি শ্লেষের সাথে বলেছিল– মালিক আউর নওকরকা ফারাক উও নাদান আব সামঝেগা। তারপর ক্রুদ্ধস্বরে পিওনের উদ্দেশ্যে খিচিয়ে উঠেছিল–তামাশা দেখতা হ্যায় কেয়া? টেবিল সাফা কর জলদি। ভাবছি, দু একদিনের মধ্যে ওকে একটা টেলিফোন করব।

এই হারেছ সাহেব আমাদের মতই চাকরিজীবী, আগাখান কমুনিটিরও কেউ না। তথাপি তার মত অবাঙ্গালী অফিসার এমনকি একজন নগন্য অবাঙ্গালী পিওনও নিজেকে মিলের মালিক ভাবতে অভ্যস্ত ছিল।

রশিদ সহজেই স্টারের কস্ট এন্ড রিপোর্ট শাখায় চাকরি পেয়ে গেল। এই সেকশান ছিল এস আই খান সাহেবের অধীনে। কিন্তু শীঘ্রই মুহম্মদজুবায়ের নামে এক অবাঙ্গালী ভদ্রলোককে মিলে চাকরি দেয়া হল এবং কস্ট-রিপোর্ট সেকশান সহ ওয়েজেস সেকশনকে হিসাব বিভাগ থেকে আলাদা করে তার অধীনে দেয়া হল। তিনি মধ্য ভারতের উদ্বাস্তু ছিলেন, বাঙালিদের মনেপ্রাণে ঘৃণা করতেন। সবচেয়ে বেশি বিরক্ত ছিলেন তার বিভাগের কর্মচারিদের উপর। তারা সবাই বাঙালি ছিল। গোদের উপর বিষফোড়ার মত কয়েকজন স্টাফ ছিল হিন্দু ও খ্রিস্টান। রশিদ বেটে-খাটো কিন্তু স্মার্ট। সেকথাবার্তায়ও বেশ চৌকশ ছিল। জুবায়ের সাহেবের ঘোর অপছন্দের তালিকায় এ ধরনের বাঙালি এক নম্বরে অবস্থান করত। ফলে রশিদ এখানেও বেশিদিন চাকরি করতে পারেনি, তার প্রয়োজনও ছিলনা। সে মোরেলগঞ্জ কলেজে শিক্ষকতার চাকরি নিয়ে চলে যায়।

বাঙালি ছেলেরা বিকম-এমকম পাশ করতে পারে এটা জুবায়ের সাহেবের কাছে তেমন বিশ্বাসযোগ্য ছিল না। তিনি একদিন বিরক্ত হয়ে কস্ট শাখার অফিস অ্যাসিসটেন্ট চঞ্চল সাহাকে জিজ্ঞাসা করলেন, চঞ্চল তোমহারা সোর্স কেয়া? চঞ্চল বাবু অবাক হয়ে জুবায়ের সাহেবের মুখের দিকে তাকালেন।

কিয়া, সামঝা নেহি! ক্যায়সে সামঝেগা? আই ওয়ান্টেড টু নো ইওর সোর্স, নকরি মিলা ক্যায়সে?

চঞ্চল বাবু বাম রাজনীতির অনুরক্ত ছিলেন, বেশ স্প্রিটেড, বললেন– এডুকেশন স্যার, আমি কমার্স গ্রাজুয়েট, ইন্টারভিউ ফেস করে এসেছি।

আই ডোন্ট বিলিভ দ্যাট, অ্যান্ড আই ডোন্ট রিকগনাইজ ইওর গ্রাজুয়েশন ডিগ্রী অলসো, হো সকতা তোম....।

কথা কেড়ে নিয়ে চঞ্চল বাবু বললেন, ইউনিভার্সিটি হ্যাজ রেকগনাইজ্ড মি, এন্ড আই ডোন্ট নিড ফারদার রেকগনিশন ফ্রম এনিওয়ান অব ইউ।

জুবায়ের সাহেবের ফর্সা মুখ মুহূর্তে লাল হয়ে গেল। ক্রোধের সাথে কিছুক্ষণ গুম হয়ে বসে থাকলেন। কিন্তু তার বেশি কিছু করার উপায় ছিলনা, ডিপার্টমেন্টের যাবতীয় কাজের জন্য তাকে চঞ্চল বাবুর উপর নির্ভর করতে হত। তবে এটা তার গাত্রদাহ বাড়িয়ে দিয়েছিল। কয়েক দিন পর নিজ কমুনিটির এক ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে অফিসে ঢুকে বললেন–'চঞ্চল মিট হিম, হি ইজ ওয়ালী। য়ু ইউল টিচ হিম এণ্ড গিভ হিম আইডিয়া এবাউট অল ডিপার্টমেন্টাল ওয়ার্ক। অ্যাট দ্য সেম টাইম য়ু উইল ওয়র্ক আন্ডার হিম।'চঞ্চল বাবুকে নিরুত্তর দেখে মনে মনে হাসলেন, তারপর ভ্রুকুটি করে বললেন– এনি প্রবলেম, চঞ্চল?

চঞ্চল বাবুর চাকরির বিশেষ প্রয়োজন ছিল,বললেন– নো স্যার।

ওয়ালী রশীদের পরিত্যাক্ত হাফ সেক্রেটারিয়েট টেবিলে জাঁকিয়ে বসল।

জুবায়ের সাহেব একদিন বললেন, চঞ্চল আই নিড এ টিউটর ফর মাই ডটার।

ওয়েল, আই শ্যাল ট্রাই স্যার।

নো নো, আই ওন্ট অ্যালাউ এনি আননোন পারসন ফর মাই গ্রোনআপডটার। আই থিংক, ইউ কাম এন্ড টিচ হার। আই নো হিন্দুজ আর বাই নেচার গুড টিচার্স।

চঞ্চল বাবু রাজি হলেন। মেয়েটা পড়াশুনায় ভাল, কিন্তু চঞ্চল বাবু দেখলেন পড়ার সময়টা সে খুবই বিব্রত অবস্থায় থাকে।

তুমি সবসময়এমন ভয়ের মধ্যে থাকো কেন? কোন সমস্যা হলে বল।

কই, না তো স্যার, ভয়ে ভয়ে থকব কেন! ঠিকই তো আছি। তারপর একটু থেমে ধীরে ধীরে নিচুস্বরে বলল, আব্বা প্রায়ই দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে থাকেন, আমার অস্বস্তি লাগে তাই। আই অ্যাম সরি স্যার!

জুবায়ের সাহেব একদিন ধরা খেলেন। তার বড় বোন হবেন হয়তো, পাশের ঘরে ঢুকে হৈচৈ বাধিয়ে দিলেন–আরে জুবায়ের তোম ওহা খাড়া কিউ, তারপর হঠাৎ গলা নামিয়ে বললেন, ও আচ্ছা সামাঝ্ লিয়া–দ্যাট হিন্দু টিচার! ঠিক হ্যায়, ঠিক হ্যায়, জরুর নজর রাখনা।

পরদিন বাইরে দেখা হলে জুবায়ের সাহেব চঞ্চল বাবুকে বললেন–চঞ্চল ডোন্ট মাইন্ড, কোই ব্যাচেলর স্পেশালি হিন্দু ব্যাচেলর আউর হামারা লেড়কি এক ঘরমে দেড়-দো ঘন্টে একসাথ একেলে রহে ইয়ে হামারা বিলকুল পছন্দ নেহি, বাট হামারা পাস কোই অলটারনেটিভ ভি নেহি হ্যায়। ইসি লিয়ে খেয়াল রাখনা পড়তা। য়ু উইল অলসো রিয়ালাইজ ইট হোয়েন য়ু উইল বি এ ফাদার অব এ বিউটিফুল গার্ল।

আন্দোলনের কাল

শেখ মুজিব সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন ৬-দফা ব্যাখ্যা করা এবং জনগনকে ৬-দফার পক্ষে সঙ্গবদ্ধ করার জন্য তিনি প্রতিটি জেলায় সভা-সমাবেশ করবেন। প্রথম জেলা হিসাবে বেছে নিয়েছিলেন খুলনাকে।১৯৬৬ এপ্রিলের মাঝামাঝি সময়ে খুলনার জনসভায় তিনি জ্বালাময়ী ভাষায় একে একে ৬-দফা ব্যাখ্যা করেন। রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগেরাতে যশোরে তাকে গ্রেফতার করা হয়। তবে কোর্টের আদেশে তার জামিনহয় এবং তিনি যশোরে জনসভায় বক্তৃতা করেন।পূর্ববঙ্গের গভর্নর মোনেম খান ছিলেন এক অতি নিকৃষ্ট শ্রেণীরমোসাহেব, প্রেসিডেন্ট আইয়ুবকে প্রভুজ্ঞান করতেন। তিনি ঘোষণা করেন যে তিনি গভর্নও থাকা পর্যন্ত শেখ মুজিবকে জেলের ভিতরেই থাকতে হবে। এভাবে বিভিন্ন জেলায় পর্যায়ক্রমে শেখ মুজিবেরজনসভা, গ্রেফতার ও জামিন চলতে থাকে। এর সমাপ্তি ঘটে ৮ মে নারায়নগঞ্জে জনসভার পর।দেশরক্ষা আইনে শেখ মুজিবকে অনির্দিষ্ট কালের জন্য আটককরা হয়। প্রায় দেড় বছর পর ১৮ জানুয়ারি ১৯৬৮প্রহসনমূলকভাবে তাকে মুক্তি দেয়া হয় এবং

সাথে সাথে জেল গেট থেকে পুনরায় গ্রেফতার করা হয়। এবার হত্যার উদ্দেশ্যে তাকে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় প্রধান আসামী হিসাবেফাঁসিয়ে দেয়া হয়।

এর কিছুদিন আগে পাকিস্তান থেকে পূর্ববঙ্গকে বিচ্ছিন্ন করার ষড়যন্ত্রেও দায়ে নৌবাহিনীর লে. কমান্ডার মোয়াজ্জেম হেসেনকেপ্রধান আসামী করে 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' দায়ের করা হয়েছিল। আইয়ুব ও তার পরামর্শকরাএই কথিত ষড়যন্ত্রের মধ্যে শেখ মুজিবকে ফাঁসিয়ে ৬-দফা আন্দোলন নস্যাৎ করার এক চমৎকার সম্ভাবনা দেখতে পেলেন এবংকালবিলম্ব না করে মামলায় তাকে প্রধান আসামী হিসাবে ফাঁসিয়ে দেন। মামলার কয়েক দিনের মধ্যেপ্রধান আসামী বদলানোর এই খেলা শুরুতেই জনগণের কাছে মামলার যর্থাথতা প্রশ্নবিদ্ধ করে তোলে,যদিও সবাই তখন ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিল। এই সময়টা আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগের জন্য ছিল কঠিন সময়।নিজেদের বাইরে তখন ৬-দফার পক্ষে কোন বন্ধু ছিলনা। পাশাপাশি সরকারের হুমকি-ধামকি ও ধরপাকড় দল দুটিকে কোণঠাসা করে ফেলেছিল।

যেদিন শেখ মুজিবকে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় ফাঁসানো হয় আমরা দশ-বারোজন ছাত্র সকালের দিকে জাহিদের বর্ণালী প্রেসে মিলিত হলাম। পাশেই সুইটহাইজ তখন পরিত্যাক্ত অবস্থায় খাঁখাঁ করছিল। একজন দুজন করে আমরা সবাই আওয়ামী অফিসে এলাম। অফিসটি ছিল যশোর রোডে, আহসান আহমদ রোডের সংযোগস্থলের সামান্য পশ্চিমে। ভেতরে তখনষড়যন্ত্র মামলায় শেখ মুজিবের গ্রেফতারের প্রেক্ষিতেআওয়ামী লীগ নেতাদের আলোচনা চলছিল। আমরা বাইরে অপেক্ষারত ছিলাম। সংক্ষিপ্ত আলোচনা শেষে তারা জানালেন, এই মুহূর্তে কোন কিছু করা হলে তা আদালত অবমাননারসামিল হতে পারে। তাছাড়া তাদের হাতে পর্যাপ্ত তথ্য নেই এবং ভারপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের সাথেও যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি।এখন এককভাবে কিছু করতে গেলেসবাই গ্রেফতার হয়ে যাবে এবং বাইরে ৬-দফার পক্ষে কাজ চালানো কঠিন হবে। তবে কেন্দ্র থেকে নির্দেশ পাওয়া মাত্রই তারা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে বিলম্ব করবেন না।

খুবই যুক্তিপূর্ণ কথা। সত্যি বলতে কি বেশ স্বস্তি পেলাম, আবার ভেতরে কাঁটার মত যন্ত্রণায় বিদ্ধ হতে থাকলাম। মুজিব ভাই স্পষ্টত এক মিথ্যা ষড়যন্ত্র মামলায় গ্রেফতার হয়েছেন, আইয়ুব খাঁন তাকে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলাতে চায়, অথচ আমরা প্রতিবাদ করব না এটা মেনে নেয়া আসলেই খুবই কঠিন ছিল।সবার মনোভাবসম্ভবত একই ছিল। কিছুক্ষণ নিরবতার পর একজন বলে উঠল, আমরা এ সিদ্ধান্ত মানিনা। কয়েক সেকেণ্ড সময় নিয়ে আর একজন বলল,আমরা অবশ্যই মিছিল করব। আমার মনে প্রচণ্ড ভয়, কিন্তু পারস্পরিক শক্তিই সাহস যোগালো। কে আর পিছিয়ে থাকতে পারে!এক শিহরণ জাগানো মুহূর্ত, সবাইপ্রত্যয় নিয়েবলল- মিছিল হবেই।

আওয়ামী লীগ নেতারা আপত্তি করলেন না, বললেন এটা তোমাদের সিদ্ধান্ত, তবে আমরা এই মুহূর্তে কোন মিছিল মিটিংয়ে যাচ্ছিনা। আওয়ামী লীগ অফিসে ফেস্টুন রেডি ছিল। আমরা কাগজ সংগ্রহ করে দ্রুত কয়েকটি পোস্টার লিখে ফেললাম– শেখ মুজিবের মুক্তি চাই, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা মানিনা, মিথ্যা মামলা আগরতলা মানিনা-মানব না, আমাদের বাঁচার দাবী ৬-দফা মানতে হবে, গ্রেফতার নির্যাতন বন্ধ কর। কয়েক মিনিটের মধ্যে আট-দশটি ফেস্টুন নিয়ে আমরা দশ-বার জন ছাত্র শ্লোগান দিতে দিতে বেরিয়ে পড়লাম। আপাত লক্ষ্য ডাকবাংলা, যদিও প্রতিটি মুহূর্তে পুলিশি বাঁধার ভয় ছিল।

আমি জানতাম যেভাবেই হোক না কেন আমাকে অন্তত গ্রেফতার এড়িয়ে যেতে হবে, নইলে জুট মিলের চাকরি থাকবেনা। আমি চারদিকে নজর রেখেছিলাম এবং দ্রুত ছুটেআসা পুলিশ ভ্যানটা ঠিকসময়ে আমার নজর কেড়েছিল। আমরা তখন সবে পার্কের সামনে, গাড়িটা একেবারে হুড়মুড় করে ক্ষুদ্র মিছিলটার উপর হামলে পড়ল।তার আগেই আমি এক পৌঢ় ভদ্রলোকের চলমান রিকশায় উঠে বসেছি। আমার চেহারায় এক ধরনেরবোকাটে সারল্য ছিল। ভদ্রলোক একপলক তাকিয়ে মুখ ঘুরিয়ে নিলেন। পিকচার প্যালেস ছাড়িয়ে এসে বললেন, এখানে নামলে তোমার বোধহয় তেমন অসুবিধে হবেনা। আমি সালাম দিয়ে নেমে এলাম।আমি বাঁচলেও ধরা পড়েছিল অনেকেই। তবে শীঘ্রই তারা কোর্ট থেকে জামিন নিয়ে বেরিয়ে আসে।

৬-দফা প্রস্তাব উত্থাপনের সাথে সাথে শেখ মুজিব ৬-দফার প্রতি সমর্থন জানানো এবং আন্দোলনে সামিল হওয়ার জন্য দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানান।ষাটের দশকে দেশের রাজনীতিতেবামশক্তির বিশেষপ্রভাব ছিল। তিনি তাদের প্রতি আন্দোলনে সামিল হওয়ার জন্য ক্রমাগত আহ্বান জানিয়ে যাচ্ছিলেন।কিন্তু বুর্জোয়া ফর্মুলা বিবেচনায় জ্ঞানবৃক্ষসম বাম তাত্ত্বিকেরা ছিলেন অনড়। তা সত্ত্বেও ৭ জুলাই শেখ মুজিবের মুক্তি ও ৬-দফাদাবী আদায়ের ধর্মঘটে ঢাকার টঙ্গি, তেঁজগা, ডেমরা, নারায়নগঞ্জসহ গোটা দেশের শিল্প শ্রমিকরা বাঁধভাঙ্গা বন্যাস্রোতের মত মিছিল করে বেরিয়ে এসেছিল।শ্রমিকরা ঠিকই বুঝেছিল এই লোকটা এবং তার ৬-দফা তাদেরই।সে সময়তৃণমূলে কাজ করা বাস্তববাদীবাম শ্রমিক নেতারাওঐ সব মহাজ্ঞানী তাত্ত্বিকদের উপেক্ষা করে সাধারণ শ্রমিকের সাথে থাকা শ্রেয় বিবেচনা করেছিলেন। সে সময় দৌলতপুর জুট প্রেস শ্রমিকদের মধ্যেও বাম শক্তির অপ্রতিহত প্রভাব ছিল। নেতৃবৃন্দ ছিলেন ৬-দফার বিরুদ্ধে। তথাপি অধ্যাপক আবু সুফিয়ানের নের্তৃত্বে তৃণমূল শ্রমিকরা ৬-দফার পক্ষে ঘুরে দাঁড়ায়।

বলা বাহুল্য,আইয়ুব খান তারপ্রতিশ্রুতবন্দুকের ভাষা ব্যবহারে মোটেওকার্পণ্যকরেন নি।ঢাকা নারায়নগঞ্জে মিছিলের উপরগুলি চালিয়ে মনুমিয়া আবুল হোসেনসহবহু শ্রমিককে হত্যা ও আহত করে ৬-দফামোকাবেলার নিষ্ফল চেষ্টা চালিয়ে ছিলেন।৭ জুলাই আন্দোলন পূর্ববঙ্গে শেখ মুজিব এবং ৬-দফাকে এক অতি উচ্চ মার্গে তুলে দেয়।

’৬৯-এর জানুয়ারিতে ছাত্রলীগ এবং ছাত্র ইউনিয়নের মেনন ও মতিয়াগ্রুপের সমন্বয়ে ছাত্র সংগ্রম পরিষদ গড়ে উঠলে দেশব্যাপী আন্দোলন তীব্র হয়ে ওঠে। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ১১-দফা দাবী উত্থাপন করে। এই দাবীর অন্যতম এক দাবী ছিল শেখ মুজিবের ৬-দফা। অচিরেই ছাত্র, শ্রমিক জনতার মিছিল মিটিং-এ ৬-দফা, ১১দফা, শেখ মুজিবসহ সকল রাজবন্দীর মুক্তি, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার, তোমার আমার ঠিকানা-পদ্মা মেঘনা যমুনা,দুনিয়ার মজদুর এক হও, আফ্রোএশিয়ল্যাটিন আমেরিকার মহান নেতা মওলানা ভাসানী-জিন্দাবাদ, জয় বাংলা প্রভৃতি শ্লোগানে কেঁপে ওঠে গোটা পূর্ববঙ্গ। এ আন্দোলন এতই দুর্বার ছিল যে তা ঠেকানোর সাধ্য আইয়ুবের ছিলনা।

দেশব্যাপী ঘেরাও আন্দোলন তখন তুঙ্গে। খুলনা ছাত্রলীগের পাশাপাশি ছাত্র ইউনিয়নের দুই গ্রুপ সমানতালে পাল্লা দিয়ে আন্দোলন সংগ্রাম করছে। ছোট বড় সব কল কারখানার অথর্ব আপসকামী শ্রমিক ইউনিয়নগুলো তাসের ঘরের মত একে একে ধ্বসে পড়ছে। একের পর এক নতুন শ্রমিক ইউনিয়ন গড়ে উঠছে। শ্রমিকদের দাবীর তালিকাগুলো দেখলে বুঝা যায় এতদিন কিভয়াবহ বঞ্চনার শিকার ছিল তারা। তবে সর্বত্র মজুরি বৃদ্ধি ও কার্যসময় ৮ ঘন্টায় নামিয়ে আনার দাবীই ছিল মুখ্য। নব্বুইভাগ কারখানার মালিক ছিল অবাঙ্গালী, বাঙালি মালিকানাধীন কারখানার অবস্থাও ভিন্নতর কিছু ছিলনা।

আমি স্টার জুট মিলে চাকরি করতাম। শ্রমিকদের প্রথম শিফট শেষ হত সকাল দশটায়। দ্বিতীয় শিফটের শ্রমিকরা কাজে যোগ দিত। হাজার হাজার শ্রমিকের এই আসা-যাওয়ার প্রক্রিয়া সমাধা হত প্রায় নিঃশব্দে। অফিসে বসে আমরা টেরও পেতাম না। হঠাৎ একদিন দশটার শিফট ভাঙ্গার পর প্রচণ্ড হৈচৈ শুরু হল, শ্লোগান উঠল– দুনিয়ার মজদুর এক হও, আমাদের দাবী মানতে হবে, জয় বাংলা। মুহূর্তের মধ্যে শত শত উত্তেজিত শ্রমিক মিলের অফিসগুলো ঘেরাও করে ফেলল এবং ম্যানেজারসহ সকল বিভাগীয় প্রধানকে অফিস থেকে টেনে হিচড়ে বের করে নিয়ে গেল। আমাদের হিসাব বিভাগীয় প্রধান ঢাকায় ছিলেন, চার্জে ছিলেন সহকারী হিসাবরক্ষক কাজী গোলাম আকবর। বিভাগীয় প্রধানের চেম্বারে বসায় তিনিও ধরা খেলেন। হিসাব ইনচার্জের চেম্বারের পাশেই আমাদের বসার জায়গা। ইউনুস সাহেব আমাদের ইমিডিয়েট বস, পিছিয়ে পড়া একজন শ্রমিককে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা এদের নিয়ে কি করতে চাও? সে না থেমেই হাঁটতে হাঁটতে জবাব দিল– এনাদের আজ তেল বের করে ছাড়ব স্যার!

আমরা খবর পেলাম মিলের ফিনিসিং গোডাউনের সামনে তিন রাস্তার মোড়ে সব অফিসারকে কঠিন ঘেরাও-এরে মধ্যে রাখা হয়েছে। তাদের গালিগালাজ করা হচ্ছে।প্রখর রৌদ্র, কিন্তু কাউকে ছাতা ব্যবহার করতে দেয়া হচ্ছেনা, পানি পর্যন্ত খেতে দেয়া হচ্ছেনা। মার্চের খরতাপে প্রকৃতি দুঃসহ হয়ে উঠেছিল। ইউনুস সাহেব ছিলেন আকবর সাহেবের আপন ভাই, বললেন– মনোয়ার সাহেব, আমাদের বোধহয় একবার দেখতে যাওয়াউচিত। কথাটা আমিও ভেবেছিলাম, কিন্তুশুনেছি দৌলতপুর কলেজের কয়েকজন ছাত্রের নেতৃত্বে ঘেরাও সংগঠিত হয়েছে। তারা আমার পরিচিত হলে পিপলস জুট মিলের ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘঠতে পারে সেই ভয়ে যাওয়ার সাহস হয়নি। তবে আমাদের পিওন লুৎফর বাদ সাধল, বলল– স্যার ওদিকে মোটেও যাবেন না, অ্যাসিসটেন্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার ওখানে গিয়েছিল,তার বসের দিকে ছাতাটা বাড়িয়ে ধরতেই শ্রমিকরা মার মার করে ছুটে আসে। ভালরকম হেনেস্থা তো করেছেই, তার উপর ঘেরাও করে রেখেছে।

আমাদের টিফিন হত সাড়ে বারোটায়। আমরা বাইরে হোটেলে খেতাম, ঐ পথেই যেতে হয়। ঘেরাও-এর কাছে এসে পরিচিত কোন ছাত্রকে না দেখে স্বস্তি পেলাম। তবে অস্বস্তির কারণ ঘটালো ঘেরাও-এর ভিতরকার অবস্থা। অফিসাররা সবাই প্রায় মধ্যবয়সী অথবা প্রৌঢ়। একজন একেবারেই বৃদ্ধ- ইসমাইল সাহেব, মিলের স্টোর ইনচার্জ। ভদ্রলোক ইউপির উদ্বাস্তু, খুবই আমুদে মানুষ। প্রখর রৌদ্রেসবাই ঘেমে নেয়ে অস্থির। গরমে ঘামে কারো চোখ-মুখ লাল হয়ে আছে, কারো মসীবর্ণ ধারণ করেছে। ইসমাইল সাহেব মোটাসোটা মানুষ, তার অবস্থা সবচেয়ে কাহিল– পানি পানি করে আর্তনাদ করছেন। বিস্ময়কর লাগল যখন দেখলাম একটা কিশোর ছেলে জগ এবং গ্লাস হাতে কাচুমাচু মুখে রোদের মধ্যে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে, কিন্তু ক্রুদ্ধ লোকগুলো তাকে তার দাদুর কাছে যেতে দিচ্ছেনা। হঠাৎ মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল– পানি খেতে দিচ্ছেন না কেন, পানি দেন।

প্রকৃতি ছিল বৈরি, ঘেরাওকারীরা তেঁতে ছিল, মুহূর্তের মধ্যে ক্রুদ্ধ প্রতিক্রিয়া দেখালো– এসে গেছে শালাআর এক দালাল।তারা আমাকে ঘিরে ফেলল এবং কেউ কেউ ছাতা তুলে মারতে উদ্যত হল। আমার সাথে রশিদ সাহেব ছিলেন। তিনি কমার্স কলেজে ইউসুফ সাহেবের ক্যাবিনেটের জেনারেল সেক্রেটারি ছিলেন। তাকেও আমার মত পিপলসজুট মিল ছাড়তে হয়েছিল। তবে স্টারে তার চাকরি পেতে সমস্যা হয়নি, এস আই খান সাহেবের কল্যাণে। তিনি আমার উপর রাগ ভুলে গিয়েছিলেন এবং তখন আমরা ঘনিষ্ট বন্ধু।তার উপস্থিত বুদ্ধি প্রখর ছিল, সাথে সাথে চেঁচিয়ে উঠলেন– উনি কে জানেন? উনি খুলনা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের নেতা। এখানে ছাত্র কে আছেন?

একটা ছেলে এগিয়ে এলো, বলল– আমি গোলাম রহমান, দৌলতপুর কলেজের ছাত্র, এখানে আমাকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে।

আমাকে কিছুটা কর্তৃত্বপূর্ণ আচরণ করতে হল– বেশ, কিন্তু এনাদের পানি খেতে দিচ্ছেন না কেন? এমন নির্দেশ কে দিল? এই গরমে পানির অভাবে ঐ বৃদ্ধ ভদ্রলোকের কোন ক্ষতি হলে আন্দোলন কোন দিকে যাবে বুঝতে পারেন! গোলাম রহমান করিৎকর্মা ছাত্র ছিল, সে আমার সামনে থেকে উত্তেজিত শ্রমিকদের সরিয়ে নিয়ে গেল। অফিসাররা পানি এবং কেউ কেউ ছাতার আশ্রয়ও পেলেন।

ঘেরাও-এ পড়া বাঙালি অবাঙ্গালী অফিসার নির্বিশেষে প্রায় সবাই রশিদের কথা স্টান্টবাজী হিসাবে নিয়েছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমেপ্রকল্প প্রধান বিশ্বাস করে বসেছিলেন। তিনি উর্দুভাষী বাঙালি, কলকাতা থেকে এসেছিলেন। আমি অচিরেই তার আক্রোশের শিকারহলাম। ঢাকা থেকে ফিরে এস আই খান সাহেবথমথমে মুখে জিজ্ঞাসা করলেন– ঘেরাওয়ের সময় কি হয়েছিল? তুমি কি সত্যি ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের লোক?

বললাম– না স্যার, রশিদ ঐ কথা বলেছিল ক্ষিপ্ত শ্রমিকদের হাত থেকে আমাকে বাঁচানোর জন্য। নইলে আনোয়ার সাহেবের মত আমিও অপদস্ত হতাম এবং ঘেরাও-এর মধ্যে পড়তাম। আমি তো স্যার, ইসমাইল সাহেবের কষ্ট দেখে পানি দিতে বলেছিলাম, তাতেই বিপত্তি। পরে আর নরম হওয়ার উপায় ছিলনা, ফলে এমনভাব দেখাতে হয়েছিল যে আমি সংগ্রাম কমিটির সদস্য। ওরা পানিও দিয়েছিলএবংদু-তিনজন অফিসারকে ছাতাও ব্যবহার করতে দিয়েছিল।পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে আমি এটা করতে বাধ্য হয়েছি, কিন্তু প্রকল্প প্রধান বিষয়টা বুঝবেন না ভাবতেও পারিনি। আপনারা স্যার খুলনা থানায় খোঁজ নিয়ে দেখতে পারেন, আমি যদি সংগ্রাম পরিষদের সদস্য হই, পুলিশের খাতায় আমার নাম অবশ্যই থাকবে।

বিষয়টা এখানেই শেষ হলনা। মিলে আমরা বেশ কিছু স্টাফ ছিলাম যারা জুনিয়র অফিসার গ্রেডে বেতন পেতাম কিন্তু অফিসার পদবি ছিলনা। ফলে আমরা ছিলাম স্টাফ ইউনিয়নের সদস্য ছিলাম। ঘেরাও চুক্তির আওতায় দেশব্যাপী বেতনবৃদ্ধির যে সুবিধা দেয়া হয় আমরাও তা পেয়েছিলাম। দুর্ভাগ্যক্রমেঅল্প কিছুদিনের মধ্যে দেশে জেনারেল ইয়াহিয়ার মার্শাল ল জারি হয়।

আমরা ভয়ে ভয়ে ছিলাম। অফিস খোলা মাত্রই প্রকল্প প্রধানের অফিসে আমাদের ডাকা হল। কঠিনস্বরে তিনি বললেন– তোমরা অবৈধভাবে বেতনবৃদ্ধি নিয়েছ,তোমাদের বেতন থেকে তিন ইনস্টলমেন্টে টাকাটা কেটে নেয়া হবে। আমরা ফিরে যাচ্ছিলাম। হঠাৎই আমার দিকে তর্জনি নির্দেশ করে বললেন–নট ইউ, ইউ ওয়েট। তারপর দাঁতে দাঁত চেপে বললেন– ইউ মাস্ট রিফান্ড দ্য মানি জাস্ট নাও।

বিনীতভাবে বললাম– স্যার, টাকাটা ঘরের চাল মেরামতে খরচ করে ফেলেছি,আমিও স্যার, বেতন থেকে কাটিয়ে দেব।

– হাঁহ্! লিডার! অখনো লিডারি করছে, বাংলা বলছে- বাংলাহ্! আহম্মকটা বুঝতেই পারেনিকোথায় কি গেছে! তার টেবিল ঘিরে দু-চারজন বাঙালি অবাঙ্গালী অফিসার বসেছিলেন। তারা মেসাহেবের মত হেসে মাথা দোলালেন। ম্যানেজার হঠাৎ চিৎকার করে উঠলেন– গো এন্ড ডিপোজিট দ্য এন্‌টায়ার মানি টু ক্যাশ রাইট নাও!

আমি নিচে এলাম, এস আই খান সাহেবকে বললাম– স্যার আমার কাছে তো কোন টাকাই নেই।

– ঠিক আছে যাও, কাজ করোগে। অন্যরা যেভাবে দেয় তুমিও সেভাবেই বেতন থেকে টাকাটা শোধ করে দেবে।

আন্দোলনের কালে এক ছুটির দিনে সুইটহাউজে বসেছিলাম, তখন মধ্যাহ্ন। ঘর্মাক্ত কলেবরে কামরুজ্জামান টুকু এসে আমার বিপরীতে চেয়ার দখল করে বসল। বেশ মুডি। সিগারেট ধরিয়ে কয়েক কাপ চায়ের অর্ডার দিয়ে নিঃশব্দে একের পর এক ধোয়ার ভাঙ্গাচোরা কুণ্ডলী ছুড়তে থাকল আমার মুখের উপর।

জাহিদ বিরক্ত হয়ে বলল–এ কি ধরনের অসভ্যতা!

টুকুর এই মুডের সাথে আমরা কম বেশি পরিচিত। এর অর্থ তার কাছে গুরুত্বপূর্ণ কোন তথ্য বা সংবাদ আছে। তবে আমার মুখের উপর সিগারেটের ধোয়া ছোড়া, এটা হল তার মার্কিন দূর্গে কামান দাগার প্রাকটিস বিশেষ। ছেষট্টি সালের কথা, বিনয় তখন পৌরসভার চাকরি হারিয়ে সাংসারিক ঝামেলায় খুবই বিব্রত ছিল। মা-বোন এবং বোনের ছেলে মেয়ে নিয়ে তার সংসার। ৭ জুলাই ৬-দফার পক্ষে এবং শেখ মুজিবের মুক্তির দাবীতে দেশব্যাপী ধর্মঘট ডাকা হয়েছিল। খুলনা কালিবাড়ি রোড দিয়ে আমাদের বিশাল মিছিলটা যখন অতিক্রম করছিল মুসলিম লীগ দলীয় পৌরসভা চেয়ারম্যান তার স্টেশনারি দোকান মমতাজ স্টোর খোলা রেখে দোকানের সামনে চ্যালেঞ্জিং মুডে দাঁড়িয়ে ছিলেন। মাত্র এক'শ গজ দূরে কোতোয়ালি থানা। তিনি আসলে ফাঁদ পেতেছিলেন। তবে নেতৃবৃন্দের কঠোর খবরদারীতে পাতা ফাঁদে পা না দিয়ে মিছিলটা শান্তভাবে এগিয়ে গেল। পরিকল্পনা ব্যর্থ হওয়ায় চেয়ারম্যান খুবই হতাশ ও ক্রুদ্ধছিলেন। মিছিলে বিনয়কে দেখে তার সব রাগ যেয়ে পড়ে বিনয়ের উপর। বিনয় পৌরসভায় কেরানির চাকরি করত, সেদিন মিছিলের পুরোভাগে থেকে ভরাটগলায় শ্লেগান দিচ্ছিল। পরদিনই সে তার চাকরিটা হারায়। চরম দুরবস্থায় পড়ে বিনয় বাড়ি যাওয়াও ছেড়ে দিয়েছিল, তবু রাজনীতির নেশা ছাড়েনি। জাহিদ এবং আমরা কয়েকজন মিলে তার জন্য সামান্য চাল-ডালের ব্যবস্থা করতে পেরেছিলাম মাত্র।

বিনয় একদিন সকালে এসে বলল– চলো বস, কালিপদ স্যারের কাছ থেকে হাত দেখিয়ে আসি।

কালিপদ স্যার স্কুলে আমাদের গ্রামার পড়াতেন। উচ্চাঙ্গ সংগীতের শিক্ষক ছিলেন। ভাল গনক হিসাবেও পরিচিত ছিলেন। আমি কাউকে হাত দেখাতাম না, বাবা এবং বড় চাচার নিষেধ ছিল। তথাপি গেলাম। আমরা সরকার সুইটস থেকে আধসের রসগোল্লা নিয়েছিলাম। স্যার বললেন– কিরে তোরা এই সাত সকালে?

– মনোয়ার একটু হাত দেখাবে স্যার।

– বটে, তা তুই দেখাবি না? আবার মিষ্টিও এনেছিস! আমি মিষ্টি খাই?

– স্যার! আপনি মাঝে মাঝে সরকার সুইটসের রসগোল্লা খান, তাই ভাবলাম.....।

স্যার দু'জনেরই হাত দেখলেন। বিনয়কে বললেন, মনোয়ারের পাছ ছাড়িসনে, ও বিরাট বড়লোক হবে। তোর হাতে শুধু খাটাখাটনিই সার। শোন, বড়লোক হলেও মনোয়ার কিন্তু মনেপ্রাণে কমুনিস্ট, আরে তোদের ঐ সব কমুনিস্ট না, মানবিক আরকি! ওর পাছ ছাড়িসনে, তোরও একটা হিল্লে হয়ে যাবে।

এসব কথা বিনয় টুকুসহ অনেককেই বলেছিল। আমি কমিউনিজম পছন্দ করতাম না। টুকুর ধারণা আমি ধনতন্ত্র মতাদর্শে বিশ্বাসী। তার উপর হস্তরেখার এমন ব্যাখ্যা! সেই থেকে টুকুর পরিকল্পনা ভবিষ্যতে আমার প্রাসাদ দুর্গে কামান দেগে সর্বহারা বিপ্লবের উদ্বোধন ঘটাবে। আমার মুখের উপর সিগারেটের ধোয়া ছুড়ে সে নাকি সেই প্রাকটিসটা চালিয়ে যাচ্ছে। জনান্তিকে বলে রাখি, জুট মিলে দীর্ঘ ৩৭ বছরের কর্মজীবনে যার মধ্যে প্রায় তিন দশক অফিসার এবং হিসাব প্রধান পদে চাকরি করেও ধনী হওয়া তো দূরের কথা, আমার উপার্জন কখনো কায়ক্লেশে জীবন ধারণের অতিরিক্ত কিছু ছিল না।

টুকু মুখ খুলল, বলল–আজ এক বিরাট কাজ করেছি। শুনলে সৈয়দ সাহেবের হয়তো খারাপ লাগতে পারে, তবে এটা না করলে পুরো সংগঠনটা ছাত্র ইউনিয়নের হাতে চলে যেত। আজ পৌরসভার মেথর-ঝাড়ুদারদের ইউনিয়ন গঠিত হল। আমি সভাপতি, ছাত্র ইউনিয়নের সৈয়দ ইসা সম্পাদক। নতুন কমিটি নিয়ে মিছিলও হল। সে এক দারুণ ব্যাপার! ঝাড়ু, বালতি, ড্রাম, ব্রাশ, বেলচা,আঁচড়া, কোদাল নিয়ে মিছিল। সামনে আমি আর ইসা। আরো দু চারজন ছাত্র আছে। মজুরী বাড়ানো, শেখ মুজিবের মুক্তি, ৬-দফা, ১১-দফা,চাল-ডাল-তেলের দাম কমানোর দাবীতে গলা ফাটিয়ে শ্লোগান দিচ্ছি। ওরা পিছন থেকে সমানে খুচিয়ে যাচ্ছে–'দারুকা বারে মে কুচবলিয়ে সাব, দারুকা কিম্মত এতনা জাস্তি হ্যায়,চলেগা ক্যায়ছে সাব, কাম করেগা ক্যায়ছে। দিজিয়ে সাব,দারুকা বারেমে কুচশোল্‌গান দিজিয়ে।' কি আর করা, মদের দাম কমানোর জন্য শ্লোগান দিতে হল, একটু বেশিই দিতে হল ওদের তাগিদে। মিছিল শেষে আর এক বিপত্তি। সবাই এত খুশি যে কোলাকুলি না করে ছাড়বে না। করতে হল, সবাই ঘর্মাক্ত, কেউ কেউ আবার উদোম গা, মদের গন্ধ তো আছেই। টুকু আমার দিকে ফিরল– কি সৈয়দ সাহেব পারতে নাকি? নাকি আমার গা থেকে বিশেষ কোন দুর্গন্ধ পাচ্ছো?

– না, তা পাচ্ছি না বটে, তবে ফুলেল তেল পাউডার সেন্টের সুবাসও তো পাচ্ছিনা, মিছিলে রাণী বালা -কমলা বালারা ছিল না, নাকি ছিল?

– টুকু খানিক হো হো করে হাসল, বলল– ছিল, তবে তারা সেলাম বাবুজি বলে তাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের কাজটা সেরেছে।

টুকুর প্রশ্নটা আমাকে বেশ ভাবালো। ভেবে পেলাম না সত্যি পারতাম কিনা। কি জানি ঘটনার মধ্যে পড়লে হয়ত পেরেও যেতাম।

ঘেরাও আন্দোলন তখন তুঙ্গে। ছোট বড় কলকারখানা যেখানে আছে সেখানেই ঘেরাও আন্দোলন। ছাত্রদের উপর অসম্ভব চাপ। শ্রমিকরা ছাত্রদের কাছে আসে, তাদের সমস্যাগুলো তুলে ধরে।প্রতিটি ক্ষেত্রে শ্রমিক বঞ্চনার চিত্র মর্মান্তিক। সাড়ানা দিয়ে পারা যায়না। আমরা বিস্মিত হতাম কিভাবে পুরাতন ইউনিয়নগুলো মালিকদের পকেটে চলে গেছে! সর্বত্র নতুন নেতৃত্বের তাগিদ এবং শ্রমিকরা ছাত্রদের চায়।শ্রমিকদের এই দাবী পুরণে সে সময় ছাত্রলীগের জাহিদুর রহমান, কামরুজ্জামান টুকু, নজরুল ইসলাম, ইউনুস আলী প্রমুখ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছিল। তাদের নেতৃত্বে একে একে কত যে ইউনিয়ন গড়ে উঠেছিল বলা কঠিন। শুধু শ্রমিক নয়, ধীরে ধীরে কৃষকরাও ছাত্রদের অফিসগুলোতে যোগাযোগ করতে শুরু করল। এরা ভাগচাষি অথবা ক্ষেত মজুর। ছেলেরা যে তাদের যথেষ্ট সহযোগিতা দিতে পারত তা নয়। তবে একবার তাদের এলাকায় যেয়ে সভা সমিতি করে দিয়ে আসতে পারলেঅনেক কাজ হত। এভাবে বেশ দ্রুত অধিকার সচেতন হয়ে উঠছিল এতদিনেরঅসহায় প্রান্তিক মানুষগুলো।

একবার পাইকগাছার এক গ্রাম থেকে কয়েকজন হতদরিদ্র মানুষ এলো সুইট হাউজে। তারা সম্ভবত ছাত্র ইউনিয়নের অফিসে যেতে চেয়েছিল, কেননা তাদের অভিযোগ ছিল স্থানীয় জোতদারদের বিরুদ্ধে যাদের মধ্যে আওয়ামী লীগের একজন প্রভাবশালী নেতাও ছিলেন। তবে ঘাটে উঠে ঠিকানার জন্য লোকজনের সহযোগিতা চাইলে তারা সুইটহাউজ ও বর্ণালী প্রেসের পথ দেখিয়ে দেয়। আওয়ামী লীগ নেতার বিরুদ্ধে অভিযোগের ধরন দেখে ছেলেরা বিস্মিত হয়েছিল। জমি থেকে ধানের আঁটি সরিয়ে নেয়ার পর দরিদ্র মহিলা ও শিশুরা জমিতে

ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ধান এবং ইদুঁরের গর্তের ধান কুড়িয়ে নিয়ে যায়। মহিলা এবং শিশুরা যখন ধান খুঁটছিল, কেউ বাধা দেয়নি। তবে ধান কুড়ানো শেষ হলে মালিকপক্ষ তাদের সেগুলো মালিকের উঠানে রেখে আসতে বাধ্য করে।

ছেলেরা কয়েকজন তার সাথে কথা বলেছিল। তিনি দুঃখ প্রকাশ করে বলেন– এধান তারা নেননা, যারা খোটে তারাই পায়। তবে এই মহিলাদের তার জমি থেকে ধান কুড়ানোর কথা নয়, সেজন্যই তিনি ধানগুলো রেখে দিয়েছেন, পরে সালিশ করে ব্যবস্থা নিতেন। যাহোক ছাত্র ভাইদের কথা অনুসারে তিনি এখনইসবাইকে যার যার ধান তিনি ফেরত দেয়ার ব্যবস্থা নিচ্ছেন।

এরমধ্যে খবর পেলাম আওয়াল ভাই আসছেন খুলনায়, ঘেরাও আন্দোলন সম্পর্কে আমাদের সাথে কথা বলতে চান। আমরা ছাত্রলীগের এককালীন স্বনামখ্যাত নেতা আওয়াল ভাই সম্পর্কে অনেক কথা শুনেছি, দেখিনি কখনো। রূপসা রেস্টহাউজে তার সাথে আমাদের দেখা হল। তিনি ইস্পাহানি গ্রুপের জেনারেল ম্যানেজার হিসাবে নিজের পরিচয় দিয়েছিলেন। বললেন, তাদের খুলনা কটন মিলের আন্দোলন ছাত্রলীগের হাতে থাকায় তিনি খুশি হয়েছেন, বামপন্থীদের হাতে পড়লে তার কাজ কঠিন হত। ছোট ভাইদের কাছে তার দাবী, তার মিলে যাতে ঘেরাও না হয় সেটা আমাদের দেখতে হবে। কেননা ইস্পাহানি গ্রুপ ৬-দফা আন্দোলনে সহায়তা করছে।

আমরা বিস্মিত হলাম। বললাম–আপনি রাজনীতি করতেন, নিশ্চয় বুঝবেন আমরা তাদের আন্দোলনে সহযোগিতা না করলে ছাত্র ইউনিয়ন অথবা কমুনিষ্টরা কর্মীরাই এগিয়ে আসবে। তারা কেউ না কেউ ঠিকই ঘেরাও সংগঠিত করবে।

– সেটা যাতে করতে না পারে আপনারা দেখবেন, এ জন্য আমাদের বাজেটও আছে।

আমাদের কেউ কেউ হেসে ফেলল, বলল– ভাই সময়টা এখন আপনাদের সময়ের মত নেই, টাকা পয়সা, পজিশন ইত্যাদি দিয়ে এখন আন্দোলনকারীদের কেনা-বেচা যায়না। আমরা ৬-দফা চাই তো চাইই, এতটুকুও আপস নয়, বরং আরো বেশি চাই। কটন মিলের শ্রমিকরা আমাদের কাছে এসেছে আমাদের উপর আস্থা আছে বলেই। এভাবে একের পর এক কল-কারখানার শ্রমিকরা আসছে। আমরা তাদের আস্থার মর্যাদা রাখব।

– অনেক বড় আশা নিয়ে এসেছিলাম। আমরা বুঝতে পারছি শ্রমিকরা বঞ্চিত, আমরা অবশ্যই এটা দেখব।

– তারাও অনেক বড় আশা নিয়ে আমাদের কাছে এসেছে। তারা সত্যিই খুবই বঞ্চিত, চিন্তার বাইরে। অথচ আপনারা এখানে আছেন এবং এতদিন এসব দেখেন নি।

আওয়াল ভাই ফিরে গেলেন। যাওয়ার আগে আমাদের পিঠে হাত রেখে বললেন- তোরা এবারপারবি রে। মনে হচ্ছে বঙ্গবন্ধু ঠিকই পেরে যাবেন।

খুলনার দক্ষিণাঞ্চলে বহু গ্রাম আছে যেগুলো হিন্দু প্রধান। অধিকাংশই নিম্নবর্ণের হিন্দু। তারা যে কিভাবে অধিকার ও নিরাপত্তা বঞ্চিত অবস্থায় কালাতিপাত করে তা আমরা কমই জানতাম। একবার মংলার বাজুয়া থেকে কয়েকজন লোক এলো আমাদের অফিসে। তারা হাতে গুলিবিদ্ধ এক মেয়েকে খুলনা সদর হাসপাতালের বারান্দায় বসিয়ে রেখে এসেছে। তার চিকিৎসা হচ্ছেনা, কি নাকি ঝামেলা, পুলিশ কেস-টেস হবে। তারা ঘাবড়ে গেছে। বাজুয়া হিন্দু অধ্যুষিত গ্রাম, ধান চাষের জন্য বিখ্যাত ছিল। চালকলও ছিল সম্ভবত। তারা বলেছিল, বাজুয়ার এক প্রভাবশালী মুসলিম লীগ নেতা ৬-দফার মিছিলে গুলি চালিয়ে মেয়েটিকে আহত করেছে, চিকিৎসার অভাবে তার হাত নষ্ট হওয়ার উপক্রম।

ছেলেরা মেয়েটির চিকিৎসার ব্যবস্থা করে দিয়েছিল। পরে আমরা শুনি কেসটা সম্ভবত সে রকম ছিলনা। মেয়েটি তরুণী এবং সুন্দরী। লোকটি প্রায়ই তাকে উত্যক্ত করত।তবে ৬-দফা ও ঘেরাও আন্দোলনের কারণে পরিস্থিতি তখন পাল্টে গেছে, মুখবুজে সবকিছু সহ্য করার দিন গত হয়েছে। জেগে ওঠা মানুষগুলো রুখে দাঁড়ায়। অবস্থা বেগতিক দেখে গুলি ছুড়ে পালিয়ে যায় বদমাশটা।

মেয়েটির উপযুক্ত চিকিৎসার জন্য পেনিসিলিন ইনজেকশানপ্রয়োজন ছিল। অথচ ওষুধটা তখন দুস্প্রাপ্য ওদুর্মূল্য। গোয়ালপাড়া বিদ্যুৎ কেন্দ্রের মেডিকেল অফিসার ছিলেনআমার ভগ্নিপতি ড. আব্দুল গনি।তার স্টক থেকে চারটা ফ্রি স্যাম্পল পাওয়া গেল, বললেন– বাকি দুটো তোমাদের সংগ্রহ করে নিতে হবে। আমি যখন হাসপাতালে তার কৃতজ্ঞ অভিভাবকদের কাছে অ্যাম্পলগুলো দিতে গিয়েছিলাম মেয়েটিকে প্রথম দেখলাম। ভারি সুন্দরী, মনে হল তার হাত কোনভাবেই নষ্ট হতে দেয়া যায়না। আমি তাকে আর কখনো দেখিনি।

এরপর হঠাৎ আবার এক অন্ধকার সময় নেমে এসেছিল। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করলে সরকার ব্যাপক ধরপাকড় শুরু করে। ছাত্র নেতৃবৃন্দ যে যার মত আত্মগোপনে যেতে বাধ্য হয়। চাকরির কারণে আমি ছাত্রলীগ কমিটিতে সদস্য পদ ছাড়া কখনো অন্য কোন পদ গ্রহণ করিনি। ঘরোয়া মিটিং-এ আলোচনা ছাড়া কখনো জনসভায়ও বক্তৃতা করিনি। কিন্তু পরিস্থিতি সে সময় আমাকে

পার্কের এক জনসভায় সভাপতিত্ব করতে বাধ্য করেছিল। ফলে আমাকেও বেশ কয়েক দিনের জন্য বাড়ি ছেড়ে পালাতে হয়। সম্ভবত পনের বিশ দিন পর গ্রেফতারি পরোয়ানা ধামা চাপা পড়ে গেলে একদিন হাসপাতালে যেয়েবেডটি শূন্য দেখতে পাই। মেয়েটির হাত হয়তো তখনকার মত রক্ষা পেয়েছিল, কিন্তু কে জানে একাত্তরে শ্বাপদদের হাত থেকে সে বাঁচতে পেরেছিল কিনা! তার বেদনার্ত চেহারা এখনো আমাকে ভাবায়।

প্রকাশ্য মঞ্চেঃ পার্কে উত্তপ্ত জনসভা

খুলনায় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়েছিল ছাত্রলীগ এবং ছাত্র ইউনিয়নের মতিয়া ও মেনন গ্রুপের সমন্বয়ে। ছাত্র ফেডারেশনের কেউ কেউ সভা মিছিলে যোগ দিত। তবে পার্কের জনসভায় সভাপতি মনোনীত হতেন পালাক্রমে এইতিন দল থেকে। জানুয়ারি মাসের শেষ দিকে সম্ভবত এক রোববার ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে পার্কে জনসভা ছিল। ঊনসত্তরের উত্তাল দিনগুলিতে এমনমিছিল মিটিং প্রায় লেগেই থাকত। সেদিনের জনসভায় সভাপতিত্বকরারপালা ছাত্রলীগের। দিনটা ছিল খুবইউত্তেজনাপূর্ণ। সকাল থেকে ছোট বড় মিছিল সহর প্রদক্ষিণ করছে। ছাত্র ইউনিয়ন নেতা হেকমত আলী ভুঁইয়ার নেতৃত্বে একটি মিছিল ফেরিঘাটে পৌঁছালে বিহারীদের ছুরিকাঘাতে তিনি গুরুতর আহত হন। তাকেদ্রুত খুলনা সদর হাসপাতালে নেয়া হয়। সচরাচর এ ধরনের ঘটনা ঘটলে শহরের অবস্থা থমথমে হয়ে যায়, কিন্তু আজ অবস্থা ভিন্ন। গোটা শহর যেন ক্রোধে ক্ষোভে টগবগ করে ফুটছে। শহরে লোকজনের ভীড় অন্য দিনের তুলনায় বেশি। উত্তেজনা প্রশমনের জন্য পুলিশ সভা, মিছিল, মাইক ব্যবহার বন্ধ করে দিয়েছে। তবে দিনভর পার্কে বিক্ষুব্ধ লোকের সমাবেশ ঘটতে দেখে তারা বুঝেছিল সভা বন্ধ করা অসম্ভব ব্যাপার। সতর্ক ব্যবস্থা হিসাবে তারা মাইকের দোকানগুলো বন্ধ করে দেয় এবং ছাত্র নেতাদের মধ্যে গ্রেফতার আতঙ্ক ছড়িয়ে দেয়।

পরিস্থিতির কারণে বেলা এগারোটার দিকে ছাত্রলীগের বিশেষ সভা অনুষ্ঠিত হয় অ্যাডভোকেট জলিল সাহেবের দলিজঘরে। ছাত্র নেতারা অনেকেই উপস্থিত। মাঝে মাঝে পার্কের অবস্থা সম্পর্কে খবর পাওয়া যাচ্ছে, সেখানে বিস্তর লোক জমায়েত হয়েছে। রোজই হয়, তবে আজ অনেক বেশী। লোক ক্রমাগত বাড়ছে। বোঝা গেল কিছু একটা ঘটবে। আমাদের সমস্যা দলের অভ্যন্তরীণ রোটেশন অনুযায়ী আজ যার সভাপতিত্ব করার কথা সে অনুপস্থিত। অথচ যারা উপস্থিত আছে তারা কেউই আজ পার্কের জনসভায় সভাপতিত্ব করতে রাজী নয়। সভা বন্ধ রাখার পক্ষেও সুপারিশ করল কেউ কেউ। এ সময় আমাদের এক তরুণ কর্মী কাইয়ুম হাউ মাউ করে কেঁদে ফেলল। বলল, গত মিটিংয়ের দিন সকালে আমি ছাত্র ইউনিয়নের অফিসে গিয়েছিলাম আমাদের যারা বক্তৃতা করবে তাদের লিস্ট দিতে। ওদের অফিসে যেয়ে দেখি হৈচৈ, চেঁচামেচি। নেতারা সবাই সভাপতিত্ব করতে চায়। আর আমাদের নেতারা পালাতে পারলে বাঁচেন। এই আমাদের বড় ভাইদের সাহস!

সবাই থমকে গেল। আমি ভেবেছিলাম এরপর কেউ না কেউ এগিয়ে আসবে। কিন্তু সবাই নত মুখে বসে আছে। আমি কখনো দলের পোস্ট হোল্ডার ছিলাম না– না সভাপতি, না সম্পাদক, তবে সব সময়ই ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য ছিলাম এবং কমিটি গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতাম। বললাম– কাইয়ুম শোনো তোমাদের বড় ভাইরা অন্য দলের নেতাদের তুলনায় কেউই কম সাহসী নয়, তবে আজকের পরিস্থিতি ভিন্ন, যা সামলানো যেমন কঠিন হবে, মিটিং শেষে গ্রেফতারও অনিবার্য। আর জানই তো আমরা ছয় দফার জন্য সংগ্রাম করি, এদেশের মাটি ও মানুষের জন্য সংগ্রাম করি, যা সরাসরি সরকারের বিরুদ্ধে যায়। তাই আমাদের নেতাদের উপর আইয়ুবের পুলিশের শ্যেনদৃষ্টি। আর তুমি যাদের কথা বললে তারা দেশ অপেক্ষা ভিয়েৎনাম, আফ্রো-এশিয়া-ল্যাটিন আমেরিকা সমস্যা নিয়ে সোচ্চার বেশি,আউয়ুবের বিরুদ্ধে যতটুকু বলে তার চেয়ে ঢের বেশি বলে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে। এসব নিয়ে আইয়ুব ও তার পেটোয়া বাহিনীর তেমন মাথা ব্যাথা নেই,তাদের উপর সরকারের আক্রোশও কম। যাক এসব কথা, সভা হবে, কেউ সভাপতিত্ব না করলে আমিই করব।

পরিস্থিতি তখন এতটাই জটিল যে এরপরও কেউ আমাকে উদ্ধার করতে এগিয়ে এলো না। এমন পরিস্থিতিতে একজনই ঝাঁপিয়ে পড়তে পারত- কামরুজ্জামান টুক, তখন ওষুধ কোম্পানির চাকরিতে বরিশালে। আমি স্টার জুট মিলে চাকরি করতাম। একাউন্টস ইনচার্জ সিরাজুল ইসলাম সাহেব আমার ছাত্র রাজনীতির সংযোগ ভালই জানতেন। তার বক্তব্য ছিল অফিসের কাজ সময়মত করে দিলে, মিলে শ্রমিক রাজনীতি না করলে এবং জেলে না ঢুকলে শহরে আমি কি করছি না করছি তা নিয়ে মিল ম্যানেজমেন্ট মাথা ঘামাতে যাবে না। এখন জেলে ঢোকার একটা বড় ধরনের আশংকা সৃষ্টি হল। তা সত্ত্বেও রিস্ক নিতেই হল।

জীবনে প্রথম ও শেষবারের মত পার্কের জনসভায় সভাপতিত্ব করতে উঠলাম। মাইক নেই, অনুমোদন পাওয়া যায়নি। সভারও অনুমোদন নেই। কিন্তু মানুষের চাপে গোটা পার্ক উপচে পড়ছে, তাদের চোখ মুখ বলে দিচ্ছে, তারা কি চায়। একটা বড় টেবিল নিয়ে আসা হল পার্কের ঠিক মাঝে, জনতার মধ্যে, যাতে খালি গলায় দেয়া বক্তৃতা চারদিকের মানুষ ভালভাবেই শুনতে পায়। টেবিলের উপর একটা মাত্র চেয়ার। আমি চেয়ারে উঠে বসলাম। বক্তৃতা হবে টেবিলের উপর দাঁড়িয়ে। ছাত্র সংগঠনের নেতৃবৃন্দ ছাড়াও তিনটি কলেজ থেকে ছাত্র সংসদের ভিপি

ও জিএস বক্তৃতা করার সুযোগ পেল। তারাই প্রথম বক্তা। খুলনা পলিটেকনিক ইনিসটিটিউটের ভিপি গর্জে উঠল– 'পুলিশ যদি আমাদের উপর গুলি ছোড়ে আমরা বোমা ছুড়ব। পলিটেকনিকে পড়ি, বন্দুক ককটেল কি ভাবে বানাতে হয়, চালাতে হয় জানি।' মনের মত কথা পেয়ে জনতা ফুঁসে উঠল। তাকে সতর্ক করলাম, কি করবে না করবে সেটা ভেতরে রাখো, অন্য কথা বল। কিন্তু পুরো সভা জুড়ে আগুনের ফুলকি ছুটতেই থাকল।

এর মধ্যে ভীড় ঠেলে কমার্স কলেজের বাংলার অধ্যাপক এগিয়ে এলেন, হাতে কাগজে মোড়া প্যাকেট। হাসপাতাল থেকে হেকমতের রক্তমাখা জামা সরিয়ে এনেছেন। চমকে উঠলাম, কাছে ছাত্রলীগের বাবর আলী দাঁড়িয়ে ছিল। তাকে বললাম চুপচাপ কোথাও সরিয়ে রাখো, উত্তেজনা বাড়ে এমন কিছু করা যাবে না। বাবর আলী কি বুঝল কে জানে, কিছুক্ষণ পর বাঁশের মাথায় হেকমতের রক্তমাখা শার্ট উড়িয়ে বিপুল বিক্রমে ভিড় ঠেলে এগিয়ে এলো। উত্তেজিতভাবে লোকজন দাঁড়িয়ে পড়তে থাকল। আমার গলায় জোর ছিল। সবাইকে কঠিন ভাবে বসতে বললাম। তারা থমকে বসে পড়ল। টেবিলের পায়ার সাথে বাঁশটা বেঁধে বাবর আলী উত্তেজনাকর বক্তৃতা দিতে চেষ্টা করতেই তাকেও থামিয়ে দিলাম, বললাম তোমার টার্ন পরে আসছে। হেকমতের রক্তমাখা পতাকাটা টেবিলের সামনে পতপত করে উড়তে থাকল। দীর্ঘ সময় ধরে বক্তৃতা হল। আমি বক্তৃতা দিতে অভ্যস্ত ছিলাম না। আলোচনা করতে কিছুটা পারতাম। তবুও দীর্ঘক্ষণ কথা বললাম, পরিকল্পনা মত আগামী দিনের প্রোগ্রাম ঘোষণা করলাম এবং সবাইকে সেদিনের মত শান্তভাবে ঘরে ফিরে যেতে এবং আগামী দিনের জন্য প্রস্তুত হতে নির্দেশ দিলাম। মিছিল করার জন্য লোকজন উম্মুখ ছিল, কিন্তু আমরা সিদ্ধান্তে অটল ছিলাম। কেননা জানতাম মিছিল হলে ফেরিঘাটের বিহারী মহল্লা, হাজি মহসিন রোডে কুখ্যাত কাহুতের বাড়ি এবং লোয়ার যশোর রোডে খান সবুরের বাড়িতে ঝামেলা হবেই এবং তা হবে প্রাণঘাতী। কঠিন কণ্ঠে সবাইকে চলে যাওয়ার নির্দেশ দিলাম। আমাদের ভয় অমূলক ছিল, লোকজন যাদের মধ্যে অনেকেই ছিল খুবই টাফ, কথা শুনেছিল।

মিটিং শান্তভাবে শেষ হওয়ায় পুলিশও স্বস্তি পেয়েছিল এবং ঐ মুহূর্তে কাউকে গ্রেফতারের কথা সম্ভবত ভাবেনি। তথাপি আমি সতর্ক ছিলাম এবং জটলার মধ্যে দ্রুত স্থান পরিবর্তন করে বেরিয়ে এলাম। বাড়ি ফিরলাম গভীর রাতে। শুনলাম দুজন ছেলে এসেছিল মটর সাইকেলে, বলে গেছে রাতে যেন বাড়িতে না থাকি, ধর-পাকড় হতে পারে। তারা সম্ভবত বাবাকে পার্কের জনসভায় আমার সভাপতিত্ব করার কথা বলেছিল। এর আগেও বাড়িতে না থাকার জন্য আমাকে কয়েকবার সতর্ক করা হয়েছে। কিন্তু আমি বাড়িতেই ছিলাম, কিছুই ঘটেনি। এবার যদিও কিছুটা ভয়ছিল, তবুও বাড়িতে থাকার সিদ্ধান্ত নিলাম। ছাত্রলীগ জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক সুশান্ত আমার সাথে ছিল।

তবে এবার আমাকে পালাতে হল। বাবাকে এত বিচলিত হতে কখনো দেখিনি। তিনি সে রাতে ঘুমান নি, বার বার ঘরে বাইরে করছিলেন, বেড়ার ধারে ঠায় দাঁড়িয়ে ছিলেন। মা এবং আমি চেষ্টা করেও তাকে ঘরে ফেরাতে পারিনি, বললেন– স্থির হতে পারছেন না। কেন জানি মনে হল সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। শেষ রাতে বু চা বানিয়ে দিল, চা বিস্কুট খেয়ে আমরা পিছন দরজা দিয়ে বাড়ি ছাড়লাম। সংকীর্ণ গলি পথ ধরে পূর্ব বানিয়াখামার রোডে উঠে ডান দিকে কয়েক পা এগিয়ে গেলে মোড়ের মাথায় রাতের দু-একটা রিকশা মেলে। আজো ছিল। আমরা রিকশায় উঠে বসলাম, তখন ফজরের আজান শুরু হয়েছে। আমরা যখন স্টেশনে এলাম হোটেলগুলোয় গরম গরম পরটা ভাজা শুরু হয়ে গিয়েছিল। এক কোণা বেছে নিয়ে নিরুদ্বেগে চারটে করে পরটা হজম করে চায়ের অর্ডার দিয়ে বসে থাকলাম। আমার হাতে তখনও অঢেল সময়।রেল স্টেশন ও স্টিমার ঘাটের ধীরে ধীরে জেগে ওঠা এবং নদীতে ভোরের সৌন্দর্য দেখে স্টেশন রোডে ফিরে এলাম। রাতের টহল পুলিশের ফেরত যাত্রার জিপ কোনরূপ সন্দেহ না করে পাশ কাটিয়ে থানার দিকে চলে গেল। পাওয়ার হাউসের মোড়ে এসে দাঁড়ালাম। অফিসের গাড়িটা ধরতে হবে।

অফিসে সব কিছুই ছিল স্বাভাবিক। কিন্তু পনেরো মিনিট যেতে পারেনি স্যার তার চেম্বারে ডাকলেন– তোমার ফোন, ধর।এটা যে বাবার কণ্ঠস্বর বুঝতে কষ্ট হল। কাঁপা কাঁপা গলায় বললেন–এখুনি পালাও, আজানের পরপরই পুলিশ বাড়ি ঘেরাও করেছিল, ওরা তোমাকে খুঁজছে। আমাদের শাসিয়ে গেছে, তোমার অফিসের ঠিকানাও নিয়ে গেছে।

এমন অভিজ্ঞতা বাবার কাছে নতুন, আমার কাছেও। ক্রেডেলে ফোনটা রাখতে যেয়ে হাত কেঁপে গেল। স্যার বললেন–তোমার বাবা?

–জি স্যার।

কাজের জন্য তিনি আমাকে পছন্দ করতেন, বললেন– অফিসের কেউ যেন না জানে। ছুটির দরখাস্ত দিয়ে চলে যাও। মিলের পশ্চিম গেট দিয়ে সেনহাটি হয়ে যাও। এখানে পুলিশ এলে বিপদ হবে। ওরা হয়তো প্লাটিনামের ভেতর দিয়ে আসবে, আমি প্লাটিনামের সিকিউরিটি অফিসার রফিক সাহেবকে বলে রাখছি। তিনি রিটায়ার্ড পুলিশ অফিসার, হয়ত সামলে নিতে পারবেন।

পনেরো দিন ছুটির দরখাস্ত দিয়ে পালিয়ে গেলাম।

আমি গোপন রাজনীতি করতাম না, কোন হাইড-আউটও ছিল না। বাগমারায় আবুদের বাড়ি যেয়ে উঠলাম। সে আমার স্কুল জীবনের বন্ধু এবং ভগ্নিপতি ছিল। দেখতে দেখতে সে বাড়িতে আরো কয়েকজন ছাত্রলীগ নেতা যেয়ে ঠেলে উঠল। সেখানে সুবিধা ছিল এই যে আগাগোড়াই তার বাবা-মা ভাই-বোন সবাই আমাদের উত্তপ্ত আলোচনা, হৈচৈ, তাস খেলা, সব ধরনের অত্যাচার অক্লেশে সহ্য করতেন। আমরা দুপুরে গিয়েছিলাম। রান্না করা ভাত-তরকারি গোগ্রাসে গিলে সাবাড় করে ফেললাম। দ্বিতীয়বার রান্না না হওয়া পর্যন্ত তাদের অপেক্ষা করতে হল। অভিযোগ তো দূরের কথা, খালামা বললেন–'বাবা, মাছটাছ তো নাই, অসুবিধা হয়নি তো?'

দু দিন পর প্রচণ্ড শব্দে চারপাশ কাঁপিয়ে এক মটর সাইকেল আবুদের বড়সড় চারচালা ঘরের সামনে সজোরে ব্রেক কষে দাঁড়ালো, আমরা তাস খেলায় মগ্ন ছিলাম। এটা এত আকস্মিক ছিল যে আমরা স্থাণুবৎ হয়ে গেলাম এবং পালানোর কথা ভুলে গেলাম। সৌভাগ্যক্রমে সে ছিল হালিম, ছাত্রলীগের গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিল। তাকে আমরা ভগ্নদূত বলতাম, কেননা সে প্রায়ই দুঃসংবাদগুলো বয়ে আনতো। তার বাবা ইনটেলিজেন্স ব্রাঞ্চের কর্মকর্তা ছিলেন, দারুণ রাশভারি মানুষ, কথা কম বলতেন। তবে হালিম ছিল বাবার একেবারে উল্টো, প্রচুর হাসতো, কথা বলত গম গম করে- উচ্চ ডেসিবেলে।

সে ঘরে ঢুকেই হৈচৈ বাধিয়ে দিল– ওরে বাবা! আব্বা তো ঠিকই বলেছে দেখছি। জাল ফেললে সব কটা রুই কাতলা এক সাথে আটকে যাবে। দেরী না করে পালাও, রেইড হলো বলে।

আমি চিন্তায় পড়ে গেলাম। এ ধরনের পরিস্থিতির মুখে পড়িনি কখনো। হাইড-আউট নেই। আবু বলল চল তোমাকে এক বাসায় দিয়ে আসি। দলিলুদ্দিনের বউ ছেলে মেয়ে বাড়ি গেছে। ও একা আছে অসুবিধা হবে না। বাড়িটাও নির্জন এলাকায়।

বানরগাতি, গল্লামারীর কাছাকাছি এক এলাকা। সবে কাঁচা রাস্তার পাশে বিলের মাঝে মাটি উচু করে দু'একটা ছাপড়া ঘর ওঠা শুরু হয়েছে। এমন জায়গায় পুলিশের ভয় থেকে বাঁচা যাবে বটে, কিন্তু ভূতের ভয় জেঁকে বসতে পারে। বিশেষত ঘুমের মধ্যে বোবায় ধরলে আমি প্রায়ই দুঃস্বপ্ন দেখি– আশরিরী কিছুর ধাওয়া খেয়ে জান বাঁচানোর জন্য এ রকমই এক জলার উপর দিয়ে শূন্যে ভেসে পালানোর প্রাণান্ত চেষ্টা করছি, অথচ গতি বাড়ছে না। ধরা পড়ি পড়ি অবস্থায় ভয়ে ঘেমে নেয়ে একাকার। ঠিক এসময় ঘুমটাভেঙ্গে যেত, আমি বেঁচে যেতাম।

দলিলুদ্দিন আমার স্কুল জীবনের বন্ধু, অতি নিরীহ মানুষ। আবুর বয়ান শুনে কাঁপতে শুরু করল। কাঁপতে কাঁপতে ঘরময় ঘুরে ঘুরে যে কথাগুলো বলল তা মোটামুটি এই–

হ্যা হ্যা তুমি বন্ধু মানুষ, অবশ্যই থাকবে, কোন অসুবিধা নেই। তোমার এত বড় বিপদ! এই যে এই মেটেতে চাল। ডাল তেল লবণ চা চিনি দুধের কৌটো সব এই শেলফে। এই যে চৌকির তলায় টুকরি- ঝাল আলু পিঁয়াজ রসুন সব এতেই পাবে। তা দশ পনেরো দিন অনায়াসেই চলে যাবে। আর এই কলসিতে পানি। ঐ যে পথের পাশে টিউবওয়েল, রাতে গেলে কারো নজরে পড়ার ভয় নেই, আশেপাশে লোকজনও কম। একেবারেই নির্জন এলাকা। কোন ভয় নেই। আর এই নাও তালা চাবি। যাবার আগে চাবিটা আবুকে দিয়ে গেলেই চলবে। আমার আবার আজই বাড়ি যেতে হবে কিনা। সে দ্রুত হাতে এয়ার ব্যাগে জামা কাপড় ভরতে ভরতে বলল, আবু দিন পনেরো ছুটি করিয়ে দিও। কথায় আছে পাপী মরে সাত ঘর নিয়ে, আমার জন্য আরো একজন অতি নিরীহ বন্ধু অফিস এবং বাড়ি ছাড়ল পনেরো দিনের জন্য।

আমরা হতভম্ব হয়ে ওর প্রস্থানপর্ব দেখলাম। দারুণ ভয় পেয়েছে বেচারা। তবে বাড়িটা এবং এলাকাটা আমার ভালই কাজে আসবে। আবু বলল থাকো, আমি মাঝে মাঝে এসে দেখে যাবো। বললাম, সুশান্তকে খবর দাও, এখানে একা থাকা অসম্ভব ব্যাপার।

অতিপ্রাকৃত কিছু বিষয় নিয়ে আমার ভয়ের কথা আবুর ভালই জানা ছিল। সন্ধ্যার মুখে ডাবলু চলে এলো।

এবার রাতের খাবারের কথা ভাবতে হল। ডাবলুকে বললাম, রাধতে পারো তো?

নির্বোধের মত বলল, আমি তো কখনো রাঁধিনি। আপনি রাঁধেন, আমি জোগাড় করে দিচ্ছি। সে চুলো ধরাতে গেল।

আমার মা এখনো যথেষ্ট পরিশ্রম করেন। পাঁচ বোনের বড় তিন জনই রান্নাবান্নায় পটু, মা নিজ হাতে তাদের রান্না শিখিয়েছেন। আমার চুলোর ধারে যাওয়ার প্রয়োজন পড়েনি। স্বভাবতই কতটা চাল, কতটা পানি, ডালের পরিমাণ, তাতে লবণ তেল মশলার অনুপাত ইত্যাদি নানা জটিল সমিকরণ মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলে খিচুড়ি রাঁধতে বসলাম। জানা ছিল এটাই সহজ রান্না। রান্না শেষে যা পেলাম–এক হাড়ি ধোঁয়াটে লবনাক্ত হলুদ বর্ণের জমাটবাঁধা বস্তু। কাঁসার বড় চামচ দিয়ে খণ্ড খণ্ড করে কেটেও তার মধ্যে আলুর হদিস মিলল না। সেদ্ধ আলু খেয়ে যে ক্ষুধা নিবৃত করব সে আশাও তিরহিত হল।

আবু দায়িত্বশীল ছিল। সকালে অফিসে যাওয়ার পথে সাড়ে আটটার দিকে পরোটা সুজি নিয়ে এল। তার শিফটিং ডিউটি। দু'টোয় ফেরার পর অবকাশ সময়টা আমাদের সাথে কাটিয়ে গেল। আমরা তৃপ্তির সাথে ঘি, ডাল-আলুভর্তা দিয়ে ভরপেট ভাত খেয়ে তৃপ্ত হলাম।

দু'এক দিন পর সন্ধ্যায় এয়ার ব্যাগ কাঁধে ঝুলিয়ে আমরা আবুর সাথে বেরিয়ে পড়লাম। দোলখোলায় শাহ নেওয়াজদের দোতালা বাড়ির সামনে আমাদের রিকশা থামল। নেওয়াজ আমার স্কুল ও কলেজ জীবনের বন্ধু। সে তখন আমেরিকায় ডক্টরেট করছে। তার ছোটভাই নুর নেওয়াজ বাইরে উত্তেজিতভাবে পায়চারি করছিল। সে মাঝে মাঝে আমাদের ছেলেদের সাথে ঘুরতো, তবে আমাদের রাজনীতির কোন অর্থ খুঁজে পেতনা। বড় ধরনের কিছু একটা করার জন্য সদা উম্মুখ ছিল এবং সেটা প্রকাশ্যে বলে বেড়াত। বড় ভাইয়ের মত সেও কেমিস্ট্রির ছাত্র ছিল, বাড়ির চিলেকোঠায় তার ছোটখাটো একটা ল্যাবরেটরিও ছিল। একদিন প্রচন্ড বিস্ফোরণে সেটা লন্ডভন্ড হয়ে যায়। অতঃপর চুল-দাড়ি বিহীন মসৃণ মাথা নিয়ে সে প্রায় এক মাস পর আমাদের সামনে আবির্ভূত হল, বলল– ডাক্তার আশা রাখে চুল দাঁড়ি গোপগজাবে, তবে সময় নেবে।

নুর নেওয়াজ বলল, আপনাদের এখানে থাকার ব্যবস্থা হয়েছে। ক দিন আর কষ্ট করে হাত পুড়িয়ে খাবেন?

বললাম, বল কি, তোমার বাবা তো দারোগা!

তাহলে ভাবুন জায়গাটা কতখানি নিরাপদ। বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা আরকি! আমি তো বাড়িতে বসেই বোমা বানাই, পুলিশ ধারেকাছেও ঘেষে না। আমরা দোতালায় নেওয়াজের ঘরে যেয়ে উঠলাম। ঘরে তাকের উপর সাজানো থ্রিনটথ্রি রাইফেলের তিনটে তাজা গুলি। বললাম কি ব্যাপার?

বাবার স্টক থেকে সরিয়েছি, একটা আয়ুব খাঁ আর একটা মোনেম খাঁর জন্য, বাকিটা এখনো বরাদ্দ হয়নি।

৫. নেওয়াজ মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েছিল। স্বাধীনতার পর পড়াশোনার জন্য সে আমেরিকা প্রবাসী হয়। সে আমেরিকায় থেকে গিয়েছিল এবং মাঝে মাঝে দেশে এসে পার্বত্য চট্টগ্রাম দাপিয়ে বেড়াত, তার ধারণা সেখানে মূল্যবান খনিজ সম্পদ মাটি চাপা পড়ে আছে। উঠাতে পারলে বাংলাদেশ বিশাল ধনী দেশে পরিণত হবে। হঠাৎ একদিন রোড অ্যাকসিডেন্টে তার মৃত্যু সংবাদ পেলাম। একজন সম্ভাবনাময় তরুণের অকাল মৃত্যু, খুবই আঘাত দিয়েছিল।

আমরা নেওয়াজদের বাড়িতে চার পাঁচ দিন ছিলাম। এক দুপুরে সে হতদন্ত হয়ে ঘরে ঢুকলো, বলল– পালান জলদি, দুনিয়া শুদ্ধ সবাই জানে আপনারা এখানে। এমন আশংকা আগাগোড়াই ছিল। আমি নেওয়াজকে আমাদের আশ্রয় দেয়ার ব্যাপারটা নিয়ে তার অতি ঘনিষ্ঠজনদের সাথেও আলোচনা করতে পইপই করে নিষেধ করেছিলাম। আমাদের হালকা ব্যাগ সবসময় গোছানো থাকে। ঘাড়ে নিয়ে দরজার দিকে পা বাড়াতেই নেওয়াজ জিজ্ঞেস করল, কোথায় যাবেন এখন?

মেজাজ খারাপ ছিল, বললাম–ঠিক করিনি। আবুকে বোলো, আপাতত তার আস্থানায় যাচ্ছি। সে যেন রাতে রুটি-টুটি কিছু একটা নিয়ে যায়। নেওয়াজচুপ করে গেল। ঐ ভর দুপুরে আমরা আবার বানরগাতির পরিত্যক্ত ঘরে ফিরে গেলাম।

মা বসে ছিলেন না, খুলনা পুলিশের একজন বড় কর্মকর্তা আমাদের দূর সম্পর্কের আত্মীয় ছিলেন। এতদিন কোন যোগাযোগ ছিলনা, আজ বিপদের মুখে তাকে ধরলেন। তিনি বললেন, এই মুহূর্তে কিছু করা কঠিন, অন্তত পনেরো দিন ধরা না পড়ে পালিয়ে থাকুক। তারপর দখা যাবে।

সপ্তাহ খানেকের মধ্যে তিনি খবর পাঠালেন। মাকে বললেন, পুলিশ যাকে খুঁজছে সে তো মনোয়ার হোসেন। মনোয়ার আলী পালিয়ে বেড়াচ্ছে কেন? পুলিশের টার্গেট একজন ফুলটাইমার এজিটেটর। আপনার ছেলে তো জুট মিলে আটটা-পাঁচটা অফিস করে। তারপরও এসব করে কখন? ওকে বাড়ি আসতে বলুন, সভা-টভা করতে মানা করুন। সেদিন সভায় ওরা বোকার মত বোমা বন্দুক বানানোর কথা বলেছিল।

মজার ব্যাপার হল ছেলেরা আমাকে চিনত মনোয়ার হোসেন নামে। আমার প্রসঙ্গ উঠলে, প্রকৃত নাম না জেনেই তারা এ নামেই আমার পরিচয় দিত। সম্ভবত মনোয়ারের সাথে হোসেন অধিক মানানসই ছিল। আমি কদাচ ভুল সংশোধন করে দিতাম। সেদিনও সভাপতির নাম তারা সেভাবেই ঘোষণা করেছিল।

আমি আবুকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ি ফিরলাম। মার চোখে অশ্রু। বাবা নির্বাক, একেবারেই ভেঙ্গে পড়েছেন। সাতচল্লিশের দেশভাগে বসিরহাটে সবকিছু ছেড়ে আসার পর জজ কোর্টে হেডক্লার্কের চাকরি সম্বল করে ভারি সংসারের বোঝা টানতে হত বাবাকে। আমাদের উপর ভরসা করে আবার দাঁড়ানোর স্বপ্ন দেখতেন। লেখাপড়া বরবাদ করে সেটা শেষ করেছি। এখন জুট মিলে চাকরি নিয়ে সংসারে যেটুকু প্যালা ট্যালা দিয়ে যাচ্ছিলাম সেটাও জুয়ার বোর্ডে তুলে দিয়েছি। গুমোট ভাব কখন কাটত কে জানে, ছোট ভাই-বোনরা হৈচৈ করতে করতেপ্লেটভরা তেল-ঝাল মাখা মুড়ি এবং এনেহাজির করল, তাদের চোখে আমি তখন বিশেষ একটা কিছু!

চা পর্ব শেষ হলে দাদী বললেন এদিকে আয়, মোটা ফর্সা মত দারোগাটা কে রে, চিনিস নাকি?

বিলক্ষণ চিনি, ছাত্রদের পিছনে সর্বদা চিনে জোঁকের মত লেগে থাকেন।

ওর বোধ হয় বয়স্থা মেয়ে আছে, তাইনা। খালি তোর বিয়ে দেয়ার কথা বলছিল। বোধহয় তোরে পছন্দ। দাদী মিটি মিটি হাসতে থাকেন।

না দাদী, ওনার যদি মেয়ে থাকে সুন্দরী হবে নিশ্চয়ই, তবে আইয়ুবভক্ত ছাড়া কারো ভাগ্যে ও সিকে ছিড়বে না। আসলে খাটাখাটনির চোটে ভদ্রলোকের নেয়াপাতি ভুঁড়ি খর্চে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে। ছাত্রদের ঘরে পাঠিয়ে খাটনি এবং ভুঁড়ি দুটোই বাঁচাতে দেখুনগে এমন পরামর্শ সব বাড়িতেই দিয়ে এসেছে।

২১ ফেব্রুয়ারি '৬৯:ড্রাগনের মত এক অচিন্তনীয় মিছিল

বাঙালির বাঁচার দাবী ৬-দফা, ১১-দফা এবং আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলাকে কেন্দ্র করে '৬৯-এর শুরু থেকেই দেশের রাজনীতিঅগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে। শেখ মুজিবসহ সকল রাজবন্দীর মুক্তি, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার, আইয়ুবের অপসরণ এবং শ্রমিকদের বিভিন্ন দাবীতে দেশজুড়ে গণ আন্দোলন ও ঘেরাও আন্দোলন এক অসাধারণ উচ্চতায় পৌঁছে যায়।আন্দোলনের পর্যায়ে মাত্র এক মাসের মধ্যে আমরা দেশজুড়ে আর এক মহান একুশে ফেব্রুয়ারির পুনরাবৃত্তি ঘটতে দেখি। উনসত্তরের ২১ ফেব্রুয়ারি ছিল বাহান্নর একুশের মতই প্রখর, রক্তাক্ত এবং প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশের রাজনীতিতে এক টার্নিং পয়েন্ট।

সেদিন গোটা দেশে একুশে ফেব্রুয়ারির স্বাভাবিক কর্মসূচি খুব দ্রুত রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে উপনীত হয়। দেশব্যাপী এই আন্দোলনে খুলনা অসামান্য অবদান রেখেছিল। খুলনার সকল গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল রাজনৈতিক দল এবং ছাত্র ও সাংস্কৃতিক সংগঠন যৌথভাবে দিনটি উদ্‌যাপনের উদ্যোগ নেয় এবং দিনব্যাপী বর্ণাঢ্য কর্মসূচী গ্রহণ করে। সম্মিলিত উদ্যোগ খুলনায় সাড়া ফেলে দিয়েছিল এবং সর্বস্তরের মানুষকে রাজপথে টেনে এনেছিল। এদিন সকালের অনুষ্ঠানমালা ভাবগম্ভীর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু এরপর যা ঘটেছিল তা অচিন্তনীয় ছিল।

বেলা তখন প্রায় সাড়ে দশটা, খুলনা মিউনিসিপ্যাল হলে উপচে পড়া ভীড়ে বিদগ্ধজনের আলোচনা চলছে। ছাত্র নেতৃবৃন্দের কেউ কেউ পার্কে নতুন শহীদ মিনারের নির্মাণকাজ তদারকিতে ব্যস্ত। শহীদ মিনারটি পার্কে দক্ষিণ প্রান্তে প্রায় মাঝামাঝি স্থানে নির্মিত হচ্ছিল। এবারই প্রথম সরকারিভাবেনাগরিক কমিটি গঠন করে বৃহদাকার কংক্রীটের শহীদ মিনারটি নির্মাণ করার উদ্যোগ নেয়া হয়। শহীদ মিনার ছিল হানাদারপাকিস্তানিদের চক্ষুশূল, তারা একে বাঙালি শক্তির প্রতীক হিসাবে চিহ্নিত করত। ফলে ১৯৭১ সালে তারা শহীদ মিনারটি ডিনামাইট দিয়ে উড়িয়ে দেয়। শহীদ মিনারের নির্মাণ কাজ খুবই প্রাথমিক পর্যায়ে ছিল কেবল একদিন আগে কংক্রিটের ভিত ঢালাই হয়েছে। গত রাতভর কাজ হয়েছে, আজো টুকটাক কাজ চলছে। ওর মধ্যেই পুষ্পার্ঘ দেয়া হয়েছে। এমন সময় থানা থেকে হতদন্ত হয়ে এক পুলিশ কর্মকর্তা ছুটে এলেন। স্ফীত শরীর, দরদর করে ঘামছেন, হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন– 'ছাত্রভাইরা, আপনারা জলদি আসেন, থানা আক্রান্ত হল বলে! খালিশপুর থেকে ছাত্র শ্রমিকদের বিশাল জঙ্গী মিছিল আসছে ভাংচুর করতে করতে, কিযে ভয়াবহ অবস্থা বোঝানো কঠিন! মিছিল ডাকবাংলা থেকে ক্লে রোডে ঢুকে পড়েছে, থানার দিকে আসছে। থানা ঘিরে পুলিশও বসে গেছে পজিশন নিয়ে। মুখোমুখি হলে ভয়ংকর অবস্থা হবে। আপনারা জলদি আসেন, মিছিল সামলান, নইলে কি ঘটবে আল্লাই মালুম!'

খুলনায় এবারের একুশে উৎযাপন দিনভর নানা কর্মসূচি দিয়ে সাজানো হয়েছিল। সেটা মাটি হোক কারো তা কাম্য ছিলনা। ছাত্রদের একজন ছুটল মিউনিসিপ্যাল হলে নেতৃবৃন্দকে খবর দিতে, অন্যরা থানায়। থানা ছাড়িয়ে পশ্চিমে কেডি ঘোষ রোড ও ক্লে রোডের মোড়। পরিস্থিতি দেখতে সবাই সেদিকে ছুটল। মোড়ে পৌঁছাতেই ঝড়ের অর্কেস্ট্রার মত ভয়ংকর শব্দ সবার কানে আঘাত হানল। মিছিলের মাথা তখনো হুগলি বেকারির মোড়ে। মিছিলটা ওখান থেকেই ওল্ড যশোর রোডে ঘুরিয়ে দেয়ার লক্ষ্যে কয়েকজন সেদিকে ছুটল। মিছিলের গতি ধীর, কিন্তু মেজাজ অবিশ্বাস্যরকম ভয়ংকর। একটা বিশাল ড্রাগন যেন হেলেদুলে দু'পাশের সবকিছু মড়মড় করে ভাঙতে ভাঙতে এগিয়ে আসছে। মিছিলের সামনে কয়েকজন ছাত্রনেতা। তাদের পূব দিকে টার্ন নিতে বলা হল। কিন্তু কে শোনে কার কথা, মিছিল চলছে অদৃশ্য সুতার টানে।

প্যাকিং বাক্সের উপর উঠে কেউ কেউ ড্রাগনের লেজটা দেখার চেষ্টা করল। একজন বলল– 'কি দ্যাখবেন সাহেব! দ্যাখছেনই তো অবস্থা! শ্যাষ নাই।' শোনা গেলমিছিলটা যখন রওনা হয় লোকজন কম ছিল। পাঁচ মাইল দূরে খুলনা শহরে মিছিল করে যাওয়ার আগ্রহ সবার থাকেনা। কিন্তু পথে দলে দলে লোকজন মিছিলে সামিল হয়েছে, অনেকে লাঠিসোটা নিয়েও এসেছে। জংশন ছাড়ানোর আগেই মিছিলটা বিশাল আকৃতি পায়। তারপর যত এগিয়েছে মিছিলের আকার ততই বেড়েছে। বয়রা কটন মিল ছাড়ালে মিছিলটা ভয়ংকরএবং জঙ্গী হয়ে ওঠে।

মিছিলকারীরা দেয়াল, প্যাকিংবক্স, লাইটপোস্ট, যে যা পারে তাই বেয়ে উঠে দোকানপাটের মাথায় ঝোলানো উর্দু ও ইংরাজী সাইনবোর্ডমড়মড় করে ভেঙে চুরমার করছে। হাতুড়ির বাড়ি, হাত-পা ছড়ে যাওয়া, বাক্স ভেঙে আছাড় খাওয়া, বিদ্যুতের শক কিছুই তারা গ্রাহ্যে আনছে না। মিছিলটা ক্লে রোড বরাবর এগোতেই ছাত্র নেতৃবৃন্দ থানায় ছুটে এলো। পুলিশদের বলা হল ভেতরে যেয়ে দরজা বন্ধ করে দিতে। তাদের জাগায় ছাত্র নেতৃবৃন্দ থানার সামনে লাইন করে পজিশন নিয়ে দাঁড়িয়ে গেল। একটু পরেই কেডি ঘোষ রোডের মুখে আগুনের গোলার মত ড্রাগনের মুখটা দেখা গেল, দু'পাশের ঘনসন্নিবিষ্ট দোকানের উর্দু ইংরাজি সাইনবোর্ড চুরমার করতে করতে এগিয়ে আসছে। আমরা সবাই ভয়ার্তভাবে থানার সামনে দাঁড়িয়ে ছিলাম। উন্মত্ত মবের রোষানলে পড়লে কি পরিণতি হয় সবারই তা জানা, বিশেষত সে মবটা যদি হয় ক্রুদ্ধ ক্ষুব্ধ এক দঙ্গল জঙ্গী শ্রমিকের মব।

হঠাৎ একজনের দৃষ্টি পড়ল থানার দেয়ালে লাগানো ইংরাজিতে 'খুলনা কোতোয়ালি' লেখা টিনের নীলবর্ণের ছোট নামফলকটার উপর, সে চিৎকার করে উঠল–'এখনো এটা খোলেন নি, খোলেন জলদি!' বিপদের মুখে মানুষ যে কি অসাধ্য সাধন করে তা না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন। পুলিশ অফিসারটি ক্ষিপ্র গতিতে দেয়ালে হাত চালালেন, কিভাবে যে পেরেকসুদ্ধ নেমপ্লেটটা উপড়ে ফেললেন আল্লাই মালুম।তিনি অনেক্ষণ বুঝতেই পারেননি যে আঙ্গুল থেকে দরদর করে রক্ত ঝরছে।

অল্পক্ষণের মধ্যে সগর্জনে আগুনের হলকা ছড়াতে ছড়াতে ড্রাগন মিছিলটা এসে গেল। আমরা দীর্ঘ সময় উদ্বেগের সাথে থানার সামনে দাঁড়িয়ে একের পর এক স্লোগান দিয়ে মিছিলটা পার করে দিলাম এবং স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। মিছিলের নেতৃবৃন্দকে বলা ছিল তারা যেন মিছিলটা পার্কে নিয়ে সমাবেশ করে উত্তেজনা প্রশমনের উদ্যোগ নেয়। সবার মাথায় তখনও দিনব্যাপী একুশের সাজানো প্রোগ্রাম সফল করার চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছে!

আমরা যখন পার্কে ফিরে আসি তখন সেখানে এক অভাবিত দৃশ্য। আওয়ামী লীগের আজিজ ভাই, ন্যাপের জব্বার সাহেব, পিডিপির জলিল সাহেব, সন্দীপনের খালেদ রশীদ স্যারসহ রাজনৈতিক ও ছাত্র নেতৃবৃন্দ ছোটাছুটি করে মিছিলের লোকদের পার্কে ধরে রাখার প্রাণপণ চেষ্টা করছেন। লোহার গেট আঁটকানো। কিন্তু পার্কের সীমানা প্রাচীর নাসিরউদ্দিন হোজ্জার সমাধি প্রাচীরের মতই হাস্যকর– শক্ত করে বন্ধ করা বিশাল লৌহকপাট, চারপাশে তিন-সাড়েতিন ফুট উচু পাঁচিল। ড্রাগন মিছিলটা উন্মত্তের মত পাঁচিল টপকে বেরিয়ে গেল। ভয়োদর্শীর মত কে একজন বলে উঠল– 'এ যৌবন জলতরঙ্গ রুধিবে কে!'

উন্মত্তের মত ছুটতে ছুটতে কয়েকজন শ্রমিক পার্কের দক্ষিণ প্রান্তে নির্মীয়মাণ শহীদ মিনারের ভিতের গর্তে আছাড় খেয়ে পড়ল। মাত্র একদিন আগে গর্তের মধ্যে কংক্রিটের ভিত ঢালাই করা হয়েছে। লোকগুলো পড়িমরি করে উঠে আবার মিছিলের সাথে ছুটল। আমরা গর্তে পড়ে থাকা মারাত্মকভাবে আহত একজনকে উঠতে সাহায্য করলাম। সে ব্যাথায় ছটফট করছিল। লোকজন পাশ দিয়ে ছুটছে। কেউ দেখেও দেখছে না। কংক্রিটের কিনারে লেগে লোকটার ডান পায়ের হাড়ের উপর চার ইঞ্চি পরিমান জায়গা ছড়ে সাদা হয়ে আছে। কপাল চেপে ব্যথা সামলানোর চেষ্টা করছে সে, চোখের জল বাধা মানছে না। এরমধ্যে এক মাঝবয়সী লোক ছুটতে ছুটতে ফিরে এলো, বেশ রাগের সাথে বলল– 'পড়লি ক্যামনে, হুঁশকরি চলতি পারস না! অহন ক'দেহি, আমাগের লগে যাতি পারবি, না পারবিনা?'

আমরা বললাম– আগে ওকে হাসপাতালে নেন, চিকিৎসা দরকার।

লোকটা নরম হল। বলল– আমিতো চিনিনা বাজান, তোমরা অরে হাসপাতালে নেও। সে আর দাঁড়াল না, মিছিলের দিকে ছুটল।

পার্কের ভাঙ্গাহাট ফেলে আমরা সুইট হাউজের দিকে রওনা দিই। অনন্ত বাবুর এই রেস্তরায় ছাত্রলীগের ছেলেরা বসে। অফিস ভাড়া করার মত পয়সা তখন ছাত্রদের ছিল না। ছেলেরা সংগঠন করত প্রাণের তাগিদে। কিছুদিন আগে অনন্ত বাবুর অনুরোধে ছাত্রদের সাথে তার এক 'জেন্টেলমেন এগ্রিমেন্ট' হয়েছিল– রেস্তরার অর্ধেক চেয়ার অনন্ত বাবুর, অর্ধেক ছাত্রদের। চুক্তিটা দু-এক দিন বজায় ছিল, তারপর ভেস্তে যায়। একদিন দেখি, রাস্তার ওপারে মনিন্দ্র বাবুর বাড়ির সামনে খোলা মাঠে গরান কাঠের বিশাল স্তুপ। অনন্ত বাবু বললেন– 'কি আর করি, আপনারা দিনভর চেয়ার দখল করে রাখবেন, কেউ বড়জোর এক কাপ চা-একটা সিঙ্গাড়া খাবেন, আমার চলে কিভাবে! জমিটা ভাড়া নিলাম। একশ মন গরান কাঠ নামিয়েছি, জ্বালানি করে বিক্রি করব।'

পার্ক থেকে বেরিয়ে দেখি ড্রাগন মিছিলটা হেলেদুলে তপ্ত নিঃশ্বাস ছাড়তে ছাড়তে সার্কিট হাউজের দিকে যাচ্ছে। ওদিকে আর্মি ক্যাম্প এবং আইয়ুবের যোগাযোগ মন্ত্রী খান সবুরের বাড়ি। জঙ্গী মিছিল ওখানে গেলে কি ঘটতে পারে ভেবে আমরা মুষড়ে পড়লাম। কিন্তু বেশিদুশ্চিন্তা হলআহসান আহমদ রোডের মাথায় শত শত লাঠির আস্ফলন দেখে। পাশেই বাংলাদেশ ব্যাংকের সাইড গেট। মোড় থেকে দক্ষিণে কয়েক পা গেলেই অনন্তবাবুর সুইটহাউজ এবং জাহিদের বর্ণালী প্রেস- আমাদের আনঅফিশ্যাল অফিস। মিছিলটা কেন জানি হঠাৎ ওখানেই থমকে দাঁড়িয়েছে। সবাই সেদিকে ছুটল। তারপর যা চোখে পড়ল তাতে রক্ত হিম হওয়ার অবস্থা। দু দিন আগে নামানো অনন্ত বাবুর গোলার কাঠ হাতে হাতে উঠে যাচ্ছে এবং অনন্ত বাবুর সাথে আমাদের ছেলেরাও পাগলের মত ছোটাছুটি করে ওদের নিবৃত করার প্রাণপণ চেষ্টা করছে।

কিন্তু কে শোনেকার কথা। দেখতে দেখতে গোলা শূন্য হয়ে গেল। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে সর্বস্ব হারিয়ে হাহাকার করতে করতে অনন্ত বাবু ঘর্মাক্ত দেহে পথের উপর বসে পড়লেন। এ যেন আক্ষরিক অর্থেই পথে বসা।

মিছিলের একাংশ আগেই সার্কিট হাউজের দিকে চলে গিয়েছিল। তারা সোজা গিয়েছিল না ডানে কমার্স কলেজের দিকে টার্ন নিয়েছিল দেখার অবকাশ ছিলনা। মিছিলের বাকি অংশগরানের লাঠি হাতে মারমুখী হয়ে উঠল এবং সার্কিট হাউজের দিকে রওনা দিল। তবে তারা কোন দিকে গেল তা নিয়ে কারোআর তেমন আগ্রহ ছিলনা। আমরা অনন্তবাবুকে নিয়ে সুইটহাউজে ঢুকলাম। কেউ কথা বলার মুডে ছিলাম না। সে দিন পথে ঘাটে এ ধরনের জঙ্গী মিছিলের কোন লেখাযোখা ছিল না। কোন মিছিল কোন দিক থেকে আসছে, কোথায় যাচ্ছে, কে কার সাথে যুক্ত হয়ে ফুঁসে উঠছে তার কোন হিসাব ছিল না।

পল্টু ছাত্রলীগ করত, কিছুটা পাগলা টাইপের ছিল। তার বাড়ি যশোর রোডে, চা খেতে সুইটহাউজে ঢুকে আমাদের দেখে হৈচৈ করে উঠল– আপনারা এখানে আর ওদিকে তো সব পুড়ে ছাই হয়ে গেল। কি পুড়ছে সে নিশ্চিত করতে পারল না, বলল সবুরের বাড়িটাড়িহবে হয়তো।অথচ আমরা গুলির শব্দ শুনিনি। আইয়ুবের যোগাযোগ মন্ত্রীরবাড়ি পুড়বে, একেবারে সামনে ২২ ফ্রন্টিয়ার ফোর্সের হেড কোয়ার্টার– সার্কিট হাউজ,আর্মিরা পুতুলের মত দাঁড়িয়ে দেখবে, খুবই অবিশ্বাস্য মনে হল। তবু আমরা দু চারজন চা খেতে শাহীন হেটেলে গেলাম। খুব কাছেই খান সবুরের বাড়ি।পল্টুর কথা মিথ্যে নয়। সত্যি খান সবুরের বাড়ি এবং ভিতরে ধানের গোলা পুড়ছে। পুড়ছে। বাড়ি থেকে তখনো ধোয়ার কুণ্ডলী উঠছে, পথের উপর অজস্র পোড়া-ছেড়া কাগজ এবং ভাঙ্গাচোরা মালপত্র ছড়ান।

খান সবুর পঞ্চাশের দশকে খুলনার মুসলমানদের মধ্যে জনপ্রিয় ব্যক্তি ছিলেন, কিন্তু ষাটের দশকে একজন ধিকৃত ব্যক্তি মাত্র। সে সময় এমন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বকমই ছিলেন যারা তার পেটোয়া বাহিনীর হাতে নিগৃহীত হননি। খুলনা-খালিশপুর-সেনহাটি এলাকায় যত মারামারি, দাঙ্গা, শ্রমিক নিগ্রহ তাকে তার হোতা ভাবা হয়। বিহারী গুন্ডারা ছিল তার মূল শক্তি। বিহারীদের ঝোড়োগতির আক্রমণে বাঙালিরা প্রথমে মার খেত। পরে তারা যখন সঙ্গবদ্ধ হয়ে রুখে দাঁড়াতো, বিহারী গুণ্ডারা তখন উধাও, সামনে এসে দাঁড়াতো আইয়ুব সরকারের পেটোয়া বাহিনী। ক্ষুব্ধ শ্রমিকরা এবার দাদ তুলতে চেয়েছিল। খান সবুর বাড়িতে ছিলেন না। আধঘন্টা তাণ্ডব চালিয়ে ড্রাগন মিছিলটা রূপসার দিকে চলে যায়। মন্ত্রীর বাড়ি আক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও সামনে সার্কিট হাউজের ইপিআর ও আর্মিরা সংযত ছিল। সম্ভবত মিছিলের ভয়াবহ আকার ও আক্রোশ তাদেরকে অ্যাক্শানে যেতে নিরুৎসাহিত করেছিল।

এরপর দুপুরের দিকে যেটা ঘটল তা আরো ভয়াবহ। আমরা খবর পেলাম কাহুটের বাড়ি ঘেরাও হয়েছে এবং সেখানে গোলাগুলি চলছে। হাজি মহসীন রোডের মোড় থেকে দক্ষিণে সামান্য এগোলেই ডান হাতে খুলনা পৌরসভার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এডিসি আফজাল কাহুটের বাসা। বাড়িটি একতালাএবং পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। তিনি পাঞ্জাবী এবং সম্ভবত সে কারণে বাঙালিদের প্রতি খুবই অসহিষ্ণু ও বিদ্বেষ পরায়ণ। যেখানেই তার পোস্টিং হয়েছে সেখানেই কুখ্যাতি কুড়িয়েছেন। কিছুদিন আগে বাগেরহাটে ছাত্র জনতার মিছিলে গুলি হয়। তিনি তখন অফিসের কাজে বাগেরহাটে ছিলেন, প্রচার ছিল যে, এই ঘটনায় তিনি ইন্ধন যুগিয়েছেন। খুলনাতে এর তীব্র প্রতিক্রিয়া হয়।

বাড়িতে ইংরাজিতে কাহুতের নামফলক লাগানো ছিল। তিনি বাসায় ছিলেন না। ভিতরে পুলিশের পাহারা ছিল। মিছিলটি ইংরাজি নামফলক ভেঙ্গে দিয়ে ইট পাটকেল ছুড়তে ছুড়তে ধীর গতিতে চলে যাচ্ছিল। তথাপি প্রহরারত পুলিশ কেন যে হঠাৎ গুলি ছুড়েছিল বলা কঠিন। এটা অগ্নিতে ঘৃতাহুতির কাজ করল। বৃষ্টির মত ইটপাটকেল পড়তে থাকল বাড়িতে। তথাপি মিছিলকারীরা ভেতর ঢোকার পথ করতে সমর্থ হলনা। উত্তেজিত মব পাশের দোকান ভেঙ্গে কেরাসিন তেলের টিন বের করে নিয়ে এলো। সেগুলো ছুড়ে দিল বাড়ির ভেতর এবং মশাল ছুড়ে আগুন ধরিয়ে দিল। এদিকে কোণঠাসা পুলিশ উন্মত্তের মত গুলি চালাতে থাকল। পুলিশের গুলিতে একে একে প্রাণ হারালো হাদিস,আলতাফ, প্রদীপ।অনেকেই আহত হল। তা সত্ত্বেওউন্মত্ত মব বাড়িটা ঘেরাও করে রাখলো। তাদের ছত্রভঙ্গ হওয়ার কোন লক্ষণ দেখা গেলনা।

পুলিশের গুলি ফুরিয়ে এসেছিল, থানা থেকেও সাহায্যের আশা ছিলনা। পুলিশ ঝুঁকি নিতে বাধ্য হল, উদ্যত রাইফেল হাতে তারা হঠাৎ লাইন করে বেরিয়ে এল। একজনের পর একজনের রাইফেলের নল ডান ও বাম দিকে ঘোরানো। তারা রাস্তার মাঝ দিয়ে অসম্ভব ক্ষিপ্রতার সাথে ঘেরাওকারীদের অতিক্রম করল এবং ছুটে সাকিট হাউজের দিকে পালিয়ে গেল। ক্রোধে ফুঁসতে থাকা লোকজন ঐ মুহূর্তে কিভাবে যে সম্মোহিতের মত স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল বলা কঠিন। তবে লাইনের শেষ পুলিশ জমিরুদ্দিনের ভাগ্য সুপ্রসন্ন ছিলনা, সে পা পিছলে পড়ে গেল। ড্রাগন ততক্ষণে সুপ্তি ভেঙ্গে জেগে উঠেছে হতভাগ্য পুলিশটার উপর পুরো আক্রোশ নিয়ে!

এদিন কাহুটের বাড়ি থেকে মিছিলের উপর গুলি এবং ছাত্র ও শ্রমিক হত্যার সংবাদে রূপসা, খালিশপুরসহ বিভিন্ন শিল্প এলাকা থেকে আরো অনেক জঙ্গী মিছিল খুলনা শহরে এসে প্রতিবাদে ফেটে পড়ে। দৌলতপুরেও এদিন একের পর এক জঙ্গী মিছিল ও সমাবেশ হয়। মিছিলে পুলিশের গুলিতে মাহতাব ও ইস্রাফিল মৃত্যুবরণ করে। বস্তুত সেদিন গোটা খুলনা এলাকা দিনজুড়ে ভয়াবহ রণক্ষেত্রের রূপ নিয়েছিল।

খুলনায় আমাদের মধ্যবিত্ত ভব্যতা, শালীনতা ও বুদ্ধিবৃত্তিক চিন্তা-চেতনায় সাজানো একুশের বর্ণাঢ্য প্রগ্রাম এক লহমায় অমার্জিত এক ড্রাগন মিছিলের সামনে পড়ে তছনছ হয়ে যায়। অথচ কেউই আক্ষেপ করেনি। কোন দ্বিমতও ছিলনা যে, লক্ষ্যভেদ করার জন্য এটাই ছিল সবচেয়ে প্রখর কর্মসূচি। এই ঘটনার পর পার্কের জনসভায় শহীদদের স্মরণে পার্কের নাম শহীদ হাদিস পার্ক এবং মিউনিসিপ্যাল হলের নাম শহীদ আলতাফ মিলনায়তন রাখা হয়। সে সময় বিভিন্ন শহীদের নামে আরো কিছু নাম পরিবর্তন করা হয়েছিল, কিন্তু কালের গহ্বরে তা বিস্মৃত।

উনসত্তরের একুশে ফেব্রুয়ারিতে এমন জ্বলন্ত ঘটনা গোটা দেশজুড়েই ঘটেছিল যা ছিল আমাদের ইতিহাসের এক মহান টার্নিং পয়েন্ট। পরদিনই আমরা আইয়ুবের সাজানো ফাঁসির মঞ্চ থেকে বঙ্গবন্ধুকে ফিরে পাই।

দেশের রাজনীতিতে দৃশ্যপট পরিবর্তন

প্রেসিডেন্ট আইউব ঘটাকরে ডিকেড আব রিফর্মস বা উন্নয়নের দশক উদ্‌যাপন করতে চেয়েছিলেন। ঢাক-ঢোল পিটিয়ে প্রচার প্রপাগান্ডাও শুরু হয়ে যায়। উদ্দেশ্য তার উদ্ভাবিত মৌলিক গণতন্ত্রের সংবিধান সংশোধন করে তৃতীয় বারের জন্য রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হওয়া। গণতন্ত্রের সাথে যে কোন ধরনের বিশেষণ যোগ করলেই গণতন্ত্রের দফারফা ঘটে যায়। মৌলিক গণতন্ত্র ভিন্ন কিছু ছিলনা- সস্তা তবকে মোড়া নিখাদ স্বৈরতন্ত্র। ঢাকাতেও জনসভা করেছিলেন আইয়ুবখান। কাগজে পড়েছি বিভিন্ন কর্নার থেকে কেউ কেউ আওয়াজতুলেছিল– উন্নয়নের স্বার্থে জাতি তাকে আরপ্রেসিডেন্ট দেখতে চায়। আইয়ুব খান সম্ভবত অতিরিক্ত কিছু আওয়াজের জন্য কিয়ৎকাল অপেক্ষা করেন। দুর্ভাগ্যক্রমে সাঁড়া মেলেনি।তড়িঘড়ি করেতিনি বলে ওঠেন– হা যব আপ চাহেতে হে... এই গুরু দায়িত্ব তিনি নেবেন বৈকি।

পরদিন আমরা মতিভাইয়ের সাথে মোড়ের রেস্তরায় বসে চা খাচ্ছিলাম। খবরের কাগজ থেকে চোখ সরিয়ে তিনি বললেন– তোমাদের এক গল্প বলি শোনো। আমার এক আত্মীয় চাকরি করতেন সৈয়দপুর রেলওয়ে ওয়ার্কশপে। আজিমুল্লা নামে এক বিহারী শ্রমিক নেতা ছিল, পুরো দালাল। ম্যানেজমেন্ট যখন শ্রমিকদের কিছু সুযোগ সুবিধা দেয়ার কথা ভাবতো, সেটা আগেভাগেই তাকে জানিয়ে দিত। সে তখন ঐ সাথে আরো দু চারটে দাবী যোগ করে সভা ডেকে গরম গরম বক্তৃতা দিয়ে অনশন ধর্মঘটে বসে যেত। তার চামচাদের ছোটাছুটিও বেড়ে যেত। আসলে এ সবই ছিল লোক দেখানো ব্যাপার। ম্যানেজমেন্ট যা মানার তা তো আগেই মেনে বসে আছে।দুচার দিন পর একটা মকফাইটের মত হত। কিছু হৈছে চেঁচামেচি। তারপর ম্যানেজমেন্ট সিদ্ধান্ত দিতেন- ঠিকহ্যায় আপকা ইয়ে সব দাবী হামলোক মান লিয়া,ফিকর মৎ কিজিয়ে লিডার সাব,বাকি ডিমান্ড হামারা নলেজ মে হ্যায়, আয়েন্দা বার দেখা যায়েগা।

খুবই যুক্তিপূর্ণ কথা, সবাই মাথা নাড়ে- একবারে তো আর সব দাবী মেলেনা। এবার পান্ডা চামচাটা সমবেতশ্রমিকদের উদ্দেশ্যে তাদের স্বার্থেও প্রতি লীডারের দরদ, সংগ্রাম ইত্যাদি নিয়ে নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা দিয়ে আবেদন জানায়–ঠিকহ্যায় ভাইলোগ, আপ আভি এযাযত দিজিয়ে হামারা লিডারনে স্ট্রাইক তোড়ে।এভাবে ভালই চলছিল।তবে শীঘ্রই সব জারিজুরি ফাঁস হয়ে গেল। ফলে সে যখন আর একদফা হাঙ্গার স্ট্রাইকে গেল এবং একই নাটক করল, তার চারপাশে মজা দেখার জন্যবেশ লোকজন জমা হয়েছিল। তার চামচারা হতদন্ত হয়ে হাতে কয়েকটা কাগজ নিয়ে ছুটে এলো– হা ভাই আপকা স্ট্রাইক বিলকুল সাকসেসফুল হুয়া, মালিকনে হামারা আসলি সব ডিমান্ড মান লিয়া আউর বাকিসব ডিমান্ড, প্রমিজ কিয়া আয়েন্দাবার জরুর মান লেগা।ম্যানেজমেন্ট আসিসট্যান্ট লেবার অফিসার সাবকো ভেজা, উনহে আপকো সবকুছ বাতায়গা।অতঃপর চিরাচরিত পদ্ধতিতে সে যখন শ্রমিকদের কাছে লীডারের অনশন ভাঙ্গার এযাযত চাইল, সবাই নিশ্চুপ। হঠাৎ একজন মুখ খুলল– আরে নেহি নেহি! কাঁহে তোড়েগা হাঙ্গার স্ট্রাইক? লীডারনে স্ট্রাইক কিয়া তব তো কুছ মিলা, স্ট্রাইক চলনেছে বাকি ডিমান্ড জরুর ভি মিল জায়েগা। আজিমুল্লা ভাইয়া, আপ লাগেরহ, স্ট্রাইক মৎ ছোড়ো, হামলোগ তোমহারা সাথ হ্যায়। কয়েকজন সাথে সাথে সমর্থন জোগাল– হা হা সহি বাৎ, স্ট্রাইক মৎ তোড়ো ভাইয়া।

পান্ডা চামচা প্রমাদ গেনে। তবে এরা খুব ধুরন্ধর হয়, দ্রুত সামলে নিয়ে বলে– শুনলিয়া তো ভেইয়া, সব লোগোনে এযাযত দে দিয়া, আপ স্ট্রাইক তোড় দিজিয়ে। সে ইশারা করতেই অ্যাসিসটেন্ট লেবার অফিসার বড় এক গ্লাস রুহ আফজার শরবৎ আজিমুল্লার মুখে ঠেসে ধরে। মুহূর্তের মধ্যে আজিমুল্লা চোঁ চোঁ করে সেটা গলাধকরণ করে ফেলে।

মতিভাই বললেন– আমাদের প্রেসিডেন্টের হয়েছে ঐআজিমুল্লা ব্যাটার দশা! লোকজন চায়না, তবু মকারি যায়না!

প্রেসিডেন্ট আইয়ুব শেখ মুজিবকে ফাঁসি দিতে চেয়েছিলেন। তাকে যখন আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় ফাঁসানো হয় আর্মি ইনটেলিজেন্সের মে. জে. উমার নাকি বলেছিলেন এবার জনগণই তার পিঠের চামড়া তুলে নেবে। আইয়ুবের মুখে ছিল স্বস্তির ছাপ। তিনি বুঝে উঠতে পারেন নি যেআসলে নিয়তি তাকে নিয়ে বাজী ধরে বসে আছে। সুক্ষ সুতোয় বাঁধা সফোক্লিসের তরবারি ঝুলিয়ে দিয়েছে তার মাথার উপর।অচিরেই গণরোষে ভেসে গেল আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা,প্রধান বিচারপতির বাসভবনভস্মীভূত হল, তিনি পিছন দরজা দিয়ে পালিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানের ফ্লাইট ধরলেন। নিঃশর্তেমুক্তি পেলেন শেখ মুজিব ও অন্যান্য অভিযুক্তরা।২৩ মার্চ রেসকোর্স ময়দানের বিশাল সমাবেশে ছাত্র

সংগ্রাম পরিষদে পক্ষ থেকে সভাপতি তোফায়েল আহমদ শেখ মুজিবকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধীতে ভূষিত করে বাংলার জনগনের স্বার্থের প্রতি তার অবিচল বিশ্বস্ততা ও নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রামের স্বীকৃতি জানালেন। তার / আইয়ুবের বেতার ভাষণ- ২১/২-আমি পরবর্তী নির্বাচনে প্রতিদন্ধিতা করছিনা্ এটা চূড়ান্তএবং এই ঘোষণা দ্বারা সব শংসয়ের, সন্দেহ অবিশ্বাসের অবসান

দেশের উভয়াংশ জুড়ে গণ আন্দোলনের মুখে আইয়ুবের মসনদ তখন একেবারে নড়বড়ে হয়ে গেছে। তবে আইয়ুবের পতন, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি কয়েকটি সাধারণ ইসু বাদে পশ্চিম পাকিস্তানের আন্দোলন একেবারেই ভিন্নধর্মী ছিল। সেখানকার আন্দোলনের মূল উপজীব্য ছিল তাসখন্দ শান্তিচুক্তি এবং ৬-দফার বিরোধীতা। দেশের উভয়াংশের মধ্যে চাহিদার এই এপোল-ওপোল পার্থক্য খুবই সিম্বলিক ছিল।দিনে দিনে আইয়ুবের সময় কাছিয়ে আসছিল, তথাপি তিনি হাল ছাড়েন নি। রাওয়ালপিন্ডিতে দেশেরবিভিন্ন রাজনৈতিক দলের গোলটেবিল বৈঠক আহ্বানকরে তিনি মসনদ টিকিয়ে রাখার প্রচেষ্টা নিলেন। ভাসানী ন্যাপ ও ভুট্টোর পিপলস পার্টি বৈঠক বর্জন করলেও শেখ মুজিব সম্মত হলেন। তিনি চেয়েছিলেন বৈঠকে যোগ দিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানি নেতৃবৃন্দের সামনে ৬-দফা ও ১১-দফা প্রস্তাব ব্যাখ্যা করার সুযোগ নেবেন। তারাপুরোপুরি না জেনেই প্রেসিডেন্টআইয়ুব, পিপলস পার্টির ভুট্টো এবং জামাতে ইসলামীর মওলানা মওদুদীরএকপেশে প্রচারণার কারণে৬-দফা সম্পর্কে বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন।

আইয়ুব খান দুরাশা করেছিলেন শেখমুজিবকে হয়তো বা ৬-দফার ব্যাপারে কিছুটা নমনীয় করতে পারবেন এবং এই সাফল্য দেখিয়েপশ্চিম পাকিস্তানিদেরকে সপক্ষেনিতে সক্ষম হবেন যা তার মসনদকে এযাত্রা বাঁচিয়ে দিতে পারে।ফলে কদিন আগে যাকে ফাঁসিতে ঝোলানোর ব্যবস্থা চুড়ান্তকরেছিলেন তাকেইআবার একান্ত ডিনারে আমন্ত্রণ জানালেন। কিন্তু ৬-দফার প্রশ্নে শেখ মুজিব ছিলেন অনড়। তাকে নমনীয়করতে ব্যর্থ হয়ে আইয়ুব খাননিরূপায় হয়েক্ষমতা ছাড়ার সিদ্ধান্ত নেন।তবে ক্ষমতা গ্রহণের জন্য তিনি গ্রীন সিগন্যাল দিলেন স্বগোত্রীয় জেনারেল ইয়হিয়া খানকে।২৫ মার্চ রাতে বেতার ভাষণে তিনি বলেন- উন্মত্ত জনতা দেশের প্রশাসন দখল করেছে, তারা দেশকে ধ্বংসের দ্বার প্রান্তে নিয়ে গেছে, তাদের নিয়ন্ত্রণ করার মত কেউ নেই। এই অবস্থা থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য সেনাবাহিনীই একমাত্র প্রতিষ্ঠান। সুতরাং তিনি সেনা প্রধানকে তার দায়িত্ব পালনের নির্দেশ দিয়েছেন। অথচ তিনি নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতা হস্তান্তরের উদ্যোগ নিতে পারতেন, কিন্তু নেন নি, কেননাতার ক্ষিণ আশা ছিল জেনারেল ইয়াহিয়া হয়তো কোন না কোন ভাবেতাকে ক্ষমতার শীর্ষে রেখেও দিতে পারেন। কিন্তু ইয়াহিয়া সোজাসুজি দরজা দেখিয়ে দিলেন।

আন্ডার গ্রাউন্ডের চার নেতা হুলিয়া মুক্ত হলেন

মাথার উপর হুলিয়া নিয়ে দীর্ঘ আত্মগোপনে থেকে চার কমুনিষ্ট নেতা নিজেদের নাম অনেকটাই লিজিন্ডি পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। আয়ুব তাদের ছেড়ে দিলেন। প্রকাশ্যে এসে আব্দুল হক ও তোয়াহা ৬-দফার বিরুদ্ধে প্রচারে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন, কিন্তু আয়ুবকে হতাশ করে মোজাফফর আহমদ ও মহিউদ্দিন ৬-দফার ব্যাপারে নিরব থাকলেন। হক তোয়াহায় বিরুদ্ধাচার ভাসানী ন্যাপের অনুরূপ ছিল।

মওলানা ভাসানী অবিভক্ত ভারতে আসাম প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতি ছিলেন। মনে প্রাণে মুসলমান ছিলেন, অন্যায় ও অবিচারের শোষণ নিস্পেষণের বিরুদ্ধে ছিলেন। তার কৃষক আন্দোলনের কারণে আসামের অতি নাজুক মুসলিম লীগ কোয়ালিশন মন্ত্রী সভার পতন ঘটাতেও কসুর করেন নি। পাকিস্তানে মুসলিম লীগের দুঃশাসনে বিরক্ত হয়ে আওয়ামী লীগ গঠন করেন। পরবর্তীতে আমেরিকার সাথে সামরিক গাটছাড়া বাঁধার প্রতিবাদে আওয়ামী লীগ ছেড়ে ন্যাপনাল আওয়ামী পার্টি গড়ে তোলেন। আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে আমেরিকার আগ্রাসী ভূমিকার কঠোর সমালোচক, নিরপেক্ষ ব্লক ও কমুনিষ্ট ব্লকের প্রতি খুবই সহানুভূতিশীল ছিলেন। কমুনিষ্ট পার্টি নিষিদ্ধ থাকায় আন্দোলনের নেতাকর্মীরা তার দলের ছত্রছায়ায় থেকে কাজ করতেন। ফলে তার পার্টি দুই বিশ্ব কমুনিষ্ট ধারায় বিভক্ত হয়ে যায়। তথাপি তার নেতৃত্বাধীন চীনপন্থী ন্যাপ শক্তিশালী সংগঠন ছিল, একগুচ্ছ ত্যাগী কর্মী ছিল। কিন্তু কমুনিস্ট আন্দোলনের লাইন নিয়ে পার্টি কর্মীরা একের পর এক বিভক্ত হতে থাকলে তিনি উপলব্ধি করেন এটা কোন একক পার্টি নয় এবং পার্টির নিয়ন্ত্রণও তার হাতে নেই। চোখের সামনে বিশাল পার্টিতে ছত্রাখান হয়ে যেতে দেখে তিনি 'ভোটের আগে ভাত চাই' শ্লোগান দিয়ে '৭০-এর যুগান্তকারী নির্বাচন থেকে সরে আসেন। ভাসানী ব্যক্তিগত ভাবে বিপুল জনপ্রিয়তার অধিকারী ছিলেন। লুঙ্গি পাঞ্জাবী সাথে মাথায় চিকন তালের শলায় বোনা টুপি পরতেন। পীরের ভক্তি পেতেন, অসংখ্য মুরিদও ছিল। তারা হুজুরের তেল পানি পড়ার প্রত্যাশায় তেল ও পানি ভর্তি মুখ খোলা বোতল নিয়ে দু'ধারে সারি দিয়ে বসত, তিনি মাঝ দিয়ে হেঁটে যাওয়ার পথে অনাবরত ফু দিতে দিতে যেতেন।

একবার পানি পড়া নিয়ে ঘরে ফেরার পথে এক ভক্তের মনেহল, তার বোতলে হুজুরের ফু পড়েনি। সে নদীতে বোতল উপুড় করে আবার নতুন পানি ভরে নিয়ে ফিরে এলো। হুজুর বললেন, নদীতে যেখানে বোতল উপুড় করেছিস সেখান থেকে বোতল ভরে নিয়ে বাড়ি যা। বিশ্বাস রাখিস কাজ হবে।

একজন কমরেড এতক্ষণ মিটি মিটি হাসছিলেন, লোকটা চলে গেলে বললেন– হুজুর আপনার কি বিশ্বাস, এতে কাজ হবে?

– কি জানি বাপু। তোমাগো মত তাগো পয়সা কড়ি নাই যে ডাক্তার দেখাবে। অসুখ-বিসুখ এমনিতেই সারে। ভক্তি বিশ্বাস থাকলে তাড়াতাড়ি সারে। তবে তোমাগোটা যে সারবে না তা হলপ করে কইতে পারি।

বিরোধী রাজনৈতিক মহলে ভাসানী সম্পর্কে প্রচলিত ধারণা তার কথা এবং কাজ স্ববিরোধী, একজন এজিটেটর এবং ক্ষমতা ও দায়িত্ব গ্রহণে অসমর্থ। তিনি স্ববিরোধী বটে। তাকে সংগ্রামী নেতা বলা হয়। তিনি ঘেরাও এবং জ্বালাও পোড়াও আন্দোলনের উদগাতা, যা '৬৯ এর গণআন্দোলনে যথেষ্ট প্রভাব ফেলেছিল। তবে এই আন্দোলনের নেতৃত্ব এবং কৃতিত্ব কোনটাই তিনি নিজের দিকে টানতে পারেন নি। শেখ মুজিব তখন আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা এবং ফাঁসির আশংকা কাঁধে নিয়ে জেলে বন্দি, গোটা আন্দোলন ধাবিত হল তার মুক্তি এবং তার ৬-দফা, ১১-দফা দাবীর পক্ষে।

ভাসানীর জনপ্রিয়তা ছিল তুঙ্গে। কমুনিষ্ট ছিলেন না, মানবিক ছিলেন। মেহনতি মানুষের পক্ষে কথা বলার সুবাদে বামকর্মীদের উপর আস্থা রাখতেন। বামকর্মীরা তাকে দেখতেন লক্ষ্য অর্জনের অবলম্বন হিসাবে। বিরুদ্ধবাদীদের প্রচার ছিল মওলানা ভাবেন তিনি বামদের, এবং বামরা ভাবতেন তারা মওলানাকে ব্যবহার করছেন। শেষ পর্যন্ত কোনটাই ঘটেনি।

বামদের আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গি এশিয়া, আফ্রিকা, ল্যাটিন আমেরিকার কথা যতটা ভাবতেন নিজেদের বেজটার কথা ততটা ভাবতেন না। বৃদ্ধ ভাসানী দেখলেন সংগ্রামী যৌলুস বজায় থাকছে, অথচ গায়ে আচড় লাগছে না, আদো এশিয়ার নেতারা মৌলবাদী ভাষন নিয়ে আফ্রিকা এমিয়ার নেওয়া ভাবুকগে। মজলুম জননেতা মওলানাকে আফ্রো এশিয়া ল্যাটিন আমেরিকায় মহান নেতা বানিয়ে বাংলার আকাশ বাতাস উত্তাল করে তুললেন, বাংলার মানুষের আসু সংকটের নিয়ে মোটেও ততটা বললেন না। অথচ বাংলার মানুষ খুঁজছিল বাংলার একজন নেতা। মুজিব বললেন, পাকিস্তানি কায়েমীস্বার্থবাদীদের রোষানলে পড়ে চরম নিগৃহীত হলেন, কিন্তু পিছু হটলেননা। বাংলার মানুষ বুঝল, দেশী লোকটি আমাদের।

ভাসানী না হতে পারলেন আন্তর্জাতিক নেতা, না হতে পারলেন বাংলার। মহিরুহের পতনঘটল। চোখের সামনে তার দল ছত্রাখান হয়ে গেল। চারদিকে আন্দোলন সংগ্রাম। কর্মীদের রক্ত তখন টগবগ করে ফুটছে। মহেন্দ্রখান উপস্থিত। ভোটের বাক্সে লাথি মেরে তারা সামাজিক অর্থে দিগবিদিক ছুটলেন কেউ এদিক কেউ ওদিকে, কত তত্ত্ব কত মত। তাদের নেতা তখন মওলানা ভাসানী নন, এমনকি দেশের কেউ নন, চিনের চেয়ারম্যানই তাদের চেয়ারম্যান। এতবড় রাজনৈতিক দৈন্য নিজের পায়ের উপর আস্থাহীনতা বিস্ময়কর এবং ভয়াবহরকম ক্ষতিকর। বাঙালি কাউকে নেতা হতে দেখলে আমাদের গা চিড় চিড় করে ফুটতে থাকে।

জেনারেল ইয়াহিয়ার আবির্ভাবঃ অবাধ নির্বাচনের ঘোষণা এবং এলএফও'র নিগড়

মুখে শেখ ফরিদ বগলে ইট নিয়ে জেনারেল ইয়াহিয়ার আবির্ভাব ঘটল ২৫ মার্চ, ১৯৬৯-এ। উত্তাল আন্দোলন এক লহমায় স্তব্ধ হল। তবে অন্যদের মত ইয়াহিয়াও জানতেন এই থমথমে অবস্থা ঝড়ের পূর্বাভাষ মাত্র, ভেঙ্গে পড়তে সময় নেবেনা।ক্ষমতা গ্রহণের পর তিনি দ্রুতআইয়ুবের শাসনতন্ত্র, পার্লামেন্ট, মন্ত্রীসভা, প্রাদেশিক সরকার, পশ্চিম পাকিস্তানে এক ইউনিট ও উভয় প্রদেশের সংখ্যাসাম্য বাতিল এবংনতুন শাসনতন্ত্র প্রণয়নের জন্য প্রাপ্ত বয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে অবাধ নির্বাচনের মত জনদাবীগুলো মেনে নিলেন,বললেন– অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় আমি আপনাদের জানিয়ে দিতে চাই দেশে নিয়মতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠার উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করা ছাড়া অন্য কোনো অভিলাষ আমার নেই।শুরুতে কাজেও তার পরিচয় রাখলেন, ক্ষমতা গ্রহণের ছয় মাসের মাথায় (২৮ সেপ্টেম্বর) পশ্চিম পাকিস্তানে এক ইউনিট বাতিল, ১ জানুয়ারি ১৯৭০ থেকে প্রকাশ্য রাজনৈতির অধিকার এবং এক ব্যক্তি এক ভোটের ভিত্তিতে বছরের শেষদিকেনির্বাচন অনুষ্ঠানের ঘোষণা দিলেন। একটি বিষয় অশনি সংকেতের মত তার হাতের মুঠোয় থেকে গেল।নির্বাচনের নীতিমালাঘোষণার জন্য৩১ মার্চ পর্যন্ত সময় নিলেন।

ইয়াহিয়া খান পূর্ববঙ্গের গভর্নর হিসাবে ভাইস অ্যাডমিরাল আহসান এবংপ্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হিসাবে লে. জেনারেল সাহেবজাদা ইয়াকুব খানকে বেছে নিলেন। তারা উচ্চ শিক্ষিত এবংভদ্রলোক হিসাবেসুখ্যাতছিলেন। সামরিক বাহিনীর আরো একজন উচ্চ শিক্ষিত কর্মকর্তা রাও ফরমান আলী খান সিভিল প্রশাসনের সামরিক উপদেষ্টা নিযুক্ত হলেন। তিনি '৬৫ সাল থেকে আর্মাড কোরের প্রধান হিসাবে পূর্ববঙ্গে কর্মরত ছিলেন। সেনাবাহিনীতে তাকে তাত্ত্বিক ও পূর্ব পাকিস্তান বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ভাবা হত। বহিরাবরণে তিনি নিপাট ভাল মানুষএবং সদালাপী অধ্যাপকের মতছিলেন। কেউ তখন ভাবতেও পারেনি যে তার বগলেও একটি ভয়ংকর ইট লুকানো আছে। ফলেইয়াহিয়ার সদিচ্ছা নিয়ে প্রথম দিকে কারো তেমন কোন সংশয় ছিলনা।

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া শেখ মুজিবের ৬-দফা প্রস্তাবের প্রথম দফা–একব্যক্তি একভোটের ভিত্তিতে অবাধ নির্বাচনের ঘোষণা দিয়েছিলেন। এর ফলে তিনি সেনাবাহিনীর 'বাজ' গোষ্টি এবং পাঞ্জাবী রাজনীতিবিদ, আমলা ও শিল্পপতিদের তোপের মুখে পড়েন। বাঙালিরা পাকিস্তানি

জনগোষ্টির ৫৬ শতাংশ হওয়ায় 'এক ব্যক্তি এক ভোট' এবং'জনসংখ্যা অনুপাতে প্রদেশগুলির জন্য আসন বণ্টনের ঘোষণা বাঙালিদেরনির্বাচনের মাধ্যমেদেশের শাসন ক্ষমতায় যাওয়ার সম্ভাবনা সৃষ্টি করেছিল। এটাই ছিল প্রভূত্ববাদী পাকিস্তানিদেরআক্রোশের কারণ। প্রেসিডেন্টইয়াহিয়া তাদেরকে আশ্বস্ত করলেন এই বলে যে, পূর্ব পাকিস্তান থেকে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিরা পার্লামেন্টে নির্বাচিত হয়ে আসবে, তাদের একটা বড় অংশ ৬-দফা এবং আওয়ামী লীগের ঘোর বিরোধী, আওয়ামী লীগ কখনোই সরকার গঠনে সমর্থ হবেনা।তা ছাড়া তিনি এমন কিছু আইন দ্বারা পার্লামেন্টের ক্ষমতা বেঁধে দেবেন যাতে সংবিধান অনুমোদনের ক্ষেত্রে সর্বময়কর্তৃত্বতার হাতেইথাকবে। পাকিস্তানের সংহতি, ইসলামী ধ্যান-ধারণা এবং দেশের উভয়াংশের কাছে গ্রহণযোগ্যতার বাইরে কোন শাসনতন্ত্রে তিনি সম্মতি দেবেন না। ৩১ মার্চ তিনি লীগাল ফ্রেম ওয়ার্ক আদেশ ঘোষণা করলেন। এই ঘোষণা সাথে সাথেবাঙালিদের উৎসাহে ঠাণ্ডা পানি ঢেলে দিল। পূর্ববঙ্গ জুড়ে সোরগোল উঠল এটা ইয়াহিয়ার হাতে এক ধরনের ভেটো ক্ষমতা। ফলে এলএফও'র আওতায় নির্বাচন অর্থহীন হবে। ৬-দফা ভিত্তিক শাসনতন্ত্র পার্লামেন্টে পাশ হলেও ইয়াহিয়ার কলমের খোঁচায় তা বাতিল হয়ে যাবে এবং পুনর্নির্বাচনের প্রশ্ন উঠবে।

বিষয়টা ভাসানী ন্যাপের মত আমাদেরকেও স্পর্শ করল এবং আমাদের মধ্যে ধারণা প্রবল হয়ে উঠল যে আন্দোলনকে অগ্রসর করে নেয়া ছাড়া গত্যান্তর নেই। পক্ষান্তরে ইয়াহিয়ার এলএফও জামাত মুসলিম লীগের মত ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলগুলোকে প্রভূতস্বস্তিদিল, তাদের যেটুকু বিরোধীতা তা কেবল লোক দেখানো। গোটা পশ্চিম পাকিস্তান স্বভাবতই এলএফওকে স্বাগত জানাল। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব কঠোর ভাষায় এলএফওর সমালোচনা করলেন। তবেসবাইকে বিস্মিত করে নির্বাচনে যাওয়ার ঘোষণা দিলেন। তিনি বললেন মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার ফিরিয়ে আনতে হবে এবং অবাধ নির্বাচনের মাধ্যমেই কেবল তা সম্ভব।

এলএফও প্রসঙ্গ এবং বঙ্গবন্ধু

'৭০ এর মাঝামাঝিতে নির্বাচনী প্রচারে বঙ্গবন্ধু এলেন খুলনায়। খুলনায় এলে তিনি যশোর রোডের পাশে নুরনগরে তার ছোটভাই শেখ নাসিরের বাড়িতে উঠতেন। নাসির ভাই হাসিখুশি চমৎকার মানুষ। একটা পায়ে সামান্য ত্রুটির কারণে পা টেনে টেনে হাঁটতেন। আমাদের সাথেখুবই ভাল সম্পর্ক। বাড়িটা সুপরিচিত ছিল কয়েকটা পোষা হরিণের জন্য। হরিণগুলো বাড়ির সামনে বেড়া ঘেরা প্রশস্ত আঙ্গিনায় চরে বেড়াত। তাদের মায়াবী চোখ পথচারীদের দৃষ্টি কাড়ে। ব্যস্ততা ভুলে তারা ক্ষণিকের জন্য থমকে দাঁড়ায়। একবার এক ভদ্রলোক বেড়ার ধারে এসে দাঁড়ালেন, একটা হরিণ কাছে এগিয়ে এলো। তিনি তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে থাকলেন, আঙ্গুলের ফাঁকে সিগারেট, তখনো ধরানো হয়নি। হরিণটা আপ্লুত হয়ে তার আঙ্গুলের ফাঁক থেকে সিগারেটটা টেনে নিয়ে দিব্যি গলাধকরণ করে ফেলল। ভদ্রলোক হতভম্ভ। সেই থেকে পথচারীরা অনেকেই হরিণগুলোকে সিগারেট অফার করতেন, হরিণগুলোও কৃতজ্ঞতা জানাতো মায়াবী দৃষ্টি মেলে।

আমরা ছ-সাতজন ছাত্রলীগ কর্মী বঙ্গবন্ধুর সাথে দেখা করতে গেলাম। সবাই বেশ অস্থির। আমাদের ধারণা নির্বাচনে নেমে বঙ্গবন্ধু ভুল করতে যাচ্ছেন। আমরা নাসির ভাইয়ের জনাকীর্ণ বৈঠকখানায় ঢুকে পড়লাম। তিনি বসতে বললেন। কিন্তু ঘরভর্তী মানুষ, বসার মত সামান্য জায়গাও ছিলনা। তার সাথে কথা বলা সহজ হবেনা ভেবে আমরা ইয়াহিয়ার খাঁর লিগাল ফ্রেম ওয়ার্কের (এলএফও) আওতায় নির্বাচন যে অর্থহীন এবং বিপর্যয়ের কারণ হবে সে বিষয়ে একটা আর্টিকেল লিখে নিয়ে এসেছিলাম। বললাম–ভাই আপনি খুবই ব্যস্ত, সেজন্য আমরা এই আর্টিকেলটা লিখে এনেছি, আপনি সুযোগ মত পড়ে দেখবেন। আমরা যত্ন সহকারে সংক্ষেপে দেড় পৃষ্ঠার মধ্যে আমাদের যুক্তিগুলো তুলে ধরেছিলাম যাতে তার মূল্যবান সময়ের উপর বেশি চাপ না পড়ে। সেটা তার হাতে দিলাম। উল্লেখ্য যে '৫৯ সালে কলেজে ভর্তির পর ছাত্রলীগ রাজনীতির সাথে গভীরভাবে যুক্ত থাকলেও তার সাথে এই আমার প্রথম দেখা। আমি বরাবরই রাজনীতিকদের সাথে সম্পর্ক এড়িয়ে থেকেছি। তিনি কাগজটা হাতে নিয়ে দু'এক মিনিট চোখের সামনে ধরে রাখলেন, তারপর যত্নের সাথে রোল করে আমার হাতে ফিরিয়ে দিয়ে বললেন তোদের কাছে রেখে দে, নির্বাচনের পর খুলে পড়িস।

বললাম মুজিব আই, ইয়াহিয়া খান অদ্ভুত সব শর্তযুক্ত 'লিগাল ফেম ওয়ার্ক' ঘোষণা করেছেন। এলএফও'র নানা শর্তের বেড়াজালে জড়িয়ে নির্বাচনে জিতেও সদস্যরা স্বাধীনভাবে শাসনতন্ত্র রচনায় সমর্থ হবেন না। এদিকে নির্বাচন নিকটবর্তী। আমরা বলতে চাচ্ছি এই এলএফও'র অধীনে নির্বাচন অর্থহীন হবে, জিতলেও ৬-দফা অর্জিত হবেনা, বাঙালিদেরহাতে ক্ষমতাও আসবেনা। মধ্যেপড়ে আন্দোলনের জোয়ার থেমে যাবে। এটা খুলনা ছাত্রলীগের সর্বসম্মত অভিমত।আর্টিকেলটা আপনি একটু পড়ে দেখবেন প্লিজ।

বঙ্গবন্ধু বললেন– কি লিখেছিস চোখ বুলিয়েই বুঝেছি, ভাসানী আর তার চ্যালারা যা বলে সেগুলোই তো লিখেছিস। শোন, এখন নির্বাচনই আন্দোলন, সে আন্দোলনের জোয়ার বইছে। ক্ষমতা যে ওরা সহজে দেবেনা তা আমি জানি। কিন্তু আমরা দেখতে চাই বাংলার নেতা কে, বাংলার পক্ষে কথা বলবে কারা? নির্বাচনেরমাধ্যমেই সেটা সম্ভব। তোরা পূর্ব বাংলা থেকে আমাকে শতভাগ সিট পাইয়ে দে, লিগাল ফ্রেম ওয়ার্ক কিভাবে গুড়িয়ে দিতে হয় আমি দেখিয়ে দেবো!

বিস্ময় বাধা মানল না, মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল– 'শতভাগ সিট! নয় মন তেল.... ।' বঙ্গবন্ধুর কঠিন দৃষ্টির সামনে থমকে গেলাম। অসম্ভব রেগে গিয়েছিলেন, বললেন–তোরা আমার চেয়ে রাজনীতি বেশি বুঝিস? আমার চেয়ে বাংলার মানুষকে বেশি চিনিস? তোরা বাংলার কত জাগায় গিয়েছিস, আর আমি কত জাগায় গিয়েছি! যা, কাজ কর, আমার শতভাগ সিট চাই। তোদের কি ধারণা– পাবো? নাকি এখনো হাতির ক্ষুদে ক্ষুদে চোখ দিয়ে নিজেদের শক্তিটা মাপিস!

আমি কথাটা জীবনেও ভুলিনি! তিনি বুঝিয়ে দিলেন, কতটা শক্তি ধরে বাঙালি, আর বাঙালিরাই তা উপলব্ধি করেনা। আমাদের দ্বিধা তবু যায় না, শতভাগ সিট কিভাবে সম্ভব? '৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের ভূমিধ্বস বিজয় ঘটেছিল। কারণও ছিল, শেরেবাংলা ফজলুল হক, মওলানা ভাসানী এবং শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মত রাজনৈতিক দিকপালরা মিলে যুক্তফ্রন্ট গড়েছিলেন, এবার শেখ মুজিব একা। সবাই জানে পূর্ব বাংলা থেকে তিনি মেজরিটি পাবেন, তাই বলে শতভাগ!

পূর্ব বাংলায় রাজনীতিতেপোলারাইজেশন

১ জানুয়ারি, ১৯৭০ থেকে প্রকাশ্য রাজনীতির ঘোষণা দিয়েছিলেন প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান। এর আগে ডিসেম্বরে ছাত্রলীগের ঘরোয়াকর্মী সভায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বলেছিলেন আগামী নির্বাচনে বাংলাদেশের ভাগ্য নির্ধারিত হবে। বাঙালির মুক্তি সনদ ৬-দফার পক্ষে জনগণের ম্যান্ডেট চাইব আমরা।৪ জানুয়ারি ছাত্রলীগের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর বিশাল জনসভায় বঙ্গবন্ধু বলেন– পাকিস্তানের প্রথম দশকে আমরা নানা দলের নির্বাচনী ঐক্যজোট, যুক্তফ্রন্ট এবং একের পর এক কোয়ালিশন সরকারের পরিণতি দেখেছি। আমাদের অভিজ্ঞতা থেকে আমরা আর রাজনৈতিক দলের ঐক্যে বিশ্বাসী নই, আমরা জনগণের ঐক্যে বিশ্বাসী। ৬-দফা বাঙালির মুক্তি সনদ, আমরা ৬-দফার পক্ষে জনগণের ম্যান্ডেট চাই।

তার বক্তব্যে আমরা যেমন আশংকা দেখছিলাম, তেমন বিপুল সম্ভাবনাও দেখতে পাচ্ছিলাম। গত চার বছরের অভিজ্ঞতা থেকে আমরা বুঝেছি ৬-দফার প্রশ্নে আপোষ করাহলে স্বায়ত্ত্বশাসনের দাবী যেমন অর্থহীন হয়ে যাবে, তেমনি ৬-দফা নিয়ে আপোষ না করলে কোন রাজনৈতিক দল আমাদের সাথে আসবে না। এক কঠিন পরিস্থিতি মধ্যে আমাদের একলাই চলতে হবে এবং সেটা বিশাল দায়িত্ব।

নির্বাচন যত এগিয়ে আসছিল,আমরা ততই আশান্বিত হয়ে উঠছিলাম। জনগণের মধ্যে পোলারাইজেশন সুস্পষ্ট হয়ে উঠছিল। সমাজতান্ত্রিক আদর্শ ও বাঙালি জাতীয়তাবোধ প্রায় পরস্পর বিরোধী হলেও মূলত এ দুটি কারণে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের এক বিরাট অংশন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি বা ন্যাপের অনুরক্ত ছিল। বলা বাহুল্য, ন্যাপ প্রথমদিকে এজাতীয় প্রচারে অভ্যস্ত ছিল। কিন্তু ন্যাপের ক্রমাগত বিভক্তি এবং মওলানা ভাসানীর ইসলামী সমাজতন্ত্র জাতীয় বক্তব্য তাদের হতাশ করে। পক্ষান্তরে আওয়ামী লীগের ৬-দফা কর্মসূচীর মধ্যে তারা তাদের চিন্তা চেতনার প্রতিফলন দেখতে পায়।হিন্দু সমাজের এই পরিবর্তন সত্তরের নির্বচনপূর্বকালে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে, বিশেষ করে যখন সেপ্টেম্বরের শেষে শারদীয় দুর্গাপূজার বিজয়াদশমীতে ভৈরব নদের কূল অগনিত মানুষের ৬-দফা, ১১-দফা, জয়বাংলা এবং শেখ মুজিব- শেখ মুজিব ধ্বনিতে মুখর হয়ে ওঠে।

পোলারাইজেশনের আর একটি উল্লেখযোগ্য পক্ষ ছিল '৪৭-এর দেশভাগের পর মাতৃভূমি বিহার ছেড়ে আসা ভাগ্যাহত বিহারী মুসলিম সম্প্রদায়।বিহারের রুক্ষ পরিবেশ, বেঁচে থাকার জন্য কঠিন সংগ্রাম প্রকৃতিগতভাবে তাদেরকে রুক্ষ করেছিল। তার উপর ছিল '৪৬ ও '৪৭-এর ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার দুঃসহ ক্ষত ও প্রভাব। '৪৭-এর দেশভাগের পর এই বিহারী কমুনিটি পূর্ববঙ্গে চলে আসে। দুর্ভাগ্যক্রমে এরা ছিল নেতৃত্বশূন্য। তাদের শিক্ষিত ধনী ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীসিন্ধু প্রদেশেআশ্রয় নিয়েছিল। ফলে সর্দার শ্রেণীর অশিক্ষিত এবং অসম্ভব টাফ কিছু লোক পেশী শক্তিবলেপূর্ববঙ্গে আগত বিহারীদের প্রত্যক্ষ নেতৃত্বে চলে আসে। মুসলিম লীগ সরকার বিশেষ উদ্দেশ্যে তাদেরকে অন্ধ কুপের মত কিছু কিছু কলোনিতে নিয়ে জড় করে। এই ব্যবস্থা শেষপর্যন্ত তাদেরকে স্বার্থগৃধ্ধু মুসীলম লীগ, জামাত, অবাঙ্গালী শিল্পপতি এবং আর্মির ক্রীড়ানকে পরিণত করে।সব মিলিয়ে এমন এক জগাখিচুড়ি অবস্থা সৃষ্টি হয় যা তাদেরকে জীবন সম্পর্কেসম্ভবত অনেকটাই নিস্পৃহ ও হতাশ করে তুলেছিল।

বিহারে'৪৬-এর ভয়াবহ দাঙ্গার পর অভিভক্ত বাংলার প্রধানমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী উদ্বাস্তু বিহারীদের পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় দেন। তিনি নিজেও ছিলেন উর্দুভাষী বাঙালি। স্বভাবতই বিহারীরা শহীদ সোহরাওয়ার্দীর ভক্ত ছিল। পূর্ববঙ্গে প্রথম দিকে তাদের অনেকের মধ্যেএই সমর্থন অব্যাহত ছিল। তবে তাদের শেষ পছন্দ ছিল মুসলিম লীগ, ইসলাম ও পাকিস্তান। এই তিনটি তাদের কাছে সমার্থক ছিল।তাদের মধ্যে রাজনীতি সচেতনতা খুবই নিম্ন পর্যায়েরছিল এবং মূলত হিন্দু ও ভারত বিদ্বেষের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। পরবর্তীতে এই বিদ্বেষ মুসলিম লীগ ও জামাত বিরোধী বাঙালি মুসলমান পর্যন্ত প্রসারিত হয়। মুসলিম লীগ ও জামাতের প্ররোচনায় তারা বাঙালিদের যে কোন আন্দোলনকে সন্দেহের চোখে দেখতো এবং তার বিরুদ্ধে সরকার, সরকারি দল ও পাকিস্তানি পুঁজিপতিদেরলাঠিয়াল হিসাবে কাজ করত। বাঙালির মুক্তি

সনদ ৬-দফা ভিত্তিকআন্দোলন তীব্রআকার ধারণ করলে পাকিস্তানের প্রতি তাদের আনুগত্য প্রায় ধর্মযুদ্ধের মানসিকতায় উপণীতহয়। স্বভাবতই '৭০-এর নির্বাচনে তারা মুসলিম লীগ ও পাকিস্তান পন্থী দলগুলির পক্ষে শক্ত অবস্থান নেয়।

বিহারীদের সম্পর্কে আমার কিছু অভিজ্ঞতা আছে, দুর্ভাগ্যক্রমে তাতেতিক্ততার আধিক্য। ছেলেবেলা থেকে আমি বিহারি ছেলেদের নিগ্রহ সহ্য করে এসেছি। আমরা তখন ফেরিঘাট রোডের এক দোতালা বাড়িতে থাকি। উপরের একমাত্র কামরায় বাবা মা থাকেন। নিচে দাদী এবং মেজ মামার সাথে আমরা। উত্তরে প্রায় তিনশ গজ দূরে ফেরিঘাটের বিহারী কলোনির শুরু। আমার বয়সী বিহারী ছেলেরা ক্ষীণকায় কিন্তু রুক্ষ এবং দুর্দান্ত। আমি তাদের কোপদৃষ্টিতে পড়ে গিয়েছিলাম, কেননা আমার কাছে বেশ কিছু কাঁচ ও সাদা পাথরের মার্বেল, লাট্টু, ঘুড়ি এবং তাস (সিগারেটের খালি প্যাকেট) ছিল। ওরা দুর্ধর্ষ বর্গীর মত হানা দিয়ে আমার হাতে যা পেত ছিনিয়ে নিয়ে ঝড়ের বেগে উধাও হয়ে যেত। আমি প্রথমদিকে একবার সাহস করে ওদের ধাওয়া করেছিলাম। দুর্ভাগ্যক্রমে শিরিষনগর গেট পর্যন্ত যেয়ে ওদের বুহ্যের মধ্যে পড়ে মুখে এবং তলপেটে তিন চারটে শক্ত পাঞ্চ খেয়ে ছুটে বাড়িতে এসে নীরবে অশ্রুপাত করেছিলাম। জিনিসপত্র হারানোর চেয়ে মার খাওয়ার কষ্ট এবং অপমান অসহ্য ছিল। তথাপি একই উদ্বাস্তু জীবনের কারণে আমরা তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলাম।

তাদের উদ্বাস্তু জীবনের কষ্ট আমাদের চেয়েও অনেক বেশি হতাশাব্যাঞ্জক ছিল এবং পাশাপাশি আমার অভিজ্ঞতা আমাকে তাদের সম্পর্কে দোটানায় ফেলেছিল। যাহোক আমি সব সময় তাদের বসতি এলাকার মধ্য দিয়ে যাওয়া ফেরিঘাট রোড এড়িয়ে চলতাম। অথচ বড় হয়ে আমি যখন জীবীকার তাগিদে জুট মিলে চাকরি নিলাম আমাকে প্রায় চার বছর ফেরিঘাট রোড এবং খালিশপুরের মত দু-দুটো বিহারী কলোনি মধ্য দিয়ে সাইকেলে এবং পরবর্তী প্রায় তেত্রিশ বছর অফিসের গাড়িতে যাতায়াত করতে হয়েছে। কর্মস্থলে, বিস্ময়ের সাথে আমার চারপাশে তাদেরই দেখতে পেলাম–পিওন থেকে শুরু করে সর্বোচ্চ বস পর্যন্ত প্রায় সবাই বিহারী। বসদের অধিকাংশই ছিল গুজরাটী,ইউপি এবং পাঞ্জাবী লোকজন। তারা স্বচ্ছন্দে উর্দু বলত এবং আমাদের প্রতি তাদের ব্যবহার বিহারীদের থেকে ভিন্নতর ছিলনা। আমরা অজ্ঞতাবশে এবং আচরণগত কারণেতাদের সকলকে একই গোত্রভুক্ত ধরে নিয়েছিলাম।

'৪৬-এর দাঙ্গার পর বিহার থেকে পশ্চিমবঙ্গে হটে আসা এবং '৪৭-এর দেশভাগের পর বিহার ও পশ্চিম বাংলা থেকে উদ্বাস্তু হয়ে আসা বিহারীদের ঢল নামে পুর্ব বাংলায়। এদের এক বড় অংশ ট্রেনযোগে খুলনায় এসে বিক্ষিপ্ত ভাবে ছড়িয়ে পড়ে। ধীরে ধীরে এদের খুলনার কয়েকটি নির্দিষ্ট স্থানে সঙ্গবদ্ধ করা হয়। এসব পকেটের মধ্যে খালিশপুর ও ফেরিঘাট ছিল অন্যতম। এই বিহারী কমুনিটি নেতৃত্বশূন্য ছিল। খালিশপুরে কয়েকটা জুটমিল, পেপার মিল, পাওয়ার স্টেশন, অয়েল ডিপো ইত্যাদি চালু হওয়ার সাথে সাথে সরকারী উদ্যোগে খালিশপুরেনতুন উপশহর গড়ে উঠেছিল। উত্তরাংশে পশ্চিম বাংলার বাঙালি এবং দক্ষিণাংশে বিহারের উদ্বাস্তুদের কলোনি। তবে উত্তরাংশে সম্ভ্রান্ত কিছু বিহারী এবংক্যালকেশিয়ান নামে পরিচিত উর্দুভাষী বাঙালিও ছিল। এখানে দ্বিতল, ত্রিতল কয়েকটি বাড়ি নির্মিত হয়, উন্মুক্ত কিছু প্লটও রাখা হয় শিক্ষিত মধ্যবিত্তদের জন্য। একটি প্রশস্ত রাস্তা, কৃত্রিম খাল, অয়ারলেস অফিস, টাওয়ার ইত্যাদি দুই এলাকাকে নামকাওয়াস্তে বিভক্ত করেছিল। তবে মানসিকভাবে এলাকা দুটিপরস্পরের সাথেসম্পর্কহীন ছিল এবং উভয় অংশের ভাষা সংস্কৃতি এবং জীবনযাত্রার মধ্যে যোজন দূরত্ব বিদ্যমান ছিল।

বিহারীরা ছিল অসম্ভব পরিশ্রমী। খালিশপুর শিল্প এলাকার শিল্প শ্রমিক বলতে যাদের বোঝায় বিহারীরা ছিল প্রকৃতপক্ষে তাই। তাদের জন্ম মৃত্যু বেড়ে ওঠা আবর্তিত হত খালিশপুর উপ-শহর ও শিল্প এলাকাকে কেন্দ্র করে। গ্রামে বা দূরে তাদের দ্বিতীয় কোন ঘর-বাড়ি, আত্মীয়-স্বজন ছিল না, পাল পার্বনে বাড়ি যাওয়াও প্রয়োজন ছিল না। তাদের চাহিদা ছিল খুবই সীমিত, যা শিল্প মালিকদের কাছে পছন্দনীয় ছিল।

গোষ্টিগতভাবে বিহারীদের অবস্থা হয়েছিল কুয়ার ব্যাঙের মত। প্রকৃত নেতৃত্বশূন্য এই বিহারীদেরকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে '৪৭-এর ১৪ আগস্টে আঁটকে ফেলা হয়েছিল এবং চিন্তা চেতনার দিক থেকে প্রতিবন্ধী করে দেয়া হয়েছিল। অবস্থা এমন ছিল যে '৪৭-এর ১৪ আগস্টর পর তাদের মানসিক বয়সবৃদ্ধিএকেবারেই থমকে গিয়েছির। এভাবে পকেটের মধ্যে ফেলে রাখার ফলে পূর্ব বাংলার বৃহৎ জনগোষ্ঠীর সাথে তারা কখনো মেশেনি। তাদের চৌহদ্দির ওপাশে যে বাঙালি পরিবার বসবাস করে তার সাথে কথা বলেনি। তারা কদাচ বাংলা ভাষা ব্যবহার করতো। এমনকি অফিসের পিওন যে বহু বাঙালি কর্মচারীর মধ্যে সারা দিন কাটিয়েছে, সেও এক দুর্জ্ঞেয় কারণে কখনো বাংলায় কথা বলেনি।ধীরে ধীরে এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে এভাবে তাদের বিচ্ছিন্ন করে রাখা সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা প্রসুত ছিল। পরবর্তীতে শ্রমিক আন্দোলন এবং জাতীয় যে কোন আন্দোলনে এরা ছিল মুসলিম লীগ, জামাত, পশ্চিম পাকিস্তানি মালিক, সরকার ও চড়ান্ত পর্যায়ে সামরিক জান্তার বিশ্বস্ত লেঠেল, যার চূড়ান্ত প্রকাশ ও পরিসমাপ্তি ঘটে একাত্তরে বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধে।তারা এদের আনুগত্য ও নিষ্ঠুর শক্তিকে নিজেদের সংকীর্ণ স্বার্থে ব্যবহার করেছিল এবং সবশেষে উচ্ছিষ্টের মত এদের পরিত্যাগ করেছিল।

ছেলেবেলায় এবং চাকরি জীবনেরঅধিকাংশ সময় আমাকেভয়ে ভয়েএই বিহারী পকেট দুটো ব্যবহার করতে হয়েছে। বিহারী আতঙ্ক ছিল সর্বব্যাপী। সাধারণ বাঙালিরা আগাগোড়াই তাদের ভয় পেয়ে এসেছে।তারা অনেকেই নেপালী কুকরির মত ছোরা এবং ভোজালী ব্যবহারে সাবলীল ও সিদ্ধহস্ত ছিল।তাদের প্রতি সাধারণ বাঙালির ভয়টা কতটা গভীর ছিল একটা ঘটনা থেকে তার পরিচয় মেলে।

সম্ভবত সত্তরের অক্টোরের এক শনিবারবড় বাজারের হাট ছিল। আমি মহেন্দ্রদাশের মোড়ে গ্রাম থেকে আনা শাক সবজির দর-দাম করছি, হঠাৎই ভয়ার্তভাবে গুজব ছড়িয়ে পড়ল যে কাকামিয়ার হোটেলের সামনে বাঙালি-বিহারী রায়ট বেঁধে গেছে। বিহারীরা বাঙালিদের কাটতে কাটতে এগিয়ে আসছে। বিপরীতমুখে উন্মত্তের মত ছুটতে থাকা লোকজন এবং রিকশাওয়ালারাগুজবটা ছড়াতে ভালই অবদান রাখলো। বিহারীরা নাকি লাঠি ছোরাছুরি নিয়ে আক্রমণ চালিয়েছে। তারা এদিকে এসে পড়ল বলে!ভরা হাটে মুহূর্তে এলাহীকান্ড ঘটে গেল। হাটশুদ্ধ লোকজন সওদাপাতি ফেলে দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ক্লে রোড, কেডি ঘোষ রোড, ভৈরব স্ট্যান্ড রোড দিয়ে জান বাঁচাতে প্রাণপণে ছুটতে থাকল। তাদের দেখাদেখি সোয়ারির অপেক্ষায় স্ট্যান্ডে দাঁড়ানো রিকশাগুলোও তীর বেগে যে যেদিকে পারে ছুটতে শুরু করল। মানুষের হৈ হল্লা, রিকশার বিরামহীন ক্রিং ক্রিং শব্দ,আশেপাশের স্বর্ণ এবং বইয়ের দোকানেরটিনের সার্টারবন্ধ করারকর্ণবিদারীআওয়াজ- যেন টিনের উপর করাত চালাচ্ছে একদল অধৈর্য লোক–সব মিলেভয়ংকর ঘোলাটে পরিস্থিতির জন্ম দিল। রিকশাওয়ালাদের কমুনিটিতে পারস্পারিক সহমর্মিতা গভীর, তারা উল্টো মুখে ছুটিয়ে নিয়ে গেল সওদাপাতি করতে আসা যাত্রীসমেত রিকশাগুলোকে। আমি ফেরত যাত্রারযাত্রীবিহীন রিকশাগুলো থামানোর আকুল চেষ্টা করলাম। পালানোর ব্যস্ততায় তারা আমাকে নির্দয়ভাবে উপেক্ষা করল। অগত্যা প্রাণপণ পা চালিয়ে বাড়ির পথ ধরলাম।

আমাদের লজ্জার সীমা ছিলনা। দুটো ধর্মের ষাড়ের লড়াইয়ের মত চমৎকার দৃশ্য ফেলে আমাদের মত শত শত বীর বাঙালি লেজ গুটিয়ে ছুটে পালাচ্ছে বিহারী আতঙ্কে! খুলনা বড়বাজারে তখন মাড়োয়ারি ব্যবসায়ীদের সংখ্যা কম ছিল না। তারা ধর্মের নামে দুটো ষাড় ছেড়ে দিয়েছিল। গোটা শহর ও বাজার চষে বেড়াতো ষাড় দুটো, ফ্রি খেয়ে খেয়ে বিশাল আকৃতি ধারন করেছিল। ষাড় দুটো এক সাথে বাজারে কমই ঢুকতো, আজ কিভাবে যেন ঢুকে পড়েছে। বাজারের পশ্চিম মাথায় কাকা মিয়ার হোটেল। সেখানেমুখোমুখি হতেই শাক-সবজির ঝাঁপির উপর আধিপত্য নিয়ে বিশাল দুইষাড়ের মধ্যে মরণপন লড়াই। মুহূর্তে হোটেলের প্রবেশ পথে জিলাপির আগজ্বলন্ত কড়াই, সিঙ্গাড়ার গামলা, কাবাবের চুলা উল্টে পড়ল। মেছিয়াররা অধিকাংশই বিহারী মুসলমান। ধর্মের ষাড়ের প্রতি তাদের ভাব-ভক্তি থাকার কথা নয়, তারা তাদের ব্যবসায়িক ক্ষতি নিয়ে ক্রুদ্ধ। দ্রুত বড় বড় ডেগ ধরা বাঁশের লাঠি নিয়ে তারা আসরে নেমে পড়ল। লাঠির আস্ফলন, কণ্ঠে বিজাতীয় হুংকার–মার শালেকো মার, ষাড়ের ঠেলাঠেলি, তামাশা দেখতে জড় হওয়া লোকজনের হৈচৈ! ভিড়ের পিছনে থাকা আমজনতা মুহূর্তের মধ্যে যা বুঝার বুঝে নিল। এমতাবস্থায় একমাত্রকরণীয়-'য পরৈতি স জীবতি।'

ঘটনাটা শহরে নূন্যপক্ষে এক বর্গমাইল জুড়ে ভালই প্যানিক সৃষ্টি করেছিল। হুজুকে মেতে আমিও ক্ষিপ্রতার সাথে পৃষ্ঠপ্রদর্শনকারী জনতার ভিড়ে মিশে গিয়েছিলাম। ঘটনাটা আমি ভুলতে চেয়েছিলাম, কিন্তু কেউ কেউ দেখে ফেলেছিল।

১২ নভেম্বরের ঘূর্ণিঝড় নিরব জনতাকে ৬-দফার দিকে টেনে নিয়ে গেল

১২ নভেম্বরের ঘূর্ণিঝড় ছিল বাঙালি জীবনের এক মহা বিপর্যয়। ঘূর্ণিঝড় কেড়ে নিয়েছিল উপকুল-জনপদের দশ লক্ষ প্রাণ। এত ব্যাপক মৃত্যু এবং ঐ সাথে সামরিক সরকার ও পশ্চিম পাকিস্তানিদের অমার্জনীয়উপেক্ষা গোটা বাঙালি জাতিকে যেমন কাঁদালো তেমনি ভাবালো। এক নিরব মেরুকরণ ঘটে গেল বাঙালি মানসে।

নির্বাচনী প্রচার তখন তুঙ্গে, উপকূলের এক বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে ১২ নভেম্বর ভয়ংকর দুর্যোগের রাত নেমে আসে। রেডিওতে ১০ নং বিপদ সংকেত ঘোষণা আবহাওয়া কর্তৃপক্ষের কাছে যথেষ্ট উপযুক্ত মাত্রা বলে বিবেচিত হয়নি। তারা 'মহাবিপদ সংকেত' 'মহাবিপদ সংকেত' বলে ত্বারস্বরে ঘোষণা দিতে থাকলেন। সে ঘোষণা ঝড়ের ক্রুদ্ধ গর্জন ও সামুদ্রিক জলোচ্ছাসের তান্ডবে বার বার ভেঙ্গে চুরমার হতে থাকে। উপকূল থেকে শত কিলোমিটার দূরে আমাদের একমাত্র পাকা কামরা সংলগ্ন গোলপাতা ও মূলি বাঁশের ছোট ছোট চারটে কামরা দেখতে দেখতে ধূলিস্যাৎ হয়ে যায়। আমরা সবাই সে রাতপাকা ঘরটিতে জড় সড় হয়ে আমার সনি রেডিওটা ঘিরে প্রায় বিনিদ্র রাত কাটিয়েছি।

বনেদী ঐতিহ্যের কারণে আমাদের পরিবার ছিল রক্ষণশীল। তবে উদ্বাস্তু জীবনের কঠিন দিনগুলোতে আমরাঅযৌক্তিক গোড়ামির দেয়াল ভেঙ্গে বেরিয়ে আসতে সচেষ্ট ছিলাম।তথাপি দাদী বললেন, এ হল আল্লার গজব, আমাদের কোনো মহাপাপের কারণে এই গজব নেমে এসেছে। কোরাণ শরিফে আছে পাপের কারণে আল্লার গজবে পড়ে সামুদ জাতি, সডোম এবং আরো অনেক শহর পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। তোরা আরো জোরে কলেমা পড়।

বললাম–দাদী, আল্লাহর গজব ঠিকই, তবে ভৌগলিক কারণে এগুলো ঘটে, মানুষের পাপ-পূণ্যের সাথে তেমন সম্পর্ক আছে বলে মনে হয়না। পৃথিবীতে যত্রতত্র আরো বড় বড় পাপের ঘটনা আকছার ঘটছে, সেখানে তেমন গজবের কথা শুনিনা। তা ছাড়া গজবে নিরীহ এবং ছোট ছোট পাপীরাই ভোগে বেশি।

দাদী থামিয়ে দিলেন– চুপ কর, রেডিও শুনতে দে।

প্রসঙ্গক্রমে, ঊনসত্তর সালে আমি যখন লুকিয়ে চুরিয়ে সনি ট্রানজিস্টর রেডিও কিনি, পারিবারিক রক্ষণশীলতার প্রথম দিকে সেটা আমাকে সেরে রাখতে হত। যখন ধীরে ধীরে প্রকাশ পেল, দাদী বললেন শয়তানের বাক্স, বাড়ি থেকে ফেরশেতা বিদায় হল। সেকালে দাদীর মত অনেকেরই বিশ্বাস ছিল অতটুকু বাক্স, ভেতরে মানুষ ঢোকেনা, রেকর্ড ঢোকানো হয়না, অথচ মানুষের গলায় কথা হয়, গান-বাজনা হয়। শয়তানের কারসাজি ছাড়া আর কি হতে পারে!এক ভোরে অবশ্য রেডিওটা দাদীর ঘরে নিয়ে সুলোলিত কণ্ঠে পবিত্র কোরান পাঠ শুনিয়ে তাকে হতবাক করে দিয়েছিলাম। দাদী জানতেন শয়তান কোরান শরিফ পাঠ করেনা, সেই থেকে শয়তানের বাক্স বলা ছেড়ে দিয়েছিলেন।

বাবা অবশ্য তেমন বলতেন না। একসময় গ্রামোফোনে প্রচুর গান শুনতেন, সিনেমাও দেখতেন। তবে পরবর্তীতে ধর্মের দিকে ঝুঁকেছিলেন। প্রচুর ইসলামী বই পড়তেন। এসববই মধ্যযুগীয় ধর্ম গবেষণা ও বিশ্লেষণে পূর্ণ ছিল, যেখানে গান বাজনা নাটক ইত্যাদি নির্দয় আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু ছিল।বাবা বলতেন বসে বসে গান শোনা জড় জীবনের লক্ষণ। তবে তার বড় অনুযোগ ছিল তিনশ টাকা বাজেখরচ না করে আমি কেন ভাই বোনদের জন্য অতি প্রয়োজনীয় বই, ডিকশনারি, জামা-কাপড় কেনার কথা ভাবিনি! ছোট ভাই বোনরা অবশ্য রেডিও পেয়ে মহা খুশি, দুপুরে বাবার অনুপস্থিতিতে তারা গান, নাটক শুনত। বলাবাহুল্য মা-দাদীও কাজের ফাঁকে আনমনাভাবে তাতে কান পাততেন।

১১ নভেম্বর রাত থেকে অবশ্য বেচারিদুয়োরানীর দুঃখ-কালের অবসান ঘটল। দুর্যোগের পুরো সময়টা আমরা সবাই রেডিওটা ঘিরে 'মহাবিপদ সংকেত' 'মহা বিপদ সংকেত' সতর্কবার্তা শুনতে শুনতে আতঙ্কের মধ্যে প্রায় বিনিদ্র রজনী পার করলাম। বিপদ সংকেত খুব দ্রুত উচ্চগ্রমে উঠে গেল যা আমাদের বোধের অতীত ছিল। বাস্তবে আমরা দেখছিলাম পথ-ঘাট উঠান-মাঠ জলমগ্ন, সামুদ্রিক জলোচ্ছাসের আগ্রাসী জল ঘরের মেঝে ছুঁই ছুঁই করছে। মড় মড় করে ভেঙ্গে পড়ছে গাছের ডাল, গোটা গাছ উপড়ে পড়ে পথ-ঘাটে মানুষ ও রিকশা চলাচল বন্ধ করে দিয়েছে। সমুদ্র থেকে শত কিলোমিটার ভিতরে খুলনা শহরের যখন এই হাল,উপকুলের জনপদের অবস্থা তখন না জানি কি ভয়াবহ ছিল!

দেড় দিন ঝড়-জলের তান্ডবের পর এক সময় প্রকৃতি শান্ত নিস্তব্ধ হয়ে আসে। সে নিস্তব্ধতা কবরের নিস্তব্ধতা! কান্নার মত মানুষ থাকেনা, যারা থাকে তারা স্তব্ধ হয়ে যায়। সেদিন কত লোক মারা গিয়েছিল, কোন পরিসংখ্যান নেই, থাকার প্রশ্নও ওঠেনা। ফলে নানা হিসাব। কারো মতে দশ, কারো মতে পাঁচ লাখ। কোন কোন বিদেশী বিশেষজ্ঞের ধারণা দু'লাখ মাত্র। বাংলাদেশে ঘন বসতির মানবেতর জীবন যাপন অনেক বিদেশীর কাছেই অবিশ্বাস্য। একাত্তরে এক বিদেশী সাংবাদিক খালিশপুরের রেললাইন বরাবর দগ্ধীভূত কাঁচা শ্রমিক বস্তির পরিসর দেখে সম্ভবত নিজেদেরপ্রশ্বস্তবাসগৃহের বিবেচনায়একটা হিসাব কষেনিয়েছিলেন। রেডিওতে তার ভাষ্য ছিল–'বাঙালিদের গোপনে বলা ক্ষয়ক্ষতি ও উচ্ছেদের পরিমাণ অতিরঞ্জিত বলেই মনে হয়।' বলাবাহুল্য, তিনি এই শিল্প এলাকা- যেখানে স্বল্প পরিসরে পাশাপাশি রি-রোলিং মিল, নিউজপ্রিন্ট মিল, হার্ডবোর্ড মিল, পাঁচটি জুট মিল, বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র, অয়েল ডিপো, স-মিল প্রভৃতি অবস্থিত ছিল, সেখানকার আগেকার চিত্র দেখেন নি। রেল লাইন ও ইপিআডিসি রোড বরাবর দুপাশের ঘিঞ্জি বস্তিগুলো দেখেননি। দেখেননি গায়ে গায়ে লাগানো আট ফুট বাই দশফুট কাঁচা ঘর ও সংলগ্ন একফালি বারান্দায় গড়ে চারজন লোক বসবাস করে। নিজেদের অত্যাধুনিক ও স্বচ্ছল আর্থ সামাজিক অবস্থানের কারণে 'পূর্ব পাকিস্তান' নামে কথিত একটি কলোনিরবাস্তব দুর্দশা তাদের মাথায় না আসাই স্বাভাবিক।তাদের বোধে আসা কঠিন যে, সামুদ্রিক জলোচ্ছাসের বিশাল বিশাল ঢেউ আছড়ে পড়ে গ্রামের কাঁচামাটিরঘরবাড়ি উপড়েদিয়েছে, পরমুহূর্তে ফিরতি ঢেউয়ের তীব্র টানে সমুদ্রে ভেসে গেছে ভাঙ্গা ঘর, মানুষজন, গবাদি পশু, গাছপালা। নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে শত শত জনপদ। এখানে দুই লাখের কথা বলা মৃতের সাথে পরিহাস মাত্র।

কাগজের পৃষ্ঠাগুলো তখন ভরে থাকতো ঝড়-জলোচ্ছাসের তান্ডবের ছবিতে, সংবাদে। লোমহর্ষক ছবি, হৃদয়স্পর্শী কাহিনীর কোন শেষ নেই। লাশ ছড়িয়ে আছে থিকথিকে কাদায় মাখামাখি হয়ে, ডোবায় খালে-বিলে নদীতে পাশাপাশি কোথাওবা জড়াজড়ি করে মন্থর টেউএ ভাসছে মানুষ পশুও সরিসৃপের লাশ। একই রশিতে বাঁধা মা ও চার শিশু সন্তানের লাশ সে সময় গোটা জাতিকে হাউমাউ করে কাঁদিয়ে ছেড়েছিল। মা ছাড়া কে পারে এভাবে সন্তানের জন্য জীবন উৎসর্গ করতে! কোথাও গ্রামের চিহ্ন নেই। কেবল ঘরের পোতার অবশেষ, ভাঙ্গা কাত হওয়া খুটি জানিয়ে দিচ্ছে একদা এাখানে জনপদ ছিল। ভেঙ্গে উপড়ে পড়ে আছে গাছপালা।পথ, ভেড়িপথ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। পরিস্থিতি মেরুকরণ এবংনির্বাচনেরকাজ এগিয়ে নিল নিজস্ব ধারায়।

ঝড়-জলোচ্ছাসের তান্ডবের পর মওলানা ভাসানী সক্রোধে উচ্চারণ করেছিলেন–'ওরা কেউ আসেনি'। মুসলিম ভ্রাতৃত্ব এবং এক দেশ এক জাতির ধুয়া তুলে যারা দু'যুগ ক্ষমতার মসনদে মৌরসী পাট্টা গেড়ে বসেছিল সেই পশ্চিম পাকিস্তানি সামরিক জান্তা, আমলা ও রাজনীতিবিদ- তারা কেউই বাঙালিদের করুণ দশা দেখতে আসেনি। সাহায্য সহযোগিতা দূরেথাক, সহানুভূতি জানাতেও কেউ আসেনি।খুব কাছাকাছি সময়ে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়াখান চীন থেকে রাওয়ালপিন্ডির পথে ঢাকা এলেন, অথচ এতবড় প্রাকৃতিক বিপর্যয় দেখে যাওয়ার তাগিদ অনুভব করলেন না। তাদের শুভাগমন ঘটে অনেক পরে। তার আগেই সমুদ্রে অজস্র ভাসমান লাশ এবং ভাঙ্গা ঘর-বাড়ির অবশেষ দেখে মানবিক কারণে বৃটিশ সৈন্যরা উপকূলে নেমে পড়ে এবং গলিতপ্রায় হাজার হাজার লাশ দাফনে প্রাণান্ত পরিশ্রম করে। এতেও পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষের ঘুম ভাঙ্গেনি, বরং বৃটিশ নেভিকে তারা অননুমোদিত প্রবেশের দায়ে অভিযুক্ত করে। বাঙালিদের মধ্যে যারা তখনও বঙ্গবন্ধুর ৬-দফা

পাকিস্তান ভেঙ্গে দেবে কি দেবে না তা নিয়ে ঘোর চিন্তাক্লিষ্ট ছিলেন, তাদের অনেকেই সেদিন ৬-দফার অপরিহার্যতার কথা ভাবতে শুরু করেন এবং পূর্ববাংলার রাজনীতি অতি দ্রুত ৬-দফাকে কেন্দ্র করে দানা বাঁধতে থাকে।

ভাসানীর দলে ভাঙ্গন

মওলানা ভাসানী লিগাল ফ্রেম ওয়ার্কের আওতায় নির্বাচনে অংশ নিয়েছিলেন। ১১ অক্টোবর তিনি দলীয় প্রার্থীদের নাম এবং রেডিও ভাষণে নির্বাচনী ইস্তাহার ঘোষণা করেন।দুর্ভাগ্যক্রমে তিনি ৬-দফা প্রস্তাবকে সিআইএ প্রণীত ফর্মুলা বলে অভিহিত করে তীব্রভাবে ৬-দফার বিরুদ্ধাচরণ করতেন। ফলে দ্রুত তার জনপ্রিয়তায় ধস নামে। সেটা ঠেকানোর জন্য তিনি আগেই 'স্বাধীনতার' দাবী জানিয়ে বসেন। তবে তার এই দাবী ছিল অসময়োচিত ওপ্রহসনমূলক–সোনারপাথরবাটি বিশেষ– 'স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তানের' দাবী। পাকিস্তানি ভূত যেন মাথা থেকে নামতেই চায়না! এউদ্ভটদাবী হালে পানি পায়নি।তার দলের জনপ্রিয়তা ঘোর সংকটের মুখে পড়ে। জনগণকে বন্যাস্রোতের মত ৬-দফার পক্ষে ধাবিত হতে দেখে তার দলেও ভাঙ্গনের সুর বেজে ওঠে। তার পার্টিতে তরুণ কর্মীদের মধ্যে পশ্চিম বাংলার নকশাল আন্দোলন এবং কমুনিস্ট চীনের চেয়ারম্যান মাও-এর অবিসংবাদিত প্রভাব আগে থেকেই মেরুকরণ তীব্র করে তুলেছিল। মওলানা ভাসানীর ছত্রছায়া ছেড়ে তারা কেউ কেউ আওয়াজ তুললেন–'ভোটের বাক্সে লাথি মারো-বাংলাদেশ স্বাধীন কর। আর একদলউদ্যমী কর্মী দেশের সর্বত্র আলকাতরা দিয়ে বিশাল বিশাল হরফে 'পার্লামেন্ট হচ্ছে শুয়ারের খোয়াড়' এবং 'শুয়ারের বাচ্চা জনগণ, থাকল তোদের নির্বাচন, আমরা চললাম সুন্দরবন' জাতীয় স্লোগান লিখেমুক্তাঞ্চলে যেয়ে সশস্ত্র শ্রেণী সংগ্রামে অবতীর্ণ হলেন। নকশালবাড়ির আদলে জনগণকে দূরে ঠেলে তারা চেয়ারম্যান মাওয়ের–'বন্দুকের নলই রাজনৈতিক ক্ষমতার উৎস' এই থিওরি চূড়ান্ত সমাধান হিসাবে বেছেনিলেন।

নকশাল আন্দোলন তখন তুঙ্গে। ছেলেরা ত্যাগ এবং আদর্শে অণুপ্রাণিত ছিলএবং শ্রেণীশত্রু নিধনের দ্বারা দেশব্যাপী ভালই প্রভাব বিস্তার করেছিল। কিন্তু তা প্রকাশ্য রাজনীতির জন্য যথেষ্ট ছিলনা। তাছাড়া চেয়ারম্যান মাওয়ের তত্ত্বের অপব্যাখ্যা করে 'শ্রেণীশত্রুর রক্তে হাত রঞ্জিত' করে সাচ্চা কমুনিস্ট হওয়ার বাসনায় উৎসাহী কর্মীরা অনেক ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করে 'হত্যাকাণ্ডের' মত ঘটনা ঘটিয়ে বসে। তবে প্রকৃত সমস্যা দেখা দেয় তখন, যখন আর্থ-সমাজবিশ্লেষণের অতিশয় তুচ্ছ তুচ্ছ মত পার্থক্যগুলো বিশাল বিশাল আদর্শিক ঝান্ডার মত উড়িয়ে তারা নিজেরাই ক্রমাগত ভাগ হতে থাকেন। যদিও তারা জানতেন রাষ্ট্রবিজ্ঞান আদৌ গনিতের মত দুই আর দুইয়ে চার হওয়ার মত সুনিশ্চিত বিজ্ঞান নয়। এখানে সমন্বয়ের সুযোগ এবং প্রয়োজনীয়তা দুইই বিদ্যমান। তথাপি ক্রমাগত পার্টি ভাগ হতে থাকল মূলত ব্যক্তি নেতৃত্বের স্বার্থে, যে নেতৃত্বগুণ ও দূরদর্শীতা তাদের কোনো নেতারই ছিলনা বলেই প্রতীয়মান হয়। তাদের প্রিয় স্লোগান ছিল 'চীনের চেয়ারম্যান আমাদের চেয়ারম্যান।'তাদের প্রায় সবারই পকেটে ছিল মাওয়ের উদ্ধৃতি লেখা ক্ষুদ্রাকায় 'লাল বই।' মাও-এর তত্ত্ব ও বক্তব্যের আলোকে নিজ দেশের পরিস্থিতি ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের জন্য তারা পশ্চিমবঙ্গের নকশাল নেতা চারু মজুমদার এবং চীনের পিকিং রিভিউ-এর মুখাপেক্ষী ছিলেন।এ এক বিস্ময়কর পরনির্ভরশীলতা ও অন্ধ অনুকরণ। এমন দেউলিয়াপনা নিয়ে জাতীয় রাজনীতিতে ভূমিজ কোন নেতাইতার কর্মীদের উপর অবিসম্বাদিত প্রভাব সৃষ্টি করতে সমর্থ হননি। তাদের লক্ষ্য অর্জন করুণভাবে ব্যর্থ হয়।

যাহোক, মওলানা ভাসানী তার চোখের সামনে তার বিশাল ও সুসংগঠিত দলের এমন ছন্নছাড়া দশা এবং ধীরে ধীরে বিলীন হয়ে যাওয়া দেখে নির্বাচনে উৎসাহ হারালেন, দাবী জানালেন–'ভোটের আগে ভাত চাই।' তাতেও হালে পানি না পেয়ে শেষ মুহূর্তে শেখ মুজিবকে সমর্থন দিয়ে নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ানোর ঘোষণা দিলেন, যদিও তখন প্রার্থী প্রত্যাহারের সময়সীমা অতিক্রান্ত হয়ে গেছে।

ইয়াহিয়ার নিরপেক্ষ নির্বাচনের ঘোষণাকে রাও ফরমানের বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখালেন

১২ নভেম্বরের ঘূর্ণিঝড় ...তারিখের নির্বাচনকে খানিকটা অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যে নিয়ে ফেলল। এমন একটা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের পর নির্বাচন যুক্তিযুক্ত কিনা সে প্রশ্ন উঠল। যাদের হালে পানি নেই তারা নির্বাচন স্থগিত করার দাবী জানালেন। বঙ্গবন্ধু বললেন কেবল উপদ্রুত এলাকার আসনগুলোর নির্বাচন সাময়িকভাবে স্থগিত রেখে অন্যান্য আসনে নির্বাচন ঘোষিত সময়েই হতে হবে, নইলে আন্দোলন। পশ্চিম পাকিস্তানও একমত, তারা নির্বাচনের জন্য মুখিয়ে আছে। ইয়াহিয়ার সামরিক বেসামরিক সকল এজেন্সীএবং দেশের প্রায় সকল রাজনৈতিক দল সুনিশ্চিত ছিল যে,পূর্ব বাংলার পঞ্চাশ-ষাট ভাগের বেশী সিট শেখ মুজিবের ঝুলিতে যাচ্ছে না, আর পশ্চিম পাকিস্তান থেকে তো একটিও না। তিনশ সিটের পার্লামেন্টে আওয়ামী লীগের সদস্য সংখ্যা বড়জোর৮০ থেকে ১০০ হলেও হতে পারে।এই শক্তি নিয়ে তাদের ৬-দফা ভিত্তিক শাসনতন্ত্রের স্বপ্ন ফানুষের মত মিলিয়ে যাবে। ইয়াহিয়ানির্বাচন অনুষ্ঠানের গ্রীন সিগন্যাল দিলেন, নতুন সময় নির্ধারণ করলেন ৭ ডিসেম্বর, ১৯৭০।

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন সামরিক সরকার রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করবে না, নির্বাচনেও না, নির্বাচন হবে নিরপেক্ষ। তবে নির্বাচন মাঠে গড়ানোর সাথে সাথে পূর্ব বাংলার গভর্নরের সামরিক উপদেষ্টা মে. জে. রাও ফরমান আলী খান তাদের ঘোষিত নীতির প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে বুনো মোষের মত নির্বাচনি এরেনায় ঢুকে পড়লেন। তারচিন্তা স্বচ্ছ ছিল না। তিনি ধরে নিয়েছিলেন পূর্ব পাকিস্তানে এই নির্বাচন হবে ইসলাম ও পাকিস্তানের সংহতি রক্ষার নিয়ামক।তার মাথায় ঢুকে গেছে শেখ মুজিব নির্বাচনে ৬-দফার পক্ষে ম্যান্ডেট চাচ্ছেন পূর্ব বাংলাকে পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য এবং তাকে অর্থ ও সমর্থন যুগিয়ে যাচ্ছেভারত। অতএব নির্বাচনে যে কোন মূল্যে এদের ঠেকাতে হবে। পাকিস্তান ও ইসলামপন্থী শিবিরের ভোট যাতে ভাগ না হয়ে যায় সে জন্য তিনি প্রতিটি আসনে আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে একক প্রার্থী দেয়ার উপর সর্বাধিক গুরুত্ব দিলেন। এ জন্য প্রয়োজন ছিল পাকিস্তান ও ইসলামপন্থী দলগুলির মধ্যে নির্বাচনী ঐক্য গড়ে দেয়া। তবে মাঠে নেমে তিনি বুঝলেন একটা অসম্ভবকঠিন কাজ হাতে নিয়েছেন– নেতারআধিক্য, দলেরআধিক্য, দলগুলির মধ্যে ভয়াবহ অনৈক্য, সিওর সাকসেস প্রার্থীরছড়াছড়ি,অর্থ সংকটঅচিরেই তাকে গোলক ধাঁধার মধ্যে নিক্ষেপ করল।

তিনি ইয়াহিয়া খানের কাছে মুসলিম লীগের আটকে থাকা কোটি কোটি টাকার ফান্ড ছেড়ে দেয়ার অনুরোধ জানালেন। আয়ুব আমলে মুসলিম লীগ ত্রিধাবিভক্ত হলে কোর্টের আদেশে এই ফান্ড ব্লক করা হয়। ইয়াহিয়া তখন বিশ্বের ও দেশবাসীর সামনে নিজ ভাবমূর্তি গড়ে তোলার জন্যউদগ্রীব, কোর্টের আদেশ অমান্য করতে চাইলেন না। তবে সামরিক ও সিভিল প্রশাসনে কর্তৃত্বের কারণে রাও ফরমানের পক্ষে অর্থ সংগ্রহ কঠিন কিছুছিলনা। তিনিপাকিস্তানের ধনাঢ্য শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের বদন্যতায় ইসলাম ও দক্ষিণপন্থী পার্টিগুলির জন্য পর্যাপ্ত অর্থ প্রবাহের ব্যবস্থা করে দিলেন।তবে এজন্য প্রশংসার বদলে প্রায় সব পার্টিইতাকে পক্ষপাতিতেরদায়ে প্রেসিডেন্টের কাছেঅভিযুক্ত করে। কেননা সংগৃহীত অর্থের সিংহভাগ তিনিতার প্রিয় দল জামাতে ইসলামীকেদিয়েছিলেন।

আওয়ামী লীগের বিজয় ঠেকাতে তার মূল পরিকল্পনা ছিল দক্ষিণপন্থী দলগুলোর মধ্যে নির্বাচনী ঐক্য গড়ে দেয়া। প্রতিটি কেন্দ্রে পাকিস্তানি ও ইসলামী আদর্শের একজন প্রার্থী থাকবে। যে দল যে কেন্দ্রে শক্তিশালী সেখানে তাদের প্রার্থী থাকবে, অন্য দলগুলি সেই একক প্রার্থীর পক্ষে একযোগে কাজ করবে। অতি সরল সলিউশন, তবে প্রার্থী বাছাইয়ের কাজে নেমেরাও ফরমান অতি দ্রুত হাঁটুসমান পাঁকে দেবে গেলেন। প্রায় সব কেন্দ্রে যোগ্য ও জনপ্রিয় নেতার ছড়াছড়ি, কেউ কাউকে ছাড় দেবেন না,একেবারেই না। রাও ফরমান শিরদাঁড়ার ব্যাথায় অসুস্থ হয়ে পড়লেন। এদিকে তার গোপন কাজ এতটাই উলঙ্গ হয়ে পড়েছিল যে বঙ্গবন্ধু নির্বাচনে সামরিক কর্তৃপক্ষের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্নতুললেন। একদিকেপক্ষপাতিত্ব এবংঅন্যদিকে নির্বাচনে অবৈধ হস্তক্ষেপের অভিযোগ– প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া স্বীয় ভাবমূর্তিরক্ষার খাতিরে রাও ফরমানের শিরদাঁড়ার ব্যাথার সমস্যাটা কাজে লাগালেন, চিকিৎসার জন্য তাকে লন্ডনে পাঠিয়ে দিলেন।

তবে রাও ফরমান দ্রুতই ফিরে এলেন, দেখলেন এক হতাশাব্যাঞ্জক চিত্র, ঐক্য প্রচেষ্টা যতটুকু এগিয়েনিয়েছিলেন, তার অবর্তমানে প্রার্থীর প্লাবনে তা খড়কুটোর মত ভেসে গেছে। শেষপর্যন্ত নিজের একান্ত বংশবদ গোলাম আজমের জামাতে ইসলামী ও মওলানা ফরিদ আহমদের নিজামে ইসলামদল দুটির মধ্যে ঐক্য গড়ে দিলেন। তখন প্রার্থীতা প্রত্যাহারের সুযোগ ছিলনা, সিদ্ধান্ত দিলেন যেখানে যে দলের প্রার্থী শক্তিশালী সেখানে তিনি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন এবং তাকে সমর্থন জানিয়ে জোটের অপর প্রার্থী নিষ্ক্রিয় হয়ে যাবেন। অচিরেই তারা তাদের মার্কা নিয়ে ধর্মের নামে এক নতুন ভেলকি দেখানোর সুযোগ আবিস্কার করলেন। নেজামে ইসলামের মার্কা ছিল বই এবং জামাতের দাড়িপাল্লা। তারা দেয়ালে দেয়ালে শ্লোগান লিখে দিলেন–'আল্লা এক হাতে কেতাব (বই) এবং আর এক হাতে মিজান (দাড়িপাল্লা) দিয়েছেন।' কোরআনের সুরা– তোমরা ন্যায় বিচার কর এবং কেতাবের দ্বারা ফায়সালা কর। শোনা যায় এই শ্লোগানটিও রাও ফরমানের কুটিল ব্রেনের উদ্ভাবন। জামাত ও নেজামে ইসলামের এমন ধর্মীয় ভাওতা শুধু এই শ্লোগানেই সীমাবদ্ধ ছিল না।

বেসামরিক প্রশাসনের হর্তকর্তা হওয়ায় রেডিও সম্প্রচারের উপর জেনারেল রাও ফরমানের নিরঙ্কুশ ক্ষমতা ছিল। উদ্দেশ্যমূলকভাবে এ সময় রেডিওতেএকটা গান প্রায়ই বাজানো হত–'পাকিস্তানের উৎস কি ভাই- হক্ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ।' জামাতে ইসলামির সভা-সমিতিতেও গানটি বাজানো হত। সাম্প্রতিক কালে গানটি লেখা হয়, লিখেছিলেন সম্ভবত কবি ফররুখ আহমদ। গানটি শ্রুতিমধুর ছিল, তবে বক্তব্য সঠিক ছিলনা। পাকিস্তান সৃষ্টির উৎস কখনোই ইসলামী বিধি-বিধান চালুর ধারনা প্রসুত ছিলনা, ভারতের বঞ্চিত পশ্চাদপদ মুসলমানদের সার্বিক স্বার্থ ও নিরাপত্তা বিধানের ধারণা প্রসূতছিল। পাকিস্তানের স্থপতি মোহম্মদ আলী জিন্না পাকিস্তান সৃষ্টির পর প্রথম ভাষণেই বিষয়টি স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন– 'ফ্রম টু ডে.....রিলিজিয়াস হ্যাজ নো বিজনেছ উইথ দ্য অ্যাফেয়ার অব দ্য স্টেট।' তবে ধর্মের নামে এত বিভ্রান্তিকর প্রচার প্রপাগান্ডা সত্ত্বেও তখন বাঙালিদের কোনভাবেই লক্ষ্য থেকে টলানো যায়নি, জামাত-নিজামে ইসলামের ভাগ্যেও সিকা ছেড়েনি।

নির্বাচন নিয়ে নানা অপপ্রচার ও ধর্মীয় ভাওতা

নভেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহ। ঝড়-জলোচ্ছাসের স্কব্ধতা শেষে আবার নির্বাচনী প্রচারণা শুরু হয়ে গিয়েছিল। স্টার জুট মিলের বেলালউদ্দিন ছিলেন ফিনিশিং স্টাফ। স্টাফ ইউনিয়নের কর্মকর্তা হওয়ার সুবাদে অফিস করা ছেড়ে দিয়েছিলেন। ইদানিং জামাতের রাজনীতির দিকেও ঝুঁকে ছিলেন। কস্টিং ইনচার্জ চঞ্চল বাবুর টেবিলের সামনের হাতলওয়ালা চেয়ারটা তার বিশেষ পছন্দের ছিল। চেয়ারটা কোণাকুণি ঘুরিয়ে জাঁকিয়ে বসে তিনি রাজনীতিতে তার সমিকরণগুলো সবাইকে বোঝাতেন। বুঝলেন রবিউল সাহেব–ভারত শেখ মুজিবের ঘাড়ে পা রেখে যেটা করতে চাচ্ছে, মাথামোটা মুজিব সেটা বুঝছে না, মাথায় ঘিলু থাকলে তবে তো বুঝবে। দাদারা টাকা দিচ্ছে, সে লাফাচ্ছে।লাফালাফির বাড়াবাড়িটা দেখেছেন।এই দেখেন না নৌকা উঠিয়েছে গেটের মাথায়, ঘরের ছাদে, গাছের মগডালে। আল্লা এসব সইবেন কেন? গতকাল জুম্মার আগে মওলানা সাহেবেরবয়ান তো শুনলেনই। এটা স্রেফ আল্লার নাফরমানি। কিস্তি থাকবে পানিতে, তা না উঠানো হল গাছের মাথায়, ঘরের ছাদে। আল্লা বললেন, দেখ তবে! তিনি পানিকে কিস্তি বরাবর উঠে যাওয়ার আদেশ দিলেন। ১২ নভেম্বরের এত যে বন্যা, জলোচ্ছ্বাস,এত মৃত্যু কি আর সাধে হয়? নেতাদের নাফরমানির জন্যই হয়।

সিমন সুব্রত সরকার, নেটিভ খৃস্টান,ছোটখাট মানুষ, কৌতুহলী হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন– তা মুসল্লীরা কি বললেন?

বলবে আবার কি! তারা তো উম্মি মানুষ, কিছুই বোঝে না। মাওলানা সাহেব চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেবার পর এখন বুঝে গেছে। এভাবে বুঝাতে পারলে বুঝলেন রবিউল সাহেব, নৌকা ফিনিশ, মগডাল থেকে ধপাস করে মাটিতে আছাড়ে পড়ে ভেঙ্গে খানখান হয়ে যাবে।

রবিউল সাহেব প্রায় মধ্যবয়সী, ধার্মিক মানুষ। অফিসের কাজের বাইরে প্রচুর ধর্মীয় বই পড়েন, বললেন–আচ্ছা বেলাল সাহেব আওয়ামী লীগ যদি এভাবে বুঝায় যে, তাদের নৌকা নূহ নবীর কিস্তির মত, এ কিস্তির উপর যারা ভরসা করবে আল্লা তাদের বাঁচাবেন, যারা করবে না তারা বানের তোড়ে ভেসে যাবে–কেমন লাগবে আপনাদের? সাথে সাথে তোচিৎকার করে বলবেন, নূহ নবীর কিস্তির সাথে আওয়ামী লীগের মামুলি নৌকার তুলনা! কতবড় মোনাফেক এরা! এ সব বলতে বলতে তো মুখে ফেনা তুলবেন, তাই না?অথচ এই যে আপনারা আপনাদের প্রতীকে ভোট দেয়ার জন্য দেয়ালে লিখেছেন–'আল্লা এক হাতে কেতাব আর এক হাতে মিজান দিয়েছেন।' জানেন নিশ্চয়ই এটা আল্লাহর কালাম(সুরা)দুটি অংশ জুড়ে বানানো। আপনারা আপনাদের নেজামে ইসলাম ও জামাতে ইসলামি পার্টির নির্বাচনী প্রতীক মামুলিবই আরদাড়িপাল্লাকে আল্লার কেতাব আর মিজান বানিয়েছেন। এটা যে কত বড় নাফরমানি বোঝেন কিছু? যান, আল্লার কাছে পানা চান, তওবা করেন আগে। আর এভাবে ইসলামের নামে যা ইচ্ছা তাই বলা বন্ধ করেন।এটা শক্ত গোনা। এটা ইসলাম সম্পর্কে মানুষের মনে ভুল ধারণা দেবে।

বেলাল সাহেব রবিউল সাহেবের মত মুসল্লিমানুষের সমর্থন না পেয়েমুখ কালো করে উঠে গেলেন। তিনি তওবা করেছিলেন কিনা অথবা পরবর্তীতে এ ধরনের মিথ্যা প্রপাগান্ডা থেকে বিরত ছিলেন কিনা তা আমার জানা নেই। ঝড় জলোচ্ছ্বাস প্রকৃতির নিয়ম।তবে নির্বাচনের দিন পর্যন্ত একে পুঁজি করে ধর্মের অপব্যাখ্যা দিয়ে আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে জামাত ও নেজামে ইসলামের কর্মীদের মিথ্যা প্রপাগ্যান্ডা কখনো বন্ধ থাকেনি।

আমি এক দুপুরে খালিশপুর থেকে রিকশায় খুলনা যাচ্ছিলাম। কিছুটা যাওয়ার পর রিকশাওয়ালা হঠাৎ বলল–ভোটের হালচাল কেমুন বুঝেন সাহেব, আপনেরা শিক্ষিত্ মানুষ কিছু তো কইবেন। আমি আলোচনার মুডে ছিলাম না, তাছাড়া সামনে পিছনে বসে কথা বলাও কঠিন, বললাম তোমরা তো ভাল বোঝো, এত দিন নিজেদের অবস্থা দেখছ, এত কথা শুনছ, যেটা ভাল মনে হয় করবে।

না সাহেব, রিকশায় বইয়ায় তো আপনেরা আমাগো ওপর তালিমের ফুলঝুরি ফুটাইতে থাকেন, তাই কইতেছিলাম আরকি।

মানে? কি বলতে চাও পরিস্কার করে বল।

শুনেন স্যার, আগের খ্যাপে এক ক্যানভাসার ভাই আমারে অনেক তালিম দিছেন–এই যে এত বড় বানটা হইল আগে কখনো এমন দ্যাখছ না শোনছ? কও অহন ক্যান হইলো? ঐ আওয়ামী লীগ পানির নৌকা ছাদে তুলছে, গাছের মাথায় তুলছে, এ তো আল্লার নাফরমানি! আল্লা সহ্য করেন নাই, তিনি নৌকা বরাবর পানি উঠায়ে দেছেন। কথায় বলেনা পাপী মরে সাত ঘর নিয়া। ঐ শ্যাখের পাপে গজব নামছে, আমরাও ডুবছি। এই শ্যাখ আবার যদি জেতে, না জানি আরো কত গজব দ্যাখতে হয়! কয়– শোন মিয়া, আমাগো সবাইরে মানুষের নাফরমানি এবং আল্লার কঠিন স্বাস্তির কথাটা মাথায় রাখতে হইব। ঐ নাও ডুবাইতে হইব, তওবা পড়তে হইব, নইলে আল্লা রহম করুন, আমাদের য্যান আবার নূহের প্লাবনের মদ্দি পড়তি না হয়!

কি আর করুম সাহেব, খ্যাচ কইরা ব্রেক কষছি। হে ব্যাডা হুমড়ি খাইয়া পড়তে পড়তে আমার কাঁধ ধইরা কোন মতে নিজেরে সামলাইছে। মেজাজ খারাপ আছিল, ঝাঁঝের সাথে কইলাম– নামেন। লোকটা বেকুফ হইয়া আমার দিকে তাকায়া থাকল। আবার কইলাম– কি হইল অহনো বইয়া রইছেন! নামেন জলদি!

হে ব্যাডা হতভম্ভ হইয়া কইল, ক্যান! আমি তো খালিশপুর যামু কইছি–

যান না, কে মানা করছে! ওহানে বিহারীগো পাইবেন, হ্যাগোরে বুঝায়েন, গোস্তো-পরাটাও পাইবেন। তয় আমার রিকশা থিকা নামেন, আমার রিকশা আপনাগে জন্যি না।

কইল, তোমার কথা বোঝলাম না মিয়া।

বোঝনের কাম নাই। ওই মিয়া! দক্ষিণ সাউথখালি আমার বাড়ি। ঘর ভাঙ্গছে চোষট্টির গোর্কিতে। তহন নৌকা গাছে উঠাইছিল কোন হালায়? তর মোদুদির বাপে? গামছা ঝাড়া দিয়া মুখের ঘাম মুছি থপাস করি একদলা থুথু ফ্যাললাম হের সামনে। ব্যাডা লাফাইয়া পিছু হটল। অহন কেউরে তালিম দেতে হইলে বুইঝা শুইনা দিব ব্যাডা।

আল্লা মেহেরবান, ভাগ্যিস তোমারে তালিম দিতে যাইনি!

না সাহেব, আপনাগো তো চিনি, জাহিদ ভাইয়ের প্রেসে বসেন না।

জামাতের সেদিনের এ ধরনের অপপ্রচারের কথা আজ অনেকের কাছে অবিশ্বাস্য মনে হতে পারে। কিন্তু এটা বাস্তব। সেদিন এ ধরনের আরো অনেক ধর্মীয় বিভ্রান্তি ছড়নো হয়েছিল। আমাদের সৌভাগ্য সাড়ে চার দশক আগে সত্তরের মানুষগুলো এমন জড় চিন্তার বশীভূত ছিলনা। ফলে জামাত নিজেদের ছড়ানো দুর্গন্ধ নিজেরাই শুকে বেড়িয়েছে।

১৯৭০-এর নির্বাচন

দেখতে দেখতে নির্বাচন এসে গেল। আমি দীর্ঘ আট-নয় মাস ছাত্রলীগ সংগঠন এবং দলের কার্যক্রম থেকে বিচ্ছিন্ন ছিলাম। স্বভাবতই নির্বাচনে আমার কোন দায়িত্ব ছিলনা। তবু অফিস থেকে ফিরে প্রায়ই সুইটহাউজ এবং জাহিদের বর্ণালী প্রেসে যাই। ছেলেদের সাথে আগের মতই সুসম্পর্ক আছে, কেবল আমার কোনো মতামত নেই, কোনো কাজ নেই। বাড়ি ফিরতে এখন আর গভীর রাত হয়না, কিছুটা গল্পগুজব করে এবংনির্বাচনের কাজ কেমন চলছে, কার কেমন পজিশন এসব জেনে চলে আসি।সবাই ফিল্ডে কাজ করছে, কিন্তু কেউ কখনো বলেনা যে ল্যান্ডস্লাইড ভিক্টরি ঘটতে যাচ্ছে আমাদের। আমারও ধারণা সেটাপ্রায় অসম্ভব একটা ব্যাপার।

সালাহউদ্দীন ভাই (অ্যাডভোকেট সালাহউদ্দিন ইউসুফ)খুলনার তালা-ডুমুরিয়া-ফুলতলা কনস্টিটিউএনসিতে আওয়ামী লীগের মনোনয়ন পেয়েছিলেন। ওকালতি পেশার যারা রাজনীতির সাথে ওতোপ্রতভাবে জড়িত ছিলেন তারা এজলাসে কমই দাঁড়াতেন। মামলা সামলাতে হত জুনিয়রদের। স্বভাবতই তাদের ব্রীফ কমে আসত। সালাউদ্দিন ভাই ছিলেন এই দলে। তবে আমার ধারণা ছিল তিনি বিত্তশালী পরিবারের লোক, ওকালতি পেশা সৌখিনতা মাত্র। রাশভারি ও মেজাজি ছিলেন যা আমার ধারণাকে বদ্ধমূল করেছিল।

তিনি যখন নির্বাচনে নামলেন, আমার ভুল ভাঙ্গল। একদিন সন্ধ্যার পর সুইটহাউস থেকে আমাকে ডেকে পাঠালেন। আমি চেম্বারে ঢুকতেই গম্ভীর ভাবে বললেন, বস। তিনি তার নির্বাচনী এলাকার লোকজনের সাথে কথা বলছিলেন। তাদের বিদায় দিয়ে আমার দিকে ফিরে হঠাৎ বারুদের মত ফেটে পড়লেন– কি ভেবেছ তোমরা! তোমাদের ছেলেরা আমার জন্য কাজ করবেনা নাকি?

কেন ভাই, আমি তো দুদিন আগেও ছেলেদের দেখলাম আপনার এখানে। ডুমুরিয়া না কোথায় যাবে বলে গোছগাছকরছে।

ঠিকই দেখেছ। তবে তারা কাজের জন্য গেছে না এক্সকারশনে গেছে তাকি জানো? হৈ হুল্লোড় করতে করতে আমার রংয়ের টিন রাস্তায় ঢেলে বরবাদ করেছে, রং কি মাগনা আসে! কিছুটা বকেছি। বাবু সাহেবদের আঁতেঘা লেগেছে, আমার জন্য আর কাজ করবে না। তুমি যাও, কথা বল, ওদের আসতে বল। এরপর তো আমি এলাকায় যাবো। ফকিরের মতো একা একা যাবো নাকি? আমার সাথে তো ছেলেদের যেতেহবে।

বললাম ভাই, আমি তো প্রায় আট-নয়মাস ছাত্র রাজনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন। বিতাড়িতই বলা যায়। ওরা আমার কথা শুনবে না? আপনি বরং অন্য কাউকে দিয়ে ওদের ডেকে পাঠান।

কথা বাড়িও না। যাও এবং ওদের ডেকে নিয়ে এসো। তোমার কথা শুনবে, কি শুনবে না সেটা আমার ভালই জানা আছে।

জাহিদ এবং নজরুল দু'জন দুই গ্রুপের প্রত্যক্ষ নেতৃত্বে ছিল। জাহিদ আমার ঘনিষ্ট বন্ধু। নজরুল জুনিয়ার, তবে তার পিছনে প্রকৃত নেতৃত্বে ছিল কামরুজ্জামান টুকু। টুকুও আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু, তবে কিছুটা মেজাজী। জাহিদকে বললাম, সালাউদ্দিন ভাইয়ের সাথে ছেলেরা কাজ করছে না। তুমি কি জানো ব্যাপারটা।

ভালই জানি। সালাউদ্দিন ভাই অসহ্য চরিত্র। যেমন মেজাজ তেমনই কৃপণ। এক কাপ চা খাওয়ার পয়সা তো দেনই না, কিছুটা রং পড়ে গেছে তাই নিয়ে ছেলেদের উপর যাচ্ছেতাই মেজাজ দেখিয়েছেন। ছেলেরা ভলানটারিলি কাজ করছে, বেতনভুককর্মচারি তো নয় যে,যা খুশি তাই বলা যাবে। বুঝিয়ে বললে পারতেন।

বললাম– জাহিদ এটা তো ঠিক, আওয়ামী লীগ থেকে যারা নির্বাচনে দাঁড়িয়েছেন তাদের অধিকাংশই বিত্তহীন। সালাহউদ্দিন ভাইয়ের বাড়তি অসুবিধা তার মেজাজ। কিন্তু তাদের তো জিতিয়ে আনতে হবে।

ঐ একটা সিট হারালে কিছুই যায় আসে না। আর তিনি এমনিতেই হারবেন।

আমি অবাক হয়ে জাহিদের মুখের দিকে তাকিয়ে বললাম– নাসির ভাইয়ের বাসায় বঙ্গবন্ধুর কথাগুলো নিশ্চয় তোমার মনে আছে– 'তোরা আমাকে পূর্ব বাংলার হান্ড্রেড পার্সেন্ট সিট দে, আমি দেখিয়ে দেবো কিভাবে লিগাল ফ্রেম ওয়ার্ক গুড়িয়ে দিতে হয়।'

তুমি কি বিশ্বাস করো আমরা হান্ড্রেড পার্সেন্ট সিট পাবো?

আগে করতাম না, তবেএখনকরি। গণজোয়ারটা ক্রমেই স্পষ্ট হচ্ছে। তুমি তো ফিল্ডে কাজ করছ। নিশ্চয় বুঝতে পারছ, পাওয়া সম্ভব।

যা হোক মনোয়ার, কিন্তু ওনার জন্য আমাদের কেউ কাজ করবে না, আমি বললেও না।

একই কথা টুকুও বলল। বরং সালাহউদ্দিন ভাই সম্পর্কে তার দৃষ্টিভঙ্গি আরো কঠোর। আমি বঙ্গবন্ধুর শতভাগ সিট চাওয়ার কথা তাকে স্মরণ করিয়ে দিলাম।

সে সহাস্যে বলল এতদিন রাজনীতি করছ সৈয়দ সাহেব, আর এটা বোঝো না, কখনোইশতভাগ সিট পাওয়া যায় না। পূর্ব বাংলায় আমরা কিছু সিট হারাবো নিশ্চয়। ধরে নাও তার মধ্যে তিনি একজন।

তার মেজাজ খারাপ ঠিকই, তবে অনেক দিক থেকে তিনি কিন্তু ভাল, তার জানাশোনাও ভাল এবং ডেডিকেটেড্।

ঠিক আছে, তোমার এতই যখন ইচ্ছা তুমি নিজে সরাসরি ছেলেদের সাথে কথা বলে দেখো।তবে কেউ রাজি হবে বলে মনে হয় না।

টুকুর কথা ঠিকই ছিল। যাদের সাথে কথা বললাম, বিনয়ের সাথে সবাই উপেক্ষা করল। সালাহউদ্দিন ভাইকে বললাম– বাদ দেন ওদের কথা। আপনি এলাকার ছেলেদের নিয়ে কাজ করেন, জিতে যাবেন ইনশাআল্লাহ।

সালাহউদ্দিন ভাই তীক্ষ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন– ঢাকার লীডাররা এখানে এসে কাজ করলে তোমরা যেমন উৎসাহপাও,ওরাও তেমনি তোমাদের পেলে উৎসাহ পায়। এর ইমপ্যাক্ট আলাদা। যাকগে, তুমি আমার জন্য কাজ কর এবং যেভাবে হোক আরো দু'চার জন ছেলেকে জোগাড় কর। তোমার ব্যক্তিগত বন্ধু বা ভক্ত নিশ্চয় আছে।

বললাম, ভাই আমি জুট মিলে চাকরি করি। সেখানে ছুটি সর্বনিম্ন। আর রাজনৈতিক কারণেছুটি- এতো ভাবাই যায় না। আমার চাকরিইথকবে না।

আমার সাথে যাওয়ার জন্য রেডি হও। আমাকে রাগিও না, আর এখন সামনে থেকে ভাগো।

পরদিন অফিসে যেয়ে বিস্মিত হলাম।ম্যানেজার সাহেব তার চেম্বারে ডেকে পাঠালেন। সেখানে আমাদের হিসাব বিভাগীয় প্রধানসহ বিভিন্ন বিভাগীয় প্রধানগণ সপ্তাহিক সভায় উপস্থিত ছিলেন। বর্তমান ম্যানেজার কোরায়শি সাহেব ছিলেন ভারপ্রাপ্ত, বাঙালি এবং নিপাট ভদ্রলোক। শুনেছিলাম শীঘ্রই রবার্টসন অথবা একজন বৃটিশ ম্যানেজার চেয়ারটা দখল করবেন।ম্যানেজারের চেম্বারে আমার রিসেপশানটা হল বিস্ময়কর। কোরায়শিসাহেব বললেন– মনোয়ার সাহেব, আপনার ভাই নির্বাচনে দাঁড়িয়েছেন, আর কথাটা আমাদের জানতে হল আপনার ভাইয়ের কাছ থেকে। তারপরও আপনি অফিস করে যাচ্ছেন। কেন আমরা কি ছুটি দিতাম না নাকি, যে আপনার ভাইকে আমাদের কাছে

অনুরোধ জানাতে হবে! আপনি আমাদের মহা লজ্জায় ফেলেছেন। যাক, পনেরো দিন ছুটির দরখাস্ত দিয়ে এখুনি নির্বাচনী এলাকায় চলে যান। সালাহউদ্দিন সাহেবকে আমাদের শুভেচ্ছা জানাবেন।

–চি চি করে বললাম, ঠিক আপন ভাই–

–আরে সে যাই হোক, ভাই তো। আমরা হলে তো বসে থাকতে পারতাম না।

ওখানে বসেইআমার ছুটির ফর্ম সই হয়ে গেল। তারা আগাম দাওয়াত দিলেন, জিতবেন তো অবশ্যই, কে এবার নৌকার পক্ষে নেই! এমএনএ সাহেবকে বলবেন, তাকে অবশ্যই আমাদের সাথে একদিন দুটো ডালভাত খেয়ে যেতে হবে।

নিচে আসতে আসতে দেখলাম সংবাদটা ইতোমধ্যে ভালই চাউর হয়েছে। অনেকেই আগ্রহ নিয়ে বললেন–আরে আপনার ভাই যে এমএনএ ক্যান্ডিডেট তা তো কখনো বলেন নি! কেউ কেউ বললেন আমরা তো তার এলাকার ভোটার, আর আপনি আমাদের বলবেন না? কিন্তু খোঁচা খেলাম নসরুল্লার কাছ থেকে। সে বিহারী এবং ইউনিয়ন লিডার ছিল।চার-পাঁচজন চামচা নিয়ে সিঁড়ির গোড়ায় দাঁড়িয়ে ছিল। বলল–'নমস্তে হোনেওয়ালা এমএনএ সাবকা চাচেরা ভাই। আপকো সাথ কসুরভি কিয়া, গোস্তাকিভি কিয়া। কেয়া মালুম মুঝে ফির ছাপড়া (বিহারে তার পিতৃভূমি) ওয়াপস যানা না পড়ে।' সেও তার সঙ্গীরা হো হো করে হেসে উঠল। তারা স্বপক্ষীয় প্রচার প্রচারণায় বেশিমাত্রায়আস্থাশীল ছিল এবং নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করত যে আওয়ামী লীগ মাশরেকি পাকিস্তানে বিগ পার্টি হতে পারে, কিন্তু ৪০ ভাগের বেশি সিট কখনই পাবে না। আমি এই মুহূর্তে শতভাগ সিট পাওয়ার জন্য তীব্র তাগিদ অনুভব করলাম। অন্যথায় আমি নিশ্চিত ছিলাম, নির্বাচনের পর তারা আমাকে শিলনোড়ায় ফেলে পিষবে।

সালাহউদ্দিন ভাইয়ের বাড়িতে যেয়ে বেশ ক্ষোভের সাথে বললাম, আপনি আমার চাকরির বারোটা বাজিয়েছেন, একেবারে ছোটভাই পরিচয় দিয়ে খোদ প্রকল্প প্রধানকে ছুটির কথা বলেছেন। আর বিহারীদের হাতে আমাকে জবাইয়ের মুরগি বানিয়েছেন।

তুমি বোকা নাকি? তোমাকে ভাই পরিচয় দিয়েছি, যাতে সবাই বোঝে যে পারিবারিক কারণে তুমি নির্বাচনের কাজে যাচ্ছ। নইলে তো বুঝতো ব্যাপারটা রাজনীতিক। তখন আমাদের বিপর্যয় ঘটলে তোমার চাকরিটাও রিস্কের মধ্যে পড়ে যেতো।

আমি ছাত্রদের মধ্যে মাত্র একজনকে কনভিন্স করতে পেরেছিলাম– সুশান্ত নন্দী ডাবলু, ছাত্রলীগের খুলনা জেলা কমিটির প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক ছিল এবং নজরল গ্রুপের সাথে যুক্ত ছিল। আমি সালাহউদ্দিন ভাইয়ের নির্বাচনী এলাকা তালা, ডুমুরিয়ায় তারসফরসঙ্গী হতাম। ডাবলুশহরের অফিস সামলাতো, মাঝে মাঝে আমাদের সাথেও নির্বাচনী এলাকায় যেত।

এক রোববারে সালাহউদ্দিন ভাই ফুলতলা গেলেন নির্বাচনী প্রচারে। তার পৈতৃক বাড়ি ফুলতলায়। সেখানে ছাত্রকর্মী অনেক, বললেন– ওখানে তোমার না গেলেও চলবে। অফিসে বস। ডাবলু ঠিকঠাক সামলাতে পারছে কিনা দেখো।

বেলা বাড়ার সাথে সাথে তালা ডুমুরিয়ার বিভিন্ন এলাকা থেকে নেতা-কর্মীরা আসা শুরু করল। খুব রিমোট কর্ণার থেকেও কর্মীরা এসেছে। তাদের নানা সমস্যা–১২ নভেম্বর গোর্কিতে ভেড়িপথ, চার, বাঁশের সাঁকো সব ভেঙ্গে ভেসে গেছে, মেরামত না হলে ভোটার আনা কঠিন। নয়তো নৌকার ব্যবস্থা করতে হবে। কিছু বিড়ি একান্তই প্রয়োজন। কর্মীরা চার-পাঁচটা করে বিড়ি পেলেই মহাখুশি। পোস্টার দিতে হবে। বৈষম্য তুলে ধরা 'সোনারবাংলা শ্মশানকেন' পোস্টারেরচাহিদা বেশি। তারপরও আছে–কোথায় কোন কর্মীর গাতবিধি সন্দেহজনক, কে কোথায় উল্টাপাল্টা কথাবার্তা বলে ঝামেলা পাকিয়েছে, কোথায় সবুর সাহেবের চেলারা আমাদের কর্মীদের ভয় দেখিয়েছে, মেরেছে। কোথায় অফিসের ভাড়া, মাইক ভাড়া এখনো শোধ হয়নি। কান ঝালাপালা হওয়ার জোগাড়।

ডাবলু নির্ধারিত সংখ্যক পোস্টার এবং খুব রিমোট কর্ণারের লোকদের কিছু বিড়ি দেয়ার অধিকার রাখে। কেউ কেউ বেশি পোস্টার চায়। বাড়তি দু'চারটে পায়ও। ডাবলু সতর্ক করে– যেখানে লোক সমাগম বেশি সেখানে লাগাবেন, পাহারা দেবেন, কেউযেননাছেড়েএবংঅবশ্যই পোস্টার দিয়ে নিজের ঘর সাজাবেন না। সালাহউদ্দিন ভাই কিন্তু এলাকায় যেয়ে এগুলো দেখেন। একটা নোট খাতায় ডাবলু সব লিখে রাখে, তাদের সই-টিপসই নেয়। সালাহউদ্দিন ভাই যখনই ফেরেন ইজি চেয়ারে আধশোয়া হয়ে ডাবলুর লেখাগুলো পড়েন, প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেন।কখনো মেজাজ খারাপ থাকলে খাতা না দেখেই ফেরত দেন। বেশিরভাগ সময় এটা ঘটে, সামর্থের চেয়ে চাহিদা সব সময় কয়েক ধাপ উঁচুতে থাকে, মেজাজ খারাপ হওয়ারই কথা।

অফিস ফাঁকা হলে ডাবলু ড্রয়ার থেকে দুটো বিড়ি বের করে একটা ঠোঁটে গুজে একটা আমার দিকে বাড়িয়ে বলল– ধরাবেন নাকি।

বিস্ময়ের ঘোর কাটলে বললাম– এসবের মানে কি! তুমি জানো আমি বিড়ি-সিগারেট খাইনা, আর তুমিই বা এসব কবে থেকে ধরলে? তোমার অধঃপতন দেখেআমি সত্যি অবাক হচ্ছি।

হাসতে হাসতে বলল–অধঃপতন কোথায় দেখলেন ভাই, আমি কি আগে সিগারেট খেতাম যে এখন হাতে বিড়ি দেখে অধঃপতন ভাবছেন। কি করব বলেন, এক কাপ চাও পাইনে। ভেতরে কয়েক দিন বলে পাঠিয়েছি, তাও দেয়নি। কি ধরনে কিপটে বোঝেন!

কিপটেরা দু'এক কাপ চা দিতে কার্পণ্য করে না সুশান্ত। এটা অসহযোগিতা বলতে পারো। ভাই নির্বাচনে দাঁড়িয়েছেন, বাড়ির কারোপছন্দ নয়। তাদের ধারণা ভাই জিতবেন না, মাঝখান থেকেটাকা পয়সাগুলোউৎসন্নে যাচ্ছে। বড় সমস্যাতার পরিবারের কেউ কেউ মুসলিম লীগ নেতা। আমি দশ টাকা বের করে বললাম, এটা রাখো।

সালাহউদ্দিন ভাই তো আমাকেও কিছু হাত খরচা দিতে পারেন।

বললাম শোন, আমার বেতনের টাকা মার হাতে তুলে দিই, ওভারটাইমের টাকা আমার কাছে থাকে। এ টাকা সালাহউদ্দিন ভাইয়ের নয়। তার অবস্থা বুঝি বলে আমার কোন অভিযোগ নেই।

তিনটার দিকে সালাহউদ্দিন ভাই ফিরলেন। থমথমে মুখ। সোজা ভেতরে চলে গেলেন। এক সময় ভেতরে কিছু হৈচৈ কান্নাকাটি শুনলাম। সাড়ে চারটার দিকে ঘর থেকে বেরিয়ে বললেন– চল আমার সাথে। তার মুখের অবস্থা দেখে জিজ্ঞাসা করতে সাহস হল না, কোথায় যাচ্ছি।

রিকশা চলতে শুরু করলে গম্ভীরভাবে বললেন– ভবিষ্যতে রাজনীতি করতে চাও তো? তাহলে শোনো বিয়ে কোর না, পস্তাবে। এরা শুধু তোমার রাজনীতি না, তোমার জীবনটাই বরবাদ করে দেবে। এই রিকশা, কাফে রেস্তরায় চল। পকেট থেকে কাগজের ছোট্ট একটা মোড়ক বের করে বললেন, ধর এটা।

পুরিয়াটা হাতে নিয়ে জিজ্ঞাসু নেত্রে তার দিকে তাকালাম।

তোমার ভাবির গয়না। ছিনিয়ে এনেছি। এটা কোন স্যাকরার দোকানে বেচে জলদি টাকা নিয়ে এসো।

বললাম ভাই। এ ব্যাপারে আমার কোন অভিজ্ঞতা নেই, একেবারেই নেই। জানেন তো স্যাকরারা মায়ের গায়নাতেও খাদ মেশায়। নির্ঘাত আমাকে ঠকাবে।

ধেৎতেরি বলে পুরিয়াটা একরূপ আমার হাত থেকেছিনিয়ে নিলেন। আমরা রিকশা ঘুরিয়ে সামসুর রহমান রোডে এলাম। মঞ্জুভাইয়ের বাড়ির কাছে পৌঁছে বললেন, যাও মঞ্জুকে ডেকে দাও। মঞ্জু ভাই হতদন্ত হয়ে বেরিয়ে আসতেই বললেন–তুমি হা করে দাঁড়িয়ে কি দেখছো, অফিসে যেয়ে বস। তালা, ডুমুরিয়া, ফুলতলা থেকে লোকজন আসবে মিটিং আছে। তাদের সাথে কথা বল। আমরা একটু পরে আসছি।

নির্বাচন যতই ঘনিয়ে আসছিল কাজের চাপ ততই বাড়ছিল। তালা, ডুমুরিয়া এলাকা ছিল খাল বিল জলায় ভরা।যোগাযোগ ব্যবস্থা আগাগোড়াই খারাপ ছিল। ১২ নভেম্বরের ভয়াবহঝড়-জলোচ্ছাসের পর একেবারেই বেহাল দশা। রাস্তা মেরামত এবং নৌকার ব্যবস্থা করার জন্য চাপ ক্রমাগত বাড়ছিল। সালাহউদ্দিন ভাই বললেন আজই তুমি ঢাকা যাও। মুজিব ভাই এর সাথে কথা বলে যে ভাবে পারো পাঁচ হাজার টাকা নিয়ে এসো। আর কিছু পোস্টার– 'সোনার বাংলা শ্মশান কেন' নিয়ে এসো। মুজিব ভাইকে বোলো–খায়বার তার জীপ গাড়িটা ফেরত নিয়ে গেছে, তিনি যেন তাকে বলে দেন নির্বাচন পর্যন্ত জীপটা আমার কাজে ছেড়ে দেয়।

বললাম ভাই, খায়বার সাহেবও তো তেরখাদা থেকে এমপি পদে নির্বাচনে দাঁড়িয়েছেন, এ অবস্থায় তার জীপটা কি ভাবে আপনাকে দেবে।

ও নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না, যা বললাম তাই কর। আমি ঢাকাগামী ট্রেন ধরলাম। ট্রেনটা তখন যেতো সিরাজগঞ্জ-জগন্নাথগঞ্জ ঘাট হয়ে, ময়মনসিংহের উপর দিয়ে।কমপক্ষে ১৮-২০ ঘণ্টা সময় লেগে যেত।

আমি সালাহউদ্দিন ভাইয়ের নির্দেশ হুবহু পালন করেছিলাম। ট্রেন থেকে নেমে সরাসরি ধানমন্ডি বঙ্গবন্ধুর বাড়ি চলে গিয়েছিলাম, আমার ফেরারতাড়া ছিল। আমি বুঝিনি যে, ঝোড়ো কাকের হালে বঙ্গন্ধুর দরজায় যেয়ে দাঁড়িয়েছি। অনেকগুলো দৃষ্টি একসাথে আমার উপর পতিত হল। আমরা ভোররাতে মধুপুরের জঙ্গল অতিক্রম করেছিলাম। আমার জানা ছিল না, জঙ্গলের সাদা ধুলো আমার একমাথা চুলের কি দুর্দশা ঘটিয়েছে। আমি স্টেশনের চাপকল থেকে কেবল হাত মুখটাই ধুয়ে নিয়েছিলাম।

মুজিব ভাইয়ের সাথে আমার আগে একবারই মাত্র দেখা হয়েছে, খুলনায় নাসির ভাইয়ের বাড়িতে, যখন আমরা আইয়ুবের এলএফও-র আওতায় নির্বাচনের অসারতা নিয়ে তাকে স্মারকপত্র দিতে গিয়েছিলাম। তার অভাবিত স্মরণশক্তি সম্পর্কে আগেই শুনেছি। ঘরের চারপাশে সোফায় লোকজন ঠাসাঠাসি করে বসা। মাঝে দাঁড়িয়ে তিনি একজনের সাথে কথা বলছিলেন। দরজার দিকে ফিরে তাকে বললেন– দাঁড়া, আগে এই বনমানুষটাকে বিদেয় করি। সরাসরি নাম ধরে কিছুটা বিদ্রুপের স্বরে বললেন, ভারি ব্যস্ত দেখি! কোন্ কনস্টিটিউয়েনসিতে কাজ করছিস? কি জন্য এসেছিস, বল তাড়াতাড়ি।

আমি হতভম্ভ হয়ে দ্বিতীয় একজন 'মনোয়ারের' সন্ধানে এদিক ওদিক তাকাচ্ছিলাম, সম্বিত ফিরতেই হড়বড় করে বলে গেলাম–সালাহউদ্দিন ভাইয়ের কনস্টিটিউয়েনসি তালা-ডুমুরিয়ায়। তিনি আপনার কাছে পাঠালেন। অতঃপর আর্জিগুলি জানাতেই রাগে ফেটে পড়লেন– টাকা! টাকা কেন? নমিনেশন নেয়ার আগে সবাই এক একজন গৌরী সেন, আমার জন্য আপনাকে মোটেও ভাবতে হবেনামুজিব ভাই। নির্বাচনের খরচআমি নিজেই চালিয়েনিতে পারব, সে তওফিক আল্লাহ্ আমাকে দিয়েছেন! কথার ফুলঝুরি! নমিনেশন হয়ে গেল তো ব্যাস, শুরু হল টাকা টাকা করে ধরনা!

সোফায় উপবিষ্টলম্বা ফর্সা এক ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে বললেন– এই দু হাজার টাকা দাও। তিনি সোফা থেকে উঠে এসে মুজিব ভাই এর হাতে চারটে নোট ধরিয়ে দিলেন। আমি পাঁচ হাজারের কথা বলতে গিয়েছিলাম, কঠোর দৃষ্টিতে থামিয়ে দিলেন, বললেন–তাকে তো একটা মটর সাইকেল দিয়েছি। সেটা চড়ে না?

মটর সাইকেল!– আমার কণ্ঠে বিস্ময়।

ও, তাহলে মটর সাইকেল দেখোনি। তার মানে বেচা সারা! যা করে করুক গে। সালাহউদ্দিনকেবলবি সে পার্টির সেক্রেটারি, গাড়ির দরকার হলে খায়বারকে তাকেই বলতে হবে। আমি ফিরে আসছিলাম, হঠাৎ ঘাড় চেপে ধরে বললেন–এই শোন, তালায় কাজ করছিস, সবুরের এলাকা, কেউ কেউ বলে সিটটা হারাবো, সবাই নাকি তার উপর ক্ষ্যাপা, তোদের কি ধারণা?

ভুল বলে ভাই, আমার মোটেও তেমন মনে হয়না, এলাকায় তিনি খুবই জনপ্রিয়। ভাল ভোটেই জিতবেন ইনশাআল্লাহ!

সালাহউদ্দিন ভাইকে যখন কথাগুলো বললাম, বললেন–হ্যা, যাদের নির্বাচনী এলাকা দূরে তারা মটর সাইকেল পেয়েছে। কিন্তু ও দিয়ে আমি কি করব!এই বয়সে ভারি শরীর নিয়ে তালা, ডুমুরিয়ার ভাঙ্গাচোরা মেঠোপথে মটর সাইকেল চালাব! অথবা ধর, কারো পিছনে বসে এমএনএ ক্যান্ডিডেট নির্বাচনী প্রচার করে বেড়াচ্ছে, কেমন লাগবে? মটর সাইকেল নয়, আমার টাকার দরকার, দিয়েছি বেঁচে।

নির্বাচনী প্রচারে বিচিত্র অভিজ্ঞতা

তখন তালা ডুমুরিয়া ছিল দুর্ভিক্ষ পীড়িত এলাকা। ১২ নভেম্বরের ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাব, সম্ভবত আরো কিছু কারণে শস্যহানি ঘটায় এই অবস্থা। দুর্ভিক্ষ স্থানীয় জনজীবনে মারাত্মক প্রভাব ফেলেছিল। খাবারের অভাব তীব্র ছিল, নির্বাচনী প্রচারে যেয়ে আমরাও এর প্রতিক্রিয়া হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করি।

নির্বাচনী প্রচারে গেলে আমাদের সাথে প্রায়ই এলাকার দু'একজন নেতা কর্মী থাকেন।দু-তিন দিন পর ডুমুরিয়ায় প্রগ্রাম ছিল। গাড়িতে উঠে বেমানান এক যুবকের দেখা পেলাম। রুক্ষ চেহারা। পরনে রংজ্বলা কালো প্যান্ট, কালো কোটের উপর ময়লা ঘিয়েরং চাদর, গলার রংচঙে মাফলার, পায়ে হলুদ কেডস। টাফ লোক নিঃসন্দেহে। তাকে আমাদের পছন্দ হল না। সালাহউদ্দিন ভাই কেন যে একে সাথে নিয়েছেন তা বোধগম্য নয়।

লোকটা আমার সন্ধিগ্ধ দৃষ্টি দেখে সম্ভবত মনের ভিতরটা পড়ে ফেলল। বলল, কাকার বাড়ি কাজ করি। দাদী সাথে পাঠালেন। আজ নাকি আপনারা তালা ডুমুরিয়ার ভিতর কনে কনে যাবেন, সবুরের গুন্ডাপান্ডারা....

সালাহউদ্দিন ভাই সামনে থেকে ধমকে উঠলেন– এহ্! মহা বীর যাচ্ছেন আমাদের সাথে, চুপ থাক।

ডুমুরিয়া খুলনার খুবই কাছে- মাত্র আধ ঘন্টার পথ। কিন্তু তখন রাস্তা ব্রীজ ফেরি কিছুই ছিলনা। আমাদের ডুমুরিয়া যেতে হত যশোর-চুকনগর হয়ে। আমরা খুলনা থেকে রওনা দিয়েছিলাম আটটার আগে। শীতের সকাল। পথের দুপাশে চাতকের মত তাকাতে তাকাতে খুলনা শহর অতিক্রম করলাম, দৌলতপুর পৌঁছেও দেখা গেল কোন হোটেল রেস্তরার ঝাঁপ খোলেনি। উনিশ মাইলের মাথায় নোয়াপাড়া, গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসাকেন্দ্র, গাড়ি জোর গতিতে এটাকেও পিছনে ফেলে গেল। আমরা কেউই ভোরে নাস্তা করে আসিনি। শেষে একরূপ নিরুপায় হয়ে বললাম, আপনি বোধহয় নাস্তা করে বেরিয়েছেন সালাহউদ্দিন ভাই?

এই সাত সকালে তোমার ভাবি দেবে নাস্তা! বাড়িতে নটা সাড়ে নটার আগে নাস্তা হয়না। সামনে চল তখন দেখা যাবে।

চুকনগর ডুমুরিয়ার বড় ব্যবসা কেন্দ্র যা খুলনা ও সাতক্ষীরার উত্তর এবং যশোরের দক্ষিণ সীমানাকে একত্রিত করেছিল। এখানে আওয়ামী লীগের বড় নির্বাচনী অফিস ছিল। এক সুদর্শন ভদ্রলোক, সম্ভবত আব্দুল হামিদ এই এলাকায় সালাহউদ্দিন ভাইয়ের প্রধান নির্বাচনী সমন্বয়ক ছিলেন। এলাকার একমাত্র দোতালা বাড়ির সুপ্রশস্ত অফিস কক্ষে আমরা যখন পৌঁছালাম তখন বেলা প্রায় দশটা। কারো পক্ষে ধারণা করা

সম্ভব ছিলনা যে আমরা এখনো নাস্তা করিনি। সেখানে অনেক লোক ছিল, আমাদের ভদ্রতায় বাধল নাস্তার কথা বলতে। গোটা এলাকা দুর্ভিক্ষ পীড়িত, তা সত্ত্বেও দ্রুত কয়েক কাপ চা এবং কয়েকটা টোস্ট আমাদের সামনে উপস্থিত করা হল। এখানে একটা সভা ছিল। পনের বিশ জন লোক সমবেত হয়েছিল। তাদের উপর চোখ বুলিয়ে সালাহউদ্দিন ভাই বললেন– তোমরা যে পঞ্চাশ ষাট জনের কথা বলেছিলে।

হামিদ সাহেব বললেন–লোকজন তো হত, কিন্তু সবাই এখন মাঠে। আপনি ভাববেন না, তারা বঙ্গবন্ধুর নৌকা ছাড়া আর কিছু চেনে না।

মিটিং সেরে আমরা যখন বেরোলাম অফিসের সামনে বড়সড় ভিড়, সালাহউদ্দিন ভাইকে দেখতে চায়, কথা শুনতে চায়। ভালই বক্তৃতা করেন সালাহউদ্দিন ভাই, জ্বালাময়ী ভাষণ, অকুতোভয়ে বঙ্গবন্ধুর নৌকায় ভোট দেয়ার আহ্বান জানিয়ে বললেন– সবুর খানের দিন শেষ, আপনাদেরও ভয় পাওয়ার দিন শেষ, মনে রাখবেন এ সুযোগ হেলায় হারানো যাবেনা। জয় বাংলা। তার ভারিক্কি চেহারা, অবয়ব, গুরুগম্ভীর কণ্ঠস্বর সবই অনুকূল ছিল, লোকজন চোখেমুখে প্রত্যয় নিয়ে ফিরে গেল।

এবার আমাদের ডুমুরিয়া প্রপারের দিকে রওয়ানা দেয়ার পালা। আমরা চুকনগর বাজার থেকে কিছু খেয়ে যাওয়ার কথা ভাবছিলাম। তবে এটা সম্ভব ছিলনা। সালাহউদ্দিন ভাইয়ের পক্ষে আশেপাশে যারা আছে তাদের না নিয়ে হোটেলে ঢোকা যেমন সম্ভব ছিলনা, তেমনই হোটেলে বাড়তি খাবার পাওয়াও ছিল অসম্ভব ব্যাপার। খবির আগেই আশপাশ ঘুরে দেখে এসে ডাবলুকে বলছিল– এ এক আজব জায়গা, হোটেল আছে, দু চারটে বাসি পচা মিষ্টি ছাড়া কোথাও কোন খাবার নেই। দু একটা হোটেলে দুপুরে কিছু ভাত রান্না হলেও হতে পারে, গ্যারান্টি নেই। আমরা গাড়িতে উঠে বসলাম।

পথে পথে কয়েক জায়গায় আমাদের থামতে হল। সেখানে কর্মী ও লোকজন জমায়েত হয়েছিল। কোথাও শুভেচ্ছা বিনিময়, আবার কোথাও লোকজন বেশি হলে অনির্ধারিত বক্তৃতাও দিতে হত, ব্যস্ততার অজুহাত খাটত না। কেউ কেউ সমস্যার কথা তুলে ধরতে চেষ্টা করলে সালাহউদ্দিন ভাই বলতেন– এসব অনেক শুনেছি ভাই, উপায় নেই, এর মধ্যেই তোমাদের কাজ করতে হবে, কাঁধে হাত রেখে বলতেন, যাও লেগে পড়। সত্যসত্যই লোকজন কোমর বেঁধে লাগত। তারা লড়াইটাকে শুধু সালাহউদ্দিন ভাইয়ের নয়, নিজেদের লড়াই হিসাবে নিয়েছিল।

ডুমুরিয়া প্রপারে একটা ছাপড়া হোটেলে আমরা খেয়ে নিলাম। প্রচণ্ড ক্ষুধা ছিল, হোটেলের আকার প্রকার নিয়ে মাথা ঘামানোর সুযোগ ছিলনা। স্থানীয় নেতৃবৃন্দই খাবারের আয়োজন করেছিলেন। হোটেলে সংক্ষিপ্ত আলোচনা শেষে আমরা ডুমুরিয়ার ইন্টিরিয়রে রওনা দিলাম।গাড়ি যতই এগোচ্ছিল পথের পাশে খাল এবং খালের শাখা প্রশাখা ততই বাড়ছিল। খালে অজস্র ছোট ছোট ডিঙ্গি নৌকা, নৌকায় ছোট ছোট হাল। খেলনার মত মনে হয়। পথের পাশে দু এক জায়গায় সারি করে রাখা বেশ কিছু নতুন নৌকা, বিক্রির জন্য রাখা হয়েছে। শুনে বিস্মিত হলাম ডুমুরিয়ার ভিতরে নৌকাইচলাচলের মূল মাধ্যম। এজন্য প্রত্যেক পরিবারেই একাধিক নৌকা আছে। খুব দ্রুত আমাদের পথ চলা শেষ হল, এরপর গাড়ি চলেনা। তখন ডিঙ্গি নৌকাই ভরসা। তবে আমাদের হাতে অতটা সময় ছিলনা।

আমরা এক বাড়ির দলিজ ঘরে বসেছিলাম। ঘর এবং বারান্দা ভর্তী লোক, ষাট-সত্তর জনের কম হবেনা। সালাহউদ্দিন ভাই মনে হল বেশ খুশি। তারপর হঠাৎ একজনের দিকে তাকিয়ে বললেন– হরেন তোমাদের ওখানে যাব বলেছিলাম, কিন্তু যাব কি ভাবে?

যাতি হবি ক্যান কর্তা, আমরা আইছি না! আমাগো খান কয়েক পোস্টার, ক বান্ডিল বিড়ি দ্যান। আর য্যানে য্যানে ভেড়ি ভাঙ্গিছে আর য্যানে য্যানে খাল সেহানে একটা দুটো করি ডিঙ্গি ভাড়া করি দ্যান। ভাড়াটা আগেই দিতি হবিনে। ভাই বললেন, ঠিক আছে বস।

আমি ঘরের মাঝামাঝি এক বেঞ্চে বসে ছিলাম। সালাহউদ্দিন ভাইয়ের নির্দেশ ছিল পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করা, তার কাছে খবর ছিল কেউ কেউ নাকি খান সবুরের ভয়ে ভোট কেন্দ্রে যাবে কিনা এবং কাকে ভোট দেবে তা নিয়ে দ্বিধায় পড়েছে। তবে তেমন কোন আশংকা আছে বলে আমার মনে হয়নি। পাশের একজন বলল– না বাবু তেমন কিছুনা, আমরা ভয়ে ভয়ে থাকি, কথা কম কতি হয়, বাইরে অনেক সুময় ভেন্ন কথাও কতি হয়, তয় ভেতরে ভেতরে সবাই একজোট। ভগ্‌মান সহায় হোন, ওনারে ভোট এবার দেখায়ে ছাড়মু!

বিভিন্ন এলাকা থেকে লোকজন এসেছিল। সালাহউদ্দিন ভাই সময় নিয়ে চমৎকার আলোচনা করলেন। শেষে বললেন, জানি আপনাদের অনেক কথা আছে, সমস্যা অনেক, তবে আমাদের হাতে সময় কম। আমি শুধু একথা বলতে পারি যে, গত বেশ কিছু দিন থেকে আপনাদের সাথে কাজ করে এলাকা ঘুরে আপনাদের সমস্যাগুলো আমি প্রায় আপনাদের মতই জানি, তবে আমাদের সামর্থ কম, তার মধ্যেও যতটুকু পারি, খুবই অকিঞ্চিৎকর, করতে চেষ্টা করব। তিনি স্থানীয় কয়েকজন গণমান্য ব্যক্তি ও প্রত্যেক বুথের ভারপ্রাপ্ত কর্মীদের ছাড়া সবাইকে বাইরে যেয়ে ডাবলুর কাছ থেকে পোস্টার ও অন্যান্য কাগজপত্র বুঝে নিতে বললেন। আমার কোন কাজ ছিলনা, খানিক ঘোরাঘুরি করে বারান্দার পাশে দাঁড়িয়ে ডাবলুর বিলিবন্টন দেখতে থাকলাম। কাজটা নিঃসন্দেহে ঝামেলাপূর্ণ, ডিসেম্বরের কনকনে শীতেওতার ফর্সা নাকের উপর স্বেদবিন্দু।

বেলা গড়িয়ে এলে সালাহউদ্দিন ভাই বেরিয়ে এলেন। সঙ্গের লোকজনের মুখ ভার, কেউ কেউ প্রকাশ্যেই অসন্তুষ্ট। যে বাড়িতে আমরা বসেছিলাম, ভদ্রলোক প্রৌঢ়, প্রাজ্ঞও বটে। পাশ থেকে একজনের কাঁধে হাত রেখে বললেন– মোহন, ধরে নাও এটা বিদুরের খুদ। কাজটা তো আমাদের সবার, কি বল।

আমি চায়ের জন্য উসখুস করছিলাম, পরিবর্তে গাড়িতে উঠার নির্দেশ হল। পথে এক ফাঁকে সালাহউদ্দিন ভাইকে বললাম, বিকালে অন্তত এক কাপ চা পাবো বলে ধারণা করেছিলাম। কিন্তু আপনি তো কিছু না বলে ঝটপট আমাদের গাড়িতে উঠিয়েদিলেন। সালাহউদ্দিন ভাই বললেন, তুমি নিশ্চয় আমার চেয়ে বেশী চা খাওনা। শেরে বাংলার গল্পটা জানোতো। নির্বাচনি প্রচারে যেয়ে মাঝরাতে ক্ষিধেয় যখন সবার নেতিয়ে পড়ার হাল, তখনি সুসংবাদ এলো ছুটে যাওয়া জবাইয়ের খাশিটা এইমাত্র ধরা গেছে। এখানে ছুটে যাওয়া মোরগ টোরগ ধরা পড়লেও পড়তে পারে, তবে চায়ের আশা করো না। কেন ওখানে বিস্কুট আর শরবৎ খাওনি?

– খেয়েছি। ডিসেম্বরের শীত, তার সাথে মিলিয়ে ঠাণ্ডা শরবৎ, মন্দ না।

আমরা ডুমুরিয়া প্রপারে পৌঁছে সেই হোটেলে ঢুকলাম। ওখানে তখন বেশ কিছু লোক। নিচু গোলে ছাওয়া ঝুপড়ির ভিতর ক্যাশের টেবিলে কালি পড়া হারিকেন টিম টিম করে জ্বলছিল, লোকগুলোর মুখ পর্যন্ত ভালভাবে দেখা যায় না। ওরা হারিকেনটা সালাহউদ্দিন ভাইয়ের টেবিলে রেখে গেল। তার থমথমে মুখের ভাজগুলো বড় স্পষ্ট ভাবে দেখা যাচ্ছিল। এখানে এসেই আমরা সবুরের গুন্ডাদের হাতে নৌকার এক কর্মীর বেধড়ক মার খাওয়ার দুঃসংবাদ পেয়েছি, ভয়ে তাকে চিকিৎসার জন্য খুলনায় নেয়াও সম্ভব হচ্ছেনা, তারা সালাহউদ্দিন ভাইয়ের জন্য অপেক্ষা করছে।

সালাহউদ্দিন ভাই নিচুস্বরে বললেন, সমস্যাটা কি বুঝতে পারছ? এই রাতে আমাদের সাথে ওকে নিলে আমাদের গাড়িও আক্রান্ত হতে পারে। আর না নিয়ে গেলে স্থানীয় লোকদের মধ্যে তুমি একটা বাজে ধারণা রেখে যাচ্ছ যে, সবুরের গুন্ডাদের মোকাবেলা করারক্ষমতা তোমাদের নেই! পুলিশ এখনো আমাদের কথা শোনেনা, যতটা শোনে সবুরের কথা। সব গ্রামেই একই হাল। আবার দেখো, আমাদের হাতে সবুরের মত গুন্ডাপান্ডাও নেই, জনসমর্থন আছে, কিন্তু জনতা গুন্ডাদের সামনে সহসা দাঁড়ায় না। একটু ভেবে তিনি বললেন– ঠিক আছে, যখন যাবো দেখা যাবে।

আমি জিজ্ঞাসা করি, ভাই ডুমুরিয়া তো নকশাল প্রভাবিত এলাকা। ওরা তো নির্বাচনের বিরুদ্ধে ছিল, আমাদের নিয়ে ওরা কি ভাবছে বলে মনে হয়? সবুরের গুন্ডারা এভাবে মারল লোকটাকে, ঘটনার পেছনে ওদের ইন্ধন নেই তো?

সালাহউদ্দিন ভাই কিছুক্ষণ নিরব থেকে বলেন– সবুরের গুন্ডারা একাই একশ। তবে নকশালদের বুঝে ওঠা কঠিন, যাহোক এখনো পর্যন্ত তো কোনো ডিস্টার্ব করেনি। আমাদেরস্থানীয় নেতারা ওদের সাথে কথাবলেছে, তেমন অসুবিধা হবেনা বলেই শুনেছি।

এখানে সংক্ষিপ্ত আলোচনার কথা ছিল, তেমন জমলনা। সবাই ভারাক্রান্ত, আহত লোকটাকেঅদূরে ডিঙ্গি নৌকায় শুইয়ে রাখা হয়েছে। সালাহউদ্দিন ভাই সহসা উঠে পড়েন, আমরা তার সাথে খালপাড়ে গেলাম। লোকটাথেকে থেকে কাতরাচ্ছিল। ভাই বললেন আপনারা দু-তিনজন থানায় যান, দারোগাকে আমারকথা বলেবলুন যে আহত লোকটাকে আপনারা নৌকায় খুলনা সদর হাসপাতালে নিয়ে যাবেন, পথে যাতে কোনঝামেলা না হয় সেটা তিনি আপনাকে দেখতে বলেছেন, কাল সকালে তিনি খবর নেবেন।

পরদিন প্রচারে যেয়ে আমরা খুবই আমোদিত হলাম। দারোগা সাহেব একরূপ হতদন্তহয়ে ছুটে এলেন, সালাহউদ্দিন ভাইকে জবরদস্ত এক স্যালুট ঠুকে বললেন আপনার ম্যাসেজ সময়মতই পেয়েছিলাম স্যার, সব ব্যবস্থাই নিয়েছি, খবর তো পেয়ে গেছেন স্যার।

– সে তো বুঝলাম, আপনার এলাকায় আমার কর্মীকে গুন্ডাপান্ডারা পিটিয়ে আধমরা করে ফেলল, আপনার মাথাব্যথা নেই। থাকবে কেন! সবুর সাহেবের পিছনে ছুটতে ছুটতে আপনাদের কোমরের বেল্ট ঢিলা হয়ে যায়, লোকেরা কেমন আছে কিভাবে আছে তা জানার ফুরসত কোথায় আপনাদের!আমিএখানে গ্রাম-গঞ্জ চষে বেড়াচ্ছি, নিজেই তো দেখছি কি বিপদজনক হাল বানিয়েছেন এলাকায়। মনে হয়না এখানে থানা-পুলিশ আছে। বোঝাযাচ্ছে পরিবর্তনের হাওয়াটা এখনো টেরই পান নি।

– স্যার স্যার, কি যে বলেন স্যার! তিনি আমতা আমতা করতে থাকেন।

সালাউদ্দিন ভাই এবার কর্তৃত্বের সুরে বললেন– অতীত ভুলে যান সাহেব, ঠিকভাবে দায়িত্ব পালনকরুন। আমাদের কর্মীরাও যাতে নির্বিঘ্নে কাজ করতেপারে সেটা দেখবেন আশা করি।

– জ্বি স্যার, ঠিকই বলেছেনস্যার, আমি ভরসা পেলাম।

আমরা ইন্টিরিয়রে যাওয়ার জন্য জীপে উঠলাম। লোকজন মহা খুশি। উৎসাহের আতিশয্যে একজন বলে উঠল–ভাই, আপনি এভাবে থানাটা একটু সামাল দিতে পারলে সবুরের গুন্ডাপান্ডারা লুকানোর জাগাপাবিনানে।

সালাহউদ্দিন ভাই মাঝে দু'দিন ফুলতলায় নিবিড়ভাবে নির্বাচনী প্রচার চালাবেন বলে মনস্থ করলেন। ফুলতলা তার নিজের এলাকা, এখানে ছাত্র ও রাজনৈতিক কর্মীর অভাব নেই। আমাদেরও ফুলতলায় যাওয়ার প্রয়োজন হত না। আমরা অফিস সামলাতাম। একদিন ফুলতলা যাওয়ার আগে বললেন তোমরা এখন ডুমুরিয়া যাও, কিছু পোস্টার লিফলেট পৌছে দিয়েএসো আর ওদের ওখানে নাকি কিসব সমস্যা দেখা দিয়েছে। কি আর করা, লিখে নিয়ে এসো, কিছুই তো আর করতে পারবনা। সব জায়গায় শুধু সমস্যা আর সমস্যা, মাথা খারাপ হওয়ার যোগাড়।

আমরা বেবিট্যাক্সিতে দৌলতপুর-শাহপুর হয়ে ডুমুরিয়া গেলাম। তখন সেটাই ছিল সহজ পথ। আমাদের ধারণা ছিল পেস্টারগুলো হস্তান্তর করে এবং এবং কিছু নোট নিয়ে দ্রুত ফিরে আসা যাবে। কিন্তু ওরা যখন বুঝতে পারল ডাবলু ছেলেটা হিন্দু এবং ছাত্রলীগের জেলা কমিটির সাধারন সম্পাদক, তাদের এলাকায় যাওয়ার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাল। এলাকাটি হিন্দু অধ্যুষিত। সেখানে ভাসানী ন্যাপ ও নকশালদের জোর প্রভাব। তারা আওয়ামী লীগকে সাম্প্রদায়িক দল বলে প্রচার করত এবং আওয়ামী লীগ বর্তমানে যে ধর্ম নিরপেক্ষতা ও বাঙালি জাতীয়তাবাদের কথা বলছে তা কেবল লোক দেখানো, হিন্দু ভোটের লোভে, বাস্তবে তাদের দলে উচ্চপদে কোন হিন্দু নেই এবং নির্বাচনের পর তারা হিন্দুদের উপর মুসলিম লীগের মতই জঘন্য আচরণকরবে।

যদিও সশস্ত্র নকশাল ক্যাডারদের ব্যাপারে আমাদের বেশ ভয় ছিল তবুও তাদের দাবী উপেক্ষা করা সম্ভব হলনা। আমাদের যেতে হল খাল পথে ছোট ডিঙ্গি নৌকায়।এ এক নতুন অভিজ্ঞতা। খালপাড়ের বিক্ষিপ্ত গ্রাম, গ্রাম্য জীবন, অবারিতবিল দেখতে দেখতে খুব দ্রুতই আমরা উদ্দিষ্টে পৌছে গেলাম। সুন্দরভাবে গোবরে লেপা এক উঠানে হোগলার পাটিতে আমাদের বসতে দেয়া হল। এখানে সুশান্ত নায়ক, তাকে ছাত্রলীগ জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক হিসাবে পরিচিত করানো হল।সে ছোটখাটো সুন্দর একটা বক্তুতা দিল। সে ভাষা আন্দোলন থেকে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা পর্যন্ত ঘটনাবলীর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা ও ব্যাখ্যা দিয়ে বলল বঙ্গবন্ধু এবং তার হাতেগড়া ছাত্রলীগ ও আওয়ামী লীগই প্রকৃতপক্ষে বাঙালি জাতীয়তা ও অসম্প্রদায়িক রাজনীতির ধারক এবং চালিকাশক্তি। দীর্ঘ ২৩ বছর পর একটা সুযোগ এসেছে, আপনাদের প্রতি অনুরোধ– কোন অপপ্রচারে বিভ্রান্ত হবেন না, ভোটকেন্দ্রেঅবশ্যই যাবেন এবং সুযোগটা কাজে লাগাবেন। ওরা আবার ডিঙ্গি নৌকায় আমাদের ফিরিয়ে দিয়ে গেল, উৎফুল্লভাবে বলল– সুশান্তদা, খুব ভাল কইছেন কিন্তু, কাজ হবেনে।

ওরা আমাদের বাতাসা, কদম ও নারকেলের নাড়ু খেতে দিয়েছিল। যখন দৌলতপুর পৌছালাম দুপুর অনেকটাই গড়িয়ে গেছে। খিদেয় পেট চোঁ-চোঁ করছে। সুশান্ত বলল বাড়ি পৌছাতে এখনো কমপক্ষে এক-দেড় ঘন্টা লাগবে, তারপরও বাড়িতে ভাত পাব কিনা সন্দেহ আছে। বললাম চল একটা হোটেলে ঢুকি।

হোটেলে বোয়াল মাছ এবং মাংস ছিল। আমরা কেউই বোয়াল মাছ খাইনা, সুশান্ত জিজ্ঞাসা করল, কিসের মাংস? ব্যস্ত মেছিয়ার আমাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুযোগ দিয়ে হন হন করে অন্য টেবিলে চলে গেল। সুশান্তকে বললাম– তুমি যদি খেতে চাও ওটা খাশির মাংস, আর যদি খেতে না চাও, গরুর মাংস হলেও হতে পারে। আমি মেছিয়ারকে ডাকলাম এবং সর্বশেষ বিকল্প-সবজি ও ডালের অর্ডার দিলাম।

নির্বাচনের তখনও ৪–৫ দিন বাকি। সালাহউদ্দিন ভাই তালায় ব্যাপক প্রচারের পরিকল্পনা নিলেন। মঞ্জু ভাই এবং আরো দু'একজন অ্যাডভোকেট সালাহউদ্দিন ভাইয়ের সফর সঙ্গী হবেন। আমি হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। এই শীতেররাত বাইরে কাটানো যে কি কষ্টকর তা এর মধ্যে হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছি।

তাদের দুপুরের পর রওনা দেয়ার কথা। অপরাহ্নে চুকনগরে ডুমুরিয়ার সব ইউনিয়ন নেতাদের গুরুত্বপূর্ণ সভা। পরদিন ভোরে তালার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়বেন তারা। আমি সাড়ে চারটার দিকে পুরানো বন্ধুদের সাথে দেখা করার জন্য সুইটহাউসের উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে বেরোলাম। আমি যখন সালাহউদ্দিন ভাইয়ের বাড়ির কাছাকাছি পৌঁছালাম খায়বার সাহেবের জীপটা তার বাড়ির সামনে দাঁড়ানো দেখে বিস্মিত হলাম। আরো বিস্মিত হলাম সালাহউদ্দিন ভাইকে ক্রুদ্ধভাবে রাস্তায় একবার এদিক একবার ওদিক পায়চারী করতে দেখে। আমি ঘড়ির দিকে তাকালাম। তাদের এ সময় যশোরের রাজঘাট হয়েচুকনগর অথবা কাছাকাছি কোথাও থাকার কথা। সালাহউদ্দিন ভাই আমাকে দেখে বারুদের মত ফেটে পড়লেন– এই তোমার আসার সময় হল!

থতমত খেয়ে বললাম, ভাই আমার তো আসার কথা ছিল না।

হ্যা, তোমার আসার কথা না, যাদের আসার কথা তারা কেউ আসছে না। তোমার মঞ্জু ভাই, তার মহা গুরুত্বপূর্ণ কেস ডেফার হয়েছে কাল পর্যন্ত। আর একজনের বিশেষ এক আত্মীয় হঠাৎ অসুস্থ, তিনিও আসতে পারবেন না। এদের সাথে যিনি 'পিকনিকে'যাচ্ছিলেন, তার পিকনিক জমবে না,খামোখা কেন যাবেন! বুঝলে তো কেমন নির্বাচন করছি! তুমি আর ডাবলু চল। ওঠো গাড়িতে।

বুঝলাম ভাইকে আর চটানো ঠিক হবে না। বললাম, পনেরো মিনিট টাইম দেন ভাই, বাড়ি থেকে গরম কাপড় নিয়ে আসি, মাকে বলে আসি।

আমি এখনি চলে যাবো। উঠলে ওঠো, নইলে দুর হও সামনে থেকে!রাস্তার পূবপাশ দিয়ে গায়ে চাদর জড়ানো এক ভদ্রলোক দক্ষিণমুখো হাঁটছিলেন, চেঁচামেচি শুনে থমকে দাঁড়ালেন। কাকতালীয়ভাবে, তিনি আমার বাবা, জজ কোর্টে চাকরি করেন। অফিস ছুটির পর বাড়ি ফিরছেন। অ্যাডভোকেট সালাহউদ্দিন সাহেবকে বিলক্ষণ চেনেন। তার চোখে মুখে বিস্ময়। কি এমন ঘটেছে যে এই মেজাজিউকিল সাহেব তার ছেলেকে রাস্তায় ফেলে এভাবে ধমকাচ্ছেন।

বাবার সাথে তখন আমার বেশ দূরত্ব। এক ছাদের নিচে থাকি। কদাচিৎ দেখা হয়, কথা হয় আরো কম, কালেভদ্রে। সবকিছুর মূলে আমার রাজনীতি। সেখানেও ব্যর্থতা। তবে অত সব দেখার সময় কোথায়? একছুটে রাস্তা পার হয়ে তার কাছে যেয়ে বললাম–আব্বা চাদরটা দেন, মাকে বলবেন, তালায় যাচ্ছি, ফিরতে দু'একদিন লাগতে পারে। বাবা নিঃশব্দে চাদরটা খুলে দিলেন, পকেট হাতড়ে দুটো দশ টাকার নোট বাড়িয়ে দিলেন। আমি এক ছুটে গাড়িতে যেয়ে উঠলাম।

গাড়িতে সালাহউদ্দিন ভাই এর সিটের পিছনের সিটটা সবসময় খবিরের দখলে থাকে। সে ছিল নোংরার হদ্দ। তার গাথেকে মাঝে মাঝে বোটকা গন্ধও পাওয়া যেত। আমরা রাগারাগি করলে সালাহউদ্দিন ভাই বলতেন ওকে ঘাটিও না। সে আমাদের সাথে বিশেষ কথা বলত না। ড্রাইভারের কাছে শোনা, তার কাছে নাকি বড় ড্যাগার আছে, খোলার সময় ক্যার ক্যার শব্দ হয়- ভয় ধরানো!আমি দীর্ঘদিন ছাত্র রাজনীতির সাথে যুক্ত, অনেক মারামারিও দেখেছি। ক্ষেত্রবিশেষে এ ধরনের টাফ লোকদের প্রশ্রয়ও দিতে হয়েছে। কিন্তু সে সময় কি রাজনৈতিক, কি ছাত্র সংগঠন কেউই ওদের মাথায় উঠতে দিত না। ডাবলুর বয়স কম ছিল, গুছিয়ে কাজ করতে সমর্থ ছিল এবং সালাহউদ্দিন ভাইয়ের খুলনা অফিস ভালই সামলে রেখেছিল। সে খানিকটা ভয়, খানিকটা ঘৃণা থেকে খবিরকে এড়িয়ে চলত। কিন্তু শীঘ্রই খবির সম্পর্কে তার ধারণা পাল্টে যায়।

আমরা চুকনগর বাজারে পৌঁছালামরাত সাড়ে আটটার দিকে। সভা পরদিন বিকাল পর্যন্ত পিছানো হয়েছে। হামিদ সাহেবের দোতালায় আমাদের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা ছিল।পরদিন ভোরে তালায় যাওয়ার কথা।সাড়ে আটটার মধ্যে প্রস্তুত হয়ে আমরা নাস্তা করতে নামলাম।বাজারে দু তিনটা হোটেল ছিল। বিস্ময়ের ব্যাপার, একটা মাত্র হোটেলে কড়াইতে ১৫-২০টা রসগোল্লা এবং ছোট এক কাঁচের আলমারিতেআড়াই পাউন্ড প্রায় শক্ত হয়ে যাওয়া পাউরুটি পাওয়া গেল। তখন পিস করা পাউরুটি পাওয়া যেত না এবং আমরা নিশ্চিত হলাম যে আমাদের আসার আগে দোকানদার রসগোল্লার কড়াই থেকে অন্তত গোটা চারেক মৃত তেলাপোকা উঠিয়ে বাইরে ফেলে দিয়েছে এবং আলামত গোপনের কোন চেষ্টাই করেনি। সেগুলো দোকানেরপাশে সবুজ ঘাসের উপরঊর্ধ্বপদ নিশ্চল পড়ে আছে। দোকানদার দু'পাউন্ড পাউরুটি একটা রংচটা টিনের বাসনে সাজিয়ে আমাদের টেবিলে রাখল এবং ওর একটার গলা চেপে ধরে মাঝারি সাইজের চাকু দিয়ে যথাসম্ভব সুন্দর করে কাটতে শুরু করল। সালাহউদ্দিন ভাই বললেন, আগে একটা কাটো, টেস্ট করে দেখি। আমাদের দ্বিতীয় দফা পাউরুটি বা রসগোল্লা কোনটাই চেখে দেখার ইচ্ছা জাগেনি। ঘোষ মশায়ের খাবার, সালাহউদ্দিন ভাইয়ের পয়সা দুটোই সেযাত্রা রক্ষা পেল। অবশ্য ভবিষ্যৎ দেখার ক্ষমতা যদি আমাদের থাকত বাকি রসগোল্লা ও পাউরুটি আমরা পরম যত্নে তখনি জীপে উঠিয়ে নিতাম।

তালায় ঢোকার কিছু আগে আমরা এক বাড়ির পাশে দাঁড়ালাম, বাড়িটা উচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। খাটো কালো কোট পরা এক পৌঢ় ভদ্রলোক বেরিয়ে এসে গাড়িতে উঠলেন। সালাহউদ্দিন ভাই বললেন– আগে আবার একটু ভিতরে যান, ভাবিকেআমার সালাম দিয়ে বলেন– আমরা আড়াইটে তিনটের দিকে ফিরব, পাঁচ ছ জন লোকের মত ডাল-ভাতের ব্যবস্থা যেন রাখেন, শুধু ডাল-ভাত। তালা ডুমুরিয়ার দুর্ভিক্ষ অবস্থা তখন সবারই জানা, অতিরিক্ত কিছু কেউ আশা করত না।

তিনি বললেন, তা না হয় হল, কিন্তু তালার চেয়ারম্যান কি না খাইয়ে ছাড়বে।

– শোনেন মাস্টার সাহেব, হাসি মুখের ডাল-ভাতে অমৃতের স্বাদ পাবো, কিন্তু গোমড়া মুখের কোর্মা পোলাওআমাদের রুচবে না, তারপরও তার সম্পর্কে এখন নানা কথা কানে আসছে।

তালায় চেয়ারম্যান অফিসে দীর্ঘক্ষণ মিটিং হল। সর্বত্র একই সমস্যা। দূর প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে ভোটারদের ভোট কেন্দ্রে উপস্থিত করাটাই বড় সমস্যা। নভেম্বরের ভয়াবহ ঝড় জলোচ্ছ্বাসে পানির তোড়ে সর্বত্র ভেড়িবাঁধ ভেঙ্গে গেছে। বাঁধের উপর দিয়ে পায়চলা পথ বিচ্ছিন্ন। অনেক জায়গায় খালের উপর বাঁশের সাঁকো ভেঙ্গে গেছে। আবার শীতের কারণে অনেক এলাকায় খাল বিল শুকিয়ে যওিয়ায় ডিঙ্গি বা নৌকায় লোকজন আসবে তারওউপায় নেই। এ অবস্থায় ভোট কেন্দ্রে লোকজন জোগাড় করে আনতে বেশি কর্মী প্রয়োজন। সমস্যা আরো আছে–সবুর সাহেবের গুন্ডাপান্ডাদের ভয়, জামাতের ধর্মের নামে বিভ্রান্তি ছড়ানো, পোস্টার লিফলেটের স্বল্পতা, নির্বাচনি অফিসের স্বল্পতা, কর্মীদের আপ্যায়ন, সাইকেল ভাড়া, সমস্যার অন্ত নেই।

কেউ কেউ সালাহউদ্দিন ভাইকে তাদের এলাকায় যাওয়ার জন্য বারবার তাগিদ দিচ্ছিলেন– এতে লোকজন উৎসাহ পাবে, তাদের সাহস বাড়বে, আবার জামাতের ধর্মীয় ভাওতার মুখোশও খুলে দেয়া যাবে। আমি উদ্বিগ্ন ছিলাম ভাই আবার রেগে না যান। তবে সেটা অমূলক ছিল। তিনি বললেন– আজ এবং কাল সময় আছে, কিছু যায়গায় অবশ্যই যাব, তবে কতদূর কভার করতে পারব জানিনা।ডাবলু বিভিন্ন এলাকার নেতা কর্মীদের মধ্যে কিছু কিছু পোস্টার, লিফলেট, ব্যালট পেপারের নমুনাইত্যাদি সরবরাহ করতে যেয়ে গলদঘর্ম হল। একজন প্রৌঢ়ডাক্তার তালা এলাকায় সালাহউদ্দিন ভাইয়ের নির্বাচনী প্রচারের অন্যতম সমন্বয়ক ছিলেন, ডাবলুকে গাইড করলেন। সবাইকে সতর্ক করে বললেন– লিফলেট পোস্টার সাবধানে নিতে হবে, সবুরের লোকেরা যেন গাপ করে না দেয়, আর এমন জায়গায় টাঙাতে হবে সবাইযেন দেখতে পায়।

আমি কিছুক্ষণ আগে পথের দুপাশের দোকানগুলো ঘুরে এসেছি, হতভম্ভ হওয়ার মত ব্যাপার, একটা দোকানেও একমুঠো মুড়ি পর্যন্ত নেই। এটা আমাকে ভাবিয়ে তুলেছিল, কিছুটা অন্যমনস্ক ছিলাম, এক মাঝবয়সী লোক পাশে এসে দাঁড়ালেন, কিছুটামলিন এবং বিমর্ষ, মৃদুস্বরে বললেন– সাহেব আপনারা মিজান আর কেতাব মার্কা নিলেন না কেন? ঐ মার্কা নিলে কত ভাল হত, হাজার হোক আল্লার মার্কাতো। বললাম, কি বলছেন এসব! আল্লার কেতাব এবং মিজান তোপরম পবিত্র জিনিষ, আমাদের নির্বাচনে তা দলের মার্কা হতে যাবে কেন? নির্বাচনে আদৌএসব মার্কা নেই। যা আছে তা শ্রেফ বই আর দাড়িপাল্লা। যারা এগুলোকে আল্লার কেতাব আর মিজান বলে প্রচার করছে তারা মানুষকে ভাওতা দিচ্ছে এবং মহা গোনার কাজ করছে।

– কিন্তু সাহেব, যারা এখানে জামাতের প্রার্থীর পক্ষে কাজ করছে তারা তো বলছে এই মার্কা আল্লার কেতাবে লেখা আছে, প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য এই মার্কায় ভোট দেয়া।

– শুনুন ভাই, কিস্তির কথাও কেতাব কোরানে আছে। কিস্তি মানে নৌকা।কিন্তু আওয়ামী লীগ কি ওভাবে প্রচার করছে? করছে না, কারণ তারা ধর্মের নামে মানুষকে ভাওতা দেয়না। প্রার্থীরা যেসব মার্কা পেয়েছেন– নৌকা, বই, দাড়িপাল্লা, হারিকেন অথবা কুড়েঘর সবই দুনিয়ার মামুলি জিনিষ। সাধারণ মানুষ যারা নাম পড়তে পারেনা তাদের ভোট দেয়ার সুবিধার জন্য প্রার্থীর নামের পাশে মার্কাগুলো দেয়া আছে যাতে উম্মি মানুষ মার্কা দেখে পছন্দেরপ্রার্থীকে ভোট দিতে পারে।

ভদ্রলোক হতভম্ভ দশা কাটিয়ে তাড়াতাড়ি বললেন, তাহলে সাহেব এই কথাগুলো আপনারা লোকদের বুঝান।

আমরা অবশ্যই চেষ্টা করব, তবে আপনি আমাদের চেয়ে এলাকার লোকদের বেশি চেনেন, আপনাকেও এটা সবাইকে বোঝাতে হবে। ভদ্রলোক বিদায় নিলেন।

দেড়টা বেজে গিয়েছিল। ক্ষিধেয় সবার পেট পেট চো চো করছে। সেই সকালে চুকনগর বাজারে বাসি শক্ত দু পিস পাউরুটি আর একটারসগোল্লা খেয়ে বেরিয়েছি, তারপর এ পর্যন্ত দু এক গ্লাস পানি ছাড়া পেটে কিছুই পড়েনি। এখানে কেউ এক কাপ চাও খাওয়ায় নি। ডাবলু পোস্টার বন্টন করতে করতে বলল, দেখেন না ভাই একটু চা সিঙ্গাড়া পাওয়া যায় কিনা। বললাম, আমি আগেই সে চেষ্টা করেছি, তালার সব চায়ের দোকান, হোটেল, মুদিখানা কোনটাই বাদ রাখিনি। সব আছে, কেবল এক কণা খাবার কোথাও নেই, না মুড়ি না কলা। লজেন্স বিস্কুট বাতাসা পর্যন্ত নেই। অবিশ্বাস্য, দুর্ভিক্ষ এলাকা, তাই বলে এমন! দেখলাম সালাহউদ্দিন ভাই মুখ গম্ভীর করে এদিকে আসছেন। পাছে আর সুযোগ না পাওয়া যায়, তাড়াতাড়ি বললাম ভাই, দেড়টা তো বেজে গেল, সবাই খেতে চায়, কিন্তু তালার কোন দোকানে এক মুঠো মুড়ি পর্যন্ত নেই।

সালাহউদ্দিন ভাই চাপা স্বরে বললেন– তা তুমি কি করতে বল আমাকে, আমি এখন খুলনার মুড়ি পট্টিতে যেয়ে মুড়ি আনব!আমার হতভম্ভ ভাব লক্ষ্য করে তার বোধ হয় করুণা হল, বললেন শোনো আমি সকাল থেকে চেয়ারম্যানকে কয়েকবারনাস্তার কথা বলেছি, খাওয়ার কি ব্যবস্থা তাও জিজ্ঞাসাকরেছি, সে শুনতেইপায়নি। সে তখন হয় অন্যের কথা শুনতে, নয়তো আমাকে তারগাদা গাদা সমস্যার কথা বলতে ব্যস্ত। অপেক্ষা কর, ফেরার পথে ব্যবস্থা তো করাই আছে।

বললাম ভাই এদিকে ড্রাইভারখুবসমস্যা করছে, সে দু'ফাইল ফেনসিডিল চায়, তার নাকি অসুখ।

সালাহউদ্দিন ভাই অস্ফুট স্বরে উচ্চারণ করলেন– বদমাশ একটা!

– আমি বলেছি এক ফাইল নাও, এটা শেষ হতে তো দু'তিন দিন লেগে যাবে। না, তার এখনিই দু'বোতল চাই।

– তুমিকি বোঝোনা নাকি? তার একসাথে দু ফাইলই লাগবে, তোমার কাছে পয়সা থাকলেকিনেদাওগে। নইলে পথে অ্যাকসিডেন্ট-ফ্যাকসিডেন্ট ঘটিয়ে বসতে পারে।

সালাহউদ্দিন ভাই ফিরে গেলেন। খবির বলল, ও তো একটা নেশাখোর, এটা দিয়ে নেশা করে, বোঝেন না?

আমরা তখন সর্দি-কাশি হলে দু'এক চামচ ফেনসিডিল খেতাম, অফিসের ডিসপেনসারি থেকেই পাওয়া যেত, কিন্তু সেটা যে নেশারও বস্তু এই প্রথম জানলাম। আমি খবিরের হাতে টাকা দিয়ে বললাম, যা চায় কিনে দাও গে।

আমরা গাড়িতে উঠলাম, গাড়ি তালা প্রপার ছাড়িয়ে ভিতরের দিকে চলা শুরু করল। তিনটা সাড়েতিনটা বাজতে তখনো দেড় দু ঘন্টা বাকি।সালাহউদ্দিন ভাই বললেন সামনে দু'এক জাগায় যেতে হবে, হিন্দু এলাকা, অভয় না দিলে সবুরের লোকজনের ভয়ে কেউ ভোট কেন্দ্রে যেতে সাহস পাবে না। একটা জনসভাও আছে ভিতরে, এখানে জনসভা করা মোটেও সহজ ব্যাপার না। এরা সাহস দেখিয়েছেন, আমাদের যাওয়া জরুরী। আমাদের সাথে স্থানীয় একজন নেতা ছিলেন, বললেন–কিছুটা সামনে গেলে মুদিখানা আছে, মুড়ি বাতাসা পাওয়া যেতে পারে।

কিছুদূর যেতেই এক ভাঙ্গাচোরা মাটির ঘরের সামনে একরাশ ধূলা উড়িয়ে গাড়িটা ব্রেক কষে দাঁড়ালো। অপরিসর দাওয়ার অর্ধাংশ জুড়ে ছোট আগোছালো মুদিখানা। আমরা নেতিবাচক উত্তরের জন্য প্রস্তুত ছিলাম, দোকানদার হতাশ করল না, বলল কিছু নেই বাবু। আমাদের পথপ্রদর্শক তার সাথে তর্ক জুড়ে দিল– দুর্ভিক্ষ হইছে, তাই বইলা মুড়ি টুড়িও থাকবে না! বিহানেও তো খাইয়া গেছি।

– হ খাইছ। না খাওয়া মানুষ তো আরো ছেল, তারা খায়ে গেছে, কি কবা? সে হঠাৎ নরম হল, বলল আপনারা মেহমান মানুষ, থাকলি কি দেতাম না।

ডাবলু আমাদের সঙ্গের ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করল, আপনাদের ওখানে দোকান নেই? সেখানে কিছু পাওয়া যাবে না?

– না, ভাইডি।তারপর সে অধোবদন হয়ে বসে রইল।

রাস্তার কোথাও ভাঙ্গা, কোথাওখোয়া ওঠা, কোথাও উচু নিচু মাটি– প্রচন্ড ঝাকুনি এবং ধুলার মধ্যে আমাদের এগোতে হচ্ছিল। ক্ষুধা আমাদের ক্লান্ত করে ফেলেছিল। আমরা বিরক্তির চরমে পৌঁছে গিয়েছিলাম। তথাপি চুপচাপ ছিলাম। সেটা খানিকটা সালাহউদ্দিন ভাইয়ের মেজাজের কারণে, খানিকটা আমার শেরে বাংলা পড়াছিল তাই। পথে নির্ধারিত অনির্ধারিত অনেকগুলো জমায়েতে ভাই বক্তৃতা দিলেন। তার স্টামিনা বিস্মিত হওয়ার মত। গাড়ি চলা শুরু হলে সে কথা বলতেই বেশ গম্ভীর হয়ে বললেন, নির্বাচনটা তোমার হলে হয়তো ডাবলুই তোমার স্টামিনার প্রশংসা করত।

এক সময় মোড় ঘুরে আমাদের গাড়ি এক স্কুলের মাঠে এসে দাঁড়াল। তখন অপরাহ্ন অনেকটাই গড়িয়ে গেছে। শীতের সন্ধ্যা নামতে তেমনএকটা বিলম্ব নেই। সেই তালা থেকে শুনে আসছি এখানে একটা বড় সড় জনসভা হবে। স্কুল ঘরের সামনে নড়বড়ে একটা টেবিল পিছনে ততধিক নড়বড়ে তিনটে চেয়ার। টেবিলের সামনে আট দশজন কৌতুহলী বাচ্চা এবং নৌকার জনাকয়েক অকুতোভয় সৈনিক।

ভয়ে ভয়ে সালাহউদ্দিন ভাইকে জিজ্ঞাসা করলাম, লোকজন কি আমাদের দেরি দেখে চলে গেছে ?

একজন কর্মী বললেন– না, সবাই আছে, কিন্তু সভাপতি আসেননি, বাড়িতেও নেই। মরুকগে!

সভাপতিত্ব যার করার কথা তিনি ভয়ে আসেননি, তার ঘরে সোমত্ত মেয়ে আছে। তাকে সম্ভবত ভয় দেখানো হয়েছে। সঠিক ব্যক্তিই সভাপতির চেয়ারে বসলেন। তিনি স্থানীয় আওয়ামী লীগের সভাপতি। মাঝের চেয়ারে বসলেন সালাহউদ্দিন ভাই। তার পাশেগায়ে পুরানো বনেদি শাল জড়ান সমীহ জাগানো এক সফেদ বৃদ্ধ। তিনি সালাহউদ্দিন ভাইয়ের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করে চুপচাপ বসে রইলেন।

সভাপতি উঠে দাঁড়িয়ে অনভ্যস্ত–অবিন্যস্ত ভাষায় সালাহউদ্দিন ভাই এর পরিচয় দিলেন, বললেন– নৌকার গণজোয়ার এখন, এখনো যদি আমরা ভয় পাই তবে সাহস পাবো কবে? উনি থানা পুলিশ বাঁধবেন, ওনার অনেক ক্ষমতা, সবুর সাহেবের গুন্ডারা আমাদের কি করবে? আমরা যার বক্তৃতা শুনতে এসেছি–এখন বক্তৃতা করবেন আমাদের সেই প্রিয় নেতা সালাহউদ্দিন ভাই।সাথে সাথে শ্লোগান দিলেন– তোমার ভাই আমার ভাই: সালাহউদ্দিন ভাই সালাহউদ্দিন ভাই, তোমার দাবী আমার দাবী: ৬-দফা ৬-দফা, তোমার নেতা আমার নেতা: শেখ মুজিব শেখ মুজিব, জয় বাংলা। শ্লোগানের জবাবও তিনিই দিলেন। তার সাথে কণ্ঠ মেলালো মাঠের আট-দশটা কচি কণ্ঠ,কয়েকজন আওয়ামী লীগ কর্মী এবং আমরা কজন। আমি হতভম্ভ হয়ে গেলাম মাঠের বাইরে পথের উপর ইতঃস্তত বিক্ষিপ্তভাবে বড়জোর বিশ পঁচিশ জন লোক হাতের বন্ধ ছাতা অথবা লাঠি মাটিতে ঠেকিয়ে উবু হয়ে বসে আছে বটে, কিন্তু কেউ শ্লোগানের সাথেকণ্ঠ মিলালো না, নড়েচড়েও বসল না।। এ ধরনের 'বিশাল' জনসভায় ভাষণ দেয়ার জন্য এত কষ্ট করে এতদূর আসার অর্থ আমার বোধগম্য হলনা। পাশে দাঁড়ানো একজন কর্মীকে বললাম, মিটিং তো শুরু হয়ে গেল, লোকজন কি আর আসবে না?

– মনেকয় না, যারা আসার তারা আসি গেছে।

– এই মাত্র বিশ-পঁচিশ জন?

কি কন? মানুষ দেহেন না?ঐ যে রাস্তার ওপাশে সুপুরি বাগান,আগাছার ঝাড়– কিছু দেহেন ওহানে? মানুষজন দেহা যায়? ওরা মাঠে আসবি না। সবুর সাহেবের গুন্ডাগো ভয়!রাইতে ওগোর মায়ে-বউগো– থাউকওসব কথা। হ্যারা অনেক কিছুই করতে পারে। থানা পুলিশও ওগোর পক্ষে। এ বেচারারা কি করবো কন!

এটা ছিল আমার কাছে এক নতুন অভিজ্ঞতা। সেদিন সালাহউদ্দিন ভাই সন্ধ্যা পর্যন্ত বক্তৃতা করেছিলেন, শুধু স্থানীয় লোকজন নয়, আমরাও মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনেছিলাম। সে বক্তৃতা ছিল কখনো প্রশান্ত, কখনো জ্বালাময়ী। বললেন–পুলিশ যদি আসে ন্যায়ের পক্ষই আসবে, এটা আমি দেখব। ভয় পাবেন না, ভোট দিতে আসবেন সবাই। এবার ওদের গদি ঠিকই উল্টে যাবে। সবুরের লেঠেলরা লাঠি নিয়ে এলে আপনারাও লাঠি নিয়ে রুখে দাঁড়াবেন, ল্যাজা সড়কি নিয়ে এলে আপনারাও ল্যাজা সড়কি নিয়ে মোকাবেলা করবেন। এদেশ বাঙালির, হিন্দু-মুসলিম-বৌদ্ধ-খ্রীস্টান সকলের। আপনাদের ভয় পাওয়ার কিছু নেই। আপনারা নির্ভয়ে নৌকায় ভোট দিন। এর পরেরবার যখন আসব আপনারা বাগানে নয়, স্কুলের মাঠে বসেই বক্তৃতা শুনবেন আশা করি। জয় বাংলা।

চারদিকে অন্ধকার নেমে গেছে। আওয়ামী লীগ সভাপতি এবং আরো দু'তিন জন কিছুটা পথ এগিয়ে দেয়ার জন্য জীপে উঠলেন। সম্ভবত তার প্রয়োজনও ছিল। এক জায়গায় রাস্তাটা কিছুটা ভাঙ্গা। ঠিক মাঝখানে চারজন লোক দাঁড়িয়ে কথা বলছে, গাড়ির জন্য পথ ছেড়ে দেয়ার ইচ্ছা আছে বলে মনে হয় না। সভাফেরত লোকজন যারা যাচ্ছে, অচ্ছুতের মত সাইডে নেমে নালার ঝোপঝাড় ভেঙ্গে যাচ্ছে। তাদের উদ্দেশ্য কি ছিল জানি না, বলা কঠিন, তবে তলপেটে একটা শিরশিরে অনুভূতি আমাকে পীড়া দিতে থাকল। ওরা কয়েকজন ঝপাঝপ জীপ থেকে নামল, অন্যদের পিছনে ঠেলে খবির দুহাত পকেটে ঢুকিয়ে সামনে এসে দাঁড়াল, কয়েক সেকেন্ড ওদের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল–মিয়াভাই যে কথা কটা কইছেন মনে রাখবা, আখেরে ভাল হবে নইলে পস্তাবা।এত ছোট্টো এবং এমন কার্যকর বক্তৃতা আমি কখনো শুনিনি। ওরা ধীরে ধীরে পাশে সরে গেল। আমরা জীপ নিয়ে বেরিয়ে এলাম। শুনলাম এটা নাকি সবুর সাহেবের একটা পকেট। বললাম, আপনারা ফিরবেন কি ভাবে?

– কিছুটা এগিয়ে ভেতরে পায়েচলা পথ আছে, সেখানে আমাদের লোক আছে,ওদের সাহস হবেনা।

আমরা তালা প্রপারে পৌঁছে মজার সংবাদ পেলাম, খান সবুর জামাতের প্রার্থী অ্যাডভোকেট আনসার আলীকে সমর্থন জানিয়ে নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন। কিছুক্ষণ আগেও আমি সভায় সালাউদ্দিন ভাইয়ের টলটক নিয়ে চিন্তিত ছিলাম, কিভাবে তিনি সবুরের টাফ গুন্ডা, থানা পুলিশ এসব ঠেকাবেন। এখন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম, সবুরের গুন্ডারা পর্দার আড়ালে চলে যাবে, থানা পুলিশ জামাতের পক্ষে নয়, নিরপেক্ষতা অবলম্বনকরবে। কাজটা একেবারেই সহজ হয়ে গেল আমাদের জন্য।

চুকনগরের এক হৃদয়বান মানুষ

আমাদের গাড়িটা তালা ছেড়ে বেশ কিছুদূর এসে পাচীল ঘেরা বাড়িটার সামনে দাঁড়ালো, তখন রাত আটটা বেজে গেছে। এখানে বেলা তিনটা-সাড়ে তিনটায় আমাদের মধ্যাহ্ন ভোজে অংশ নেয়ার কথা ছিল। ক্ষিধেটা আবার চাগিয়ে উঠল। গোটা বাড়ি ছিল নিশুতি অন্ধকারে ঢাকা। গ্রামাঞ্চলে শীতের রাতে আটটা-সাড়ে আটটা গভীর রাতই বটে।একটা ছেলে বেরিয়ে এল, বলল–আব্বা তো বিকেলের দিকে বেরিয়েছেন, এখনো ফেরেন নি, কোথায় যেন মিটিং আছে, কখন ফিরবেন বলেও যাননি। চাচা, দুপুরে আমরা তো অনেকক্ষণ আপনাদের জন্য অপেক্ষা করেছি। ছেলেটা একটু থেমে লজ্জিতভাবে বলল, আমাদের রাতের খাওয়াও হয়ে গেছে। মা জিজ্ঞাসা করেছেন আপনারা কি কিছুক্ষণ বসবেন?

– না বাবা, আমাদের তো এখুনি ফিরতে হবে, তোমার বাবাকে বোলো। তার পর আমাদের উদ্দেশ্যে বললেন– চল চুকনগরে যাই। সবাই বিকাল থেকে অপেক্ষা করছে, তবে এখনো আছে কিনা কে জানে। নির্বাচনী প্রচারে এই এক জ্বালা, সময় ঠিক রাখা দায়।

আমরা নটা-সাড়ে নটার দিকে যখন চুকনগর পৌঁছলাম ততক্ষণে চারদিকে শীত রাতের গভীর সুপ্তি নেমে এসেছে। কোন দোকানপাট খোলা নেই। বন্ধ কপাটের আড়াল থেকে দু'একটা বাড়িতে কেবল ক্ষীণ আলোর রেখা চোখে পড়ে। সালাহউদ্দিন ভাই স্বগতোক্তি করে বললেন এরা আবার আমরা খুলনায় ফিরে গেছি ভেবে খাবারের ব্যবস্থা রেখেছে কিনা কে জানে।

আমরা হামিদ সাহেবের অফিসেফিরলাম। প্রশস্ত রুম। রুমের এক কোণেখাট টেবিল চেয়ার পাতা। বাকি অংশে ফরাস বিছানো। গোটা ফরাসজুড়ে লোকজন বিক্ষিপ্ত ভাবে শুয়ে ঘুমিয়ে আছে। একে একে তারা কাঁচা ঘুম ভাঙ্গার বিরক্তি নিয়ে উঠে বসতে থাকল। আমরাখাটের

কাছে ফরাসেরউপর জড়সড় হয়েবসলাম। সালাহউদ্দিন ভাই হামিদ সাহেবের খাটে গায়ে লেপ জড়িয়ে জাঁকিয়ে বসে বললেন– হামিদ সাহেব, আগে ছেলেগুলোর জন্য খাবারের ব্যবস্থা করেন, সারা দিন না খেয়ে আছে।

হামিদ সাহেব খানিক চুপ করে থেকে ইথারে আদেশ ছুড়ে দিলেন, ওরে কে আছিস, কিছু খাবারের ব্যবস্থা দ্যাখ। তারপর কাজের কথা পাড়লেন। একের পর এক সমস্যা কথা, এ এলাকার সমস্যা, সে এলাকার সমস্যা। কথার শেষ নেই। আমি সারাদিন ধরে এই একই বর্ণনা শুনে শুনেঅতিশয় ক্লান্ত। আমাদের সামনে এখন কেবল দুটো সমস্যা–খাবার এবং ঘুম। হামিদ সাহেবের 'কে আছিস' লোকটাকে দেখার আশায় চাতকের মত দরজার দিকে তাকিয়ে আছি, আধা ঘণ্টা হয়ে গেছে তবু কারো আগমণ অথবা প্রস্থান দেখা গেল না। খাটের পাশে সালাহউদ্দিন ভাই এর কাছেই বসে ছিলাম। বললাম ওনার লোক কিন্তু আসেনি।

তাই তো তাই তো, ব্যাটারাসব গেল কোথায়, আমি আবার ব্যাচেলর থাকিতো, ভারি সমস্যা। হামিদ সাহেব কথাগুলো বলতে বলতে আবার দারুণ উৎসাহেনির্বাচনী প্রসঙ্গে ফিরে গেলেন। সালাহউদ্দিন ভাই ফাঁকে ফাঁকে আরো দুবার তাকে স্মরণ করিয়ে দিলেন যে তারা সারাদিন না খেয়ে আছেন। পাহাড় প্রমাণ সমস্যার তলে তার সব আর্তি চাপা পড়ে গেল। আমার দিকে ফিরে ঝাঁঝের সাথে বললেন– অবস্থা তো বুঝতেই পারছ, এখন যাও, কোথাও জায়গা করে ঘুমিয়ে পড়ো গে। খালি পেটের ঘুম গভীর হয়।

এবার কথাটা মর্যাদা পেল, হামিদ সাহেব দেয়ালের পাশে উবু হয়ে বসে থাকা একজন লোককে ডেকে বলে দিলেন, এই নে চাবি, ওনাদের তুলা ঘরের গদিটা দেখিয়ে দে।

গদিটা যথেষ্ট প্রশস্ত ছিল। লোকটা আলমারি থেকে লেপ কাঁথা বালিশ বের করে দিল। লেপের তলায় আমি আর ডাবলু এবং কাঁথাটা নিয়ে খবির ও ড্রাইভার শুয়ে পড়ল। ছুরিধারী মাস্তান অথবা ফেনসিখোর ড্রাইভার কেউই তখন আমাদের দূরের নয়, তালার ভাঙ্গা পথটায় প্রয়োজনের মুহূর্তে তারা যাকরেছিল,আপন করে নেয়ার জন্য যথেষ্ট ছিল। ক্ষুধা এবং সারা দিনের ধকলেআমরা গভীর ঘুমে তলিয়ে গেলাম।

আমি জানিনা কত রাত হবে, মনে হল কে যেন ডাকছে, খানিকটা স্বপ্নের মত–সাহেব ওঠেন, রান্না হয়ে গেছে, খাবেন চলেন। কাঁচা ঘুম ভেঙ্গে উঠে বসলাম এবং দেখলাম স্বপ্ন নয়, সত্যি! একজন মাঝবয়সী লোক আমাদেরকে খাওয়ার জন্য ডাকছে। আমরা তার পিছু পিছু হামিদ সাহেবের দোতালায় উঠে গেলাম। ফরাস জুড়ে বিক্ষিপ্তভাবে লোকজন গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। এরা দূরের লোক, মিটিং শেষে ফিরে যেতে পারেনি। খাটের সামনের টেবিল চেয়ার সরিয়ে ফরাসের উপর কিছুটা জায়গা ফাঁকা করে সেখানে একটা গামলায় ভাপওঠা ভাত ডাল আলুভর্তা এবং ডিম সেদ্ধ দেখে হামিদ সাহেবের প্রতি কৃতজ্ঞতায় মনটা ভরে উঠল। ভেবে খুশী হলাম যে শত কাজের মধ্যেও কর্তব্য ভোলেননি।

অচিরেই ভুল ভাঙল, খেতে খেতে হামিদ সাহেব হঠাৎ পাশে দাঁড়ানো লোকটাকে জিজ্ঞাসাকরলেন– হ্যারে এসব কোথায় পেলি?

আমার অবাক হবার পালা, এই লোকটাই আমাদের ঘুম থেকে তুলে এনেছে। কনকনে শীতের মধ্যেও তার নগ্ন শরীরে একটা মলিন গামছা পেঁচানো, পরনে আড়াআড়ি ভাবে কাটা একটা লুঙ্গির অর্ধাংশ, বাকি অর্ধেক হয়ত তার ছেলের পরনে ব্যবহৃত হচ্ছে। যার এমন পোষাক, শীতের দিনে তার পায়ে চপ্পল থাকে না, নেইও। লোকটা বিগলিত হয়ে প্রায় হাত জোড় করে বলল–না সাহেব আমি এসব কনে পামু। ওনারা সারাদিন না খায়ে আছেন, ভাইজান বার বার দুটো খাবারের কতা কলেন। তা ভাবলাম আমাদের জন্যিই তো এত খাটতিছেন, তাই দোকানিগো ঘুম ভাঙ্গাইয়া কেউর থে চাল, কেউর থে ডাল, কেউর থে আলু, ত্যাল এসব লইয়া পাক করছি। তয় অবিশ্যি আপনের কতা কইতে হইছে। আপনেরে জিগাইলে এটটু কয়ে দিয়েন। সে পরম বিশ্বাসআর ভক্তিরসাথে কথাগুলো বলে গেল।

আমার অবাধ্য চোখ ঝাপসা হয়ে উঠল, অবশ হাতে গ্রাস থমকে গেল। আমি ভয় পেলাম, প্রচন্ড ভয়– তার কথাগুলো, আমরা যখন জিতে যাব, চাবুকের আঘাত হয়ে ফিরে আসবে নাতো! বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে সালাহউদ্দিন ভাইকে বললাম- ওনার কথাগুলো, ঐ যে বললেন 'আমাদের জন্য খাটতিছেন'- কথাটা মনে রাখা দরকার, খুবই দরকার।

ভাই বললেন, তুমিতো জানো আমি কোন বিত্তশালী পরিবার থেকে আসিনি, ভাত খাও।

আমরা আবার তুলা ঘরে ফিরে গেলাম। আমাদের আরামের গদি ততক্ষণে বেদখল হয়ে গেছে, সেখানে অন্তত আট দশ জন লোক বেঘোরে ঘুমোচ্ছে। আমাদের সঙ্গের লোকটা অবৈধ দখল মুক্ত করার জন্য প্রাণান্ত চেষ্টা করল, কিন্তু শীতের রাত বলে কথা। শেষে নাচার হয়ে বলল–ভাই, ওখানে তুলোর পাঁজা, ভাল গরম, ইচ্ছা করলি শুতি পারেন। ডাবলুর চাদর ছিলনা, বাবার চাদরটা আমরা ভাগাভাগি করলাম।

আমাদের ঘুম ভাঙলো বেশ বেলায় লোকজনের ডাকাডাকিতে। তারা হামিদ সাহেবের কর্মচারি ছিল, কিন্তু প্রণপণ চেষ্টা করেও হাসি সামলাতে পারছিল না। আমি সহসা এর কারণ খুঁজে পেলাম না। কিন্তু ওরা যখন আমাদের জামা কাপড় থেকে কিছু একটা ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা করল হতভম্ভ হয়ে গেলাম। আমাদের জামা কাপড় সোয়েটার চাদর মায় মাথার চুল পর্যন্ত তুষারের মত পেঁজাতুলায় মাখামাখি। অতি

কিম্ভূতকিমাকার অবস্থা! হাসি পাওয়ারই কথা। ওরা একজনদ্রুত গ্লাসে পানি নিয়ে এলো। আমরা সবাই হাত ভিজিয়ে ডলে ডলে তুলোগুলো তুলে ফেলার ব্যর্থ চেষ্টা করলাম।নাস্তা খাওয়ার জন্য দোতালায় উঠতেই আর একদফা হাসির রোল উঠল। হাসি চেপে হামিদ সাহেব ধমকে উঠলেন– থামো তোমরা! নির্লজ্জেরমতসবাই ফরাস দখল করে ঘুমিয়েছ, ওনারা থাকবেন কোথায়। তারপর আমার দিকে ফিরে বললেন, আমরা সত্যি দুঃখিত, তবে আপনারা তো পরিস্থিতি বুঝতেই পারছেন। তিনি আলমারি থেকে একটা কোট ঝাড়া ব্রাশ বের করে দিলেন।

আমাদের কাছে বাড়তি জামা কাপড় ছিলনা। আমরা কিছুটা ভদ্র হতে পেরেছি বটে, কিন্তু নির্বাচনী প্রচারে বেরোনোর মত নয়। বললাম, ভাই বাড়ি ফিরতে হবে।

হ্যা, তুমি ও ডাবলু ফিরে যাও। ওরা থাকবে। আজ মঞ্জু এবং আরো একজন আসছে। আমরা চা নাস্তা খেয়ে ডুমুরিয়া হয়ে খুলনার পথ ধরলাম।

তালায় চেয়ারম্যানের পক্ষ বদল

নির্বাচনের আগের দিন রিলাক্স মুডে ছিলাম। বিকালে সুইটহাউজ এবং জাহিদের বর্ণালী প্রেসে যাব বলে ভেবেছিলাম। বিভিন্ন নির্বাচনী এলাকার খবর জানার ইচ্ছা। কিন্তু বিধি বাম, দুপুরে সালাহউদ্দিন ভাই জরুরি তলব পাঠালেন। তিনি সারা দিন রেস্ট নেবেন বলেছিলেন। অথচ অফিসে থমথমে মুখে বসে আছেন। বললেন, যেটা সন্দেহ ছিল সেটাই ঘটেছে, তালার চেয়ারম্যান পক্ষ বদলেছে। সে এখন জামাতের কোঅর্ডিনেটর। অথচ আমার ভোটার লিস্ট, কাগজপত্র, টাকা পয়সা সবই তার কাছে। অবস্থা বুঝতে পারছো? তুমি এখনি তালায় যাও, চেয়ারম্যান এবং ডাক্তার সাহেবের সাথে কথা বল, কি করা যায় দেখো।

এ কদিনে আমি চেয়ারম্যানকে ভালই চিনেছিলাম। জানতাম আমি কেন স্বয়ং সালাহউদ্দিন ভাইও তাকে ফেরাতে পারবেন না। তবু সাথে সাথে রাজি হলাম শুধু সালাহউদ্দিন ভাইয়ের কথা ভেবে। অপরিচিত পথঘাট নিয়ে আমি সবসময় ভয়ে ভয়ে থাকি। তালা কয়েকবার গিয়েছি, কিন্তু গাড়িতে চুকনগর হয়ে। এখন সালাহউদ্দিন ভাই পথের যে বর্ণনা দিলেন তা বেশ জটিল এবং যেতে যেতে যে রাত হয়ে যাবে তা নিশ্চিত। তদুপরি আমি একা। তালার চেয়ারম্যানের সাঙ্গোপাঙ্গোদের এখন আমার কাছে এক একটা কঠিন চীজবলে মনে হতে থাকল। আমার ভরসা, চেয়ারম্যান ভালই জানেন জামাত প্রার্থী আনসার আলী আমার সহপাটি ছিল এবং আমাদের সম্পর্ক এখনো যথেষ্ট ভাল। সারাটা পথ এ ধরনের নানা সমিকরণ আমার মস্তিষ্ককে ব্যস্ত রাখলো। আমি চার দফা বেবিট্যাক্সি পাল্টে খুলনা থেকে দৌলতপুর, শাহপুর ও খর্নিয়া হয়ে চুকনগর পৌঁছালাম সন্ধ্যার দিকে।চুকনগর থেকে বাসে তালার মোড়। সালাহউদ্দিন ভাই বলে দিয়েছিলেন তালা প্রপারে যাওয়ার জন্য ওখানে হেলিকপ্টার পাওয়া যায়। পেলামও বটে হেলিকপ্টার। সাইকেলের পিছনে পুরু করে কাপড়জড়ানো ক্যারিয়ারে বসে আধা ঘন্টার আনন্দদায়ক ভ্রমণ শেষে যখন তালায় পৌঁছালাম তখন বেশ রাত। চেয়ারম্যান তার অফিস থেকে বেরিয়ে জোর কদমে কোথাও যাচ্ছিলেন, আমাকে দেখে থমকে দাঁড়ালেন– আপনি! আপনি এখানে কেন?

বললাম– কাল নির্বাচন, সালাহউদ্দিন ভাই তো আমাকে এই সেন্টারে থাকতে বলেছেন।কি কি কাজ করতে হবে বলুন, আপনাদের সাথে থেকে সহযোগিতা করব। রাত জাগতে আমার কোন অসুবিধা নেই।

বেশ রাগের সাথে তিনি বললেন– কি করবেন এখানে? কাকে চেনেন আপনি? কোথায় যাবেন? শুনুন, এখানে আপনার কোন কাজ নেই। ঠিক আছে এসেছেন যখন আমার বাড়িতে চলে যান, খেয়ে দেয়ে ঘুমিয়ে থাকুনগে।তারপর গলায় রঙচঙে মাফলার জড়ানো দশাসই এক যুবককে ডেকে তার হাতে আমাকেসঁপে দিয়ে হন হন করে চলে গেলেন। আমি যুবকের সাথে চেয়ারম্যানের বাড়িতে যেতে মোটেও ইচ্ছুক ছিলাম না। তাকে বললাম ওর চেয়ে বরং আপনাদের সাথে থাকতে আমার ভালই লাগবে, কর্মীরা কোথায় আছে চলুন সেখানে যাই।

এর মধ্যে খবর পেয়ে ডাক্তার সাহেব চলে এসেছিলেন। তিনি আমাকে একপাশে ডেকে নিয়ে বললেন– চেয়ারম্যান যা বলে তাই করেন। উনি ভেতরে ভেতরে পক্ষ বদলেছেন, যদিও ঘোষণা দেননি। তবে আমার কাছে সালাহউদ্দিন ভাইয়ের কাগজপত্র টাকা-পয়সা সব বুঝিয়ে দিয়েছেন। এখন সম্ভবতআনসার সাহেবের অফিসে গেলেন। যাকগে, ঝামেলার দরকার নেই, আপনি বরং ওর সাথেই যান। এখানে তেমন একটা অসুবিধা হবে বলে মনে হয়না।

চেয়ারম্যানের বাড়িতে গত রাত আমি নিষ্কর্মা বসে এবং ঘুমিয়ে কাটিয়েছি। এটা বিস্ময়কর যে এই ভরা জোয়ারে তিনি নৌকার হাল ছেড়ে হাতে দাড়িপাল্লা ঝুলিয়েছেন। ভদ্রলোক খুব ভোরে বেরিয়ে গেলেন, বলে গেলেন, ভাত নামছে, খেয়ে ভোট কেন্দ্রে যাবেন, তবে আপনাকে বলে রাখি এখানে নৌকা জিতবে না। তার এখানে খেতে রুচি হল না, যদিও জানতাম এখান থেকে না খেয়ে গেলে সারাদিন উপোস করেই

কাটাতে হবে। ব্যাগটা কাঁধে নিয়ে বেরোতে যাবো, দরজার আড়াল থেকে এক মহিয়সীর কণ্ঠস্বর ভেসে এল–'না খেয়ে যাবেন না বাবা, ওনার মতিগতি বোঝা ভার, এতকাল নৌকা নৌকা করে এখন হঠাৎ কেন যে দঁড়িপাল্লায় গেলেন!'

আমি ধীরে ধীরে কাঁধের ব্যাগ নামিয়ে রেখে চৌকির উপর বসে পড়লাম।

অনুচ্চ পাচিল ঘেরা এক স্কুলে তালা সদরের নির্বাচন কেন্দ্র। লোক সমাগম কম ছিল না, তবুও আমার কাছে সব কেমন যেন নিষ্প্রভ বলে মনে হল। আমি ভিতরে ঢুকিনি, বাইরে দাঁড়িয়ে বেটেখাটো প্রবীন ডাক্তার বাবুর সাথে কথা বলছিলাম। নৌকার পোলিং এজেন্টরা একে একে এসে তার কাছ থেকে পরিচয়পত্র নিয়ে বুথে ঢুকে যাচ্ছিল। তাকে চেয়ারম্যানের কথাগুলো বললাম। তিনি মিথ্যা প্রবোধ দিলেন না, বললেন সেটা হতে পারে, তবে কেবল এই এক কেন্দ্রে, চিন্তার কিছু নেই।

এর মধ্যে ভোট শুরু হয়ে গিয়েছিল। মাঝবয়সী এক লোক ভোট দিয়ে বেরিয়ে এলেন। তিনি প্রাইমারি স্কুলের প্রাক্তন শিক্ষক। ডাক্তার বাবু তাকে ডাকলেন– মাস্টের, ভোট দিয়ে এলে?

– হ ডাক্তার। ভদ্রলোক না দাঁড়িয়ে পিছনে হাত বেঁধে ধীর পদক্ষেপে বাড়ির পথ ধরলেন। ডাক্তার বাবু ইশারা করতেই আমি তার পাশাপাশি এগিয়ে গেলাম, জিজ্ঞাসা করলাম– ভোট তো দিয়ে এলেন চাচা, কেমন মনে হয়?

– কি কব বাবা, ভোট তো দিয়ে এলাম পাল্লায়। আগে ঠিক করিছিলাম শ্যাখের নৌকায় দেবো, পোলাপানেরাও নৌকায় দেতে কইছিল। কিন্তু কও তো বাবা আমার এক পাও কবরে,আল্লার কেতাব আর মিজান ফ্যালায়া নৌকায় ক্যামনে ভোট দিই!

কয়েক কদম পিছনে ফেলে আসা স্কুলের অনুচ্চ প্রাচীরের গায়ে বড় বড় রঙ্গিন হরফে লেখা জামাত ও নিজামে ইসলামের নির্বাচনী শ্লোগান–'আল্লা এক হাতে কেতাব আর এক হাতে মিজান দিয়েছেন– আল কোরআন।' পাশে দাঁড়িপাল্লার ছবি এবং আনসার আলীর নাম। এই লেখা এবং প্রচার যে বেশ কাজে এসেছেতা বোঝা গেল, প্রশ্ন হল– কতখানি? শ্লোগানটা যেখানে একজন স্কুল শিক্ষককে বিভ্রান্ত করতে পেরেছে, সেখানে নিরক্ষর চাষী এবং সাধারণ মানুষের কি হাল করতে পারে তা সহজেই অনুমেয়! বললাম, চাচা নেজামে ইসলামের নির্বাচনী প্রতীক বই এবং জামাতের দাড়িপাল্লা নিতান্তই পার্থিব বস্তু। পার্থিব কারণেই এদের ব্যবহার করা হয়। এগুলোর সাথে আল্লার পবিত্র কেতাব এবং আল্লাহর ন্যায় বিচারের মিজানকে এক করে দেখা ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে কতখানি জায়েজ ভেবে দেখেছেন কখনো? ধর্মের নামে সরল মানুষকে এভাবে ধোঁকা দেয়াটাই বা কতখানি ইসলাম সম্মত? প্রৌঢ় মাস্টার হঠাৎ থমকে দাঁড়ালেন, তারপর বিড় বিড় করে কি যেন বলে চিন্তাক্লিষ্টভাবে ধীরে ধীরে হেঁটে চলে গেলেন।

দুপুরের দিকে সালাহউদ্দিন ভাই এলেন তালায়। ডাক্তার সাহেব নানা কাজে ব্যস্ত, আশেপাশে আমার পরিচিত তেমন কেউ ছিলনা। ভোট কেন্দ্রের একপাশে নিঃসঙ্গ দাঁড়িয়ে ছিলাম। স্বভাববিরুদ্ধহলেও ক্ষণে ক্ষণে দৃষ্টি আঁছড়ে পড়ছিল লাইনের পাশে দাঁড়ানো নীলাম্বরী ওড়নায় মাথা ঢাকা এক চন্দ্রমুখীর উপর। ষোড়শী হবে হয়তো, বৃদ্ধার হাত ধরে দাঁড়িয়ে ছিল। আসলে, দৃষ্টি দৃষ্টি কাড়ে। হঠাৎ কাঁধে স্পর্শ পেলাম। সালাহউদ্দিন ভাই কখন এসেছেন, টেরই পাইনি। তিনি সম্ভবত ফুরফুরে মেজাজে ছিলেন,বললেন– চেন নাকি? ঠিক আছে পরে তো আবার আসব, তখন খুঁজে বের করা যাবে, এখানে অনেক সৈয়দ পরিবার আছে। আমি আমতা আমতা করছিলাম, ডাক্তার সাহেব এসে পড়ায় উদ্ধার পেলাম।

সালাহউদ্দিন ভাইরা ফুলতলা চুকনগর এলাকার বেশকিছু নির্বাচন কেন্দ্র ঘুরে এসেছেন। ডাক্তার সাহেবকে সঙ্গে নিয়ে সরাসরি কেন্দ্রে ঢুকে গেলেন। ফিরে এলেন কিছুটা গম্ভীর মুখে। জিজ্ঞাসা করলেন– চেয়ারম্যানকে দেখলাম নাতো?

– এসেছিল সকালে, পরে আর আসেনি, মনে হয় আপনার সামনে পড়তে চায়না। তবে তার গুটিকয়েক কর্মী দাড়িপাল্লার পক্ষে কাজ করছে। কেউ কেউ চুপ হয়ে গেছে, কয়েকজন বিষন্নভাবে সকালে আমার কাছে এসেছিল, কাজে লাগিয়ে দিয়েছি।

বেশকরেছ ডাক্তার।

ভূমিধ্বস বিজয়, ঈশান কোণে ধূসর ছায়া

অল্প কিছুক্ষণ থেকে সালাহউদ্দিনভাইদলবল নিয়ে ভিতরের কেন্দ্রগুলি দেখতে চলে গেলেন। আমি নৌকার গণজোয়ারের মহেন্দ্রক্ষণে পরাজয়ের স্বাক্ষী হওয়ার অপেক্ষায় তালা সদরে থেকে গেলাম। সালাহউদ্দিন ভাইরা যখন ফিরলেন, ভোট গননা শেষ। প্রাপ্ত কয়েকটি

কেন্দ্রের ফলাফল যোগ করে দেখা গেল নিরাপদ ব্যবধানে এগিয়ে আছি আমরা। একটিমাত্র লোকের শেষ মুহূর্তের বিশ্বাস ঘাতকতায় তালা সদরের লোকজন নির্বচনী ফলাফলের আনন্দ অথবা বিষাদ– কোনটারই স্বাদ নিতে সমর্থ হলনা।

সালাহউদ্দিন ভাই ফেরার সামান্য আগে জামাত প্রার্থী আনসার আলী এসেছিল এই কেন্দ্রে। আমরা আজম খান কমার্স কলেজে পড়তাম এবং তার সাথে আমার ভাল সম্পর্ক ছিল। এই কেন্দ্রের ফলাফল তাকে কিছুটা উৎফুল্ল করেছিল। সে তার কর্মীদের সাথে কোলাকুলি করল এবং জীপে ওঠার আগে আমার উদ্দেশ্যে হাত নাড়ল। তাকে বিদায় দিয়ে হঠাৎ কেন জানি দু তিনজন জামাত কর্মী আমার দিকে এগিয়ে এলেন, বললেন– ভাই, জিতে যাচ্ছেন ইনশাআল্লা, এখন আপনাদের সামনে বিরাট দায়িত্ব, দেখবেন ইসলামের ঝান্ডাটা যেন উচা থাকে। মৃদু হেসে বললাম– আমার ভিতর ইসলামের ঝান্ডা উচা আছে, একজন হিন্দু একজন খ্রিস্টানের ভিতরও তাদের আপন আপন ধর্মের ঝান্ডা উচা আছে। আল্লার আকাশ বাতাস খুবই প্রশ্বস্ত, সব ঝান্ডাই সেখানে উড়ছে, রাজনীতির সাথে তাদের না জড়ানোই ভাল, কি বলেন। তারা কি ভাবলেন জানিনা, মুসাফা করে বিদায় নিলেন।

অল্পক্ষণের মধ্যে সালাহউদ্দিন ভাইরা ফিরে এলেন। এবারআমাদের ঘরে ফেরার পালা। সাঁঝ ঘনিয়ে এসেছে। মোড়ে মোড়ে মানুষজনের উল্লাস, আমাদের রঙজ্বলা জীপটা চোখে পড়া মাত্র গগন বিদারী 'জয় বাংলা' শ্লোগানে উত্তাল হয়ে ওঠে সবাই। সালাহউদ্দিন ভাই কোথাও নামেন, কোথাও গাড়িতে বসে দু চারটে কথা বলে বিদায় নেন। ডাবলু এবং কয়েকজন কর্মী বিরামহীনভাবে বিড়ি বিলিয়ে গেল। এই শীত সন্ধ্যায় বিড়িতে একটা সুখটান, ওদের চেহারাই বলেদিল, বিজয়ের আনন্দ থেকে কম নয় মোটেও।ড্রাইভার ঝড়ের গতিতে গাড়ি চালিয়ে নিয়ে গেল। সালাহউদ্দিন ভাই বললেন- এই তুমি আমাদের মেরে ফেলবে নাকি!

কেন স্যার, রেডিও শুনবেন না? তার কণ্ঠে বিজয়ের গর্বিত প্রত্যয়।

তখন ঘরে ঘরে রেডিও ছিল না, কদাচ দু'একজন ভাগ্যবানের ঘরে তার দেখা মিলত। ৭ ডিসেম্বর ছিল নির্বাচনের দিন। আমরা সম্ভবত রাত সাড়ে আটটার দিকে খুলনায় যার যার বাড়িতে ফিরে এসেছিলাম। তাড়াতাড়ি খেয়ে ঘরে যেয়ে শুয়ে পড়লাম। ক্লান্ত ছিলাম ঠিকই, কিন্তু চোখে ঘুমের লেশমাত্র ছিলনা, বিছানায় সনি ট্রানজিসটরটা নিয়ে লেপ মুড়ি দিয়ে আছি মাত্র। প্রতি মুহূর্তে ভূমি ধ্বস বিজয়ের ঘোষণা আমার হৃদয় তন্ত্রীতে ঝংকার তুলেছে। সময় যত এগোচ্ছিল বঙ্গবন্ধু ততই অবিসংবাদিত হয়ে উঠছিলেন। একের পর এক সিটে বিজয় যা ছিল ধারণাতীত, তাই ঘটে যাচ্ছিল।

বাবা আমার রেডিও কেনা পছন্দ করেন নি, কখনো শোনেন নি। ১২ নভেম্বর ঘূণিঝড়ের দিন তিনি এবং মা যশোরে ছিলেন। তবে আজ বেশ রাতে ঘরে হঠাৎ অস্পষ্ট পদধ্বনি শুনে লেপের ফাঁক দিয়ে দেখি পা টিপে টিপে বাবা আমার ঘরে ঢুকছেন। রেডিও বন্ধ করার সময় নেই, ঘুমের ভান করে পড়ে রইলাম। বাবা চুপিসারে লেপের ভিতরে হাত ঢুকিয়ে রেডিওটা নিয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ পর একসময় আমিও একই ভাবে বাবার ঘরের দরজায় যেয়ে কান পাতলাম। মনে হল ঘুমাচ্ছেন, নিঃশব্দে ঢুকে রেডিওটা নিয়ে এলাম। রাতভোর রেডিও নিয়ে এভাবে বাবা এবং আমার মধ্যে একটা লুকোচুরি খেলা চলতেই থাকল। সে রাতে বাঙালিদের বিজয়ের সাথে রেডিওটারও বিজয় ঘটল, তার লুকিয়ে বেড়ানোর দিন শেষ হল।

সকালে ঘুম ভাঙলো বেশ বেলায়, তখনো কিছু কিছু দূরবর্তী আসনের ফলাফল আসছে। আমার হঠাৎই মনে পড়ল লিগাল ফ্রেম ওয়ার্কের আওতায় নির্বাচনের অসারতা নিয়ে আমারলেখা দেড় পৃষ্ঠার সেই আর্টিকেলটার কথা, বঙ্গবন্ধু আমাকে ফিরিয়ে দিয়ে নির্বাচনের পর পড়ে দেখতে বলেছিলেন। খুঁজেপেতে বের করলাম লেখাটা– প্রসারিত দৃষ্টির সামনে বঙ্গবন্ধু এসে দাঁড়ালেন, দু চোখে প্রখর দৃষ্টি এবং রহস্যময়তা, আমি ক্রমাগত কুঁকড়ে যেতে থাকলাম।

রাও ফরমানের ক্ষোভ এবং হতাশা

আওয়ামী লগির বিজয় নিয়ে অতি সন্দেহবাদীরও মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না। তবে তারা একটা মাত্রা নির্দিষ্ট করেছিলেন– ষাট ভাগ। ষাট ভাগ সদস্য নিয়ে পূর্ব বাংলায় তারা সরকার গঠন করবে, কিন্তু কেন্দ্রে তাদের জন্য অপজিশন বেঞ্চই নিশ্চিত। ৬-দফা প্রশ্নে অন্য কোন দলই ছাড় দেবে না। কিন্তু তাদের সব ধরনের ষড়যন্ত্র, সব হিসাব নিকাশ ওলটপালট করে দিয়ে পূর্ব বাংলার নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ১৬৭ টি আসন পেয়ে একতরফাভাবে জিতে যায় এবং কেন্দ্রে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করল। ক্রুদ্ধ হতাশরাও ফরমান আলী স্বীয় অফিস কক্ষে বসে বসে সম্ভবত ভবিষ্যতের পরিকল্পনা চক আউট করছিলেন, গভর্নর ইয়াকুব উৎফুল্ল চিত্তে তার এই অতি প্রভাবশালী অধস্তনের অফিস কক্ষে ঢুকে বললেন, ফরমান নির্বাচনটা কিন্তু অত্যন্ত স্বাধীন ও নিরপেক্ষ ভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

ইয়াকুব পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর ডোভ বা পায়রা দলযুক্ত ছিলেন। এদেরকে হক বা বাজ দলভুক্ত ভীত এবং দুর্বল চিত্ত বলে বিবেচনা করতেন। ফারমান আলী দাঁতে দাঁত চেপে বললেন, হা তারা সবকিছু করার জন্যই স্বাধীন ছিল। (১) তিনি বাজ দলভুক্তদের অন্যতম ছিলেন না বাঙালিদের বিজয় বিশেষ করে পাকিস্তানের শাসন ক্ষমতায় বাঙালিদের মেনে নিতে কোন ভাবেই প্রস্তুত ছিলেন না।

তিনি প্রতিপক্ষের সামনে সহসা মাথা গরম করার লোক ছিলেন না। প্রথম সুযোগেই শেখ মুজিবকে অভিনন্দন জানালেন। শেখ মুজিবও কম যেতেন না, হাসতে হাসতে বললেন জেনারেল সাহেব আপনি কিন্তু আমাকে ড্যামেজ করার জন্য চেষ্টা করেন নি।

ঠিক তা নয়, আমি চেয়েছিলাম আপনি কিছু কম সিট পান, যাতে আন্দোলনের উপর আপনার নিয়ন্ত্রন থাকে, কিন্তু এখন তো আপনি আন্দোলনকারীদের নিয়ন্ত্রণে চলে গেলেন। এক্সট্রিমিস্টরা যা চায় তার বাইরে যাওয়া আপনার পক্ষে কঠিন।

আমি শতভাগ সিট চেয়েছি ভেবে-চিন্তেই, আপনার লাইনে চিন্তা করার প্রয়োজনে দেখি নি। রাও বিদায় নিলেন, তার কুটিল ব্রেনে তখন ভিন্ন চিন্তা। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বাজের দল পরিস্থিতিও মোকাবেলায় তখন সক্রিয় হয়ে উঠল। তারা ইয়াহিয়াকে সকল অঘটনের জন্য দায়ী করে ভিতরে ভিতরে ফুঁসে উঠছিলেন। কিন্তু প্রকাশ্যে আ০০০ সাহসী ছিলেন না। আমরা তখন প্রায়ই পাকিস্তান সেনাবাহিনী ইয়াহিয়ার বিরুদ্ধে সেনা অভ্যুত্থানের গুজব শুনতাম, কিন্তু ইয়াহিয়া খান সক্রোধে এ ধরনের আশংকা উড়িয়ে দিয়েছিলেন। তিনি তার প্রতি মার্কিন প্রেসিডেন্টি রিচার্ড নিক্সন ও প্রেসিডেন্টের পররাষ্ট্র উপদেষ্টা হেনরী ফিসিব্যারে বিশেষ কারণে সমর্থনের বিষয়ে অতি নিশ্চিত ছিলেন। তবে তার সেনাবাহিনীর হক অংশের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য তাদের আশ্বস্ত করলেন যে, এই কালো জারজ (ব্লাক বাস্টার্ড)দের কখনই তাদের উপর শাসন চালাতে দেবেন না।

আমার ছুটি শেষ হয়ে এসেছিল। আমি অফিসে জয়েন করলাম এবং বিব্রতকর অবস্থার মধ্যে পড়লাম। সবাই ধরে নিয়েছিল স্বয়ং এমএনএ সাহেবের ভাই তাদের সাথে চাকরি করে। যদিও বহু খুঁজে, মুসলমানদের বহুমুখী আত্মীয়তা জটের কোন স্তরেই আমি তার সাথে আমার আত্মীয়তা সম্পর্ক খুঁজে পাইনি। তথাপি প্রতিনিয়ত অভিনন্দনের বোঝা আমার স্কন্ধ ভারাক্রান্ত করে চলল। এর মধ্যে হঠাৎ ভাই এর টেলিফোন পেলাম, সন্ধ্যায় দেখা কোরো।

ডুমুরিয়ার চেয়ারম্যান ভাইয়ের সংবর্ধনার ব্যবস্থা করেছিলেন। আমরাও আমন্ত্রিত। ভাই বললেন, কাল সকালে আমরা যাচ্ছি, দুপুরের পর ফিরব। আমি অফিসের কাজের চাপের কথা বলে অক্ষমতা প্রকাশ করলাম।ভাই বললেনদু'এক দিনের মধ্যে তালাতেও তো যেতে হবে।

আমার একটা কৌতুহল ছিল, পরদিন সন্ধ্যায় ভাইয়ের বাসায় গেলাম। ডাবলু ছেলে মানুষ, উৎসাহের আতিশয্যে বলল– ভাই কেন যে গেলেন না! ইয়া বড় বড় কই পাবদা পারশে মাছ, জমাটবাঁধা দই, ঘন দুধের পায়েস, পোলাও। হাতে ঘিয়ের গন্ধ এখনো লেগে আছে। সে তার হাতটা আমার নাকের সামনে উচু করে ধরল।সালাহউদ্দিন ভাই বললেন–মনোয়ার, সত্যি খুব মিস করেছ।

বললাম ভাই তালা, ডুমুরিয়াদুর্ভিক্ষ এলাকা, ক'দিন আগে নির্বাচনি প্রচারের সময় তারা কিন্তু আমাদের ডাল-ভাতের ব্যবস্থা করতেও সমস্যায় পড়েছিল। তালায় তো এক কাপ চা, সামান্য মুড়ি দিয়েও আপ্যায়ন করতে পারেনি। যাহোক সংবর্ধনা তো অবশ্যই হবে। প্রতিটা ইউনিয়নই হয়ত উদ্যোগ নেবে, তবে এখন দুর্ভিক্ষের মধ্যে খাবারের বাহুল্য কিভাবে আশা করা যায়।

দু দিন পর তালায় সংবর্ধনা ছিল। আমি যেতে পারিনি, অফিসের কাজে আঁটকে পড়েছিলাম। ডাবলুর কাছে শুনেছি, সালাহউদ্দিন ভাই আগেই খবর পাঠিয়েছিলেন সাদা ভাত ও সাধারণ তরকারি ছাড়া কিছুই খাবেন না। কিন্তু তাদের আয়োজনও সনির্বন্ধ অনুরোধ মেজাজি সালাহউদ্দিন ভাইয়ের পক্ষেও ঠেলে ফেলা সম্ভব হয়নি।তবে আমি খুশি হয়েছিলাম চুকনগরে সালাহউদ্দিন ভাই সেই হৃদয়বান হতদরিদ্র লোকটাকে, যে তাদের জন্য কাজ করছি এই বিশ্বাসে শীতের মাঝরাতে আমাদের জন্য ডাল-ভাত রেঁধেছিল, তার কথা ভোলেন নি।

বিহারী শ্রমিক নেতা নসরুল্লা একদিন অফিসে এল। ইউনুস সাহেবের টেবিলের সামনে বসে আমার দিকে তাকিয়ে বলল– কেয়া মনোয়ার সাব, আপ আভিতক হামারা উপার গোস্‌সা হ্যোয় না!

– নেহি নসরুল্লা সাব, গোসসা কিউ হোগা?ইলেকশন হো গিয়া, ব্যাস পুরানা সব কুছ খতম হো চুকা।

– নেহি নেহি, আমি জানি আপনি আমার উপর গোসসা আছেন। উস দিন কা বাৎচিত জরুর আপনার ইয়াদ আছে।

– ছোড়িয়ে নসরুল্লা সাব, আপনি শেখ মুজিব আরবাঙালি মেয়েদের নিয়ে আজেবাজে কথা বলতেন। সবাই নালিশ করত। তাই আমি আপনাকে এসব বলতে নিষেধ করেছিলাম, এর বেশি তো কিছু নয়। সেসব মনেও রাখিনি। ভেবে দেখুন, আমরা সবাই একবার দেশ-বাড়ি ছেড়ে এখানে এসেছি, আমাদের তো এখানেই থাকতে হবে।

– হা, ওহি তো বাত হ্যায়! মাগর আপ সামাঝতা নেহি। আফসোস, আপকা ডিপার্টমেন্টমে এতনা মোহাজের হ্যায়, এক দো আদমি বাদ সব জয়বাংলা হো গিয়া। ইয়ে তো ঠিক, শ্রেফ আপকা ওয়াজেসে ইয়ে সব হুয়া হ্যায়।

– ইয়ে বাত ঠিক নেহি। ইসকা পিছে হ্যায় ডিসপ্যারিটি।হামলোগ সব ইস্ট পাকিস্তান কি রাহেনেওয়ালা হ্যায়, আউর হামারা ইস্ট পাকিস্তান ওয়েস্ট পাকিস্তান সে বহুত পিছে পড়ে হুয়া হ্যায়। আপ সোচিয়ে না, আপ লোগ হর হামেশা মিল মালিক, মুসলিম লীগ আউর আর্মি গভমেন্টকো সার্পোট দেতা হ্যায়। কেয়া মিলা আপকা কওমকো? আপকা কন্ডিশন তো হামারা সে ভি বহুতবুরা হ্যায়।ইস্ট পাকিস্তানকো অটোনমি মিলনেছে আপকা লাইফস্টাইল ভি উচা হো জায়েগা।

তবেতাদের বোধ-বুদ্ধিসব একটা নির্দিষ্ট সীমায় আটকে পড়েছিল। দুর্ভাগ্যের বিষয় ১৯৪৭-এর ১৪ আগস্টের সাথে সাথেই সেটা ঘটেছিল। তারাবিকল্প কিছু ভাবতে সমর্থ ছিলনা। এবং তার হুল ফোটানোর উৎসাহেওকখনো ভাঁটা পড়েনি। কখনো এসে বলতো– 'কেয়া মনোয়ার সাব, আপলোগকা গভমেন্ট কব ফর্ম হোগা। হাম তো কুছ লাইসেন-পারমিট্‌কা এনতেজার মে হ্যায়।' কখনো বলে–'মালুম হোতা হ্যায় মিনিস্ট্রি আউর পোর্টফেলিও লে কর আপকা পার্টিমে ইন্টারন্যাল কুছ গড়বড়লাগগিয়া,নেহি তো এতনা দের কিউ হোতা?' সে যে বোঝেনা তা নয়। বরং আমাদের চেয়ে বেশি বোঝে যে বাঙালিদের হাতে ক্ষমতা যাচ্ছেনা এবং সে জন্যই চেহারায় কুটিল ভাব ফুটিয়ে বাঙালিদের খোঁচানোর সুযোগটা নেয়। আমরা কখনো ভয় থেকে কখনো বাঙালি মানসের উদারতা থেকে বিষয়টা হজম করে যাই।

আমি আবার রাজনীতি থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়েছিলাম। কিন্তু বিজয়ের আনন্দ উৎসব ছাপিয়ে একটা আগ্রাসী গুমোট আবহাওয়ার অস্তিত্ব ভালই টের পাচ্ছিলাম। বেশ কিছুদিন পর ডাবলু বলল– সালাহউদ্দিন ভাই ঢাকা থেকে ফিরেছেন। আমরা তার সাথে দেখা করলাম।আমি অতটা হতাশ কখনোই ছিলাম না, এবার একেবারে অন্ধকার গহ্বরে নিক্ষিপ্ত হলাম। সালাহউদ্দিন ভাই বললেন–মুজিব ভাইও জানেন না সামনে ঠিক কি আছে, তবে কঠিন দিনের জন্য প্রস্তুত হতে বলেছেন সবাইকে। এক ব্যক্তি এক ভোটের নির্বাচন দিয়ে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া এখন আঙ্গুল কামড়াচ্ছে। শোনা যায় উগ্র আর্মি অফিসাররা তাকে প্রচণ্ড চাপের মধ্যে রেখেছ। তারা নির্বাচনে এমন উল্টো ফলাফলের কথা দুঃস্বপ্নেও ভাবেনি। তারপরও তারা সম্ভবত অতীতের মত পদ, ব্যবসা-বাণিজ্য, উপঢৌকন ইত্যাদি বিলি বন্টন করে আমাদের কিছু দুর্বল চরিত্রের সংসদ সদস্যের মগজ ধোলাইয়ের কথা ভেবেছিল। কিন্তু বঙ্গবন্ধু ৩ জানুয়ারি রেসকোর্স ময়দানের বিশাল জনসভায় নির্বাচিত সদস্যেদের ৬-দফা ১১-দফার প্রতি অনুগত থাকার শপথ পড়িয়ে তাদের বাড়াভাতে ছাই দিয়েছেন। এটা তাদের এতদূর ক্ষুব্ধ করেছে যে, দ্বিপাক্ষিক আলোচনার শুরুতেই ইয়াহিয়া খান নাকি শেখ মুজিবকে বলেছিলেন– হোয়াই ইউ হ্যাভ ডান অল দিস! ওরা এখন ক্ষাপা কুত্তার মত হয়ে আছে, কি করবে কিছুই বলা যায় না। তোমাদের শুধু এটুকু বলতে পারি, বঙ্গবন্ধুর নির্দেশ, কঠিন দিনের জন্য প্রস্তুত হও।

এক অজানা ভয় আমাকে আচ্ছন্ন করে ফেলল। ধীরে ধীরে উঠে বাড়ির পথ ধরলাম।

গভীর নৈরাশ্যের মধ্যে হঠাৎ এক ঝলক আশার আলো আমাদেরকে আবার উজ্জীবিত করে তুলল। প্রেসিডেন্ট সাংবিধানিক বিষয় নিয়ে শেখ মুজিবের সাথে আলোচনার জন্য ১১ জানুয়ারি ঢাকা এলেন। ১৪ জানুয়ারি ঢাকা ত্যাগের প্রাক্কালে সাংবাদিকদের তিনি বলেন, শেখ মুজিব পাকিস্তানের ভাবী প্রধানমন্ত্রী, শীঘ্রই তিনি সরকার গঠন করতে যাচ্ছেন। তার এই বক্তব্য ৬-দফা ভিত্তিক সংবিধান প্রণয়নের প্রশ্নে অনেক সংশয়-সন্দেহের অবসান ঘটাল। বাস্তবে এটা ছিল আইওয়াশ। ঢাকা থেকে ফেরার পথে হঠাৎ তিনি তার জেনারেলদের নিয়ে হাস শিকারের নামে ভুট্টোর লারকানার আল মুর্তজা প্রাসাদে যেয়ে উপস্থিত হলেন।সবাই চিন্তিত ছিল প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া, পিপলস পার্টি প্রধান ভুট্টো ও জেনারেল হামিদরা সেখানে কি করছেন। বাংলার আকাশে আবার একটি 'কাশিম বাজার কুঠি' ষড়যন্ত্রের পুনরাবৃত্তি আশংকা দেখতে পেল সবাই। আমরা সুইটহাউজে বসে আছি। রিকশা থেকে এরফান নামল। সে ছিল আমাদের সিনিয়র এবং খানিকটা পাগলাটে স্বভাবের। ছাত্ররাজনীতি করত, যা মনে আসে নির্দ্বিধায় বলে বসতো। তার আনুগত্য ছাত্রলীগ না ছাত্র ইউনিয়ন- কোন দিকে ছিল সে নিজেই জানতো কিনা সন্দেহ। তবে সব পলিটিক্যাল আড্ডায় তার অবাধ যাতায়াত ছিল। বলল–ওদিকে কাসিমবাজার কুঠি বসে গেল, আর এদিকে তোমাদের নেতা বসে বসে জালে গাব দিচ্ছে, টের পাবা- শীঘ্রি টের পাবা! বিষয়টা নিয়ে শুধু আমরা কেন, সবাই তখন ঘোর দুঃশ্চিন্তায় ছিলেন। জাহিদ শান্ত স্বভাবের ছাত্রনেতা, তবু ক্ষোভের সাথে বলল- তা এরফান ভাই, বঙ্গবন্ধুর এখন কি করা উচিত বলে আপনি মনে করেন? ওখানে তো আর বোমা মারা যাচ্ছেনা! তিনি বার বার সবাইকে ষড়যন্ত্রের ব্যাপারে সতর্ক থাকতে বলছেন, নিজেও সতর্ক আছেন নিশ্চয়ই। ধৈর্য ধরেন, দেখেন কি হয়।

এলফান প্রায় খেঁকিয়ে উঠর– কেন, স্বাধীনতা ঘোষণা করে দিক, দেরি করছে কেন!

উপযুক্ত সময় হলে ঘটনা সে দিকেই গড়াবে। চিন্তা করবেন না, তখন আপনিও একটা অস্ত্র হাতে পেয়ে যাবেন।

এর পরের ঘটনাগুলি সাজানো ছকের মত একের পর এক ঘটতে থাকল। প্রেসিডেন্টের সাথে আলোচনা কালে শেখ মুজিব ১৫ ফেব্রুয়ারির মধ্যে সংসদ অধিবেশন ডাকার দাবী জানিয়েছিলেন। ভুট্টোমার্চের শেষ দিকে ডেট দিতে প্রেসিডেন্টকেপরামর্শ দিলেন। প্রেসিডেন্ট যেন এক

আপোষমূলক তারিখ ঠিক করে ৩ মার্চঢাকায় জাতীয় সংসদের অধিবেশন আহ্বান করলেন। ভুট্টো সাথে সাথে ভয়ংকর প্রতিক্রিয়া দেখালেন, বললেন– তার দল ৩ মার্চের ঢাকা অধিবেশনে যোগ দেবে না। ঢাকা তার দলের সদস্যদের জন্য কসাইখানা হবে, তিনি তাদেরকে সেখানে যেতে বলতে পারেন না। তিনি আরো বললেন পশ্চিম পাকিস্তান থেকে কেউ যদি সেখানে যায় তাকে দেশে ফিরতে দেয়া হবেনা এবং তাকে বাইরে রেখে সংবিধান পাশ হলে তিনি করাচি থেকে খাইবার পর্যন্তআগুন জ্বালিয়ে দেবেন।

এবার প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার পালা। ১ মার্চে তিনি হঠাৎ জাতীয় সংসদের ৩ তারিখের নির্ধারিত অধিবেশন নতুন কোন তারিখ ঘোষণা ছাড়াই বাতিল করলেন। এখন সবার কাছে পরিস্কার হয়ে গেল যে আসলে তিনি অশুভ লারকানা ষড়যন্ত্রের বিষ উদ্‌গার করে দিলেন মাত্র! বাঙালিরা বুঝল পশ্চিমি কোটারী স্বার্থ বাঙালিদের হাতে ক্ষমতা ছেড়ে দেবে না। প্রেসিডেন্টের ঘোষণা পূর্ববঙ্গে মুহূর্তে অগ্নিতে দাহ্যবস্তুনিক্ষেপের কাজ করল। গোটা পূর্ব বাংলা জুড়ে বিষ্ফোরণ ঘটে গেল। বাঙালিরা লাঠিসোটা নিয়ে রাজপথে ঝাঁপিয়ে পড়ল, পূর্ব বাংলা অচল হয়ে গেল। আর্মির প্রতিরোধের মুখে তারা অকাতরে জীবন দিল, কিন্তু রাজপথ ছাড়লনা। ইয়াহিয়া খান 'বেলশাজারের' দেয়ালের লিখন পড়তে অসমর্থ ছিলেন। নইলে দেখতে পেতেন ৬-দফা ফেড হয়ে সেখানে এখন পরিস্কার ফুটে উঠেছে একদফা দাবী- বাংলাদেশের স্বাধীনতা। বঙ্গবন্ধুর সামনে এখন আর এলএফও গুড়িয়ে দেয়ার প্রশ্ন নয়, বাংলাদেশের বুক থেকে খোদ পাকিস্তানকেই গুড়িয়ে দেয়ার প্রশ্ন এসে গেল।

সেই উত্তাল দিনগুলিতে রাজধানীর পাশাপাশি শিল্পনগরী খুলনাও মিছিল মিটিংয়ে অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠেছিল। ৩ মার্চবঙ্গবন্ধু দেশব্যাপী ধর্মঘট আহ্বন করেছিলেন। সেদিন এক অচিন্তনীয় বিশাল মিছিল হাদিস পার্ক থেকে বেরিয়ে লোয়ার যশোর রোড ধরে পূব দিকে অগ্রসর হয়। ধারণা ছিল যে মিছিলটি দক্ষিণে টার্ন নিয়ে বাবুখান রোড দিয়ে বেরিয়ে যাবে। মিছিলের পুরোভাগে ছিলেন আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ আব্দুল আজিজ, সাধারণ সম্পাদক সালাহউদ্দিন ইউসুফ, আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী প্রধান মীর্যা খায়বার হোসেন, শেখ কামরুজ্জামান টুকুসহ আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগ নেতৃবৃন্দ। একই সময় বাবুখান রোড দিয়ে আর একটি বিশাল মিছিল এসে পড়ে। উভয় মিছিল একত্রে নিজস্ব গতিতে পূব মুখে অগ্রসর হয়। সামনেই ছিল সার্কিট হাইজ আর্মি ক্যাম্প। মিছিলটি এত দীর্ঘ ছিল যে তখনো পুরোপুরি হাদিস পার্ক থেকে বেরিয়ে পারেনি। এমন সময় বাংলাদেশ ব্যাংক ও অয়ারলেস স্টেশনে মোতায়েন আর্মিরা হঠাৎ মিছিলের পেটের উপর গুলি চালিয়ে বসে। সাথে সাথে কিশোর মুজিবর, জয়নাল আবেদিন, মুসা, আমজাদ সহ সাতজন মিছিলকারী ধূলায় লুটিয়ে পড়ে। অনেকে আহত হয়।এই হত্যাকান্ড দেশব্যাপী প্রতিবাদের ঝড় তোলে। পরিস্থিতি সামাল দেয়ার জন্য খুলনার ডিসি পরদিন সকালে তার অফিসে ত্রিপক্ষীয় সভা ডাকেন। খুলনা সেনা ছাউনির কমান্ডার কর্নেল শামসজনসমক্ষে ভদ্রলোকের মুখোশ পরে থাকতে অভ্যস্ত ছিলেন, বললেন– আপনাদের মিছিল তো এদিকে আসার কথা ছিলনা। যাহোক, আমাদেরও ভুল হয়েছে হঠাৎ এভাবে গুলি চালিয়ে। আজিজ ভাই বলেন আপনারা এভাবে ভুলই করতে থাকবেন এবং আমাদের লোকেরা মরতে থাকবে, আপনারা বরং ক্যান্টনমেন্টে ফিরে যান।

সাতজন সহযোদ্ধার মৃত্যু ছাত্র নেতৃবৃন্দকে খুবই ক্ষুব্ধ করেছিল।তাদের মধ্যে প্রতিশোধ স্পৃহা তীব্র হয় এবং অস্ত্রের বিরুদ্ধে অস্ত্র ব্যবহারের চিন্তা তাদের পেয়ে বসে। তারা দ্রুত সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে বন্দুকের দোকানে হামলা চালায়। দেখতে দেখতে গোলাম দসুলের অস্ত্র গুদামএবং সৈয়দ মোল্লার বন্দুকের দোকান লুট হয়ে যায়।

বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের কালজয়ী ভাষণ

আমরা ৭ মার্চের দিকে অধীর আগ্রহ ও উৎকণ্ঠা নিয়ে তাকিয়ে ছিলাম, রেসকোর্সের জনসভায় কি ঘোষণা দেবেন বঙ্গবন্ধু! কত জল্পনা-কল্পনা, কত বিশ্লেষণ, সমিকরণ। কেবল গোড়া ডান ও গোড়াবামপন্থীরা 'শতভাগ' নিশ্চিত ছিল- মোল্লার দৌড় মসজিদ পর্যন্ত, পেটি বুর্জোয়া ও মিডল ক্লাস প্রতিনিধি মুজিব আর কদ্দুর যাবেন!কিবা করবেন আপোষ ছাড়া!স্বাধীনতা গোল্লায় যাবে, ৬-দফাও যাবে, তার দৌড় বড়জোরঐ প্রধানমন্ত্রীর নড়বড়ে গদি পর্যন্ত। পার্টির সাথে সম্পর্ক না থাকলেও এ সময় আমি প্রতিদিনই বর্ণালী প্রেস, সুইটহাউজ ও আওয়ামী লীগ অফিসে যেতাম। সকলেই ঘোর অনিশ্চয়তা নিয়ে মুহ্যমান ছিল।

৭ মার্চ দুপুরের পর বাবা রেডিও নিয়ে বারান্দায় এসে বসলেন। আগে থেকেই ঘোষণা ছিল বঙ্গবন্ধুর ভাষণ সরাসরি রেডিও-টিভিতে প্রচার করা হবে। পরিস্থিতি এতটাই টানটান ছিল যে পাড়া প্রতিবেশিরা অনেকেই এসেছিলেন ভাষণ শুনতে। সবার মধ্যে উত্তেজনা ছিল, কি বলতে পারেন তা নিয়ে উৎকণ্ঠাও ছিল। কিন্তু অচিরেই সব কিছু গভীর হতাশায় নিমজ্জিত হল। বঙ্গবন্ধুর ভাষণ প্রচারিত হলনা, তিনি ভাষণ দিতে পেরেছেন কিনা তাও জানা গেলনা এবং একসময় রেডিও স্তব্ধ হয়ে গেল। কি হল, কি হতে পারে এমন দু চারটে মৃদু মন্তব্য ছাড়া কেউ কোন কথা বলল না, একটা অশুভ ছায়া যেন সবাইকে গ্রাস করল।নিঃশব্দে চিন্তাক্লিষ্টভবেতারা একে একে উঠে গেলেন।

হঠাৎ করে রেডিও বন্ধ হয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা আমাকে ভাবিয়ে তুলেছিল। আমি সুইটহাউজে এলাম, সেখানে তখন অনেকেইছিল, কিন্তু কারো কাছে কোন তথ্য বা সংবাদ ছিলনা।কাছেই আওয়ামী লীগ অফিস, দল বেঁধে সেখানে গেলাম। ট্রনজিস্টর ঘিরে দু চার জন কর্মী বসে আছে, নব ঘুরিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু ঢাকা সেন্টারের কোন খবর নেই। ডেড হয়ে পড়ে আছে। জিজ্ঞাসা করলাম– টেলিফোনে কিছু জানা যায়নি?

– না, মোমিন ভাইয়ের বাড়িতে টেলিফোনের কাছে লোক বসে আছে। তবে ঢাকায় কেউ ধরছে না, যে দু একটা বাড়িতে যোগাযোগ হয়েছে তারা মহিলা,বিশেষ কিছু জানেন না, পুরুষরা সব রেসকোর্স ময়দানে।

আওয়ামী লীগ নেতারা সবাই হাদিস পার্কে, সেখানে তখন জনসভা চলছিল।আমরা অফিস থেকে বেরিয়ে সেদিকে রওনা দিলাম।পথে বেরিয়ে বিস্ময়ের সাথে দেখলাম বিনয় চট্টোপাধ্যায় ও সৈয়দ ঈসাকয়েকজনছাত্রসহ উত্তেজিতভাবে হৈচৈ করতে করতে এদিকেআসছে।বিনয় বলল– বস, তোমরা এখানে, আমরা তো সুইটহাউজে যাচ্ছিলাম। বিনয় আমাদের পার্টির এবং সৈয়দ ঈসা ছাত্র ইউনিয়ন-মেনন গ্রুপের গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিল। বিনয় বলল– বস, সর্বনাশ যা হবার তা তো হয়েই গেল,শেখ মুজিব সারেন্ডার করে বসেছে! শুনেছ নিশ্চয়ই মিটিং-ফিটিং কিছুই হয়নি।

বিনয় আমাদের ভাল বন্ধু ছিল, ভাল কর্মীও ছিল, কিন্তু কোন কিছুই তলিয়ে দেখতে সমর্থ ছিলনা। সৈয়দ ঈসার সাথে তাকে দেখে সন্দেহ হল, বললাম– হৈচৈ বন্ধ কর, তারপর বল কোথা থেকে এ সংবাদ পেলে। রেডিও বন্ধ, ঢাকায় টেলিফোনও ধরছেনা কেউ, অথচ তোমরা দিব্যি খবর পেয়ে গেছ!

আমার কণ্ঠস্বর কঠিন ছিল, বিনয় থতমত খেয়ে সৈয়দ ঈসার দিকে তাকালো। ঈসা আমাকে বিদ্রুপের সুরেবলল– সৈয়দ সাহেব,এটা বোঝা কি খুব কঠিন যে তোমার লীডার সব কেঁচিয়ে দিয়েছে।মোল্লার দৌড় মসজিদ পর্যন্ত- একজন পেটি বুর্জোয়া নেতা আর কদ্দুর যাবে! বক্তৃতাই দেয়নি, শুনেছো রেডিও?

– আমার কথা বাদ দাও,তুমি রেডিওশুনেছ নাকি শোননি, সেটাই বল।

– আরে কোথায় তোমার বক্তৃতা! রেডিওই তো বন্ধ।

– ঠিক তাই।অথচ তোমাদের মোটা মাথায় এ প্রশ্ন এলোনা যে জাতীয় রেডিও কেন বন্ধ? ঠিক আছে ঈসা, তুমি তোমার কাজে যাও, আগে পুরোটা জানো, তারপর যতখুশি প্রপাগান্ডা চালাও। আর বিনয়, তোমার যদি কোনকিছু তলিয়ে দেখার ক্ষমতা না থাকে দয়া করে অন্য দলের ছেলেদের কথায় ধেই ধেই করে নেচো না।

যদিওআমি তখন পার্টির কেউ নই, কিন্তুসবাই খুশি হল।হঠাৎ করে রেডিও বন্ধ হয়ে যাওয়ার বিষয়টাতাদেরকেও ভাবিয়ে তুলেছিল, তবে তারা তলিয়ে দেখেনি। বললাম– বিনয়, বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে কুৎসা প্রচার কম হয়নি, কিন্তু এখনো পর্যন্ত তার কোন আচরণ আমাদের লজ্জিত করেনি– এটা আমাদের মনে রাখা দরকার। যাহোক আসলে কি ঘটেছে আমরা কিন্তু এখনো কিছুই জানিনা।

গুজবটা ভালই ছড়িয়ে পড়ল যেনতুন সেনাপ্রধান টিক্কা খান ক্ষমতা হাতে নিয়েই জনসভা নিষিদ্ধ করেছে। তার সম্পর্কে একটা ভয় আমাদের মাঝে আগে থেকেই ছিল। বেলুচিস্তানেবিদ্রোহ দমনে তার নৃশংসতা চেঙ্গিজ খা, হালাকু খার নৃশংসতার সমতুল্য ছিল বলে প্রচার করা হত। মনটা সহসা দমে গেল, ইয়াহিয়া খান বাঙালিদের উত্থান দমন করার জন্য তার সেরা কসাইটাকেই এখানে পাঠিয়েছে। কিন্তু রাতের মধ্যেই গুমোট ভাবটা কেটে সুবাতাস বইতেথাকল,সংবাদ পাওয়া গেল রেসকোর্স ময়দানে সুবিশাল জনসভায় দারুণ এক ভাষণ দিয়েছেন বঙ্গবন্ধু- অতুলনীয় ভাষণ! লোকজন চোখেমুখে প্রত্যয় এবং পবিত্র বিশ্বাস নিয়ে ফিরেছে। কসাই টিক্কা রেডিওতে বঙ্গবন্ধুরভাষণ প্রচার করতে দেয়নি, বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে রেডিওর লোকজন সাথে সাথে রেডিও স্টেশন ছেড়ে বেরিয়ে গেছে। এজন্যই ঢাকা বেতারের সম্প্রচার বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

পরদিন সকালে রেডিও ঘোষণা দিল আজ সকালে বঙ্গবন্ধুর পূর্ণ ভাষণ প্রচারিত হবে।আমরা বাইরেরবারান্দায় রেডিও ঘিরে বসে ছিলাম। পাড়া প্রতিবেশি পথচারীরা নিঃশব্দে রেডিওর চারপাশে ভীড় জমিয়ে ফেলল। তার প্রতিটি উচ্চারণ স্বরগ্রামআমাদের শিরদাঁড়ায় শিহরণ বইয়ে দিল–

...'আর যদি একটা গুলি চলে, আর যদি আমার লোককে হত্যা করা হয়, তোমাদের উপর আমার অনুরোধ রইল প্রত্যেক ঘরে ঘরে দূর্গ গড়ে তোলো। তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে এবং জীবনের তরে রাস্তাঘাট যা যা আছে সব কিছু আমি যদি হুকুম দেবার নাও পারি তোমরা বন্ধ করে দেবে।

...তোমরা আমার ভাই, তোমরা ব্যারাকে থাকো, কেউ তোমাদের কিছু বলবে না। কিন্তু আর আমার বুকের উপর গুলি চালাবার চেষ্টা করো না। সাত কোটি মানুষকে দাবায়ে রাখতে পারবা না। আমরা যখন মরতে শিখেছি, তখন কেউ আমাদের দাবাতে পারবে না।

...প্রত্যেক গ্রামে প্রত্যেক মহল্লায় আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সংগ্রাম পরিষদ গড়ে তোলো এবং তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে প্রস্তুত থকে। মনে রাখবা রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরো দেব–এ দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়ব ইনশাআল্লাহ। এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম– এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। জয় বাংলা।'

বক্তৃতা শেষ হয়ে গেছে কয়েক মিনিট আগে। যেন একমহাকাব্য পাঠ শেষ হল, কিন্তু তার রেশ যায়নি।সবাই স্তব্ধ হয়ে আছে। কিছু আগেও ভেবে অস্থির ছিলাম এই বিষম সময়ে কি বলবেন বঙ্গবন্ধু।অথচ অসাধারণ প্রজ্ঞার পরিচয় দিলেন, অবলিলায় বললেনএমন কথা যা সবার প্রাণে ভৈরব রাগেরঅনুরণন তুলল। নত হওয়া নয়, যুদ্ধ ঘোষণাও নয়, অথচ যুদ্ধ প্রস্তুতির সুনির্দিষ্ট দিক নির্দেশনা। অন্যদের কথা থাক, শুধু বিশেষ ক্রণে একজনের কথাই বলি- তিনি মেজর জিয়া, একই অনুভূতি হয়েছিল তারও। তার একমাত্র লেখার একটি ছত্রে এ অনুভূতি ভাষা পেয়েছে-'বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ আমাদের কাছে গ্রীন সিগন্যাল বলে মনে হল। আমরা প্রস্তুতি নিলাম।'

সমালোচনার জন্য সমালোচনা করা আমাদের অনেকেরই মজ্জাগত। ৭ মার্চ ভাষণের পর কেউ কেউ প্রশ্ন তুললেন, শেখ মুজিব স্বাধীনতা ঘোষণা করলেন না কেন। তিনি যদি সেদিন স্বাধীনতার ঘোষণা করে জনতাকে ক্যান্টনমেন্ট আক্রমণের নির্দেশ দিতেন, অবস্থা এমন অগ্নিগর্ভ ছিল যে, তারা তাই করত। তখন কম রক্তপাত এবং কম ক্ষতিতে স্বাধীনতা এসে যেত। নিরস্ত্র জনতাকে ক্যান্টমেন্ট অভিমুখে ঠেলে দেয়া যে কতখানি হঠকারিতা তা যে তারা বোঝেন না তা নয়, তবু সমালোচনার জন্য সমালোচনা। সেদিন ক্যান্টনমেন্ট সর্বোচ্চ প্রস্তুত অবস্থায় ছিল এবং জনসমুদ্রের গতিবিধি পর্যবেক্ষণের জন্য আকাশে হেলিকপ্টর উড়ছিল এবংতারা ছিল ঔপনিবেশিক শক্তি, জেনারেল ডায়ারের হিংস্রতা নিয়ে তারা শেখ মুজিবের পক্ষ থেকে এমন একটি ভুলের জন্য অপেক্ষা করছিল। ১৪ ডিভিশনের জিওসি মেজর জেনারেল খাদিম হোসেন রাজা বলেছিলেন শেখ মুজিব যদি একতরফা স্বাধীনতা ঘোষনা করেন তিনি তার যাবতীয় শক্তি জড় করে তার মোকাবেলা করবেন, প্রয়োজনে ঢাকা গুড়িয়ে দেবেন। সেটা তিনি করতেনও, কেননা ঢাকা তাদের আপন শহর ছিলনা। জেনারেল ডায়ারের মত তারাও ছিলেন বহিরাগত ঔপনিবেশিক শাক্ত।তবে কোনরূপ ভীতি নয়, সম্পূর্ণ ভিন্ন কারণে শেখমুজিব অসাধারণ প্রজ্ঞার পরিচয় দিয়ে সঠিক পথে পা ফেলেছিলেন।

৭ মার্চ স্বাধীনতা ঘোষণা না করার পিছনেবড় কারণ ছিল পূর্ব বাংলা সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের দেশ এবং শেখ মুজিব দেশের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা। আইনগতভাবে তিনি গোটা দেশের নিয়ন্ত্রণভার হাতে পাবেন, তিনি কেন দেশের একাংশ বিচ্ছিন্ন করার ঘোষণা করে বিশ্বে ভুল ম্যাসেজ পৌছেদিতে যাবেন? পরিস্থিতি কোন্ অমোঘ পরিণতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে এটা বুঝতে পারা কঠিন ছিলনা এবং শেখ মুজিব পাকিস্তানিদের পক্ষ থেকে অ্যাকশনের অপেক্ষা করছিলেন। বঙ্গবন্ধু অনেকবারই বলেছেন যে তিনি নিজে প্রথম আক্রমণকারী হতে চাননি, আক্রান্ত হলে উপযুক্ত জবাব দিতে চেয়েছিলেন। এজন্যই পাকিস্তানি হামলার পর অনিবার্য পরিস্থিতিতে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা ঘোষণা করেন, বিশ্ব জনমত বাংলাদেশের পক্ষেচলে আসে।

শেখ মুজিবের প্রতিটি পদক্ষেপ ছিল অসাধারণ প্রজ্ঞার পরিচয়বহ। তথাপি তার প্রতিটি পদক্ষেপ নানা কুট তর্কে সমালোচিত হয়েছে মূলত প্রতিপক্ষের রাজনৈতির ঈর্ষার কারণে। আমাদের দেশে চল্লিশ ও পঞ্চাশের দশকে দেশভাগ ও ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে একগুচ্ছ তরুণ রাজনৈতিক নেতৃত্বের উত্থানঘটেছিল। তাদের অনেকেই পরবর্তী সময়েও রাজনীতিতে সক্রিয় থাকেন যাদের মধ্যে বামপন্থীদের লক্ষণীয়প্রভাব ছিল। এ সকল বাম নেতাদের অনেকেই নিজেদের জ্ঞানী ও তাত্ত্বিক ভাবতে অভ্যস্ত ছিলেন এবং শেখ মুজিবসহ মধ্যপন্থী নেতৃবৃন্দকে নির্বোধ ও তুচ্ছ জ্ঞান করতেন।অথচ শেখ মুজিব ছিলেন খুবই জনপ্রিয় যা তিনি অর্জন করেছিলেন তার দূরদৃষ্টি, সাংগঠনিক প্রতিভা ও অসাধারণ বাগ্মিতার কারণে। এগুলো তাকে তার প্রতিপক্ষ নেতৃবৃন্দের তুলনায় অনেক উচ্চতায় তুলে দিয়েছিল। এটাই ছিল ঈর্ষার অন্যতম কারণ।

ইয়াহিয়ার শঠতামূলক আলোচনা, পাকিস্তানিদের শক্তিবৃদ্ধির চেষ্টা

পূর্ববঙ্গে পাকিস্তানিদের মাত্র এক ডিভিশন (১৪ ডিভিশন) সৈন্য ছিল। দেশব্যাপী বাঙালিদের অভুত্থান তাদেরকে ভীত সন্ত্রস্ত করে তুলেছিল। সিভিল প্রশাসন একরূপ নিষ্ক্রিয় ছিল।লারকানা ষড়যন্ত্রের মূল পরিকল্পনা ছিল ৬-দফা প্রশ্নে শেখ মুজিব ছাড় না দেয়া এবং কেন্দ্রে ক্ষমতা ভাগাভাগির প্রশ্নে ভুট্টোর সাথে সমঝোতায় না আসা পর্যন্ত সংসদ অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত রাখা হবে এবং এর প্রতিক্রিয়ায় বাঙালিদের অভ্যুত্থানেরআশংকা দেখা দিলে সামরিকভাবে তার মোকাবেলা করা হবে। ১১ ফেব্রুয়ারি রাওয়ালপিন্ডিতে ইয়াহিয়া-ভুট্টোর দীর্ঘ আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। এর মাত্র দুদিন পর প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া মারাত্মক শঠতার আশ্রয় নিলেন।একদিকে বাঙালিদের বিদ্রোহ দমনের জন্য গোপনে ইস্টার্ন কমান্ডেরজেনারেল ইয়াকুবকে 'অপারেশন ব্লিৎস' পরিকল্পনা প্রণয়নের নির্দেশ দিলেন এবং অন্যদিকেশেখ মুজিবের চাপ ও লিগাল ফ্রেম ওয়ার্কের বাধ্যবাধকতার কারণে৩ মার্চ ঢাকায় সংসদ অধিবেশন আহ্বান করলেন। আসলে লারকানা ষড়যন্ত্র সক্রিয় করা হল।

প্রেসিডেন্টের ঘোষণার পরপরই ভুট্টো মক-ফাইটে নামলেন।১৫ ফেব্রুয়ারি পেশোয়ারে সাংবাদিক সম্মেলনেজানিয়ে দিলেন ৩ মার্চের ঢাকা অধিবেশনে তার দল যোগ দেবে না, কেননা ঢাকা তার দলের জন্যকসাইখানা হবে,তার দলের সদস্যদের সেখানে জিম্মি করা হবে। তিনি আরো হুমকি দিলেন তাকে বাইরে রেখে সংবিধান প্রণীত হলে করাচি থেকে খাইবার পর্যন্ত বিপ্লবঘটাবেন(সালিক-৫১)। বিভিন্ন বক্তৃতায় উন্মাদের মত বলতে থাকেন– পার্লামেন্টে দুটো সংখ্যাগরিষ্ঠ দল-আওয়ামী লীগ এবং তার দল পিপিপি, পাঁচ বছর ক্ষমতার বাইরে থাকার কোন ইচ্ছেই তার নেই, ক্ষমতার মসনদে বসার লালসায় শেখ মুজিবের উদ্দেশ্যে বললেন- ইধার হাম উধার তুম– পাকিস্তানকে দুভাগ করেই ছাড়লেন। বিস্ময়করভাবে তার সব প্রলাপে ইন্ধন যুগিয়ে গেলেন ইয়াহিয়া খান এবং পাকিস্তানি সামরিক জান্তা। পশ্চিম পাকিস্তানের কোনো কোনো দল সংসদ অধিবেশনে যোগ দেয়ার ইচ্ছা ব্যক্ত করেছিল, ভুট্টো তাদের পা ভেঙ্গে দেয়ার হুমকি দিলেন। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া যেন সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন। তিনিতার বেসামরিক মন্ত্রীসভা বাতিল করলেনএবং ২২ ফেব্রুয়ারি রাওয়ালপিন্ডিতে সকল সামরিক গভর্নর ও এমএলএ-দের জরুরি সভা আহ্বান করলেন। দেশে পুনরায় কঠিন আর্মি রুল প্রবর্তিতহল।

জেনারেল ইয়াকুবকে আগেই 'অপারেশন ব্লিৎস' পরিকল্পনা প্রণয়নের নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। কাজে নেমেতিনি সামরিক দিক থেকে পূর্ব বাংলাকে এযাবৎ অবহেলিত করে রাখারকুফল হাড়ে হাড়ে টের পেলেন।পূর্ববঙ্গে মোতায়েন মাত্র এক ডিভিশন সৈন্যও অত্যল্প সমরসম্ভার দেশব্যাপী অপারেশন ব্লিৎস পরিচালনার জন্যযথেষ্টছিলনা।তিনি দ্রুততার সাথেপশ্চিম পাকিস্তান থেকে আরো দুই ডিভিশন সৈন্য পূর্ববঙ্গে পাঠানোর জন্য রাওয়ালপিন্ডি সামরিক হেডকোয়ার্টারে অনুরোধ জানালেন। ২৭ ফেব্রুয়ারির থেকেসৈন্য পরিবহন শুরু হয় এবং ১ মার্চ পর্যন্ত অব্যাহত থাকে।বিষয়টা গোপন রাখার জন্য পিআইএর যাত্রীবাহী বিমানে ভারী অস্ত্র ছাড়াই সিভিল ড্রেসে সৈন্যরা আসতে থাকে।তাদেরভারী অস্ত্রশস্ত্র এম.ভি সোয়াত জাহাজযোগেচট্টগ্রাম বন্দরের উদ্দেশ্যে পাঠানো হয়।

তবেপাকিস্তানি কর্তৃপক্ষের এত রাখঢাক সত্ত্বেওঢাকা বিমান বন্দর ও চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দরে কর্মরত বাঙালি কর্মচারি ও শ্রমিকদের সতর্কতার কারণেবিষয়টা দ্রুত প্রকাশ হয়ে পড়ে। শেখ মুজিব ভয়ংকর প্রতিক্রিয়া দেখালেন, বললেন– যেখানে অ্যাসেমব্লি অধিবেশনের জন্য বিমানে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে এমএনএ-দের আসার কথা সেখানে বাঙালিদের আশা-আকাঙ্খা দমনের জন্যগোপনে সৈন্য আনা হচ্ছে।অবিলম্বে সৈন্য ও অস্ত্র পরিবহন বন্ধ করার জন্য তিনি সরকারের প্রতি কঠোর হুশিয়ারি উচ্চারণ করেন এবং এ ব্যাপারে কোনরূপ সহযোগিতা না করার জন্য বন্দরের বাঙালি শ্রমিক কর্মচারিদের প্রতি নির্দেশ দেন। বিমান বন্দরেরবাঙালি কর্মচারিরা এ সময় বিমান হ্যান্ডলিং কাজ বন্ধ করে দেয়।

জেনারেল ইয়াকুব পরিস্থিতির ভয়াবহতা অনুধাবন করেসৈন্য পাঠানোস্থগিতরাখার জন্যরাওয়ালপিন্ডি সামরিক হেডকোয়ার্টারে নির্দেশপাঠান। তবে ইতোমধ্যে ব্রিগেডিয়ার জাহানজেব আরবাবের নেতৃত্বাধীন এক ব্রিগেড সৈন্য (৫৭ব্রিগেড)পূর্ববঙ্গেপাঠানো সম্পন্ন হয়েছিল।এদেরঢাকায়মোতায়েনকরাহয়। অস্ত্র বোঝাই এম ভি সোয়াত জাহাজ চট্টগ্রাম বন্দরে পৌছালেও বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে ডক শ্রমিকরা অস্ত্র খালাশ না করে জাহাজটি ঘেরাও করে রাখে।ফলেঅবশিষ্ট দেড় ডিভিশন সৈন্য পরিবহন এবং অস্ত্র খালাশের জন্য পাকিস্তানি হানাদারদের মার্চের শেষ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়।তবে পিআইএর বিমানে এ সময়পশ্চিম পাকিস্তান থেকে সাদা পোষাকে সৈন্য আনা একেবারে বন্ধ হয়েছিল তা বলা কঠিন। কেননাবিমান বাহিনী এ সময় সিভিল এভিয়েশনের নিয়ন্ত্রণভার নিজেদের হাতে নেয়। ব্যাপক হারে সৈন্য পরিবহন না হলেও কিছু অফিসার এবং কমান্ডো বাহিনীর কিছু সদস্য এ সময় সিভিল ড্রেসে ঢাকা এসেছিল এমন ধারনা খুবই জোরালো ছিল।

৭ মার্চে বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য বঙ্গবন্ধুর কৌশলগত ঘোষণা এবং পরবর্তীতে দেশব্যাপীনজিরবিহীন অসহযোগ আন্দোলন ইয়াহিয়ার সামরিক সরকারের জন্যচরম বার্তা ছিল। এয়ারমার্শাল আসগর খান অসাধারণ এক বাক্যে সরকারকে সতর্ক করেছিলেন– বাঙালিদের কাছে আজ যা গ্রহণযোগ্য, কাল সেটা থাকছে না, কাল যেটা গ্রহণযোগ্য হবে পরশু সেটা গ্রহণযোগ্য থাকবে না। তিনি কালক্ষেপ না করে অতি জরুরিভাবে আলোচনায় বসার জন্য প্রেসিডেন্টের প্রতি আহ্বান জানান। কিন্তু ইয়াহিয়া ও তার পরামর্শদাতারা তাতে কর্ণপাত করেননি।শঠ ও ক্ষমতালোভী ভুট্টো এবং চরম বাঙালি বিদ্বেষী আর্মি জেনারেলদের পরামর্শে তিনি চরমপন্থাই বেছে নিলেন। নির্বাচনের পর তিন মাস অতিবাহিত হলেও সংবিধান প্রণয়নের জন্য সংসদ অধিবেশন না ডাকা, সংখ্যাগরিষ্ঠ দলকে সরকার গঠনের সুযোগ না দেয়া এবং বাঙালিদের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযানের অজুহাত সৃষ্টি করা– এমনসব ধ্বংসাত্মক লক্ষ্যেতিনি আলোচনার ছদ্মাবরণে ১৫ মার্চ সদলবলে ঢাকা এসে পৌছালেন। দফায় দফায় শেখ মুজিবের সাথে আলোচনায় বসলেন, পশ্চিম পাকিস্তান থেকে একে একে বিভিন্ন দলের নেতৃবৃন্দকে ঢাকায় টেনে নিয়ে এলেন। বিশ্বকে দেখালেন তিনি সদিচ্ছার পরাকাষ্ঠা দেখাচ্ছেন। আসলে এ সবই ছিল ধোঁকা এবং সামরিক অভিযানের মহড়া মাত্র।

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়াঢাকায় এসে প্রথমেই ক্যান্টমেন্টে পশ্চিম পাকিস্তানি আর্মি অফিসারদের সাথে বৈঠকে মিলিত হন। বৈঠকেঅবাধ নির্বাচনের সুযোগ দান,পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে সংখ্যাসাম্য বাতিল এবং এর সুযোগে বাঙালিদের নিরঙ্কুশ বিজয় এবং বিশেষকরে সেনাবাহিনীর সে সময়কার হীন দশানিয়েপূর্ববঙ্গে মোতায়েন পাকিস্তানি জেনারেলরা তাদের উষ্মা গোপন করেননি। ব্যতিক্রম ছিলেনএয়ার কমোডর মিট্টি মাসুদ, তিনিরাজনৈতিক সমাধানের উপর জোর দেন।পরিণতিতে তাকে শুধু পূর্ব বাংলা থেকেই সরে যেতে হলনা, চাকরিওহারালেন।

ইয়াহিয়াউগ্র জেনারেলদের আশ্বস্ত করলেন–হতাশ হওয়ার কিছু নেই, বেশি বাড়াবাড়ি করলে তিনি শেখ মুজিবকে শীতল চেহারা দেখাবেন, এলএফও প্রয়োগ করবেন এবং এই 'কালো জারজদের' (বাঙালি)কখনোই তাদের (পশ্চিম পাকিস্তানি) উপর শাসন চালাতে দেবেন না (সালিক-৭২)।

১৬ মার্চ তিনি শেখ মুজিবের সাথে আলোচনায় মিলিত হন। আলোচনা প্রকৃতপক্ষে ১৭ তারিখেই শেষ হয়ে গিয়েছিল। ঐ রাতে প্রেসিডেন্টইয়াহিয়া জেনারেল টিক্কাকে অপারেশন প্ল্যান প্রণয়নের নির্দেশ দিয়ে বলেন- হারামজাদাটা ভাল ব্যবহার করল না, তোমরা এগিয়ে যেতে পার (সালিক- ৭৪, খাদিম- ৭০)। এরপর যা আলোচনা তা ভনিতা এবং শো মাত্র। আলোচনার নামে ইয়াহিয়া প্রকৃতপক্ষে দেশ ও বিশ্বকে ধোঁকা দিয়ে তলে তলে যুদ্ধ প্রস্তুতি গ্রহণএবং নিরীহ বাঙালিদের উপর আচমকা অনৈতিক আক্রমণের সুযোগ তৈরির অপেক্ষায়ছিলেন। লক্ষণীয় যে ২৫ মার্চ দিনটিকে ইয়াহিয়া নিজের জন্য খুবই শুভ লক্ষণযুক্ত দিন মনে করতেন। দু বছর আগে এই দিনে তিনি আইয়ুবকে হটিয়ে নির্বিঘ্নে পাকিস্তানের ক্ষমতা কব্জা করেন। পূর্ব বাংলাকে কব্জায় নেয়ার জন্যও তিনি এইদিনটি বেছে নেন, বুঝতেই পারেননি বাংলার মাটিতে দিনটি তার জন্যঅভিশপ্ত দিনে পরিণত হবে এবং তাকে দুঃস্বপ্নের মত তাড়া করবে।

আলোচনা ১৬ থেকে ২৪ মার্চ পর্যন্ত দীর্ঘায়িত করা হয়। একজন অবোধ ব্যক্তিও বুঝতে সক্ষম ছিলেন যে, উদ্দেশ্যমূলকভাবে কালক্ষেপ করা হচ্ছে। ফলে এ ধরনের প্রচার ডালপালা মেলে ক্রমেই বিস্তার লাভকরছিল যে, পূর্ববঙ্গে সামরিক ঘাটতি পুরণের জন্য আলোচনার আড়ালে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে সিভিল ড্রেসে আর্মি ও অস্ত্র আনা হচ্ছে। কিন্তু এটা ঠিক ছিলনা। তখন ছিল অসহয়োগ আন্দোলনের কাল এবং এই আন্দোলন শতভাগ সফল ছিল। স্বেচ্ছাপ্রণোদিত আন্দোলনকারীদের কঠোর প্রহরা এড়িয়ে আকাশ অথবা সমুদ্রপথে সৈন্য ও অস্ত্র আনা আদৌ সম্ভব ছিলনা। বিমান কর্মীরা বিমান বন্দর অচল করে দিয়েছিল এবং চট্টগ্রাম বন্দরে কয়েক সপ্তাহ ধরে ঘেরাওহয়ে থাকা সোয়াত জাহাজ থেকে পাকিস্তানিরা অস্ত্র খালাশেও সমর্থহয়নি।

তবে ২৫ মার্চের আর্মি ক্রাক ডাউনের পর ২৬ মার্চ পশ্চিম পাকিস্তান থেকে নতুন করে বিমানযোগে সৈন্য আনাএবং২৮ মার্চ সোয়াত জাহাজের অস্ত্র খালাশ শুরু হয়।এ জন্য ২৫ মার্চ অপারেশন সার্চলাইট পরিচালিত হয় কেবল পূর্ববঙ্গে মোতায়েন ১৪ ডিভিশন এবং ৫৭ ব্রিগেডের দ্বারা। ৫৭ ব্রিগেডটি কুখ্যাত ব্রিগেডিয়ার আরবাবের সেতৃত্বে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে ফেব্রুয়ারি মাসের শেষ ঢাকায় আনা হয়েছিলঅপারেশন ব্লিৎস পরিচালনার জন্য। জেনারেল ইয়াকুব দূরদর্শী ছিলেন, বুঝেছিলেন যে কোনো সামরিক অ্যাকশান পাকিস্তানকে ভেঙ্গে দেবে। তিনি অপারেশন ব্লিৎস কার্যকর করতে অস্বীকার করেন। তাকে 'ইয়োলো'(ভয়ে বিবর্ণ হওয়া) অপবাদদিনে অপসারিত করা হয় এবং বেলুচিস্তানের কসাইখ্যাত জেনারেল টিক্কাকে তার স্থলাভিষিক্ত করা হয়। তারা নতুনভাবে ভয়াবহ এক অপারেশন পরিকল্পনা- 'অপারেশন সার্চলাইট' প্রনয়ণ করে। অপারেশন সার্চলাইটের অর্থ ছিল যে কোন মূল্যে শেখ মুজিব এবং বাঙালি নেতৃবৃন্দকে খুঁজে বের করা এবং তাদের উৎখাত করা। এই উদ্দেশ্যে ২৫ মার্চ রাতে মে. জেনারেল রাও ফরমান আলীর নেতৃত্বে কুখ্যাত ৫৭ ব্রিগেডঢাকা অঞ্চলে (ক-অঞ্চল) এবংমে.জেনারেল খাদিম হেসেন রাজার নেতৃত্বে ১৪ ডিভিশন প্রদেশের বাকি অংশে (খ-অঞ্চল) অপারেশন পরিচালনা করে। ২৬ মার্চ থেকে এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে কোয়েটা ও খরিয়ান থেকেঅতিরিক্ত দুই ডিভিশন (৯ ও ১৭ ডিভিশন) সৈন্য পূর্ববঙ্গে পৌঁছালেতারা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে এবং সাময়িকভাবে প্রায় গোটা পূর্ববঙ্গ নিজেদের কব্জায় নিতে সমর্থ হয়।

মে.জে. রাও ফরমান হেলিকপ্টার যোগে খুলনা সার্কিট হাউজ মাঠে এসে অপারেশনসার্চলাইট প্ল্যান ব্যাখ্যা করে গিয়েছিলেন ২৪ মার্চ। তিনি নিজেই ছিলেন এই কুখ্যাত পরিকল্পনাও বুদ্ধিজীবী হত্যার রূপকার। খুলনায় ২২ ফ্রন্টিয়ার ফোর্স মোতায়েন ছিল, তাদের তেমন লোকবল ছিল না। সিভিল প্রশাসনও ভেঙ্গে পড়েছিল এবং তাদের আনুগত্য নিয়ে পাকিস্তানিদের মনে যথেষ্ট সংশয় ছিল। ফলে ২২ ফ্রন্টিয়ারের কমান্ডার কর্নেল শামস প্রতারণার আশ্রয় নেন। আচরণের দিক থেকে তিনি সামাজিক ছিলেন এবং কোনরূপ সন্দেহের উদ্রেক না করেই খুলনার ডিসি ও পুলিশ কমিশনারকে তাস খেলার জন্য ক্যাম্পে আমন্ত্রণ জানান। কার্যত তারা সাময়িকভাবে বন্দী হন। ফলে খুলনা পুলিশ লাইনে আশানুরূপ বিদ্রোহ ঘটতে পারেনি। ইপিআরের অবাঙ্গালী কমান্ডারও সুচতুরভাবে প্রচার করে দেন যে আর্মি অ্যাকশানের মুখে তিনি সম্ভবত তার প্রিয় বাঙালি সদস্যদের নিরাপত্তা দিতে সমর্থ হবেন না, তবে তারা ইচ্ছা করলে আগেই ক্যাম্প ছেড়ে যেতে পারে। ফলে যেখানে অনায়াসেই বাঙালি সদস্যরা অস্ত্রাগারসহ গোটা ক্যাম্প কব্জায় নিতে পারত, সেখানে কেবল কিছু রাইফেলসহ তারা ক্যাম্প ছেড়ে পালিয়ে আসে। এরপরও যে সকল বাঙালি ইপিআর ক্যাম্প ছাড়েনি তাদের ওরা সহজেই বন্দী করে এবং দীর্ঘ নয় মাস জেলখানায় রেখে তাদের উপর নির্মম নির্যাতন চালানো হয়।

কিন্তু নির্দেশমত ২৫শে মার্চ রাতেই আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগ নেতৃবৃন্দকে গ্রেফতারের অভিযান পরিচালনা করেন। বেতারকেন্দ্রও টেলিযোগাযোগ কেন্দ্রে আর্মি মোতায়ার করা। বাংলাদেশ ব্যাংকে আগে থেকেই আর্মি মোতায়ার ছিল। গ্রেফতার অভিযানে একমাত্র সাফল্য খুলনা জেলা আওয়ামী লীগ সভাপতিও এমপি এ মোঃ হাবিবুর রহমান খান এর গ্রেফতার। ঢাকা থেকে পালিয়ে যেয়ে মুক্তিযুদ্ধ সংগঠিত করার নির্দেশ সত্ত্বেও তিনি বাড়িতেউ ছিলেন।

প্রতিরোধের কাল

২৩ মার্চ ছিল পাকিস্তান ইসলামি জমহুরিয়া দিবস। কিন্তু এদিন পূর্ববঙ্গে কোথাও পাকিস্তানি পতাকা ওড়েনি। তার পরিবর্তে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের নির্দেশে উৎসব মুখর পরিবেশে সর্বত্রভবন শীর্ষে উড়ানো হয়স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা। ছাত্রলীগ ও জয়বাংলা বাহিনী সর্বত্র আনুষ্ঠানিকভাবে এই পতাকা উত্তোলন করে এবং মার্চপাস্টের মাধ্যমে নতুন পতাকাকে সম্মান জানায়। আমাদের বাড়ির ছাদে আমরাও স্বাধীন বাংলা দেশের পাতাকা উড়িয়ে দিলাম। দক্ষিণের বিস্তীর্ণ বিলভাঙ্গা বাতাসে পতাকাটা পতপত শব্দে উড়তে থাকল, আমরা ভাই বোন সমস্বরে চিৎকার করে উঠলাম– জয় বাংলা! পাতাকাটা ছিল আমার নিজের হাতে তৈরী। সবুজ জমিনে লাল সূর্য এবং সূর্যের মাঝে কাঁচা সোনা রংয়ের বাংলাদেশের মানচিত্র ছিল প্রায় নিখুঁতভাবে কাটা এবং সেলাই করা। আমি আগের রাতে দীর্ঘ সময় নিয়ে এটা তৈরী করেছিলাম।

সে সময়কারপ্রচন্ড কর্মমুখর দিনে এর অতিরিক্ত কোন কাজ আমার ছিল না। আমি আওয়ামী লীগে যোগ দেই নি, কিন্তু প্রায় নয় মাস আগে '৭০-এর মাঝামাঝিতে ছাত্রলীগ থেকে একরূপ নির্বাসন পেয়েছিলাম। আমি ব্যক্তিগত গ্রুপিং পছন্দ করতাম না, তবে জানতাম দলে গ্রুপিং অবশ্যম্ভাবী। এমনকিযদি একটি গ্রুপকে দল থেকে পুরোপুরি বিতাড়িতও করা হয় তবুও পরবর্তীতেসমমনারা নিজেরাই বিভক্ত হয়ে নতুন গ্রুপের জন্ম দেয়।আমাদের দেশে ডান, বাম, মধ্যপন্থী, ধর্মীয় সকল দলে এটা অতি প্রকট। এর পিছনে আদর্শ, কর্মসূচি ইত্যাদির একটা ক্ষিণ ভূমিকা থাকে বটে, কিন্তু নেতৃত্বের অভিলাষই মূলকথা। আমাদের কালে ছাত্র নেতাদের সামনে ঠিকাদারি, ব্যবসা, দখলদারী ইত্যাকার লোভনীয় টোপ ঝুলত না।যাহোক গ্রুপিং সব সময় যে খারাপ ছিল তা নয়, এটা দলের মধ্যে প্রতিযোগিতা এবং কাজের স্পৃহা বাড়িয়ে দিত। ছাত্র ইউনিয়ন যখন মেনন-মতিয়া গ্রুপে বিভক্ত হল ঠিক এটাই ঘটেছিল, অবশ্য তাদের গ্রুপিংটা নিছক নেতৃত্বের কোন্দল ছিলনা।

আমরাজানতাম ব্যক্তিকেন্দ্রিক গ্রুপিং নয়, প্রকৃত গ্রুপিংয়ের দিন সামনে আসছে। সে গ্রুপিং হবে বিশেষএক কর্মসূচীভিত্তক এবং সেটাই হবে আসল গ্রুপিং। সবাই এটা বুঝতো, তবেখুলনায় ব্যক্তিকেন্দ্রিক গ্রুপিং তখনএতটাই প্রবল হয়েউঠেছিল যে তা থেকে মুক্ত থাকাকঠিন ছিল। তারা অবশ্য ৬-দফা ও স্বাধীনতার ব্যাপারটা টেনে আনত। আমার ধারণা সে সময় এই ইসুতে গ্রুপিং অসময়োচিত ছিল। ফলে আমি সবাইকে গ্রুপিং থেকে বিরত থাকতে বলতাম। বস্তুত আমার ধারণা ভুল ছিলনা, কেননা ৮-৯ মাস পর ৭ মার্চ, ১৯৭১ খুলনায় যখন স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রম পরিষদ গঠিত হয় ১২ সদস্যের কমিটিতে উভয় গ্রুপ থেকে ৬ জন করে সদস্য অন্তর্ভুক্ত হয়। খুলনা ছাত্রলীগের তখন অসম্ভব জনপ্রিয়তা। যে কোন ঘরোয়া মিটিংয়ে দেড়-দুশ ছাত্র অনায়াসে সমবেত হয়।এমনই এক সময়ে, সত্তরেরমাঝামাঝিতে খুলনা ছাত্রলীগের সমান্তরাল দুটি গ্রুপের চাপে আমি ১৯৬০ সাল থেকে একাদিক্রমে ভোগ করে আসা ছাত্রলীগ শহর ও জেলা কমিটিতে আমার সদস্যপদ এবং প্রভাব দু'টোই হারিয়ে ছিলাম। যদিও তাদের সংস্রব কখনো ত্যাগ করিনি, তারা অনেকে আমার সুপ্রিয় বন্ধু ছিল এবং অনেকেছিলঅতি স্নেহভাজন। তবে মাস কন্টাক্ট আমার কখনোই ছিলনা এবং ভাল বক্তাও আমি ছিলামনা।

২৫ মার্চ বিকালে ছাত্রলীগ এবং আওয়ামী লীগের কিছু নেতাকর্মীর মুখের দিকে তাকিয়ে একটা গ্লুমি ভাব আমার মধ্যেও সংক্রামিত হল। কিন্তু তারা কোন ব্যাপারে নিশ্চিত ছিল না। আমরা মুজিব-ইয়াহিয়া আলোচনায় ইতিবাচক ফলাফল আশা করতাম। বিকল্প কিছু ছিল বলে মনে হত না। যদিও বন্ধুরা আগেই ডামি রাইফেল নিয়ে মাঠে ময়দানে প্যারেড করা শুরু করে দিয়েছিল। উৎসাহভরে আর্মি, ইপিআর ও পুলিশের প্রাক্তন বাঙালি সদস্যরা তাদের ট্রেনিং দিতে এগিয়ে এসেছিল। তবে আমি সবাইকে নিজের মত করে মাপতে অভ্যস্ত ছিলাম এবং দুঃশ্চিন্তা আমার পিছু ছাড়তো না।

ইয়াহিয়া-মুজিব দীর্ঘ আলোচনা জনগণের মধ্যে সন্দেহ ও উষ্মা ক্রমাগত বৃদ্ধি করে চলেছিল। আলোচনারনামে ইয়াহিয়া খান আগাগোড়াই প্রহসন করছেন এমন সন্দেহ খুবই প্রবল ছিল।এমন প্রশ্ন হরহামেশাই উঠত যে শেখ মুজিব কেন তার পাতা ফাঁদে পা দিচ্ছেন, তিনি কেন স্বাধীনতা ঘোষণা করছেন না! অনেক বিদগ্ধ ব্যক্তিও এমন বালখিল্য প্রশ্ন উত্থাপন করে বসতেন। প্রকৃত বিষয়টা তলিয়ে দেখতে খুব কম লোকই সমর্থ ছিলেন। স্বাধীনতা ঘোষণার মত ন্যূনতন সামরিক প্রস্তুতি আমাদের কোথায়, প্রেসিডেন্ট ভনিতা করুন আর যাই করুন আলোচনার টেবিল তো এখনো ছাড়েননি, এমতাবস্তায় আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়া কি হবে– সরল সাদাসিধা অথবা কুটিল-বুদ্ধি মানুষ এসব দেখেনা। দুর্ভাগ্যক্রমেতখন এই দু ধরনের মানুষ খুবই সরব। আমি হতাশায় ভেঙ্গে পড়লাম যখন২৪ মার্চ প্রেসিডেন্টের টিমের সাথে আলোচনা শেষে সাংবাদিকদের উদ্দেশ্যে তাজুদ্দিন আহমেদ বললেন–'আমাদের মধ্যে অতিরিক্ত কিছু আলোচনার নেই, এখন প্রেসিডেন্টকে আলোচনার চূড়ান্ত ফল ঘোষণা করতে হবে।' আমরা বুঝে গেলাম বল এখন প্রেসিডেন্টের কোর্টে।

কিন্তু প্রেসিডেন্টের ঘোষণা আরকখনো এলো না। আমি ২৫ মার্চ দীর্ঘ সময় রেডিও নিয়ে বসে ছিলাম এবং ক্রমাগত ঢাকা, করাচি, কলকাতা ও বিবিসির নব ঘুরিয়ে যাচ্ছিলাম। তার বদলে রাত দশটার দিকে হঠাৎ ঢাকা কেন্দ্র ডেড হয়ে যাওয়ার বাস্তবতা আমার হৃৎপিণ্ডে হাতুড়ির আঘাত হানল। আশংকা সত্যে পরিণত হল। আমরা একাধারে অনাকাঙ্খিত নিয়তি এবং মহা সম্ভাবনার মুখোমুখি হলাম!

বিশ্বাস করা কঠিন ছিল, যে আশা সাহস করে এতদিন ধরে রেখেছিলাম সে আশার সলতেটাআচমকা দপকরে নিভে গেছে। পাশের বাড়িতে আমার চাচারা থাকতেন। বড়ভাই ছিলেন দৈনিক আজাদের রিপোর্টার, তার টেলিফোন ছিল। আমাদের গোটা পাড়ায় সম্ভবত আমার রেডিও এবং বড়ভাইয়ের টেলিফোন ছাড়া ঢাকা বা বাইরের সাথে যোগাযোগের আর কোন মাধ্যম ছিলনা। আমার ফুফাতো বড়ভাই সৈয়দ জাফর আলী (মুন্না ভাই) আজাদের চিফ রিপোর্টার ছিলেন। তিনি আমাদের খুবই কাছের এবং অসাধারণ ভাল মানুষ ছিলেন। সেই নিঃস্তব্ধ রাতে পাশের বাড়ি কয়েকবার ভয়ংকর শব্দে টেলিফোনের রিং বেজে উঠল। নিশ্চিত ছিলাম, কলগুলো আসছে মুন্না ভাই এর কাছ থেকে। খুলনায় তার ঘনিষ্ট আত্মীয় স্বজন অগুনতি, তিনি কি কোন ম্যাসেজ দিতে চাচ্ছেন! আমি বড়ভাইয়ের জানালার পাশে যেয়ে দাঁড়ালাম।বড়ভাই মুসলিম লীগ করতেন, স্বভাবতই টেলিফোন কলের ভাষ্য সম্পর্কে কিছুই বললেন না, উল্টে জিজ্ঞাসা করলেন– তোমার রেডিও কি বলে?

– রেডিও তো হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেছে।

– তারপরও বুঝতে পারনি কি হয়েছে! এতদিন যথেষ্ট লাফালাফি করেছ, ভেবেছিলে পাকিস্তান ঠুনকো কাঁচের মত, মুজিব টোকা দেবে আর ভেঙ্গে খান খান হয়ে যাবে? তোমাদের মুজিব যা করবে ইয়াহিয়াখান, টিক্কা খাননিরবে তাই সহ্য করবে? এখন বুঝলে তো! যাও ঘরে যাও, ইয়া নফসি ইয়া নফসি করগে। আর্মি টেকওভার করেছে, তোমার ভালর জন্য বলি, মোটেও বাড়াবাড়ি কোরো না, বিপদে পড়ে যাবে।

রাতটা কাটল আধাখেঁচড়া ঘুমে। তখনো জানিনা রাতটা ছিল যুগপৎ অভিষপ্ত এবং যুগসন্ধির রাত। আজানের শব্দে জেগে গিয়েছি। মুখটা তেতো হয়ে আছে। অথচ প্রকৃতি ছিল আর সব ভোরের মতই স্নিগ্ধ, প্রশান্ত। বাড়িতে রোজকার মত পাখির কলকাকলি কানে মধু ঝরাচ্ছিল। ভোরে নামাজ পড়তে উঠে বাবা প্রথামাফিক আমাদের ডেকে চলেছেন। তিনি যতক্ষণ না মসজিদের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে যান ততক্ষণ এটা চলতে থাকবে। তবে ঘুম ভাঙ্গুক চাই না ভাঙ্গুকআমাদের ঘাপটি মেরে পড়ে থাকায় কোন হেরফের ঘটেনা। আজ তলপেটে এক অস্বস্তি আমাকেক্রমাগত খুঁচিয়ে যাচ্ছে, বিশ্বাস করতে ইচ্ছা করছে গত রাতের ব্যাপারগুলো বাস্তব নয়, দুঃস্বপ্নের মত কিছু।

হঠাৎ কিছু বিক্ষিপ্ত গুলির শব্দে চমকে উঠলাম। বাবা মসজিদে যাচ্ছিলেন, মার কাছে বাঁধা পেয়ে বাড়িতে নামাজ আদায় করলেন। আসলে আমরা জানতাম না, শহরে কার্ফু জারি হয়েছে। আমাদের মত সুইপার ঝাড়ুদাররাও কি জানত না? নাকি তারা কার্ফুর আওতামুক্ত থাকে, আর্মিরাই তা জানত না। সেই ভোরে পথঘাট পরিস্কার করতে বেরিয়েছিল তারা,বিক্ষিপ্ত গুলির আঘাতেকেউ কেউ জীবন দিল। খুলনার মুক্তিযুদ্ধে প্রথম শহীদ। অথচ নিতান্ত আপনজন ছাড়া কেউই জানল নাতারা কারা ছিল, কজন ছিল। পরিস্থিতি এবং সামাজিক অবস্থানের কারণে ঘটনাটা শ্রেফ বিস্মৃতির অতলে হারিয়ে গেল।

কার্ফু জারি করা হয়েছিল বটে কিন্তু বেলা বাড়ার সাথে সাথে কার্ফু বলবৎ করার উদ্যোগ নিতে কেউ এগিয়ে এল না। আমাদের মোড়ের মাথায় বিক্ষিপ্ত জটলা। সঠিক সংবাদ কেউ জানে না, গুজব ডালপালা মেলতে থাকে। আমি ভোর থেকে রেডিওর উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে ছিলাম, ঢাকা কেন্দ্র তখনও বন্ধ। বিবিসি, ভোয়া, করাচি, আকাশ বাণী পূর্ব বাংলার ব্যাপারে আশ্চর্যরকম নিশ্চুপ। আমার ভাঙ্গাচোরা মায়াম সাইকেলটা নিয়ে পথে বেরিয়ে পড়লাম।মোড়ে মোড়ে জটলা। হৈচৈ নেই। সবাই কথা বলছে চাপা স্বরে। পাশার গুটি উল্টে যাওয়ায় এ অবস্থা। বেরনোর মুখে পাড়ার একজন বলল–'দাঁড়াও মনোয়ার মিয়া, ঠিক কি ঘটেছে বলতো।' তারা আমার একদা রাজনৈতিক কানেকশন সম্পর্কে জানেন, সম্ভবত সে কারণেই জিজ্ঞাসা করা। বললাম ঢাকা রেডিও রাতে সহসা বন্ধ হয়ে গেছে, আর্মিরা ভয়াবহ হামলা চালিয়েছে, এটাই শুধু বলতে পারি। খবর জানতে বেরিয়েছি।

কাছেই আহসান আহমেদ রোডে এমএনএ সালাহউদ্দিন ভাই এর বাড়ি। পাশের চায়ের দোকানটাও আজ খোলেনি। আমি বাড়ির গলিতে ঢুকতেই পাশের বাড়ির জানালা খুলে কিশোর বয়সী একটা ছেলে বলল–জলদি বাড়ি যান ভাই, সালাহউদ্দিন চাচার বাড়িতে আর্মি এসেছিল, রক্ষে কেউ ছিল না। তারা আমাদের গালিগালাজ করে চলে গেছে, ভয়ও দেখিয়েছে। চাচা কোথায় আমরা কিভাবে জানব বলেন। আর্মি টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে। যে কোন সময় আবার আসতে পারে। আমি ছাত্রদের খোঁজে বেরোলাম।

ছেলেদের বিশেষ কাউকেই পেলাম না, শুনলাম টুকু দলবল নিয়ে বয়রা, দৌলতপুরের দিকে যশোর রোড বরাবর বেরিকেড দিতে বেরিয়েছে। শেখ কামরুজ্জামান টুকু তখন খুলনা জেলা আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর প্রধান ছিল। শহরে শান্তি বিধানের কাজে তারা যখন জীপ নিয়ে মধ্যরাতে খালিশপুরে নৈশ টহলে ছিল তখন খালিশপুর ফায়ার ব্রিগেড কর্মীরা তাদের ঢাকায় আর্মি ক্রাকডাউনের খবর জানায়। তারা খবরটা পেয়েছিল অয়ারলেসের মাধ্যমে। টুকুরা এ ধরনের পরিস্থিতির জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত ছিল, সাথে সাথে কাজে নেমে পড়ে। শুনে ভাল লাগল যে ফুলতলা পর্যন্ত যশোর রোড বরাবর ব্যারিকেডের পর ব্যারিকেড দেয়ার কাজ চলছে। সেখানে পর পর অনেকগুলো জুট মিল, জুট প্রেস, করাত কল আছে, বিল্ডিং নির্মাণের জন্য পথের পাশেদীর্ঘ দিন ধরে শ্যাওলাধরা পাঁজা পাঁজা ইট টাল দেয়া আছে, স্কুল কলেজ আছে এবং সর্বত্র ক্ষুব্ধ ক্রুদ্ধ ছাত্র শ্রমিকরা আছে। এরা ভীত নয়, ৭ মার্চের ভাষণে ঘুমন্ত বাঘ্রকে জাগিয়ে তুলেছেন এক মহানায়ক। কিন্তু তিনি কোথায়? বেঁচে আছেন তো! এই একটাই চিন্তা মাথা জুড়ে ঘুরপাক খাচ্ছে সারাক্ষণ।

ইতস্তত ঘুরছিলাম। রাস্তার সর্বত্র, বিশেষ করে মোড়ে মোড়ে জটলা উত্তেজনা। খানজাহান আলী রোডে এক জাগায় দেখলাম কয়েকজন হঠাৎ জটলা ভেঙ্গে রাস্তার পাশ থেকে চাকা ভাঙা একটা ইট বোঝাই ঠেলা গাড়ি টানতে টানতে পথের উপর নিয়ে এল। ইটগুলো পথের মাঝেফেলে এক পাশ উচু করে ঠেলাটা পথের উপর উল্টে দিল। তারা ব্যারিকেড আরো মজবুত করার উপকরণ সংগ্রহে এদিক ওদিক ছোটাছুটি করছিল।খুবই দুর্বল প্রতিবন্ধকতা, পাকিস্তানি হানাদারদের আগ্রাসন পনেরো মিনিটও ঠেকাতে পারবে কিনা সন্দেহ। কিন্তু তারা গায়ের ঘাম ঝরাচ্ছে, একটাই লক্ষ্য– বিনা যুদ্ধে নাহি দিব সুচাগ্র মেদিনি। আমি চলে এলাম।

সকালেই দেখে গেছি ঢাকা রেডিও বন্ধ। ফিরে দেখি একই অবস্থা। উদ্বেগ বাড়ল। বঙ্গবন্ধুর ভাগ্য নিয়েই যত চিন্তা। তিনি কি পালাতে পেরেছেন, কোথায় তিনি! আমি বিরামহীন ভাবে রেডিওর নব ঘুরিয়ে যাচ্ছিলাম। ঢাকা কলকাতা বিবিসি ভয়েস অব আমেরিকা– দুর্ভাগ্যক্রমে সব স্টেশনই বাংলাদেশের ব্যাপারে একেবারে নিশ্চুপ, কোথাও কোন সংবাদ নেই। না বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে, না গত রাতের ভয়াবহ আর্মি ক্রাকডাউন সম্পর্কে।

হঠাৎ সাড়ে নটার দিকে ঢাকা রেডিও ভয়ংঙ্করকড় কড় শব্দে সচল হয়ে উঠল। পবিত্র কোরআন পাঠ হল। কিন্তু পরমুহূর্তে আমার ক্ষীণ আশাটা এক লহমায় দপ করে নিভে গেল, উর্দু-বাংলার এক উদ্ভট জগাখিচুড়িতে এলান প্রচারিত হচ্ছে। ফাটা রেকর্ডের মত সেটা অনর্গল বেজেই চলল। ভয়ে সিটিয়ে যাবার মত অবস্থা– যেখানে ব্যারিকেড দেয়া হবে, যেখান থেকে বাঁধা আসবে, তার একশ গজের মধ্যে সবকিছু জ্বালিয়ে পুড়িয়ে তাবা করে দেয়া হবে। বাবা অস্থিরভাবে পায়চারি করতে করতে বললেন– অফিসে যাওয়া আসার পথে রোজই আর্মিদের দেখি, আগে কিছুটা ভদ্র সরল মনে হত, ইদানিং কেমন যেন হিংস্র মনে হয়– চেনবাধা ডালকুত্তার মত, ছাড়া পেলে সবকিছু ছিড়ে কামড়ে তছনছ করে দেবে। তবে পাকিস্তান এবার বোধহয় নিজের পায়ে নিজেরাই কুড়াল মারল।

আমিরেডিওর নবক্রমাগতঘুরিয়ে যাচ্ছিলাম। ঢাকার অবস্থা সম্পর্কে, বিশেষ করে বঙ্গবন্ধু এবং আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ সম্পর্কে জানার জন্য সবাই পাগলের মত উদ্‌গ্রীব ছিল। পাশের বাড়ি সেজচাচার কড়া সেনসরশীপের মধ্য থেকে মা কেবল একটা কথা জানতে পেরেছেন, রাতে ঢাকায় প্রচন্ড গোলাগুলি হয়েছে। সম্ভবত সাড়ে নটা-দশটার দিকে রেডিওরনব আকাশবাণী কেন্দ্র স্পর্শ করতেই আমার শিরদাঁড়া বরাবর একটা শিহরণ খেলে গেল। 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি'– গানটি যে এত আশা, এত আবেদন জাগাতে পারে আগেএমনভাবে কখনো অনুভব করিনি। অপার্থিবএক অনুভূতি আমাকে আচ্ছন্ন করে ফেলল– যেন কতকাল গানটি শুনিনি, আর কখনো শোনাও হবে না, আমরা শেষ হয়ে গেছি! সম্বিত ফিরতেই গা ঝাঁড়া দিয়ে উঠে দাঁড়ালাম, আকাশ বাণী তখন খবর দিচ্ছে– পাকিস্তান আর্মি গত রাতে বাঙালিদের ওপর তীব্র হামলা চালিয়েছে,ঢাকা এবং দেশের সর্বত্র যুদ্ধ চলছে। বহু লোক হতাহত হয়েছে, শেখ মুজিব বাঙালিদের প্রতিসর্বশক্তি দিয়ে পাকিস্তানি সৈন্যদের প্রতিরোধ করার আহ্বান জানিয়েছেন।সংক্ষিপ্ত সংবাদ, কিন্তু অশান্ত ঢেউয়ের উথাল পাথাল শুরু হল আমার ভিতর।

বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণাঃ পিটিআই মোড়ে ব্যরিকেড

কিছুক্ষণের মধ্যেবাড়ির সামনে সোরগোল শুনতে পেলাম।আকাশবাণীর সংবাদ সবাইকে সুপ্তি ভেঙ্গে গা ঝাড়া দিয়ে উঠতে অনুপ্রাণিত করেছে। অনেকেই এটা শুনেছিল, মুখে মুখে আরো পল্লবিত হয়েছে। অল্পক্ষণের মধ্যে পাড়ার বেশ কিছু ছাত্র, যুবক এবং শ্রমজীবীমানুষ এসে জমা হল আমাদের বাড়ির সামনে। রাজনীতির সাথে তাদের সম্পর্ক কমই ছিল। পড়াশুনা ও জীবিকার বাইরে তারা খেলাধূলা, আড্ডা, প্রেম, সিনেমা এসব নিয়েই ব্যস্ত সময় কাটাতো। তারা অনেকেই আমায় রাজনৈতিক কানেকশানের কথা জানত, কিন্তু আমি যে দীর্ঘ দিন রাজনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন তা তাদের জানা ছিলনা।

তারা উত্তেজিত ছিল, বলল আমরা কিছু করতে চাই, বলুন কি করতে হবে। শুনেছি যে আপনারা রাইফেল ট্রেনিং দিচ্ছেন, কোথায় সেটা, আমরাও ট্রেনিং নেব। ওরা সব মিলিয়ে পনেরো বিশ জন ছিল, সবাই টগবগ করে ফুটছে। আমি নিজেই জানতাম না এই মুহূর্তে করণীয় কি। কিন্তু তীব্রভাবে কিছু করার তাগিদ অনুভব করছিলাম। বললাম সকালে বাইরে থেকে ঘুরে এসেছি, কিন্তু পরিচিত কাউকে পাইনি। শুনেছি সবাই যশোর রোডে ব্যারিকেড দিতে গেছে যাতে যশোর সেনাছাউনি থেকে আর্মি খুলনায় আসতে না পারে। মনে হল সবাই একটা কাজের সুযোগ পেয়েছে, সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠল আমরাও ব্যারিকেড দেবো।

যে যার মত শাবল কোদাল জোগাড় করে নিয়ে এল। প্রচণ্ড ভয় এবং উৎকণ্ঠা নিয়ে ওদের সাথে গেলাম। আমরা পিটিআই মোড়ে খানজাহান আলী রোডের উপর ব্যারিকেড দেয়ার উদ্যোগ নিয়েছিলাম। অভিজ্ঞতার অভাব, পাশাপাশি উত্তেজনা সুষ্ঠুভাবে চিন্তা করতে দিচ্ছিল না, এ জায়গায় ব্যারিকেড কি কাজে আসতে পারে তা না ভেবেই আমরা কাজে নেমে পড়লাম। মোকাদ্দেম মোড়ের প্যারপিটের উপর উঠে দাঁড়িয়ে জ্বালাময়ী বক্তৃতা শুরু করল– 'ভাইরা আমার, আমরা এইমাত্র আকাশবাণী রেডিও'র সংবাদ এবং ও আমার সোনার বাংলা–গান শুনে এসেছি। আমাদের হতাশ হওয়ার কিছু নেই, বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন, বলেছেন–সবাইকে হানাদার পাকিস্তানি সৈন্যদের বিরুদ্ধে

সর্বশক্তিতে রুখে দাঁড়াতে হবে। আমরা খবর পেয়েছি হানাদার সৈন্যরা যশোর ক্যান্টমেন্ট থেকে বেরিয়ে আমাদের খুলনার দিকে আসছে। আমরা কোনভাবেই ওদের এখানে ঢুকতে দেব না। যশোর রোড বরাবর ব্যারিকেড দেয়া শুরু হয়ে গিয়েছে, আমরাও এখানে ব্যারিকেড দেব, আসুন আপনারা সবাই আমাদের সাথে হাত লাগান।' সে রাজনীতির সাথে যুক্ত ছিল না, কিন্তু পরিস্থিতি তাকে উদ্বুদ্ধ করেছিল। শামিম বাম আন্দোলন করতো, পিপলস জুট মিলের স্টাফ ইউনিয়নের সভাপতি ছিল। সেও জ্বালাময়ী বক্তৃতা করল। ব্যারিকেড দেয়ার ব্যাপারে প্রভূত সাড়া পাওয়া গেল।

ব্যারিকেডের উপকরণ হিসাবে দোকানের পরিত্যাক্ত ভাঙ্গা ঝাপ, 'বিক্রয় হবে' লেখা একটা পুরান পান-বিড়ির দোকান,পিটিআই-এর পাশে স্তুপ করে রাখা বেশ কিছু ইট পাওয়া গেল। সেগুলো পথের উপর ছড়ানো হল। আমরা গলদঘর্ম হয়ে এতক্ষণ যে কাজ করলাম, কলিম ভাই বললেন আর্মিরা এক লহমায় তা সরিয়ে ফেলবে, পথ কাটো ব্যাটা, পথ কাটো।

আমরা পাড়ার সুবাদে তাকে কলিম ভাই বলতাম, তাও নেহাত সামনে পড়ে গেলে তবেই। তার সাথে আমাদের যোগাযোগের সুযোগ ছিল না, প্রয়োজনও ছিলনা। অনেকেই বলতেন তিনি পাঁড় এডিকক্টড, বিষয়টা আমাদের কাছে তখন ততটা পরিস্কার ছিল না। সে সময় এ ধরনের লোকজন আড়ালে থাকতে পছন্দ করতেন। উত্তাল উনসত্তর-সত্তরের আন্দেলন, সংগ্রাম ও নির্বাচন চারদিকে হৈচৈ ফেলে দিয়েছিল। সেসব আন্দোলনে তাকে কখনো দেখিনি। কিন্তু একাত্তরের ৩ মার্চ খুলনায় যখন বন্দুকের দোকান লুট হল, তাকে দেখা গেল ছাত্র শ্রমিকদের সাথে গোলাম দসুল ও সৈয়েদ মোল্লার বন্দুকের দোকানের শার্টার ভাঙ্গতে। কিছুক্ষণ পর সাথে বন্দুক এবং প্যান্টের পকেট কর্তুজ ভরে বেরিয়েও এলেন। বন্দুকের দোকান লুটপাট এত অপরিকল্পিত ছিল যে, গুলি বন্দুক নিয়ে কে কোথায় সরে পড়ল হদিস পাওয়া গেল না। যারা সঙ্গবদ্ধ হতে পারল তারাও দেখল বন্দুকের সাথে গুলির মিল নেই, নলের ভেতর গুলি ঢুকছে না। একটা হযবরল অবস্থা তাদের হতাশ করল। তারা পরস্পরের প্রতি দোষারোপ শুরু করেছিল বটে, কিন্তু কেউ একজন যখন বলল–আমরা নতুন, প্রথম প্রথম এমনটা হতেই পারে, এর মধ্য দিয়েই আমাদের সংবদ্ধ হতে হবে। তাদের সম্বিত ফিরল।

পরদিন দুপুরের মধ্যেই প্রচার করা হল যে, এখন আমাদের বাঁচা মরার প্রশ্ন, সশস্ত্র পাকিস্তানি হানাদারদের প্রতিরোধ করতে আমাদেরও অস্ত্র প্রয়োজন, এজন্যই অস্ত্রের দোকান লুট করা হয়েছে। যারা অস্ত্র নিয়েছেন তারা মুক্তিযোদ্ধা, তাদের সংবদ্ধ হতে হবে, অস্ত্র গোলাবারুদ নিয়ে নির্দিষ্ট স্থানে রিপোর্ট করতে হবে। দুপুরের দিকে দেখলাম কলিম ভাই ঘাড়ে রাইফেল ঝুলিয়ে পকেট বোঝাই গুলি নিয়ে পাড়া ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছেন। আবার কিছুক্ষণ পর ফিরেও এলেন। পাড়ারজুনিয়র ছেলে সহিদ, সাহস করে জিজ্ঞাসা করল– কলিম ভাই, নাম রেজিস্ট্রি করে এলেন বুঝি?

নারে ভাই, এ যে বিরাট দায়িত্ব, মুক্তিযুদ্ধ বলে কথা! আমি গাজাগুলি খাওয়া মানুষ, পারব কেন, গুলি বন্দুক জমা দিয়ে এলাম।

আমরা শাবলকোদাল নিয়ে রাস্তা কাটার চেষ্টা করে যাচ্ছিলাম। কলিম ভাইও একটি কোদাল ধরলেন, দুতিনটি কোপ দিয়ে স্বগতোক্তি করলেন–তোর কাজ নারে কলিম, গুলি গাজা খেয়ে শরীরটা একেবারে ঝাঁঝরা করে ফেলেছিস। এর মধ্যে ভারি গাইতি নিয়ে শালপ্রাংশু এক নির্মাণশ্রমিক আমাদের সাথে যোগ দিলেন। তিনি খানিক আগেও আমাদের কষ্ট দেখছিলেন, বিড়বিড় করে বললেল– শুধু কোদাল শাবলে হবে না, গাইতি লাগবে। দু'জন দিনমজুর রোজকার মত কাঁধে কোদাল ঝুলিয়ে কাজের সন্ধানে দোলখোলার মোড়ে গিয়েছিল, কাজ মেলে নি, ঘরে ফেরার পথে তারাও হাত লাগালেন।

আমরা তুমুল উৎসাহে ঘন্টা দুয়েক চেষ্টা করে রাস্তার তিন ফুট মত চওড়া দু'তিন ইঞ্চি গভীর করে এসফল্টের পলেস্তারা উঠাতে পারলাম বটে, কিন্তু ক্লান্ত হয়ে ঝপাঝপ পথের পাশে প্যারাপিটের উপর বসে পড়লাম। পিটিআই-এর মোড়ে ছিল গোলপাতায় ছাওয়া ছোট এক চায়ের দোকান। আমরা এখানে বিকালে আড্ডা দিতাম। দোকানদার কলাইওঠা টিনের ট্রেতে কয়েক কাপ ধুমায়িত চা এবং কয়েকটা টোষ্ট নিয়ে এলো, প্রথমে ধরল গাইতিওয়ালার সামনে, বলল ভাগযোগ করে খান ভাই, চাঙ্গা হয়ে নেন। একজন বিস্ময়ের সাথে বলল–কি অদ্ভুৎ! এ তো দেখছিসবাই একট্টা, দেশ এবার স্বাধীন না হয়ে যাবে কোথায়!

সবাই এখন নির্মাণ শ্রমিকের নেতৃত্ব মেনে নিয়েছে, তিনি বললেন– কাজটা এখন তেমন কঠিন হবে না, খোয়াগুলো গাইতি শাবল দিয়ে আমরা ভেঙ্গে দিচ্ছি, আপনারা স্যারকোদাল দিয়ে ওগুলো তুলে ফেলুন, আর নিচে তো সবই মাটি।

পিটিআইয়ের মোড়ে বেশ কিছুলোক জড় হয়ে আমাদের কাজ দেখছিল, তারা অনেকেই ছিল আশেপাশের লোক, প্রায় সবাই পৌঢ় অথবা বৃদ্ধ। তারা বিমর্ষ ও গম্ভীরছিল। তাদের দৃষ্টিতে কৌতুহল অপেক্ষা সন্দেহের ছায়া প্রকট। তবে কেউ সেদিকে দৃষ্টি দেয়ার প্রয়োজন বোধ করেনি। আমরা দেখছিলাম প্রায় অসম্ভব কাজটা একটা লাইনে এসে গেছে।

এবার বয়স্ক লোকজন যারা এতক্ষণ বিমর্ষভাবে আমাদের কাজ দেখছিলেন, হঠাৎ জোট বেঁধে এগিয়ে এলেন, বললেন–বাবারা তোমরা যেটুকু করেছ যথেষ্ট হয়েছে, এখন ক্ষান্ত দাও।

মোকাদ্দেম অবাক হয়ে বলল– তার মানে?

কেন তোমরা কি টিক্কার এলান শোনেনি? তিনি তো হুকুম দিয়েছেন যেখানে ব্যারিকেড দেয়া হবে, যেখান থেকে বাধা আসবে তার আশপাশে একশ গজের মধ্যে তারা সবকিছু উড়িয়ে দেবে, জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খাক করে দেবে, তাবা করে দেবে– কি সব যেন বলছে রেডিওতে। তোমরা রেডিও শুনে দেখো, বার বার এই ঘোষণা দিচ্ছে। কসাইটারে তো চেন, যা বলে তা করেই ছাড়ে। তোমরা ওদের কি দিয়ে ঠেকাবা বল, ওদের অনেক শক্তি। মধ্যিপড়ে আমরা ধনেপ্রাণে শেষ হয়ে যাব।

মোকাদ্দেম হাত নেড়ে বলল, আমরা ওসব এলান টেলানের পরোয়া করি না, ওদের ঠেকাতে হবে তা যে ভাবেই হোক।

তারা খানিক এদিক ওদিক ছোটাছুটি করে আমার কাছে এলেন। কাছেই গলির মধ্যে ধাবড়া টাইপের এক গোলপাতা ঘরের মাথা ছাড়িয়ে অনেক উঁচুতে বাঁশের আগায় বিবর্ণ লাল ত্রিকোণ পতাকা উড়িয়ে আস্তানা খুলেছিলেন কালা ফকির। তাকে মাঝে মাঝে পথে দেখা যেত। রুক্ষচেহারা, শুকনো প্যাকাটির মত শরীর, মেহেদী রঞ্জিত চুল দাড়ি, চোখে সুরমার গাড় প্রলেপ। শিউলি রাঙানো আলখাল্লা ও তহবন্দ পরতেন।তিনি ছিলেন মিয়াপাড়ার আদি বাসিন্দাদের একজন, পেশায় রাজমিস্ত্রী।পরে কিভাবে ফকিরি পেয়েছেন তা আমাদের অজানা। ছেলেবেলায় এ ধরনের লোকদের প্রতি আমার একটা ভয় মিশ্রিত শ্রদ্ধা ছিল, সামনে পড়লে সালাম দিতাম। হয়তো সেই ভরসায় এগিয়ে এলেন, বললেন–বাবা তুমি ওদের মানা কর, তুমি বললে ওরা ঠিকই শুনবে। নইলে আর্মিরা কামান মেশিনগান দিয়ে আমাদের ধ্বংস করে দেবে। বাড়ি-ঘর জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করবে।

– কিন্তু চাচা, ওদের তো বিনা প্রতিরোধে ছেড়ে দেয়া যাবে না। আমাদের কিছু একটা করতেই হবে। আপনি নিশ্চই বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ শুনেছেন?

– শুনেছি বাবা, মাশআল্লাহ্! অতি চমৎকার ভাষণ,গায়ের লোম খাড়া হয়ে যায়। তবে এই সামান্য ব্যারিকেড দিয়ে তোমরা ওদের কিভাবে ঠেকাবা?জানো তো নিজের দেশে ঈদের জামাতে বোমা মারতে কসাইটার বুক কাঁপেনি। মাঝে পড়ে আমাদের জান মাল সব যাবে।

– শামিম বলল, হয়তো তাই। তবে আমরা স্বাধীনতা চাই, অথচ কে কবে শুনেছে বিনা ত্যাগে স্বাধীনতা পাওয়া যায়!

কালু ফকির বললেন– তুমি ওদের বুঝাও বাবা। ওদের থামাও, এই দয়াটুকু অন্তত কর।

– বললাম, চাচা কথাটা তো সত্যি, স্বাধীনতার জন্য আমাদের সবাইকে কিছু না কিছু ত্যাগ স্বীকার করতেই হবে।

– ঘোর হতাশা নিয়ে বললেন–হ্যা বাবা, তুমি একথা বলতেই পারো, তোমাদের বাড়িটা তো অনেক ভিতরে, কাছাকাছি কোথাও হলে দেখতাম বড় বড় কথা কোত্থেকে আসে।

থমকে গেলাম, ছেলেদের বললাম– ওনারা ঠিকই বলেছেন, তোমরা রাস্তা খোড়া বন্ধ কর।

আমাকে ওরাই টেনে নিয়ে এসেছিল। এবার আমার উপর ক্ষেপে গেল। বললাম– বুঝতে চেষ্টা কর, রূপসা ফেরিঘাট গুরুত্বপূর্ণ বটে। বাগেরহাটে যাওয়ার ওটাই একমাত্র পথ। কিন্তু ফেরিঘাটে যাওয়ার আরো দুটো বড় বড় রাস্তা আছে–সামছুর রহমান রোড, সাউথ সেন্ট্রাল রোড ও ভৈরব স্ট্রান্ড রোড হয়ে এবং তার উত্তরে লোয়ার যশোর রোড ও ভৈরব স্ট্রান্ড রোড হয়ে। সার্কিট হাউজে আর্মি হেড কোয়ার্টার এবং রূপসায় ইপিআর হেড কোয়ার্টারের কারণে লোয়ার যশোর রোড এবং ভৈরব স্ট্রান্ড রোড পুরোপুরি আর্মির দখলে। সেখানে বেরিকেড দেয়ার সুযোগ নেই। ফলে এখানেও বেরিকেড দিয়ে লাভ নেই। তাছাড়া এই তিন ফুট চওড়া গর্ত করতে আমাদের ঘণ্টার পর ঘণ্টা লাগছে। কিন্তু গর্ত ভরাট করতে ওদের আধ ঘণ্টাও লাগবে না। এমনকি রাইফেলের মুখে গর্তগুলো এলাকার লোকদের দিয়েই ভরাট করিয়ে নেবে। আমাদের তো এমন কোন বাহিনী নেই যে ব্যারিকেড ভাঙতে আসলে গুলি ছুড়ে ওদের বাধা দিতে পারব।

জনতার মেজাজ তখন চরমে, আমার পক্ষে কেউ নেই শুধু আশপাশের ক'জন পৌঢ় ও বৃদ্ধ ছাড়া। কালিম ভাই ঘৃতাহুতি দিলেন– তোমার দ্বারাও কিচ্ছু হবে না মনোয়ার, আমার মত লুটের মাল ফিরিয়ে দিয়ে আসতে হবে। কয়েকজন অপরিচিত লোক ক্রুদ্ধ প্রতিবাদ জানালো, দালালী বন্ধ করেন সাহেব, ব্যারিকেড হবেই, দেখে আসুনগে সব রোডেই ব্যারিকেড দেয়া শুরু হয়ে গেছে। সামছুর রহমান রোড, যশোর রোড কিছুই বাদ যাচ্ছেনা।

এ তর্ক কতক্ষণ চলত বলা কঠিন। আমার খালাতো ভাই ডাবলু হঠাৎ ছুটতে ছুটতে এসে বলল–'ভাই শীঘ্র এসো, রেডিওতে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণা হচ্ছে।' তখন দুপুরের টগবগে সূর্য মাথার উপর। ব্যারিকেড, শাবল-কোদাল, তর্ক-বিতর্ক ফেলে আমি পড়ি মরি করে বাড়ির দিকে ছুটলাম। পিছন পিছন অনেকেই ছুটল। পাঁচ-ছয় মিনিটের পথ। বাড়িতে পৌঁছে আমরা রেডিওর উপর হুমড়ি খেয়ে পড়লাম। কিন্তু কোন ঘোষণা নেই। বাবা বললেন, একটু আগেই ঘোষণা হয়েছে, তবে খুব অল্প সময়ের জন্য। হান্নান সাহেব না কে যেন ঘোষণা

দিলেন–'শেখ সাহেব স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন। ঢাকা চট্টগ্রাম সব জাগায় যুদ্ধ চলছে। বহু লোক মারা গেছে। বঙ্গবন্ধু সবাইকে সর্বশক্তি দিয়ে হানাদারদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতেবলেছেন। তিনি মুক্ত আছেন।' আমি আর রেডিও ছেড়ে উঠলাম না, বিরামহীনভাবে নব ঘুরিয়েই চললাম যাতে পরবর্তী ঘোষণা কোনভাবেই মিস না হয়।

আমি স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্রের ঘোষণা শুনেছিলাম সন্ধ্যার পর। আমি ডাইরি লিখতে অভ্যস্ত ছিলাম না, কিন্তু হাজার বছরের এক অপার সম্ভাবনা আমাকে ১৯৭১-এ ডাইরি লিখতে অনুপ্রাণীত করেছিল। আমি একটা ডায়রি কিনেছিলাম। তবে অনভ্যস্ততার কারণে প্রথম দিকে ডায়রি লিখেছি খাপছাড়াভাবে। ২৬ মার্চ ডাইরি হাতে নিয়ে দেখি ২৩ থেকে ২৬ তারিখ পর্যন্ত চারটি পাতা নেই, আমার ছোট বোন সেলিনা এলজাবরা কষে ছিড়ে নিয়েছে। ২৮, ২৯ তারিখের পাতায়ও এলজাবরা কষা, কিন্তু ছেড়েনি। সে এটিকে তার আঙ্কের খাতা বানাতে মনস্থ করেছে। সে বিমর্ষভাবে বলল তার ভাল কোন খাতা নেই। তথাপি রিপ্লেসমেন্ট ছাড়াই ডায়রিটা নিয়ে নিতে হল। ২৬ মার্চ দুপুরের ঘোষণা আমার শোনা হয়নি, কিন্তু শরীরের প্রতিটি অনু পরমাণুতেজেগে ওঠা শিহরণের মধ্যেসন্ধ্যার ঘোষণা শুনলাম। ডাইরির ২৭ মার্চের পাতায় ২৬ তারিখ দিয়ে লিখলাম–

'চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতার কথা ঘোষণা করা হয়। স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র বলে নিজেকে পরিচয় দিয়ে বেতার কেন্দ্রবঙ্গবন্ধু কর্তৃক স্বাধীনতা ঘোষণার একটি ঘোষণাপত্র বাংলা ও ইংরাজীতে প্রচার করে। শেখ মুজিবের মুক্ত থাকার কথা বলা হয়। আধঘন্টা ধরে অবিন্যস্ত অনুষ্ঠান গোটা দেশের বাঙালিদেরকে আনন্দে, আবেগে, উত্তেজনায় অভিভূত ও স্বাধীনতা যুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করে।'*

পরদিন ২৭ মার্চ ঈপ্সিত স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্রের সন্ধানে সারা দিন বাড়িতে কেউ না কেউ রেডিওর নব ঘুরিয়ে গেল। সাফল্য মিলল সন্ধ্যার পর। আমরা অধীর আগ্রহে রেডিও ঘিরে বসেছিলাম। ইংরাজিতেমেজর জিয়ার ঘোষণা শুনলাম– 'মেজর জিয়া, বাংলাদেশ লিবারেশন আর্মির কমান্ডার ইন চিফ এতদ্বারা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের পক্ষে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করছি।আমি আরো ঘোষণা করছি, শেখ মুজিবর রহমানের নেতৃত্বেআমরা একটি সার্বভৌম বৈধ সরকার গঠন করেছি.....।'এই ঘোষণা আমাদেরকে দারুণভাবে উৎফুল্ল করেছিল।আমাদের সন্দেহ-সংশয়ের বিদুরিত হল,আমরা আশ্বস্ত হলাম যে পাকিস্তান আর্মির বহুকথিত চেন অব কমান্ড ভেঙ্গে বাঙালি সৈন্যরা এক বিশেষ ক্রান্তি কালে জাতির পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। আমার ধারণা হল এটা পূর্ব পরিকল্পনার অংশ। আমরা আগেই শুনেছিলাম জয়দেবপুরে ২য় ইস্ট বেঙ্গলকে নিরস্ত্র করার জন্য ব্রিগেডিয়ার আরবাবের অপচেষ্টা বাঙালি সেনা ও সেনা কর্মকর্তারা ব্যর্থ করেদিয়েছিল।তবে মেজর জিয়ার ঘোষণা আমাদের মনে কিছুটা হলেও খটকার জাগিয়েছিল।

আমি জিয়ার ঘোষণা ডায়রিতে লিখিনি। তিনি বঙ্গবন্ধুর পক্ষে ঘোষণা দিয়েছিলেন। যে ঘোষণা একবার লেখা হয়েছে তা দ্বিতীয়বার লেখার প্রয়োজন বোধ করিনি। তাছাড়া তিনি বিভ্রান্তিকর ঘোষণা দিয়েছিলেন, নিজেকে 'কমান্ডার ইন চিফ' ঘোষণা করেছিলেন। কিন্তু আমাদের কাছে কর্নেল ওসমানিই ছিলেন লিজেন্ড। সেনা প্রধান হিসাবে আমরা বিকল্প কিছু ভাবতে অভ্যস্ত ছিলাম না। তা ছাড়াও অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল মজিদ, কমান্ডার মোয়াজ্জেম প্রমুখ সিনিয়র সামরিক অফিসাররা মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি পর্বে ওতোপ্রতোভাবে জড়িত ছিলেন। সেক্ষেত্রে মেজর জিয়া ছিলেন জুনিয়র এবং তার নামআমরা আগে কখনো শুনিনি।পরদিন তার ঘোষণা আমাদেরকে আরো বেশি দুঃশ্চিন্তার মধ্যে নিক্ষেপ করে– মিলিটারি ইনটেলিজেন্স থেকে তিনি সম্ভবত পাকিস্তানিদের হাতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের গ্রেফতারের বিষয়টিনিশ্চিত হন এবং সাথে সাথে নিজেকে অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট হিসাবে উল্লেখ করে ভিন্ন একটি ঘোষণা দেন। সেই থেকে বেতারে কেবলমাত্র সেই ঘোষণাটিই উপর্যুপরি প্রচারিত হতে থাকে।এমনকি স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্রের নাম থেকে বিপ্লবী শব্দটিও বাদ যায়। তবে এই বিভ্রান্তি দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দশীঘ্রই তাকে বোধে ফিরে আসতে বাধ্য করেনএই বলে যে, তার এই ঘোষণা বাংলাদেশে আর একটি মিলিটারি ক্যু ঘটেছে বলে বিশ্বে ভুল ধারণা দেবে। পরবর্তীকালে প্রমাণীত হয় জিয়া অপকৃষ্ট ধরনের রাজনৈতিকউচ্চাভিলাসী ছিলেন এবং তার মুক্তিযুদ্ধে যোগদান আকস্মিক ঘটনা ছিল। তাছাড়া বেলাল মোহম্মদের 'স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র' বইতে দেখা যায় তাকে ঘিরে থাকা স্তাবকও কম ছিলনা যারা অনেকে পাকিস্তান আর্মির 'কাকুল সংস্কৃতির' ধারক-বাহক ছিল এবং আর্মি অহমিকার পূজারী ছিল। জিয়াকে বিভ্রান্তকরতে এবং উসকানি দিতে তারাও অবদান রেখেছিল বলে মনে হয়(পৃষ্ঠা-)।

আমার ঘনিষ্ট বন্ধু ও কলিগ হাশিম সাহেব বাম রাজনীতি করতেন। ২৩ মার্চ পতাকা তোলা প্রসঙ্গে বলেছিলেন– শেখ সাহেব কতদূর যেতে পারেন বলে আপনাদের ধরনা? তার তো কোন অস্ত্র প্রস্তুতি নেই, যা কিছুটা বরং নকশালদের আছে, গ্রামে তাদের ঘাঁটি এলাকাও আছে। কিন্তু নকশালরা যে আপনাদের সাথে যাবে এমন তো মনে হয়না। এর ফল কি হবে জানেন, বাঙালিরা হয়তো আরো দীর্ঘ দিনের জন্য ওদের পদতলে পিষ্ট হবে। আর নকশালরা যদি মুক্তি সংগ্রমে আসেই তবে নেতৃত্ব কিন্তু আপনাদের হাতে থাকবে না।

এর জবাব দেয়ার মত আমার কিছু ছিল না। ভিয়েৎনামেরজননেতা ফ্যান ডং এবং কমুনিস্ট নেতা হো চি মিনের ইতিহাস আমার পড়া ছিল। তবু বললাম– পরিস্থিতি ওদিকে গড়াবে বলে মনে হয় না, তাছাড়া বঙ্গবন্ধু না ভেবেচিন্তে এগিয়েছেন এমন মনে হয়না। মেজর জেনারেল মজিদ,কর্নেল ওসমানি, কমান্ডার মোয়াজ্জেম সাহেবরা তো মাঠেই আছেন, কিছু ব্যবস্থা থাকাই তো স্বাভাবিক। হাশেম সাহেব স্বাধীনতাপন্থী ছিলেন, তবে আমার বক্তব্য তাকে তেমন আশ্বস্ত করতে পেরেছিল বলে মনে হয়না। যাহোক আমরা এখন অনেকটাই নিশ্চিত যে পাকিস্তান

আর্মির বাঙালি সদস্যদের অন্ততএক বড় অংশ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে আছে। ফলে আমাদের হাতে অস্ত্র এবং ট্রেনিং দুইই আছে। ভাবলাম হাশিম সাহেবের সাথে এখন একবার দেখা হলে ভাল হত। তবে আমি জানতাম না যে হাশিম সাহেবও ভিতরে ভিতরে নকশাল সংশ্লিষ্ট।

সেনহাটি এবং আশেপাশের বেশকিছু এলাকা নকশাল প্রভাবিত এটা আমরা জানতাম। ঘন জঙ্গল এবং পাশাপাশি দু-তিনটি নদীর কারণে অগ্নিযুগে দৌলতপুর কলেজকে কেন্দ্র করে এখানে যেমন অনুশীলন পার্টির মত সন্ত্রাসবাদী দল গড়ে উঠেছিল তেমনই চীনা কমুনিস্ট পার্টির আন্তর্জাতিকতা বাদের সমর্থনে এখানে নকশাল আন্দোলনও তীব্র হয়ে উঠে। প্রথম দিকে আমার ধারণা ছিল তারা ছোট ছোট গ্রুপে দিনটা জঙ্গলের কোন ঘাঁটিতে কাটায় এবং রাতে কালো কাপড়ে নিজেদের আবৃত করে অপারেশনের উদ্দেশ্যে লোকালয়ে আসে। আমার ভুল ভাঙলো এক কলিগের কথায়। সে আমার ঘনিষ্ট বন্ধু ছিল, একদিন বলল না চিনে আপনি যার তার সামনে নকশাল আন্দোলনকে আক্রমণ করতে যাবেন না, এটা বিপদের কারণ হতে পারে। বুঝলাম তারা শুধু জঙ্গলে নয়, তাদের অনেকে আমাদের মধ্যেই জন অরণ্যে দিনটা কাটায়।আমরা নকশাল হিসাবে চিনিনা এটাই যা।

সে সময় মাঝে মাঝে আমার শেখ মুজিবকে ট্রাজিক হিরো বলে মনে হত। সমালোচনা যেন তার পিছু ছাড়ছে না। যেভাবে অবিচল সাহস এবং দৃঢ়তা দেখিয়ে লক্ষ্যের দিকে ক্রমাগত এগিয়ে যাচ্ছেন বাংলাদেশে তার মত আর একজনও পাওয়া যাবেনা, পৃথিবীতেও বিরল। তিনি স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন, পাকিস্তানি হানাদারদের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী স্বতস্ফূর্ত প্রতিরোধ গড়ে উঠেছে এবং সেটা এগিয়ে যাচ্ছে– এটা গোড়া ডান এবং উগ্র বামপন্থীদের মারাত্মক শিরোপীড়ার কারণ ঘটিয়েছিল। তারাশেখ মুজিবের বিরুদ্ধে তীব্র প্রপাগান্ডা শুরু করে দেয় যে তিনি মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার জন্য আত্মগোপনে না যেয়ে পাকিস্তানিদের কাছে আত্মসমর্প করেছেন। পথম দু একদিন আমরা তার অবস্থান নিয়ে অনিশ্চয়তার মধ্যে ছিলাম। আমরা যখন নিশ্চিত হলাম যে তিনিসত্যই আত্মগোপন করেন নি, পাকিস্তান আর্মি তাকে বাড়ি থেকে গ্রেফতার করে নিয়ে গেছে, আমরা গভীর দুঃশ্চিন্তায় আচ্ছন্ন হলাম। তখন এমন কেউছিলনা যার সাথে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করা যায় যে,সবাই যখন পালাতে পারল,তিনি কেন পালালেন না। বরং অনেকেই ভারাক্রান্ত চিত্তে আমার কাছে এ বিষয়ে জানতে চাইল।বঙ্গবন্ধুর প্রতি আমার অগাধ বিশ্বাস ছিল, তাদের অপেক্ষা করতে বললাম।

মাত্র কয়েক দিনের মধ্যে ব্রিটিশ সাংবাদিক সাইমন ড্রিং-এর প্রতিবেদন ছিল ভিন্ন আমাকে আশার আলো দেখাল। ২৫ মার্চ রাতে ঢাকায় ভয়াবহ কিছু ঘটতে পারে এমন সতর্ক বার্তা পেয়েও শেখ মুজিবতার বাড়ি ছেড়ে যেতে রাজি হননি। তিনি আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগ নেতৃবৃন্দকে আত্মগোপনে যেয়ে যার যার দায়িত্ব পালনের নির্দেশ দেন। কিন্তু তাদের উপর্যুপরি অনুরোধেও নিজে পালাতে রাজি হন নি এবং এক পর্যায়ে অসহিষ্ণু হয়েবলেন–আমি এখানে আছি কারণ এ ছাড়া আমার আর কিছু করার নেই। আমি যদি পালিয়ে যাই আমাকে ওদের শর্তে আত্মসমর্পণ করতে হবে।* আসলেই তাই, বঙ্গবন্ধুর লুকিয়ে থাকার মত জায়গা ছিল না। পাকিস্তানিরা তাদের অভিযানের নাম দিয়েছিল 'অপারেশন সার্চলাইট'। শেখ মুজিবকে খুঁজে বের করার জন্যই এরূপ নামকরণ। তিনি আত্মগোপনে গেলে হানাদাররা তার সন্ধানে ঘরে ঘরে ঢুকে বাঙালিদের উপর নৃশংসতার শেষ অবধি যেত, ঢাকার বুকে ধ্বংসযজ্ঞের চূড়ান্ত করত এবং তাকে স্পটে হত্যা করে বিশ্ববাসীকে তাদের মর্জিমাফিক একটা ব্যাখ্যা পৌঁছে দিত। কিন্তু শেখ মুজিব বাড়ি থেকে গ্রেফতার হওয়ায় সুযোগটা তাদের হাত ছাড়া হয়।বিরুদ্ধবাদীরা যাই বলুন, শেখ মুজিব তখন দেশে এবং বিশ্বে নেতৃত্বের এমন এক উচ্চ পর্যায়ে উঠে গিয়েছিলেন যে পাকিস্তানিদের পক্ষে তাকে হত্যা করা কঠিন ছিল এবং শেখ মুজিবের তা অজানা ছিল না।

পাকিস্তানি হামলার পর রেডিও টিভি শেখ মুজিবের নিয়ন্ত্রণে ছিল না। থাকবে না তিনি আগেই জানতেন, সে জন্য ৭ মার্চ তার ঐতিহাসিক ভাষণে কৌশলগত ঘোষণা দিয়েছিলেন–'তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে এবং জীবনের তরে রাস্তাঘাট যা যা আছে সব কিছু, আমি যদি হুকুম দিবার নাও পারি, তোমরা বন্ধ করে দেবে।' তথাপি ঐ রাতে গ্রেফতারের আগে তিনি প্রথমে অয়ারলেসের মাধ্যমে এবং পরে টেলিগ্রাফ অফিসের মাধ্যমে স্বাধীনতার ঘোষণা প্রচার করেন। রাত একটা পর্যন্ত টেলিফোন চালু ছিল, এর মাধ্যমেও অনেকেই তার নির্দেশ পেয়ে যায়। তিনি তার বাসভবনে নেতৃবৃন্দের সাথে উপর্যুপরি আলোচনা করেন, তাদের নিরাপদ স্থানে সরে যেয়ে মুক্তিযুদ্ধ সংগঠিত কারার নির্দেশ দেন। ফলে আওয়ামী লীগের অন্য কোন গুরুত্বপূর্ণ নেতা পাকিস্তানিদের হাতে বন্দী হন নি। তারা প্রবাসে আশ্রয় নিয়ে গৌরবের সাথে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করেন এবং স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনেন। স্পষ্টত শেখ মুজিব কি করতে যাচ্ছেন তা তিনি ভালই জানতেন।

মুজিব জানতেন পাকিস্তানিরা তাকে মারতে পারবেনা। এর আগেও মৃত্যুর দূয়ার থেকে তিনি ফিরে এসেছেন, এমনকি আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা থেকেও। এখন তো পরিস্থিতি ভিন্ন। তার হিসাবের ভিত্তি সুদৃঢ়। তিনি গোটা পাকিস্তানের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ট দলের নেতা, তার পক্ষে বিশ্বকে বোঝানো সহজ যে দেশের শাসনভার তার হাতে আসবে, তিনি কেন বিচ্ছিন্নতা চাইবেন। বিচ্ছিন্নতা চাইতে পারে ভূট্টো, ইয়াহিয়াও চাইতে পারে যদি তারা বাঙালিদের শাসন মানতে না চায়। ক্ষমতা লোভী ভুট্টো তো এক পার্লামেন্টে উদ্ভটভাবে দুই সংখ্যাগরিষ্ট দলের কথা বলেছেন, বলেছেন পাঁচ বছর ক্ষমতার বাইরে থাকার কথা তিনি ভাবতেই পারেন না এবং আরো একধাপ এগিয়ে শেখ মুজিবের উদ্দেশ্যে বলেছেন ইধার (পশ্চিম পাকিস্তান) হাম, উধার (পূর্ব পাকিস্তান) তুম।

এসব কথা বিশ্ব নেতৃবৃন্দ ভালই বোঝেন এবং সেজন্যই তারা মুজিবের হত্যার বিপক্ষে দাড়াবেন। বিশেষতঃ আমেরিকা উদ্বিগ্ন লাল ঝান্ডার অগ্রাসন নিয়ে। ইস্ট অলরেডি রেড, সাউথও কি রেড হয়ে যাবে। এহিয়া-ভুট্টোএটা ঠেকাতে পারবে না, কিন্তু মুজিব পারেন। তার সংগঠন রয়েছে দেশ জুড়ে, জনতার মধ্যে। অতএব তাকে মারা যাবে না। মারলে ক্রুদ্ধ প্রতিহিংসাপরায়ন হয়ে মুজিবের লোক দলে দলে যোগ দেবে নকশাল আন্দোলনে, স্রেফ আর একটা ভিয়েৎনাম হয়ে দাঁড়াবে দেশটা।

অতএব আমেরিকা মুজিবকে বাঁচতে সাধ্যমত করবে। কেনা জানে, আঙ্কেল শ্যাম (মার্কিন রাষ্ট্রপতির তৎকালীন বহুল প্রচলিত প্রতীকী নাম) পিঠ চাপড়ে দিলে ইয়াহিয়ার মত জেনারেলরা কেমন বিড়াল হয়ে যায়। এই সমিকরণ ছিল মুজিবের ভরসা। বাস্তবে ঠিক তাই হয়েছে। শেখমুজিবকে তার বাড়ি থেকে গ্রেফতার করেছিল কমান্ডো বাহিনীর ক্যাপ্টেন বেল্লাল। টিক্কার প্রেস অ্যাটাশে সিদ্দিক সালিক তাকে জিজ্ঞাসা করেন কেন সে হিট অব দি মোমেন্ট-এর সুযোগ নিয়ে সে সময় শেখ মুজিবকে হত্যা করেনি? বেল্লাল জবাব দেন জেনারেলরা তাকে জীবীত ধরে আনার নির্দেশ দিয়েছিলেন। পাকিস্তানিরা ভাবতো মুজিবই সব। তাকে বিচ্ছন্ন করতে পারলে সব ঠান্ডা। মুজিব প্রকাশ্যে সে রকমই বলতেন। কিন্তু তিনি জানতেন, বাঙালি জাতি এখন এমন এক পর্যায়ে পৌঁছে গেছে যে তারা এ আন্দোলনকেএগিয়ে নিয়ে যাবে এবং এমন একগুচ্ছ নেতৃত্ব গড়ে উঠেছে যারা থামতে জানেনা এবং থামবে না। অতএব যুদ্ধ চলতেই থাকবে যতক্ষণ না স্বাধীনতা অর্জিত হয়।

বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে এত সব বৈরী মন্তব্য– এ যেন শুধু সমালোচনার জন্য সমালোচনা করা। এমনকি ৭ মার্চ ভাষণের পর তারা কেউ কেউ প্রশ্ন তুললেন, শেখ মুজিব কেন স্বাধীনতা ঘোষণা করলেন না। তিনি যদি সেদিন স্বাধীনতার ঘোষণা করে জনতাকে ক্যান্টনমেন্ট আক্রমণের নির্দেশ দিতেন তারা তাই করত, তখন কম ক্ষয়-ক্ষতিতে স্বাধীনতা এসে যেত, এত রক্তপাত ঘটতো না।এভাবে যার যা খুশি তাই বলে বঙ্গবন্ধুর সমালোচনা করা সে সময় এক শ্রেণীর রাজনীতিকের ফ্যাশন হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। নিরস্ত্র জনতাকে ক্যান্টমেন্ট অভিমুখে ঠেলে দেয়া যে কতখানি হঠকারিতা হত তা যে তারা বোঝেন না তা নয়, তবু সমালোচনার জন্য সমালোচনা। সেদিন ক্যান্টনমেন্ট সর্বোচ্চ প্রস্তুত অবস্থায় ছিল এবং জনসমুদ্রের গতিবিধি পর্যবেক্ষণের জন্য আকাশে হেলিকপ্টর উড়ছিল। তবু স্বাধীনতা ঘোষণা না করার পিছনে সেটা বড় কারণ নয়, বড় কারণ ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের দেশ এবং দেশের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা য়িনি গোটা দেশের একাংশের স্বাধীনতা ঘোষনা করে বিশ্বে ভুল ম্যাসেজ দেবেন কে? বঙ্গবন্ধু অনেকবারই বলেছেন যে তিনি নিজে প্রথম আক্রমণকারী হতে চাননি, আক্রান্ত হলে উপযুক্ত জবাব দিতে চেয়েছিলেন।

প্রসঙ্গক্রমে আমি কেবল কমুনিস্ট তাত্ত্বিক অধ্যাপক বদরুদ্দীন উমরের কথা বলব, কেননা মুজিব-বিদ্বেষ প্রকাশে তিনি কখনো রাখঢাক করেন নি, সুযোগ পেলেই দু কলম লিখে মনের ঝাল মিটিয়েছেন।

২৬ মার্চ শেখ মুজিবের স্বাধীনতা ঘোষণা প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন– তিনি (শেখ মুজিব) আত্মসমর্পণকারী, তার আচরণ তখন এমন ছিল না যিনি পাকিস্তানি হামলার জবাবে স্বাধীনতার ঘোষণা দিতে পারেন এবং তার মানসিক অবস্থা এমন পর্যায়ে ছিল যার নেতৃত্ব দেয়ার ক্ষমতা সম্পূর্ণ ভেঙ্গে পড়েছিল। (প্রবন্ধঃ 'স্বাধীনতার ঘোষণা'– বদরুদ্দীন উমর, অনুবাদ– মশিউল আলম, প্রথম আলো, ২৪-২৫ জুলাই, ২০০৪)।

অধ্যাপক উমর বিদগ্ধ ব্যক্তি, আত্মসমর্পণের অর্থ–'অন্যের বশ্যতা স্বীকার বা অস্ত্র ত্যাগ করে বিপক্ষের অধীনতা স্বীকার'– তার অজানা নয়, তা সত্ত্বেও তিনি এমন লিখেছেন। তবে বাস্তব চিত্র তার এই বিদ্বেশপ্রসূত পর্যবেক্ষণ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। শেখ মুজিব আগেই জানতেন পাকিস্তানি হামলার পর রেডিও টিভি তার নিয়ন্ত্রণে থাকবে না, সে জন্য ৭ মার্চের ভাষণে কৌশলগত ঘোষণা দিয়েছিলেন–'তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে এবং জীবনের তরে রাস্তাঘাট যা যা আছে সব কিছু, আমি যদি হুকুম দিবার নাও পারি, তোমরা বন্ধ করে দেবে।'

তথাপি ঐ রাতে গ্রেফতারের আগে তিনি দুই দফা অয়ারলেস এবং টেলিগ্রাফ অফিসের মাধ্যমে সকলের উদ্দেশ্যে স্বাধীনতার জন্য শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে হলেও হানাদারদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার নির্দেশ দেন। রাত একটা পর্যন্ত টেলিফোন চালু ছিল, এর মাধ্যমেও অনেকেই তার নির্দেশ পেয়ে যায়। তিনি তার বাসভবনে নেতৃবৃন্দের সাথে উপর্যুপরি আলোচনা করেন, তাদের নিরাপদ স্থানে সরে যেয়ে মুক্তিযুদ্ধ সংগঠিত কারার নির্দেশ দেন। ফলে আওয়ামী লীগের অন্য কোন গুরুত্বপূর্ণ নেতা পাকিস্তানিদের হাতে বন্দী হন নি। তারা ভারতে আশ্রয় নিয়ে সাফল্যের সাথে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করেন এবং স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনেন। স্পষ্টত শেখ মুজিব হতাশ ছিলেন না, কর্মব্যস্ত ছিলেন এবং কি করতে যাচ্ছেন তা ভালই জানতেন।

আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের অনুরোধ সত্ত্বেও শেখ মুজিব আত্মগোপন করেন নি। পালানোর জন্য সহকর্মীদের উপর্যুপরি অনুরোধের প্রেক্ষিতে এক পর্যায়ে অসহিষ্ণু হয়ে বলেন–আমি এখানে আছি কারণ এ ছাড়া আমার আর কিছু করার নেই। আমি যদি পালিয়ে যাই আমাকে ওদের শর্তে আত্মসমর্পণ করতে হবে।*বস্তুত পাকিস্তানিরা তাদের অভিযানের নাম দিয়েছিল 'অপারেশন সার্চলাইট'– শেখ মুজিবকে খুঁজে বের করার জন্যই এরূপ নামকরণ। তিনি আত্মগোপনে গেলে হানাদাররা তার সন্ধানে ঘরে ঘরে ঢুকে বাঙালিদের উপর নৃশংসতার শেষ অবধি যেত, ঢাকার বুকে ধ্বংসযজ্ঞের চূড়ান্ত করত এবং তাকে স্পটে হত্যা করে বিশ্ববাসীকে তাদের মর্জিমাফিক একটা ব্যাখ্যা পৌঁছে দিত। কিন্তু

শেখ মুজিব বাড়ি থেকে গ্রেফতার হওয়ায় সুযোগটা তাদের হাত ছাড়া হয়। বস্তুত বদরুদ্দিন উমররা যাই বলুন, শেখ মুজিব দেশে এবং বিশ্বে নেতৃত্বের এমন এক উচ্চ পর্যায়ে উঠে গিয়েছিলেন যে তাকে হত্যা করা কঠিন ছিল এবং শেখ মুজিবের তা অজানা ছিল না।

শেখ মুজিব আত্মসমর্পণ করেন নি, কারো বশ্যতা স্বীকার করেন নি, মুক্তিযুদ্ধ প্রত্যাহারও করেন নি। পাকিস্তানের কারাগারে সামরিক আদালতে গোপন বিচারের মুখোমুখী হয়ে পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় একাকী জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে নয় মাস কাটিয়েও নিজের অবস্থান থেকে এক চুল বিচ্যুত হন নি। শেখ মুজিবকে গ্রেফতারের পর ২৯ মার্চ করাচি বিমান বন্দরে দু'পাশে সেনা প্রহরায় চেয়ারে উপবিষ্ট বন্দী শেখ মুজিবের ছবি প্রকাশিত হয়। ছবিতে বঙ্গবন্ধুকে হতাশ ভেঙ্গেপড়া অবস্থায় নয়, বরং ক্ষুব্ধ ক্রুদ্ধ অবস্থায় দেখা যায়।তিনি পাকিস্তানি কারাগারে বন্দী ছিলেন, কিন্তু তিনিই ছিলেন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে অবিসম্বাদিত প্রেরণা। বদরুদ্দিন উমর তা ভালই জানেন,তা সত্ত্বেও তিনি সেই সব ব্যক্তির কাতারে নিজেকে সামিল করেছেন যারা ফাটা রেকর্ড বাজিয়ে আনন্দ পান।

তাত্ত্বিক পন্ডিতেরাকমই জননেতা হন, কিন্তু চালিকা শক্তি হিসাবে তারা অনন্য যদি না ঈর্ষাকাতরতা বা এ জাতীয় নেতিবাচক চিন্তা চেতনার শিকার হন। দুর্ভাগ্যক্রমে বদরুদ্দিন উমর সাহেব তার লেখায় বক্তৃতায় শেখ মুজিব সম্পর্কেঠিক এই মানসিকতার প্রকাশ ঘটিয়েছেন। মহাত্মা গান্ধির মত বঙ্গবধু শেখ মুজিব একই ধারায় বামপন্থিদের আক্রমণের লক্ষ্যছিলেন। বলা হয় যে, ভুল পথঅবলম্বন করে তারা পরিপক্কপ্রায় আন্দোলনকে সামাজতান্ত্রিক লক্ষ্যে পৌঁছাতে দেন নি। এটি শ্রেফআত্মপ্রবঞ্চনা,নিজেদের ব্যর্থতা অন্যের ঘাড়ে চাপানোর অপপ্রয়াস। তারাভালই জানেন গান্ধী বা মুজিব কেউই তাদের মত কমুনিজম বাস্তবায়নের জন্য আন্দোলনে নামেন নি। তারা গোটা জাতিকে নিয়ে স্বাধীনতার লক্ষ্যে সংগ্রাম করেছেন। চীনের জাতীয় নেতা স্যান ইয়াৎ সেন এবং ভিয়েৎনামের ফ্যান ডংও তাইকরেছিলেন। কিন্তু চিনের মাও সে তুং ও ভিয়েৎনামের হে চি মিনের মত বিচক্ষণ বাম নেতারা যথাসময়ে আন্দোলনের ট্রেনটিতে উঠে পড়েন এবং নিয়ন্ত্রণ নিতেওসমর্থ হন।দুর্ভাগ্য,আমাদের মহেন্দ্রক্ষণগুলিতে বাম নেতারাভিন দেশী নেতার বক্তব্যের আলোকে এ দেশেরবিদ্যমান পরিস্থিতির মূল্যায়ন এবং তারযথার্থতা প্রমাণেনানা জটিল তত্ত্বের উদ্ভাবন ওবিশ্লেষণ নিয়ে ব্যস্ত সময় পার করেন এবং যথারীতি নিজেদের ট্রেনটি মিস করেন।

১৩.ইন্টার কান্টনেন্টাল সাংবাদিকতার বেরোতে চেয়েছিলেন। নির্বিকার বলা হয়। গুলি খাবেন। আমরা যদি নিজেদের লোককে গুলি করতে পারি, আপনাদেরও পারব।

কাঁধে রাইফেল ঝুলিয়ে নুর নেওয়াজ ও বাবলু আমাদের বাড়িতে এলো

আমি স্বকর্ণে স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ শুনে সবেমাত্র সুস্থির হয়ে বসেছি। এ ছিল আমার জন্য এক দারুণ অভিজ্ঞতা।ইংরাজি ও বাংলায় কয়েকদফা ঘোষণাটি পাঠ করা হল বিভিন্ন কণ্ঠে। ঘোষণাটি অনায়াসে নোট করে নেয়া যেত। দুর্ভাগ্যক্রমে তখন অতটা দূরদর্শী আমি ছিলাম না। আমি নিজের ভাষায় স্বাধীনতা ঘোষণার কথা লিখেছিলাম বেশ রাতে শুতে যাওয়ার আগে। আমি তখন স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্রের অন্যান্য অনুষ্ঠান শুনছি, এমন সময় আমার ছোট বোন সেলিনা এসে ভয়ার্ত কণ্ঠে বলল– ভাই বাইরে দুটো ছেলে দাঁড়িয়ে আছে, তোমাকে ডাকছে, ওদের কাঁধে বন্দুক।বাইরে তখন বেশ অন্ধকার। সেই আবছা অন্ধকারেবাবলু এবং নেওয়াজকে চিনতে তেমন কষ্ট হল না। সত্যি তাদের কাঁধে ৩০৩ রাইফেল। আমি ভিতরে ভিতরে শিউরে উঠলাম। দুজনেই আমার ছোট ভাইয়ের মত। সন্দীপন সাংস্কৃতিক সম্প্রদায়ের সাথে যুক্ত ছিল। রাজনীতির সাথে সম্পর্ক কম। দুজনের বাবাই পুলিশে চাকরি করেন। এদের মধ্যে নেওয়াজের বাড়িতে '৬৯-এর গণআন্দোলনের সময় আমি কিছুদিন পালিয়ে ছিলাম।

মা ওদের দেখে ভীষণ বিপন্ন বোধ করলেন এবংউদভ্রান্তের মত প্রায় সারাক্ষণ আমাদের পাহারা দিয়ে রাখলেন। ওরা ভারি একটা কাপড়ের পোটলা নিয়ে এসেছিল,আমাকে হারিকেন আনতে বলে দ্রুত আমাদের নির্মীয়মান ঘরে ঢুকে পড়ল। এ সময় আমাদের বাড়িতে বিদ্যুৎ লাইন ছিলনা। নেওয়াজ পোজ-পাজ দেখাতে বেশ পছন্দ করতো, বলল– মনোয়ার ভাই জলদি হারিকেন আনেন, আমাদের হাতে সময় কম, এতদিনে বাড়িতে বিদ্যুৎ নেননি এটা কেমন কথা! বেতনের টাকা দিয়ে কি করেন?। বললাম– বিদ্যুৎ থাকলেই বা কি হত, নির্মীয়মান ঘরে তো আর লাইন পেতে না। পাশাপাশি দুটো ঘরে মাত্র দিন পনের আগে ছাদ ঢালাই করা হয়েছে। আমি হারিকেন নিয়ে ঢুকলাম।

ছাদের শার্টারের তিন চারটে বাশঁ সরিয়ে ওরা তার ফাঁকে বসে হারিকেনের স্বল্পালোকে কাপড়ের পোটলা খুলে একের পর এক গুলি নিয়ে রাইফেলের চেম্বারের ঢুকতে চেষ্টা করল। এ সম্পর্কে আমার কোন ধারণা ছিল না। এতগুলো গুলির একটাও চেম্বারে ঢুকলো না দেখে আমি বিস্মিত হলাম। নেওয়াজ ছিল ছটফটে এবং মেজাজি, মুখ খারাপ করে বসল– শালারা রাইফেল দিয়েছে, কিন্তু গুলি দিয়েছে অন্য বোরের।

এবার কারণটা বুঝলাম। ডিটেকক্টিভ বইতে বিভিন্ন পিস্তলের ভিন্ন ভিন্ন বোরের গুলির কথা পড়েছি, কিন্তু থ্রি নট থ্রি রাইফেল যা পুলিশ এবং সৈন্যরা ব্যবহার করে তাতেও যে বোরের ঝামেলা থাকে জানা ছিলনা। ওরা হতাশ হয়েগুলি-রাইফেল নিয়ে বেরিয়ে গেল, তবে যাওয়ার আগে মার সাথে একচোট ঝগড়া করে গেল।

বাবলু এবং নেওয়াজ আমার চেয়ে বেশ ছোট ছিল। ওদের কাছে রাইফেল এবং একরাশ গুলি দেখে মা আঁতকে উঠেছিলেন।ঝাঁঝের সাথে বললেন– তোমরা দুধের বাচ্চা,তোমাদের হাতে ওসব কেন! মাথা খারাপ হয়ে গেছে নাকি,যদি গুলি ছুটে যায়! তোমরা যে এসব নিয়ে ঘোরাঘুরি করছবাবা-মা জানে? রাইফেল এবং গুলিগুলো সামনের ডোবায় ফেলে দিয়ে মা ওদের ঘরে ফিরে যাওয়ার জন্য হৈ চৈ বাধিয়ে দিলেন। এক পর্যায়ে আমাকেও বললেন ওগুলো কেড়ে নিয়ে ডোবায় ফেলে দিতে। গুলি ঢুকাতে ব্যর্থ হয়ে নেওয়াজের মেজাজ এমনিতেই খারাপ ছিল,এবার বারুদের মত ফেটে পড়ল–একদম চুপ! যান এখান থেকে। আর একটা কথা যদি বলেন বন্দুকের মুখে আপনার ননী গোপাল পুত্রকে ধরে নিয়ে যাবো। তাকে দেখে আমরা মাঠে নেমেছি, আর উনি এখন আজুহাত বানিয়ে ঘরে উঠে বসেছেন। ভেবেছিলাম এক কাপ চা পাবো, তা না– যত্তোসব অযাত্রা!

ওরা যখন বেরিয়ে যাবে, বললাম– কিছুক্ষণ আগে স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র নামে পরিচয় দিয়ে রেডিওতে শেখ মুজিবের স্বাধীনতার ঘোষণা প্রচার হয়েছে, শুনেছ নাকি? বাবলু বলল না, তবে দুপুরে এ রকম ঘোষণা হয়েছে বলে কেউ কেউ বলাবলি করছিল। নেওয়াজ কটাক্ষ করতে ছাড়ল না, বলল– আপনার বন্ধুরা যখন রাইফেল নিয়ে ছোটাছুটি করছে, আপনি আছেন রেডিও নিয়ে! ভালো–

সেনহাটির আব্দুস সালাম ছিলেন আনসার অথবা মুজাহিদ বাহিনীর সদস্য। উৎসাহী ছাত্র শ্রমিকদের তিনি আর্মস ট্রেনিং দিতেন। ২৫ মার্চ আর্মি ক্রাকডাউনের পর তিনি পাকিস্তানি হানাদারদের প্রতিরোধে ঝাঁপিয়ে পড়েন।দালালরা তার ব্যাপারে আর্মি র কছে বাড়ি ঘেরাও । তাকে না পেয়ে আর্মিরা হীন পন্থা অবলম্বন করে। মায়ের কোল থেকে নিয়ে সালামের খবর জানাতে বলে খবর জানা ছিল না, বাচ্চাটাকে মাটিতে শুইয়ে মেরে ফেলার ভয় দেখায়। মা ছুটে এলে একজন বুট দিয়ে বাচ্চাটাকে চেপে ধরে পহেলে বাতাও উও গাদ্দার কাঁহা, উসকি বাদ বাচ্চিকো কিন্তু চার মাসের বাচ্চার পক্ষে মিলিটারি বুটের চাপ এক দন্ডও সহ্য করা সম্ভব হয়নি। বাচ্চাটা মারা যায়। বাবা বাচ্চার জামাটা ঘরে ফিরেট লে যাও।

ইয়াজদানী সাহেব ফিরলেন

৬ দিন পর ঢাকা থেকে ইয়াজদানী সাহেব ফিরলেন গ্রমের বাড়িতে।

সবাই তখন ঢাকার খবর জানার জন্য উদগ্রীব থাকে। একজন দুজন করে তার বৈঠকখানায় নানা বয়সী লোকজনে ভরে উঠল। ধীরে সুস্থে চা নাস্তা খেয়ে দলিজ ঘরে এসে তিনি তার আরাম কেদারায় জাঁকিয়ে বসলেন। বল দেখি এলাকার খবর কি।

এলাকার খবর তো মোটামুটি ভালই, কিন্তু ঢাকার কি অবস্থা, পথঘাটের অবস্থাই বা কি দেখলেন প্রেসিডেন্ট সাহেব? তিনি স্থানীয় প্রাইমারি স্কুলের গভর্নিং বডির সভাপতি, এজন্য সবাই তাকে এ নামে ডাকে।

আরে মাস্টের, এটাও কি বলা লাগে নাকি! আমি তো আগেই আঁচ করেছিলাম। এও কি সম্ভব পুঁচকে ছোড়ারা লড়বে পাকিস্তান আর্মির সাথে, কচু কাটা হবে না? হয়েছেও তাই। ৬-দফার সাধ মিটে গেছে।

ভিড়ের মধ্যে একটি ছেলে বিমর্ষ চিত্তে বলল– ঢাকার যুদ্ধ তাহলে শেষ হয়ে গেছে চাচা?

তবে আর বলছি কি! প্রথম রাতেই সব ঠান্ডা, ট্যাঁফোঁ নেই। জয় বাংলা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে, তাদের টিকিও দেখা যায় না।

সাথে সাথে একটা ছেলে ফোড়ন কেটে বলে বসল– তা হলে তো চাচা ঢাকা থেকে এসে ভুল করেছেন, ওখানে থাকাই ভালছিল।

মানে? কি বলতে চাচ্ছ?

মানে আর কি, ঢাকার যুদ্ধ শেষ, কিন্তু এখানে তো এখন শুরু হতে যাচ্ছে।

ক্ষুদ্র জটলটার উপর দিয়ে একটা চাপা হাসির ঢেউ খেলে গেল।

যত্তো সব! তোমরা যাও এখন। তিনি কুরসি ছেড়ে উঠে পড়েন।

তার মেয়েটা ভার্সিটির ছাত্রী, ক্লাস নেই, দুচার দিন ডামি রাইফেল নিয়ে ক্যাম্পসে প্যারেড করেছে শুনে ইয়াজউদ্দিন সাহেব একরূপ জোর করেই তাকে ঢাকা থেকেবাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছেন। দরজার আড়ালে দাড়িয়ে সব শুনছিল। বাবা ভিতরে আসতেই ক্ষুব্ধকণ্ঠে বলল– বাবা জয় বাংলা ঠান্ডা হয়ে গেছে এটা কোন আনন্দের সংবাদ না যে তুমি ওভাবে বলবে। আর শেষ হয়ে গেল ভাবছ কিভাবে! বাঙালিদের এবার এত সহজে দমানো যাবেনা।

এখন গ্রামে-গঞ্জে কেউ কাজ করছে না। পথে ঘাটে আলোচনা, অথচ কেউ সঠিক জানে না ঢাকায় কি হয়েছে, সহরেই বা কি হচ্ছে। কি হতে পারে তা নিয়ে সন্দেহ, দোদুল্যমানতা। দু একজন করে যারা গ্রামে আসছে তাদের কথা বিশ্বাস্য অবিশ্বাস্য দুইই মনে হয়। একজন প্রশ্ন করে– আপনে কি আর্মিগো দ্যাখছেন?

দেখমুনা ক্যান! তারা এক একটা দৈতের মত, ইয়া গোপ। দ্যাখলে মনে হয় যা হুনি, ঠিকই হুনি। হ্যারা এক একজনে তিনজন হিন্দু সৈন্যর মহড়া লইতে পারে। আমাগো পোলাপানরা ওগো সামনে খাড়াইবে ক্যামনে।

কেউ চিন্তায় বিমর্ষ হয়ে পড়ে, কেউ বলে– চাচা, ওরা আমাদের আক্রমণ করেছে, আমরা ৭ কোটি মানুষ, দ্যাখবেন আমরা ওদের ঠিকই শেষ করে দেবো।

কও কি বাবা। তোমরা তো দশজনও ওগোর একজনের লগে পারি ওঠবা না।

আজকালের যুদ্ধ গায়ের জোরে হয়না। আমাদের উপর ভরসা রাখেন, দোয়া করেন।

৬দিন পর ঢাকা থেকে ইয়াজদানী সাহেব গ্রামে ফিরে এলেন।

সবাই ঢাকার খবর জানার জন্য উদগ্রীব। একজন দুজন করে তার বৈঠকখানা প্রায় ভরে উঠল। হাতমুখ ধুয়ে চা নাস্তা খেয়ে পান চাবাতে চাবাতে তিনি তার আরাম কেদারায় জাঁকিয়ে বসলেন।

ঢাকার কি অবস্থা, প্রেসিডেন্ট সাহেব। তিনি স্থানীয় প্রাইমারি স্কুলের গভর্নিং বডির সভাপতি।

আরে মাস্টের, এটাও কি বলা লাগে নাকি! আমি তো আগেই আঁচ করেছিলাম। এও কি সম্ভব পুঁচকে বাঙালিরা যুদ্ধ করবে পাকিস্তান আর্মিও সাথে, কচু কাটা হবে না? ঘয়েছেও তাই। ৬দফার সাধ মিটে গেছে।

ভিড়ের মধ্যে একটি ছেলে বলল, ঢাকার যুদ্ধ তাহলে শেষ হয়ে গেছে চাচা?

তবে আর বলছি কি! প্রথম রাতেই সব ঠান্ডা, ট্যাংকও নেই। জয় বাংলা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে, তাদের টিকিও দেখা যায় না।

তা হলে তো চাচা ঢাকা থেকে এসে ভুল করেছেন, ওখানে থাকাই ভালছিল।

কেন?

ঢাকার যুদ্ধ শেষ, কিন্তু এখানে তো এখন শুরু হচ্ছে। ক্ষুদ্র জটলটার উপর দিয়ে একটা চাপা হাসির ঢেউ খেলে গেল।

যত্তো সব! তোমরা যাও এখন।

তার মেয়েটা ভার্সিটির ছাত্রী, ক্লাস নেই, দুচার দিন ডামি রাইফেল নিয়ে ক্যাম্পসে প্যারেড করেছে শুনে ইয়াজউদ্দিন সাহেব জোর করেই বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছেন। দরজার আড়ালে দাড়িয়ে সব শুনছিল। বাবা ভিতরে আসতেই ক্ষুব্ধকণ্ঠে বলল– বাবা জয় বাংলা ঠান্ডা হয়ে গেছে এটা কোন আনন্দের সংবাদ না, যে তুমি ওভাবে বলবে। আর শেষ হয়ে গেল ভাবছ কিভাবে, বাঙালিরা এবার এত সহজে দমে যাবে, অসম্ভব।

কেউ কাজ করচে না গ্রামের পথ। অথচ কেউ সঠিক জানে না ঢাকায় কি হয়েছে, সহরেই বা কি হচ্ছে। তবে দু একজন করে গ্রামে আসছে তাদের কথা বিশ্বাস্য অবিশ্বাস্য দুইই মনে হয়। আপনি কখনো পাকিস্ড়ানীআর্মি দেখেছেন? নারে বাপ তবে শুনেছি তারা দৈতের মত দেখতে একজন নাকি তিনজন হিন্দু সৈন্যর সমান,ইয়া গোপ।

ওরা আমাদের আক্রমণ করেছে, আমরা ওদের শেষ করে দেবো। কও কি বাবা। তোমার তো দশজনও ওদের সাথে লড়বে না।মুজিব জানতেন তাকে মারতে পারবেনা। মুজিব ভাবেন, মৃত্যুর দূয়ার থেকে তিনি ফিরে এসেছেন, এবারও হয়তো বাঁচবেন হয়তো না। তবে তার হিসাবের ভিত্তি দৃঢ়। তিনি গোটা পাকিস্ড়ানের নিবখুশ সংখ্যা গরিষ্ট দলের নেতা, তার পক্ষে বিশকে বোঝানো সম্ভাব যে দেশ তার নেতৃত্বে আসবে তিনি কেন বিচ্ছিন্নতা চাইবেন এটা ভূট্টো চাইতে পারে, চেয়েছেও–তার পরিস্কার বক্তব্য পাঁচ বছর ক্ষমতার বাইরে থাকতে পারব না এবং শেষমেশ বলেই দিয়েছে 'ইধার হাম, উধার তুম।' দেশভাগ ইয়াহিয়াও চাইতে পারে যদি তারা বাঙালিদের শাসন মানতে না চায়।

এটা বিশ্ব বোঝে, ভালই বোঝে, তারা নিরেট নয়, এবং সেজন্যই তারা মুজিবের হত্যার বিপক্ষে দাড়াবে। বিশেষতঃ আমেরিকা যে উদ্বিগ্ন, লাল কাস্তে-হাতুড়ির অগ্রাসন সম্পর্কে। ইস্ট অলরেডি রেড, সাউথ কি রেড হয়ে যাবে। এটা এহিয়া ঠেকাতে পারবে না, সে চেষ্টা করতে পারে তবে তা হবে খুবই কস্ট্‌লি, কিন্তু মুজিব সেটা পারেন। তার সংগঠন রয়েছে দেশ জুড়ে, জনতার মধ্যে। অতএব তাকে মারা যাবে না। মারলে ক্রুদ্ধ প্রতিহিংসাপরায়ন হয়ে মুজিবের লোক দলে দলে যোগ দেবে নকশাল আন্দোলনে, স্রেফ ভিয়েৎনাম হয়ে দাঁড়াবে দেশটা।

অতএব আমেরিকা মুজিবকে বাঁচতে সাধ্যমত করবে। এবং কেনা জানে, ইয়াহিয়ার মত জেনারেলরা কেমন বিড়াল হয়ে যায় আঙ্কেল শ্যামের চু চু শব্দে। এই সমিকরণ ছিল মুজিবের ভরসা। বাস্তবে ঠিক তাই হয়েছে। মেজর বলল উচ্চ কণ্ঠে তার সৈন্যদেরই সতর্ক করেছেন, ডোন্ট শুট, ডোন্ট শুট হিম। পাকিস্তানিরা ভাবে মুজিবই সব। তাকে বিচ্ছন্ন করতে পারলে সব ঠান্ডা। মুজিব প্রকাশ্যে সে রকমই বলতেন। কিন্তু তিনি জানতেন। বাংলাদেশ এখন যে পর্যায়ে তাতে এ আন্দোলন থামবে না। এবং একগুচ্ছ এমন নেতৃত্ব আছে যারা থামবে না। অতএব যুদ্ধ থামবে না চলতেই থাকবে।

হ্যা আপনার কাজ আছে। নামাজ মসজিদে পড়বেন। আর পাঁচ ওয়াক্ত বাড়িতে আযান দেবেন। দুদিন পর হিন্দু পলীতে গেলেন শোনায় সন্ধ্যায় আপন শখ উলুধাবন পড়ে দেয়। আজান হবার পর আজানে অসুবিধা হচ্ছে। আমরাতো জীবন ভর এই সময় দিয়ে আসছি। তাদের রাগ যেয়ে পড়ে সাধুকার উপর, ব্যাটা গেল আমাদের ডুবিয়ে গেল।

জাগা মত পেয়ে নিই, গলা নামিযে দেবো। না বাবা ও কাজ কোর না, শেষে অবস্থা অন্যরকম দাড়াবে। তার চেয়ারম্যানের কাছে নালিশ দেন। তিনি পেয়াদা পাঠান, ডাক খাদেম যে। সে কদম আলী সঙ্গে নিয়ে আসে। এর আগে কোথায় থাকতেন? যে কদম আলী ভাইরার বাড়ি। ওখানে পাঁচ ওয়াক্ত আজান দেন , জ্বি না। তাহলে এখানেও দেবে না। ওনাদের আপত্তি না থাকলে দিতে পারবো। তবে সন্ধ্যায় উলুধ্বনি শাখ ওদের সময় বাধা বুঝেছ, কদম মোলা, ঘোট পাকাতে চেষ্টা করেন, মুসলমান হয়ে চেয়ারম্যান কি বিচারটা করল দেখছেন আপনারা। রামকৃষ্ণ পুর বাজার বনী ক্যাম্প। বিডিআর- ওখানে ছিল আর্মী ক্যাম্প। কর্মকার ফ্যামিলি। ছিল কিছু, অধিকাংশইমানুষ। পাঁচপীর তলা আন্দুলিয়ার পশ্চিমে পাশের গ্রাম কুলিয়া। পাঁচপীরের কবর ছিল বলে প্রকাশ। কুলিয়ার অপজিটে মশরম পুর বি এস এফ ক্যাম্প। ভারতের চাওড়া রাস্ড়া। রাস্ড়া ছিল রামকৃষ্ণপুর দিয়ে পুড়াপাড়া হয়ে কেইবাদ পুর।

সিংহঝুলি জগন্নাথপুর ট্যাকযুদ্ধ হয়বরাবর পাকিস্ড়ানী এলাকা ছিল মাশিলা, হিজলী যখন টরচার- সহ্য করার ক্ষমতা হবে কি। কিভাবে হল জানেন। ডঃ মালেক দাঁতের ডাক্তার। রাজনীতি করতে চেয়েছিলেন। কোনটাই হয়নি না। প্রকাধিক না রাজনীতি। যাদের আমরা পাশেপাচ্ছি, নিবোধ, হিংসা পারায়ন এবং ক্রিমিনাল সেনাবাহিনী। গেরিলা বাহিনী নেই আমাদের বিমান বাহিনী হবে। হবে কোথায় দেশে অনেক পরিত্যাক্ত বিমান ঘাটি আছে আমারা শীঘ্রই এলাকা দখল নিতে পারব। নৌ বাহিনী দেশের নদী আমাদের দখলেই থাকবে আমরা ভারতীয় সাহায্যের ব্যাপারের আশাবাদী ওরা দেবে কেন, ওদের পঃ বাংলা বিচ্ছিন্ন হওয়ার ভয় থাকবে থাকতে পারে তবু দেবে। এককোটি লোককে খাওয়ার চেয়ে একটা যুদ্ধের খরচ কমই হবে।

একটা সাধারন ধারনা বেলুচরা এ ধরনের আক্রমণে ইচ্ছুক নয়। মুসলমানদেরবির"দ্ধে গোলাবর্ষন অনিচ্ছুক। নিয়াজী বলেন এটা হচ্ছে নিসঞ্চল এবং আমরা জায়গাটা চষতে এসেছি। লুক টু দি ম্যাপ। মাশরেকি হামারা মাগরেব পাকিস্তান কা নিচে হ্যায়, আই সি লেয়ার পার্ট। ইসকা কেয়া মানে ?

ছোট বাচ্চা আসরের পর জায়নামাজে বসে প্রার্থনা করছে আল্লা তুমি আমার আম্মু আর খালামনিদের ভাল রাখো। আমার ছোট্ট ভাইটাকে ভাল রাখো।

কই তোমার নিজের জন্য তো দেয়া চাইলে না?

বারে আমার তো ভয় নেই।

ঐ ছোট্ট ভাইয়ের ভয় কি?

ওমা তুমি জাননা বুঝি সৈন্যদের বন্দুকে ইয়া বড় বড় ছোরা লাগানো থাকে। তারা ছোট্ট বাবুদের হাতুরের মত আকাশে ছুরে দিয়ে পেটে ঐ ছোরা ফুটিয়ে দেয় আর হাসে। আচ্ছা কাকু ওদের ছোট্ট ছোট্ট বাবু থাকে না?

এ এক অন্তহীন প্রার্থনা। বাংলার ঘরে ঘরে অতি স্বাভাবিক দৃশ্য। মানুষের যখন জীবনের নিশ্চয়তা থাকে না, রাস্ড়া আশ্রয় থাকে না। যে কোন দিন আলার নাম। ছেলেকে না পেয়ে বুড়ো বাবা কে ধরে নিয়ে যায়। বুড়ো বলে বাবারা আমার মিথ্যা বলার কিছু নেই। আমার ছেলে বলে গেছে মুক্তিযুদ্ধে যাবে সে থেকে সে কোথায় আমি জানি না। তার সাথে কারা আছে তাও জানিনা।

উসকো কিউ নেহি রোখা?

মানা করেছিলাম সাহেব, শোনেনি।

তব মুঝে কিউ নেহী রিপোর্ট কিয়া, কিউ বাতায়া নেহি?

হুজুর আপনারা কোথায় তাতো জানিনা। তাছাড়া নিজের ছেলের নামে নালিশ করব, তাকে ধরিয়ে দেবো!

জরুর, ইয়ে ওয়াতন কা সাওয়াল হ্যায়।

সেও দেশের জন্য যুদ্ধে গেছে সাহেব।

এক প্রচণ্ড মুষ্টাঘাতে বৃদ্ধ বাবাগো বলে ছিটকে পড়েন, তার নাক দিয়ে গলগল করে রক্ত পড়তে থাকে। বৃদ্ধ মুখ চেপে কাত হয়ে নিশ্চল পড়ে থাকেন।

আমরা মুক্তিযোদ্ধা আমাদের এভাবে ভেঙ্গে পড়লে চলবে কেন? তোমার বাবা হলে তুমি পারতে? কেননা তোমার বাবা এবং তুমি বলতে পাড়ছ। সে বিষন্ন হয়ে পিছিয়ে আসে। কমান্ডার এগিয়ে যায়। আমার বোনটা কোথায়। এ প্রশ্ন প্রতিক্ষন আমাকে পুড়িয়ে মারে, যাও পুড়ার জেদ ততী বেড়ে ওঠে। দেশ স্বাধীন হবে আর আমরা কিছু উৎসর্গ করবো না তা কি হয়। রশীদ কঠিন হাতে রাইফেল চেপে ধরে ওদের অনুগামী হয়।

অধ্যাপক খালেদ রশীদ গুরু (২০ মার্চ, ১৯৭১)

২৭ মার্চ সকালেই আমি আমার লক্কড় ঝক্কড় মায়াম সাইকেলটা নিয়ে খবর সংগ্রহের জন্য বেরিয়ে পড়লাম। গতকাল ২৬ মার্চ পিটিআই মোড়ে পথের অ্যাসফল্ট যেটুকু খোড়া হয়েছিল সেভাবেই আছে, একটা রিকশা আটকানোর জন্যও তা যথেষ্ট নয়। তবে ঠেলা গাড়ি উল্টে, ইট, কাঠ ফেলে যে প্রতিবন্ধক তৈরি করা হয়েছিল সেসব উপকরণ পাশের ড্রেনে গড়াগড়ি খাচ্ছে। কারা সরিয়েছে কে জানে। আমি একরূপ নিশ্চিত ছিলাম যে সালাহউদ্দিন ভাইয়ের বাড়ি, বর্ণালী প্রেস, সুইটহাউজ এবং আওয়ামী লীগ অফিসের কোনটাই খোলা পাওয়া যাবেনা। তথাপি পিটিআই মোড়ে লোক সমাগম দেখে সাহস বাড়ল, মনে হল শহর তো এখনো বাঙালিদের দখলেই আছে। সাইকেল নিয়ে সোজা আহসান আহমদ রোডে ঢুকে পড়লাম। আমার উদ্দিষ্টগুলো এই রোড বরাবর গেলেই পাওয়া যাবে। সুশান্তদের বাড়ি।সালাহউদ্দিন ভাইয়ের বাড়ির কাছাকাছিআসতেই সামসুর রহমান রোড থেকে একটা আর্মি ভ্যান মন্থর গতিতে আহসান আহমেদ রোড ক্রস করে কমার্স কলেজের দিকে চলে যেতে দেখলাম। এই এলাকা আর্মিদের টার্গেটও বটে। আমি সাইকেল ঘুরিয়ে নিলাম, ওদের কোন পেট্রল ট্রুপের সামনে না পড়াই ভাল। দ্রুত ফেরিঘাট রোডে ফিরে এলাম। হঠাৎ মনে পড়ল গুরু আজ বইটা ফেরত দেবেন বলেছিলেন। ফলে বাড়ির দিকে না যেয়ে মির্যাপুর দিয়ে ফরাজিপাড়ায় গুরুর ডেরার উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম। এতে কিছুটা হলেও আড়াল পাওয়া যাবে। আমার অবশ্য আরো একটা উদ্দেশ্য ছিল, বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে গুরুরা কি ভাবছেন তা জানা। আমাকে হতাশ হতে হল, গুরুর ঘরের দরজায় স্বস্তা দামের চাইনিজ তালা ঝুলছে।

গুরুকে আমি প্রথম দেখি সন্দীপনে। লোয়ার যশোর রোডে বাংলাদেশ ব্যাংকের বিপরীতে ফ্লোরা হাউজের তিন তালার একটা বড়সড়ঘরে মুস্তাফিজ স্যার থাকতেন। ঘর জুড়ে ফরাস বিছানো।সন্দীপন সাংস্কৃতিক সম্প্রদায়ের রবিবাসরীয় আসর বসত এখানে।আসরে স্বরচিত গল্প কবিতা ও প্রবন্ধ পাঠ হত, আবৃতি গান বাজনা হত, বিভিন্ন বিষয়ের উপর আলোচনাও হত। সন্দীপন ছিল প্রগতিশীল ও উদারমনা অধ্যাপক, সুধিসমাজএবং একগুচ্ছ তরুণের মিলন মেলা।

গার্লস কলেজের পদার্থ বিদ্যার অধ্যাপক খালেদ রশীদকে আমি যেদিন প্রথম দেখি মনে হয়েছিল কোন এক ক্ষয়িষ্ণু জমিদার বংশের শেষঅবশেষ হবেন হয়তো। বিরল কেশ, নিমিলীত নেত্র, বিবর্ণ সাদা পাজামা-পাঞ্জাবি পরে তাকিয়ায় ঠেস দিয়েসামনে ফেলে রাখা তানপুরার উপর আঙ্গুল বুলিয়ে পিড়িং পিড়িং আওয়াজ তুলছেন। ঠেস দেয়ার পাশ বালিশটা তিনি টেনে নামিয়েছেন মুস্তাফিজ স্যারের খাট থেকে।

আমি দ্বিতীয় ব্যক্তি যে ঐ মুহূর্তে উপস্থিত হয়েছিলাম। মনে হল ভারি চোখের পাতা অতি কষ্টে তুলে তিনি কোন রকমে আমাকে এক পলক দেখে পুনরায় সুর সৃষ্টির কাজে নিমগ্নহলেন। সেকালেসব চিত্রশিল্পীই একটা বিশেষ তেলরংছবি আঁকতে পছন্দ করতেন। টেবিলক্লথে ঢাকা গোলাকারঅথবা ষড়ভূজ টেবিলের উপর ফুলদানিতে একরাশ ফুল, ঝাঁপিতে ফল, পাশে ঢাউস মদের বোতল, গ্লাস এবং টেবিলের পাশে তোয়ালেঢাকাশূন্য ভারি চেয়ার–এই ছিল ছবির উপজীব্য।ছবিরনাম– জড়জীবন। আমার সামনে দৃশ্যমান ক্যানভাসে ওগুলো নেই, আছেন গুরু, সাথে তাকিয়াআর তানপুরা। প্রকৃত নাম খালেদ রশীদ, গুরু নামের আড়ালে চাপা পড়ে গেছে।

সবাই তাকে গুরু বলতেন। গুরুর কুষ্ঠিঠিকুজি অনুসন্ধানের প্রয়োজন পড়েনি, খুব দ্রুত বুঝে গেলাম তিনি এক অসাধারণ কর্মী পুরুষ। সব কাজে প্রচুর উৎসাহ, নেতৃত্ব দেয়ার ক্ষমতাও অসাধারণ। খুলনায় গুরু নামটা চালু করেছিলেন আজকের কথা সাহিত্যিক অধ্যাপক হাসান আজিজুল হক। একদিন আসরে বললেন–যখন রাজশাহী ভার্সিটিতে পড়তাম, তাকে গুরু বলতাম, সবাই বলতো তাই।গুরু ভার্সিটিতে ছাত্রলীগ করলেও এখন বাম আন্দোলনের সাথে যুক্ত। তবে বোহেমিয়ান চেহারার কারণে তাকে তখন এড়িয়ে চলতাম। তার সাথে আজকের যে বন্ধুত্ব তা খুলনা গার্লস কলেজে অধ্যাপনার সুবাদে।

তখন পশ্চিম বাংলায় নকশাল আন্দোলনের ঢেউ। সে ঢেউ পূর্ব বাংলায় নানা জায়গায় আছড়ে পড়েছে। কিন্তু গুরু যে তাতে জড়িয়েছেনআমরা তা জানতাম না। সন্দীপনের বেশ কিছু তরুণ আগে থেকেই হ্যামেলিনের এই বঁংশীবাদকের অনুরক্ত হয়ে পড়েছিল। তাদের কেউ কেউ ঝুকল নকশাল আন্দোলনের দিকে। আমি ছাত্রলীগ করি, গণতান্ত্রিক এবং জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় বিশ্বাস রাখি। এসব পরিবর্তন আমার অগোচরেই থেকে গেল। তবে গুরুর সাথে আমার সম্পর্ক ছিল গুরু-শিষ্যের মত এবং অত্যন্ত গভীর। আমি ২০ মার্চ দুপুরে গুরুর বাসায় গিয়েছিলাম। ফারাজীপাড়া রোডে ঢুকে সামান্য এগিয়ে ডান হাতে ভিতরের দিকে একটা টিনশেড ঘর। ঘরে বিভাসকে দেখে বিস্মিত হলাম। সেছিল আমার ছেলেবেলার বন্ধু, ভাল ফুটবল খেলত। আমরা ফেরিঘাটের বাসা ছেড়ে আসার পর ওর সাথে যোগাযোগ কমে যায়, পরে আর কখনো দেখা হয়নি। দীর্ঘদিন পর দেখা, বললাম– আমার ধারণা ছিল তোমরা বোধহয় ভারতে চলে গেছে। বলল–না, গ্রামের বাড়িতে থাকি, কালেভদ্রে শহরে আসা পড়ে।

সে তখন আরো শক্তসমর্থ। কিশোর বয়সের কমনীয়তা পোড়খাওয়া চেহারায় ঢাকাপড়েছে। সে গুরুর সাথে চীনের চলমান সাংস্কৃতিক বিপ্লব নিয়ে কথা বলছিল। তখন মুজিব-ইয়াহিয়া আলোচনার পাশাপাশি এটাও ছিল একটা বার্নিং কোশ্চেন। বিষয়টা নিয়ে বিভাসের সাথে আমার তর্ক বেঁধে গেল। আমি বলেছিলাম–কমিউনিস্ট থিওরির বাইরে যেয়ে চীনের সাংস্কৃতিক বিপ্লব হচ্ছে। পোড়খাওয়া শ্রমিক শ্রেণীর বদলে কোমলমতি ছাত্রদের বিপ্লবের চালিকা শক্তি করা হয়েছে। এর পরিণতি এমন হতে পারে যে চীন গতিপথ হারাতে যাচ্ছে।আমাদের বয়সটাও তখন সেই পর্যায়ে, যথেষ্ট ম্যাচিওর্ড নয়, তর্কটা এড়ে তর্কে উপনীত হল। আমি খেয়াল করিনি গুরু আমাকে বারবার নিবৃত হওয়ার জন্য ইশারা করছেন। যখন খেয়াল হল,বিভাসের চোখ-মুখের ভাব পাল্টে গেছে। তর্ক করতে যেয়ে অনেক সময় রাগারাগি চেঁচামেচি হয়, স্বরগ্রাম চড়ে, কিন্তু চোখেমুখের এমন ভয় ধারনো পরিবর্তন আগে কখনো দেখিনি। গুরু আমার হাতে গুটি কয়েক টাকা আর একটা কেটলি ধরিয়ে দিয়ে একরূপ জোর করেই ঘরের বাইরে ঠেলে দিয়ে বললেন–যাও মোড়ের দোকান থেকে চা সিঙ্গাড়া নিয়ে এসো।

গুরু পরিস্থিতি হালকা করার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তুকঠিন দু'টো দেয়ালে তা বাধা পেল, চা পর্ব শেষ হল একরূপ নিরবে। বিভাস বলল, স্যার আজ উঠি।

গুরু বললেন–তুমি কিন্তু বইটা খুঁজে বার করার চেষ্টা কর। কারো না কারো কাছে থাকবে অবশ্যই। সপ্তাহ খানেকের জন্য পেলেও আমার চলবে।

আমি তো বহুত খুঁজেছি স্যার, এখনো কারো কাছে পাইনি। এটা কিভাবে হয় যে কমরেড স্টালিনের বইটা শ্রেফ ভ্যানিশ হয়ে যাবে!

ক্রুশেভের সময় বইটা ব্যাপক ভাবে ধ্বংস করা হয়, তাই বলে আমাদের দেশে বইটা কারো কাছেই থাকবে না তা মনে হয় না। তুমি চেষ্টা করে দেখো।

জিজ্ঞাসা করলাম, কি বই গুরু?

জবাব দিল বিভাস– ও তুমি বুঝবেনা, রুশ কমুনিস্ট পার্টিরইতিহাস, একটা মোটা বই।

তাই! গুরুকে বললাম, স্টালিনের বই তো, তাই জিজ্ঞাসা করছি।

গুরু আমার বই প্রীতির কথা জানতেন। সাথে সাথে বললেন, আমি স্টালিনের 'হিস্ট্রি অব দি কমুনিস্ট পার্টি' বইটা খুঁজছি।

আমি যখন বললাম বইটা আমার কাছে আছে গুরু কিছুক্ষণের জন্য বিহ্বল হয়ে পড়লেন। তার চেহরায় অবিশ্বাস থেকে বিশ্বাসী হওয়ার অপার্থিব আভা। বললাম– '৬৪ সালে নাভারনে গিয়েছিলাম বড় বোনের বাড়িতে।তার ভাসুররা সবাই কমুনিস্ট পার্টি করতেন। সে বাড়িতে পুরানো এক কাঠের বাক্সে অনেক বইয়ের সাথে এ বইটাও ছিল। বইয়ের মালিক দীর্ঘ দিন থেকে লন্ডন প্রবাসী। সেখান থেকে,বলতে পারেন বইটা সরিয়েছি।

তুমি বইটা অন্তত এক সপ্তাহর জন্য আমাকে দাও। আমি বহুদিন থেকে খুঁজছি, পড়ে ফেরত দেবো।

বললাম গুরু বইটা যেভাবে সংগ্রহ করেছি, সেভাবে হারাতে চাইনা। তবে সন্দীপনের নাজিম মাহমুদ স্যার এবং সাধনদার সাথে আপনিও আমার অতি শ্রদ্ধেয় জন, আশা রাখি বইটা অবশ্যই ফেরত পাবো। কালই নিয়ে আসব বইটা।

গুরু বললেন– ফেরত তো অবশ্যই পাবে। তবেআমি এখনই তোমার সাথে যেতে চাই। বলতে পারো খুবই বিস্মিত হয়েছি। এভাবে বইটা পাবো ভাবতেও পারিনি, আগামীকাল অনেক দীর্ঘ সময়!

আমরা রিকশায় উঠলাম। গুরু বললেন, তুমি তো কমুনিজম পছন্দ করনা, তাহলে বইটা সরালে কেন?

বইটা আমি নিয়েছিলাম ছাত্র ইউনিয়নের ছেলেদের সাথে তর্ক করার মালমশলা যোগাড় করতে। তারা ফট্‌ফট্ করে কিছু শব্দ আওড়াতো। তাদের জবাব দেয়ার প্রয়োজন ছিল। কিছু পড়াশুনা না থাকলে জবাব দিই কিভাবে। একটা গল্প বলি গুরু। এটা অবশ্য অনেক পরের ঘটনা। ছাত্র ইউনিনের ছেলেরা কিছু চটি বই, কিছু লিফলেট, মাও-এর লাল বই, আখের স্বাদ নোনতা, দুনিয়া কাঁপানো দশদিন এসব বই ছেলেদের পড়তে দিত, বলত এটা তাদের লিটারেচার। একদিন আমাদের এক কর্মী এসে ক্ষোভের সাথে বলল ভাই, ছেলেরা তো সব ছাত্র ইউনিয়নের দিকে ঝুঁকছে, ওদের লিটারেচার আছে। আমাদের লিটারেচার কই?

তৎক্ষণাৎ জবাব দেয়া সম্ভব হয়নি। কয়েকদিন পর ঢাকা থেকে সিরাজ ভাই(সিরাজুল আলম খান) এলেন খুলনায়। প্রশ্নটা তাকে করলাম।

তার হাসিটা সবসময় প্রাণখোলা। আমি লজ্জা পেলাম, বোকামো কিছু একটা করেছি নিশ্চয়। তারপর গম্ভীর হয়ে বললেন– তোমার কাছ থেকে এমন নির্বোধ প্রশ্ন আশা করিনি মনোয়ার। তুমি তো গণতন্ত্রী। তোমার চিন্তা-ভাবনা তো কোন এক নির্দিষ্ট ধারায় সীমাবদ্ধ নয়। যারা ধর্ম নিয়ে অন্ধ রাজনীতি করে তারা আপন ধর্মের বাইরে অন্য কোন সাহিত্য দর্শনকে পাঠ্য বলে গণ্য করেনা। গোঁড়া কমুনিস্টরাও তাই। নির্দিষ্ট কিছু বিষয়ের বাইরে অন্য কোন বিষয়কে তারা পাঠ্যজ্ঞান করেনা। কিন্তু তুমি সবই পড়বে। কোরান, বাইবেল, বেদ, কালমার্কস, লিংকন, লেনিন, মাও, বার্নাড শ, বাট্রান্ড রাসেল, রবীন্দ্রনাথ,ড. শহীদুল্লাহ, মুজতবা আলী, শরৎচন্দ্র সব। সবই তোমার লিটারেচার। বুদ্ধি বিবেচনা দিয়ে যেটা ভাল মনে হয় সেটাগ্রহণ করবে, খারাপটা বর্জন করবে। এটাই গণতন্ত্র। আমি সত্যিলজ্জা পেয়েছিলাম।

ছেলেবেলা থেকেই আমিযখন যা হাতের মাথায় পাই, পড়ে ফেলি।প্রয়োজন আমাকে সিরিয়াস বই পড়তে উদ্বুদ্ধ করেছিল, তাতে উৎসাহ যুগিয়েছিলেনবাবা, মতি ভাই, সিরাজ ভাই, নাজিম মাহমুদ স্যারের মত গুনিজন। দুর্ভাগ্যক্রমে ছাত্ররাজনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর চাকরি, আড্ডা এবং সুন্দরীস্ত্রী আমাকে বই থেকে বিশ বছর বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিল।চিন্তায় ছেদ পড়ল, গুরু প্রশ্ন করলেন– বইটা তুমি পড়েছ?

এখান ওখান থেকে ৭০-৮০ পৃষ্ঠার মত পড়েছি। আমাকে তো স্যার ডিকশনারী নিয়ে বসতে হয়, পড়া এগায় না,উৎসাহও থাকেনা। আর এখন তো ডামাডোলের অবস্থা। পরে পড়ব বলে রেখে দিয়েছি।

বিভাসকে তো আগে থেকেই চেন, কিন্তু ও কি রাজনীতি করে তা কি জানো?

ও যে রাজনীতি করে তাই তো জানতাম না, ওতো ফুটবল ক্রিকেট এসব নিয়ে ব্যস্ত থাকতো।

যাহোক, তোমাকে একটা কথা বলে রাখি–সবসময় সবার সাথে তর্ক করতে যেও না। অনেকেই এখন পার্টি, রাজনীতি এসব প্রশ্নে খুবইউগ্র, বিরুদ্ধ মত সহ্য করার মানসিকতা হারিয়েছে।

হঠাৎ করে আমাদের মাঝে নিস্তব্ধতা নেমে এলো। সেটা কাটাতেই হয়তগুরু বললেন, সাংস্কৃতিক বিপ্লব সম্পর্কে তোমার ধারণা হয়তো ঠিক নয়। আমাদের কাগজগুলোতে যা লেখা হয় তা প্রায়ই একপেশে,পশ্চিমা ঘেষা। চীনের ছাত্ররা দীর্ঘ দু'যুগ কমুনিস্ট শাসনের মধ্য দিয়ে এসেছে, তারা হাতে কলমে কাজও করেছে। তাদের এক ধরনের পরিপক্কতা আছে নিশ্চয়। নইলে মাও, লিনপিয়াও-এর মতপোড় খাওয়া কমুনিস্ট নেতারাএত গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক বিপ্লবে ছাত্রদের নামাতেন না।আমি চুপচাপ ছিলাম। ইতোমধ্যে রিকশা আমাদের বাড়ি পৌঁছে

গিয়েছিল। গুরু দাঁড়ালেন না। বইটা হাতে নিয়ে চমৎকার একটা হাসি উপহার দিয়ে অপেক্ষমান রিকশায় উঠে বসলেন। আমি ভবিষ্য-দ্রষ্টা ছিলাম না, জানতাম না গুরুর সাথে এটাই আমার শেষ দেখা।

গুরু বাম আন্দোলন করেন এবং তার মাধ্যম সাংস্কৃতিক অঙ্গন, আমি এতটুকুই জানতাম। তারা সেতু নামে একটা মাসিক পত্রিকাও বের করতেন সম্ভবত পাক-চীন মৈত্রী সমিতির ব্যানারে। কিন্তু তার সরাসরি নকশাল কানেকশানের কথা আমার জানা ছিল না। নকশাল কর্মী বা নেতৃবৃন্দ অনেকে আমাদের সাথে ছিলেন, বেশ সতর্কতার সাথে তাদের রাজনৈতিক তৎপরতা গোপন রাখতেন তা বলা বাহুল্য। গুরু আমাকে বিস্মিত করেছিলেন। আমার ধারণা ছিল তিনি আদৌ চরমপন্থী নন এবং তার আলটিমেট লক্ষ্য স্যোশালিজম, একই সাথে বাঙালিজাতীয়তারচেতনা এবং পূর্ব বাংলার মুক্তি। এ ব্যাপারে তিনি নিবেদিত ছিলেন বলেই জানি। বিষয়টা আমি পরবর্তীতে আরো নিশ্চিত হই তার ঘনিষ্ট বন্ধু কথা সাহিত্যিক হাসান আজিজুল হকের লেখায়।

হাসান আজিজুল হক লিখেছেন–'৭১-এরএক সন্ধ্যায় ভীতিপ্রদ অবস্থার মধ্যে ন্যাপ নেতা অ্যাড. আব্দুর রাজ্জাকের বাড়ি থেকে বেরিয়ে তিনি গুরুকে তাদের বাসায় যাওয়ার অনুরোধ জানান। গুরু বললেন– না, তাকে ফিরতে হবে,সব ব্যবস্থা করা আছে।তার কণ্ঠে এমন এক প্রত্যয় ছিল যার উপর কথা চলে না, তিনি তখন ব্যাকুল হয়ে জিজ্ঞাসা করেন–অন্তত এটুকু বলে যান, আপনারা কি করতে যাচ্ছেন?

আবছা অন্ধকারে দু চোখের ধক ধকে দৃষ্টি মেলে গুরু বলেছিলেন, একবার যখন শুরু হয়েই গেছে তখন এই পাকিস্তানি কুত্তা শাসকশ্রেণীর বাহিনীকে দেশের মাটি থেকে চিরকালের জন্য উৎখাত করা ছাড়া অন্য কোন কাজ থাকতে পারে না। হাসান আজিজুল হক জোর দিয়ে বলেন– 'আমি বলছি এই কথা তিনি আমাকে বলেছিলেন।' এরপর একটু খুড়িয়ে হাঁটতে হাঁটতে তিনি অন্ধকারে মিশে যান।(স্মৃতি: ১৯৭১, পঞ্চম খন্ড, সম্পাদনা- রশীদ হায়দার, পৃষ্ঠা-৭১)।

কিছুদিন পর খবর পেয়েছিলাম গুরু সম্ভবত ডুমুরিয়ার শোভনায় আছেন। এই এলাকা, অনেকেই জানতো কমরেড আব্দুল হকের নেতৃত্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান কমুনিস্ট পার্টি (এমএল)-এর প্রভাবাধীন। এই দল চীনা কমুনিস্ট পার্টির প্রভাবেপাকিস্তানের পক্ষ নিয়েছিল এবংবাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকেদুই কুত্তার লড়াই এবং সোভিয়েট সামাজিক সম্রাজ্যবাদ ও ভারতীয় সম্প্রসারণবাদের আগ্রাসন বলে চিহ্নিত করেমুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষে সশস্ত্র অবস্থাননিয়েছিল। তবে শক্তির দর্পেপাকিস্তানি সামরিক জান্তাএ জাতীয় তুচ্ছ সমর্থনের থোড়াই মূল্যদিত।তদের কাছেনতজানু জামাত মুসলিম লীগ ছাড়া বাঙালি, বিশেষকরে সশস্ত্র বাঙালি মাত্রই ছিল মিসক্রিয়েন্ট– যাদের তারা নিশ্চিহ্ন করতে বদ্ধপরিকর ছিল।

আমি গুরুর কথা ভাবছিলাম, কমুনিস্ট পার্টির কথিত গণতান্ত্রিক কেন্দ্রীকতার ফেরে হয়ত তাকে তার ঈপ্সিত বাঙালিজাতীয় মুক্তির লড়াইয়ের বদলে ঘোর অপছন্দের পাকিস্তান নামক দেশটির আওতায় কেবল সর্বহারা লাইনেই লড়তে হচ্ছে। আমি এক সময় তার অন্তর্ধানের সংবাদ শুনে বুকে শেলের আঘাত পেয়েছিলাম। শোনা যায় নদীতে গানবোটের শব্দ শুনে পরিস্থিতি রেকি করতে যেয়ে তিনি নিখোঁজ হন।সহসা আর্মিরসামনে পড়ায় খোঁড়া পা নিয়ে পালাতে পারেন নি। হতে পারে নিয়তি তাকে টেনেছিল, নইলে মধ্য বয়সেখুঁড়িয়ে চলার মানুষটি কেন রেকি করার দুরূহ কাজটি নিজে করতে যাবেন!তার লাশও পাওয়া যায়নি।তার রহস্যময় অন্তর্ধান আজো তার অনুরাগীদের ভাবায় এবং কাঁদায়।

নকশালবাড়ির ঢেউ

শান্তিধামের কাছে পুরোনো পলস্তারা খসা একতলা এক দালান, শ্যাওলা ধরা ইটের ফাঁকে ফাঁকে বট অশ্বথের চারা উঁকি দিচ্ছে। বাড়িটার একটা প্রশস্ত রূম আগে থেকেই কিছুটা পরিস্কার করা আছে। মেঝের উপর মলিন ফরাস বিছানো। এলাকাটা পঞ্চবিথী নামেও পরিচিত। এখান থেকে পাঁচটা রাস্তা চলে গেছে পাঁচ দিকে। জনাকীর্ণ এলাকা হলেও পতিত দশার কারণে বাড়িটাকে পোড়ো বাড়ি এমনকি ভূতের বাড়ি বলে মনে করে কেউ কেউ। তবে কম হলেও বাড়িতে লোকজনের আনাগোনা আছে। এক সন্ধ্যায় দু একজন করে লোকজন সন্তর্পণে এসেনিঃশব্দে ফরাসের উপর বসতে থাকল। তারা সবাই সন্ত্রস্ত, ভয়ে যতটা নয় তার চেয়ে বেশি কি সিদ্ধান্ত জানানো হবে তাই নিয়ে। পুলিশ এখন অকেটাই নিষ্কৃয়, শান্তি কমিটি একটা গঠিত হয়েছে বটে কিন্তু তাদের হাতে লোকবল নেই, আবার আর্মিদের লোকবল আছে, কিন্তু তারা এখন জয়বাংলার লোকদের নিয়েই ব্যতিব্যস্ত। তাদের আবার যথেষ্ট চেনা জানাও নেই। অতএব নিজেদের নিরাপত্তা নিয়ে নয়, তারা চিন্তিত কি সিদ্ধান্ত জানানো হবে তাই নিয়ে।

একটু পরেই এখানে সভা হবে, হয়তো আলোচনাও হবে এবং সিদ্ধান্তও জানানো হবে। সেন্টারের সিদ্ধান্ত। স্থানীয় সেন্টার সে সিদ্ধান্ত জানাবেন, মতামত আহ্বান করবেন। নীতিগতভাবে সবাই গণতান্ত্রিক কেন্দ্রীকতার প্রতি বিশ্বস্ত, কেন্দ্রের সিদ্ধান্তই তাদের সিদ্ধান্ত। আলোচকরা সবাই যুক্তি রেফারেন্স তুলে ধরবেন সিদ্ধান্তের পক্ষে এবং এক বাক্যে।

কমরেড, আমরা যুদ্ধ করব। সেন্টারের সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত, আমাদের দেশ আক্রান্ত হয়েছে রুশ সংশোধনবাদ এবং ভারতীয় সম্প্রসারণবাদ আমাদের উপর আগ্রাসী থাবা বিস্তারের দিবা স্বপ্নদেখছে। আমেরিকার দালাল পাচটা কুত্তা আওয়ামী লীগ দেশভাগের দিবা স্বপ্ন দেখছে।

আমরা যুদ্ধ করব তাদের বিরুদ্ধে পাকিস্তানি আর্মিদের সাথে কাঁধ মিলিয়ে। আপনাদের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে। পাকিস্তান তো শ্রেণী শত্রুদেরই একজন। হ্যা, ঠিক কথা। কিন্তু মনে রাখবেন শত্রুর শত্রু আমাদের মিত্র। সময় হলে ওদের উপর আঘাত হানব। গোটা পাকিস্তান লাল হয়ে যাবে। কোন সন্দেহ নেই লাল হবেই। এতে মেহনতি মানুষদের গণচীনের এবং মহান মাওসেতুং-এর সম্মতির কথা আপনারা কাগজেই দেখছেন। এখন আপনারা যার যার নির্দিষ্ট ঘাটিতে চলে যাবেন। চীনের চেয়ারম্যান আমাদের চেয়ারম্যান, মাও জিন্দাবাদ।

সব আলোচনা রেলের গতির মত ইঞ্জিনের পিছু জীবিত। আলোচনা সংক্ষিপ্ত হল, এখন কথা নয়, কাজের সময়।

রশীদ ভেবেছিল, আর্মি একশান গণমানুষের বিরুদ্ধে গেছে, ঘোষণা আসবে বাংলাদেশ মুক্ত করার পক্ষে। কিন্তু ঘোষণা শুনে তার ভেঙ্গে পড়ার দশা। কোন প্রতিক্রিয়া দেখানোর ব্যাপারে সতর্ক ছিল, তবু বেহারা মলিন মাথা ঝুকে গেছে, অনেকেরই গেছে। তারাও তার মত সম্ভ্রস্ত।

সে ভেবেছিল কিছু আলোচনা শেষ পর্যন্ত উঠবেই, ওঠেনি, সিনিয়াররা সব ক্ষুধবার যুক্তি দেখিয়েছেন। ২ দিন আগেও সুর ছিল ভিন্ন, নিশ্চিত থাকো, স্বাধীনতার যুদ্ধে যাচ্ছি আগে। প্লানটা হবে হোটিমিনের মত, বুর্জোয়া দল আওয়ামী লীগের দম থাকবে না। তাদের সুবিধাবাদী আচরণ, মুক্তিযোদ্ধাদের বিরূপ করবে, তাদের নেতারা প্রবাসে চলে গেছে, আমরাই আছি দেশে, আপনাদের ঘাটি এলাকা আছে ওরা পেলটার সেখানে পাবে মটিভেশন সহজ হবে। লাল ঝন্ডা উড়তে সময় লাগবে না। অথচ হলটা কি!

দুজন নি:শব্দে হাটছিল। হরিহর আয়া অথচ এখন কেউ কাউকে আস্থায় নিতে পারছে না। যেমন অমলেশ দাও পারেনি, সুকলীয় সেন্টার অবস্থায় নিতে বলতে পরেনি মস্তবড় ভুল সিদ্ধান্ত, প্লেনারী ডেকে আলোচনা হোক, সিদ্ধান্ত হোক। তিনিজানেন সেটা গণতান্ত্রিক কেন্দ্রীয়কতার বিরুদ্ধাচরণ বলে ধরে নেয়া হবে, পরিণতি একটাই– এনিহিলেশন।

রশিদ বিড় বিড় করে জিজ্ঞাসা করল, আমরা এখন কি করব? যেভাবে বলা হয়েছে, কম এবং জরুরী জিনিস এবং যত বেশী সম্ভব টাকা-পয়সা নিয়ে আজি ঘাটির উদ্দেশ্যে রওনা দিতে হবে, আমাদের হাতে দেড় ঘণ্টা সময় আছে।

রশিদ বুঝল ওসমান ঘাটিতেই যাবে। আদেশ আদেশ। রশিদ বলল লঞ্চ০০০ দেখা হবে। দেড় ঘণ্টা নয় রশিদের হাতে সময় ছিল বড়জোর আধ ঘণ্টা। সে মোড়ের রিকশা০০০০ থেকে রং চটা পুরানো একটা সাইকেল বেছে নিল। এগুলো ভাঙা পাওয়া যায় কি করেন রশিদ ভাই, কি নিচ্ছেন ওটা? ভাল সাইকেল।

এতেই হবে, ধুলো বালির পথ, আল ভাঙ্গাও লাগতে পারে। মোড় ঘোরার আগে ফিরে এলো, চল্লিশটা টাকা বাড়িয়ে দিয়ে বলল, টাকা কয়টা রাখেন রুস্তম উ০০ ফিরে এসে নেবো। পথঘাটে শুনি হরদম ছিনতাই, রাহাজানি হচ্ছে। ক্যান, বাড়ি যাবেন না? যাবো, কিন্তু বাড়িতে এখন আছে কে! তারপর কোথায় দৌড়াতে হয় কিজানে। তার মনের ভার অনেকখানি হালকা হল, শুরুটা অন্তত একা ০০০ মানুষকেফাঁকি দিতে হলনা। অল্পক্ষণ পর সাইকেলের হ্যান্ডেলে পুরোনো চটের থলি ঝুলিয়ে, লুঙ্গি-গেঞ্জি পরে সাতক্ষীরার পথে বেরিয়ে পড়ল রশিদ– বর্ডার একটা ঠিকই পেয়ে যাবে, ছাত্রলীগের ছেলোা তারে ভঅল চেনে, কিন্তু তার নকশাল কানেকশনের কথা জানে না, অস্ত্র একটা জুটে যাবেই।

আবুল লঞ্চঘাটে গিয়েছিল বন্ধুদের সি-অফ করতে। উদ্বিগ্ন ভাবে ওসমানকে দাঁড়ানো দেখল রেলিং ধরে রশিদ তখনো আসেনি। টুংটাং করে লঞ্চের শেষ ঘণ্টা বেজে উঠল দু'জনেই সমান উদ্বিগ্ন, কি হল রশীদের। ওসমানের অনুরোধ আরো কয়েক মিনিট লঞ্চ ঘাটেই অপেক্ষা করল– যাত্রী কম যদি আরো দু'চার জন এসে যায়। যাত্রীরা উসখুস শুরু করে শ্বাপদপদবাচ্য আর্মি সংকুল শহর ছাড়ার জন্য সবাই উদগ্রীব। ঠিক আছে অবশ্যই খোঁজ নেব, ওসমানকে আশ্বস্ত করে আবুল নেমে এল, সে অবশ্য ততটা উদ্বিগ্ন নয়। ওসমান খানিকটা ব্লাস্ট, সে বই পড়ে একটা নির্দিষ্ট লাইনে, একটা নির্দিষ্ট লাইন বিশ্বাস করার জন্য এবং বিশ্বাস করে এবাদতের মত অন্ধ ভাবে, নইলে মিটিং থেখে বেরিয়ে রশিদের করা প্রশ্নটা সে মিলিয়ে দেখতে পারত।

ঘটনা প্রবাহ আমাকে টেনে নিয়ে চলল

সন্ধ্যার মুখে খালাতো ভাই কাজল এসে বলল– ভাই আমাদের বাড়ি চল, কয়েকজন ছেলে এসেছে তারা কথা বলতে চায়। শামিম ভাই তোমাকে খবর দিতে বলল।

শামিম আমার খালাতো ভাই। তারা মিয়াপাড়ায় আমাদের বাড়ির কাছেই দেনাতুল্লার বাড়িতে ভাড়া থাকে। সে ছাত্র ইউনিয়ন মেনন গ্রুপের সাথে যুক্ত ছিল। ছাত্র ইউনিয়নের ছেলেরা অনেকেই এ সময় বেশ দ্বিধার মধ্যে ছিল, হঠাৎ করে ঘাড়ের উপর এসে পড়া এই সংগ্রামে তাদের ভূমিকা কি হবে এই নিয়ে তাদের কাছে হাই কমান্ড থেকে কোন নির্দেশ ছিল না। তারা চীনা লাইনে আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগকে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও ভারতীয় সম্প্রসারণবাদের সেবাদাস হিসাবে প্রচার করতে অভ্যস্ত ছিল। তারা তাদের পার্টি হাই কমান্ড- প্রকৃতপক্ষে চীনের মতামতের জন্য অপেক্ষা করছিল। তবে অনেকেই ছিল যারা বাংলার স্বাধীনতার প্রশ্নকে অগ্রাধিকার দিত। শামিম তাদেরই একজন।

অন্ধ বৃদ্ধপ্রায় দেনাতুল্ল্যা সর্দারের বাড়ির দোতালায় শামিমরা ভাড়া থাকত। আমি সিঁড়ি ভেঙ্গে কাজলের সাথে দোতালার ছাদে উঠে গেলাম। দেনাতুল্ল্যা চিৎকার করে উঠল–'আবার কে যায়? এত কারা যায়, এত পায়ের শব্দ কেন শুনি? এই হারামজাদারা! তোরা কি বোবা হয়ে গেলি, জবাব দিসনে কেন?' মাঝ বয়সী মেয়ে এবং দুই নাতি নাতনি নিয়ে দেনাতুল্ল্যার সংসার। তার নাতি বাশার আমাদের ভালই চেনে। ঝাঁঝের সাথে চাপা স্বরে বলল– 'নানা, চুপ থাকেন তো, বেশী কে যায়! ওনাদের আত্মীয়রা যায়, আবার কে যাবে।' ছাদে উঠে আবছা অন্ধকারে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসা পনেরো- ষোলটা স্তব্ধ থমথমে মুখ দেখে আমার শরীরের ভিতর শিহরণ খেলে গেলো। একই সাথে ভয় এবং অস্বস্তি গ্রাস করল। পাড়ার ছেলেরা আছে, আরো অনেকেই আছে যাদের চিনিনা, কখনো দেখেছি বলে মনেও পড়ে না। শামিম বলল–'ভাই এরা সবাই যুদ্ধ করতে চায়, অস্ত্র গোলাবারুদ কোথায় পাবে তাই সমস্যা। ওরা কি বলে শোনেন।'

এদের দেখে আমি হয়তো কিছুক্ষণের জন্য নিজেকে হারিয়ে ফেলে ছিলাম, দেশের মুক্তির প্রশ্নে, মুহূর্তের মধ্যে যেখানে এতগুলো ছেলে অকুতোভয়ে এগিয়ে আসে, আমার সব দ্বিধাদ্বন্দ্ব উবে গিয়েছিল। এদের কেউ কেউ গতকাল দুপুরে আমাদের সাথে রাস্তা খুড়ে ব্যারিকেড দেয়ার ব্যর্থ চেষ্টায় লিপ্ত ছিল। দুটো ছেলে বসা অবস্থায় কিছুটা সামনে এগিয়ে এলো, ওদের একজন বলল– ভাই আমি পলিটেকনিকে পড়ি, বোমা বানানোর ফর্মুলা জানি, প্রাকটিসও করেছি, তবে সেটা তেমন শক্তিশালী নয়। আর আমার এই বন্ধু আগে থেকেই বোমা বানায়। আমরা কিছু মালমশলাও জোগাড় করেছি, তাতে বড় জোর চার পাঁচটা বোমা বানানো সম্ভব। একটা গোপন জায়গা এবং মালমশলা পেলে অনেক বোমা বানাতে পারি, ছেলেদের ট্রেনিংও দিতে পারি। সে একটা চটের থলের মুখ খুলে কিছু গন্ধক, পটাশ, মোমছাল, জালের কাঠি এবং দুটো তাজা বোমা দেখালো। ভয়ংকর অস্বস্তিটা আবার ফিরে এল, ছাদের উপর ঝিরঝিরে দক্ষিণা বাতাস সত্ত্বেও মাথার ভিতর চিড়চিড়ে ভাবটা কেন জানি কাটতেই চাচ্ছেনা। শামিম আমার রাজনৈতিক বিচ্ছিন্নতার কথা জানত, বলল–ভাই আপনি বরং টুকু ভাই, জাহিদ ভাইদের সাথে ওদের যোগাযোগ করিয়ে দিন, দেখছেন তো ওরা কিছু করতে খুবই আগ্রহী। আমিও সেটাই ভাবছিলাম।

আমরা যে বাড়ির ছাদে বসে কথা বলছিলাম সেটা একেবারে মোড়ের মাথায়। দু'পাশের রাস্তার বেশ কিছু অংশ ছাদে বসেই দৃষ্টিতে আসে। হঠাৎ দক্ষিণ দিক থেকে গাড়ির হেড লাইটের তীব্র আলো বাড়ির উপর আছড়ে পড়তেই সবাই চমকে উঠল। এমনিতেই শহরে প্রাইভেট গাড়ির সংখ্যা তখন একেবারেই কম, তার উপর এ অবস্থার মধ্যে গাড়ি বের করার সাহস দেখাবে কে। দুপুর পর্যন্ত অবশ্য কার্ফু গুড়িয়ে গিয়েছিল পথে স্বতঃস্ফুর্ত মানুষের ঢলে। কিন্তু বিকাল গড়িয়ে আসতেই তারা আবার স্বেচ্ছা কার্ফু বরণ করে নিয়েছিল। সবাই ধরে নিল আর্মি জীপ না হয়ে যায় না। আমরা দ্রুত মাথা নিচু করে ছাদের সাথে প্রায় মিশে যাওয়ার চেষ্টা করলাম যাতে জীপের আরোহীরা আমাদের দেখতে না পায়। গাড়িটা বিপদজনক ভাবে ছুটে এসে মোড়ের মাথায় প্রচন্ড শব্দে ব্রেক কষে দাঁড়াল। একজন সামান্য মাথা উচু করে বলল গাড়ী তো এ বাড়ির সামনেই থেমেছে। মুহূর্তে সবার মাঝে ভয় এবং চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ল। পাশে ছিল দোতালা আর একটা বাড়ি। দু'বাড়ির মাঝে ব্যবধান চার- সাড়ে চার ফুটের কম না। অতগুলো ছেলে মুহূর্তে সে ব্যবধান টপকে পাশের বাড়ির ছাদে উধাও হল। সৌভাগ্য যে, কোন বাড়ির ছাদেই প্যারাপেট ছিল না। আমি আবছা অন্ধকারের মধ্যে বসে ও বাড়ির সিঁড়ি ঘরের নড়বড়েপ্রায় দরজা ভাঙ্গার শব্দ শুনতে পেলাম। আমি দু'বাড়ির মাঝের ব্যবধানটা জানতাম, স্থুল শরীর নিয়ে লাফ দেবার কথা ভাবিনি। একা বসে আর্মিদের জন্য অপেক্ষা করছিলাম, আশ্বস্ত ছিলাম এই ভেবে যে, পলিটেকনিকের ছেলেরা তাদের বোমা বারুদের থলে নিয়েই লাফ দিয়েছে। আমি আজও ভাবলে শিহরিত হই, কারো পা ফসকায়নি, অথবা ও বাড়ির ছাদে হুমড়ি খেয়ে পড়ার সময়ও ওরা বোমা বারুদের থলে ঠিকই সামলে রাখতে সমর্থ হয়েছিল।

আমি সিঁড়িতে ভারি বুটের শব্দ পেলাম। একা বসে মনে মনে আর্মিদের দেয়ার মত যুতসই অজুহাত তৈরী করছি, সহসা আমার ছোট ভাই মাসুকের গলা শুনতে পেলাম– ভাই এরা তোমার খোঁজে এসেছেন।

একজন সাত্তার, শাহীন হোটেলের রেস্তরার ম্যানেজার, ছাত্রলীগ করে, আর একজন মটর গ্যারেজের মেকানিক সেলিম। সেলিমকে আগে দেখেছি কিন্তু কথা হয়নি কখনো। বলল– আমি সেলিম, চেনেন হয়ত, আপনাকে নিয়ে যেতে এসেছি।

কোথায় যেতে হবে এবং কেন?

গেলেই জানতে পারবেন। ঠিক আছে এটুকু বলতে পারি একটা মিটিংয়ে যেতে হবে।

আগে বল কোথায় মিটিংটা। তারপর ছাত্তারের উদ্দেশ্যে বললাম–তুমি ভালই জানো এক বছর আগে আমাকে ছাত্ররাজনীতি থেকে সরে যেতে হয়েছে।

সাত্তার নরম প্রকৃতির ছেলে, বলল– ভাই সবই তো জানি, যাহোক এখন চলেন, ওখানে টুকুভাই জাহিদভাই সবাই আছে, তারাই আপনাকে ডেকেছে। এখন কি কারো পক্ষে দূরে থাকা সম্ভব না কাউকে দূরে রাখা সম্ভব!

বেশ, আগে আমার বাড়িতে চল, বাড়িতে বলে আসি।

সেলিম বলল, হাতে সময় নেই, আপনার বাড়ি খুঁজতে যেয়ে এমনিতেই দেরি হয়ে গেছে। সে মাসুকের উদ্দেশ্যে বলল এই খোকা, বাড়িতে বলে দিও তোমার ভাই বন্ধুদের সাথে দেখা করতে যাচ্ছে।

গাড়ি সংকীর্ণ আঁকাবাঁকা রাস্তায় হুহু করে ছুটছিল, ভাগ্য ভাল রাস্তা ছিল একেবারে ফাঁকা। বললাম– তোমরা বাড়ির সামনে এত জোরে স্কীড করে গাড়ি থামিয়েছিলে কেন? আশেপাশের লোকজন ভয় পেয়ে গেছে।

আপনার ভাইয়ের জন্যই এটা হয়েছে, একেবারে লাস্ট মোমেন্টে বলেছে– এই বাড়ি। তাছাড়া এখন আর আপনাদের সেই ঢিলেঢালা সময়টা নেই, মনে রাখবেন আমরা এখন যুদ্ধের মধ্যে আছি।

সম্ভবত বেনেখামারের সফেদাতলার দিকে কোথাও গাছপালা ঘেরা পাকা বাড়ি, বড় সড় একটা হলরুমে বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের ছেলেরা বসে ছিল, আমাদের ছেলেরাই বেশি, টুকু জাহিদসহ অনেকেই আছে। টুকু আমাদেরবসতে ইশারা করে বলল– যা বলছিলাম, এখন আমাদের বসে থাকা বা দূরে থাকার সময় নেই, আমাদের উপর যুদ্ধ চাপিয়ে দেয়া হয়েছে, যদিও এই পরিস্থিতির কথা আমরা অনেক আগে থেকেই জানতাম।...

ভিতরে ভিতরে শিউরে উঠলাম, এবার সত্যি সত্যি হয়তো এতদিন কর্মীদের যাবলে এসেছি সেই 'প্রক্রিয়ার মধ্যে পড়ার' বিষয়টা মুখ ব্যাদান করে সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। একসময় আমরা ছেলেদের উদ্দেশ্যে প্রায়ই বলতাম, বাঙালিরা ভীতু নয়, প্রক্রিয়া বা ঘটনা প্রবাহের মধ্যে পড়লে সেটা ঠিকই দেখিয়ে ছাড়বে।

শেখ কামরুজ্জামান টুকু তখন খুলনা আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী প্রধান হিসাবে দায়িত্ব পালন করছিল, বলল–পুরো যশোর রোড জুড়ে বিভিন্ন স্থানে ব্যারিকেড দেয়া হয়েছে। সেখানে রাইফেল বন্দুক নিয়ে আমাদের লোকজন প্রস্তুত আছে। অনেক ইপিআর পুলিশও প্রতিরোধে যোগ দিয়েছে। যশোর রোড দিয়ে আর্মি আসা সহজ হবে না। তবে ওদের অস্ত্রবল অনেক বেশী এবং আধুনিক। ওদের উন্নত ট্রেনিংও আছে, যা আমাদের নেই। ফলে তাদের সাথে সরাসরি যুদ্ধ ফলপ্রসু হবেনা। আমাদের প্রতিরোধ হবে গেরিলা কায়দায়, ওদের ঘায়েল করতে হবে ওদেরই অস্ত্র দখল করে। দীর্ঘ সময় লাগবে, আমাদের ভিয়েৎনাম যুদ্ধের কথা মাথায় রাখা ভাল। খুলনা সার্কিট হাউজে ২২ ফ্রন্টিয়ার ফোর্সের হেড কোয়ার্টার, ওদের জানিয়ে দিতে হবে আমরা আছি এবং সেটা আজ রাতেই। কয়েক সেকেন্ড সময় নিয়ে সবার দিকে তাকিয়ে সে বলল, আমাদের কাউকে কাউকে যেতে হবে।

আগেই গুঞ্জন থেমে গিয়েছিল, এবার পুরো ঘর একেবারে স্তব্ধ হয়ে গেল। হঠাৎ অচিন্তনীয়ভাবে হুড়মুড় করে ঘাড়ের উপর এমন ভয়াবহ দায়িত্ব এসে পড়বে কেউ সম্ভবত ভাবেনি। আমি মাথা ঝুঁকিয়ে ফেললাম, অন্যদের প্রতিক্রিয়া দেখার সুযোগ হয়নি। তপ্ত সীসার মত কানে ঢুকল–টুকুভাই, আমি প্রস্তাব করছি, আজকের অভিযানের নেতৃত্ব দেবেন মনোয়ার ভাই আর জাহিদ ভাই!

আমি হতভম্ভ হয়ে গেলাম, কল্পনাতেও ছিলনা ছাত্তার এতবড় শত্রুতা করতে পারে। সে আসলে বিশাল এক সভার সবচেয়ে নিরীহ দুজনের নাম করেছিল এবং মিটি মিটি হাসছিল। সবাই যখন বুঝল এটা রসিকতা তখন পরিস্থিতি হঠাৎ হালকা হয়ে গেল। টুকু কিছুটা ক্ষুব্ধ হলেও বলল–ভালই হয়েছে, এই মুহূর্তে সবার কিছুটা টেনশন মুক্ত হওয়ার প্রয়োজন ছিল। যাহোক এটা সিরিয়াস ব্যাপার, সুতরাং যে যাবে তার নিজেকেই বলতে হবে এবং কে যাবে সেটা পরে দেখা যাবে। আমি হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম।

আমি নিশ্চিত ছিলাম না, সত্যি আজ সার্কিট হাউজের আর্মি হেড কোয়ার্টার আক্রমণ করা হবে কি না। আমার মনে হয়েছিল এ অসম্ভব! গুটি কয়েক রাইফেল, হাত বোমা সম্বল করে ভিমরুলের চাকে ঘা দেয়া কতটুকু যৌক্তিক তাও আমার ভাবনাকে ক্রমাগত জটিল করে তুলছিল এবং নেগেটিভ চিন্তার দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল। রাত সাড়ে আটটা নটার দিকে পরিস্থিতির কারণে প্রকৃতি তখন স্তব্ধ, হঠাৎ টাশ্ টাশ্ গুলির শব্দে আমার চিন্তাসুত্র ছিন্ন হল। আমাদের মিয়াপাড়ার ফাঁকা পরিবেশে দুরাগত শব্দ সহজেই কানে আসে। পরমুহূর্তে অবিশ্রান্ত অটোমেটিক অস্ত্রের গুলিতে সে শব্দ চাপা পড়ে গেল। এটা আমাকে শিহরিত করল, গুলিগুলো আসছে উত্তর-পূব দিক থেকে, ওদিকেই তো সার্কিট হাউজ- ২২ ফ্রন্টিয়ার ফোর্সের হেড কোয়ার্টার।

কয়েকদিন পর সম্ভবত এপ্রিলের দু'তিন তারিখে রূপসার ওপারে টুকুর সাথে দেখা হল। বলল– চার-পাঁচ জন সঙ্গী নিয়ে সে ঐ রাতে আলতাপ গলির মোড়ে ড্রেনের মধ্যে বসে ইউএফডি ক্লাব ও সার্কিট হাউজের আর্মি ক্যাম্প লক্ষ্য করে থ্রিনটথ্রি রাইফেলের গুলি চালিয়েছিল, কয়েকটা বোমাও ছুঁড়েছিল। আর্মিরা পাশের সার্কিট হাউস ক্যাম্প থেকে এ সময় ইউএফডি ক্লাবে রাতের খাবার খেতে জড় হয়। জানতাম

ওদেরকে আঘাত করা যাবে না, সার্কিট হাউজ বেশ দূর, মাঠের পাশে কাঁটা তারের বেড়া, পাশের ক্লাব ঘরটাও দূরে। আমাদেরও এগোনোর উপায় নেই, সামনেই লোয়ার যশোর রোড, ফাঁকা রাস্তা, কোন আড়াল নেই। আলতাফ গলির ড্রেন থেকে উঠে এগোতে গেলে মেশিনগানের গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে যাবো। আবার বিনা প্রতিবাদে ছেড়ে দিতেও মন সায় দেয় নি। আমরা থেকে থেকে রাইফেলের কয়েকটা গুলি ছুঁড়েছি, বোমা মেরেছি এবং দ্রুত পালিয়ে গেছি। তবে এলাকাটা যুদ্ধক্ষেত্র বানিয়েছিল আর্মিরাই। আমাদের সাফল্য এই যে, ওরা বুঝেছিল আমরা আছি।

আমার সশস্ত্রযুদ্ধে যাওয়া হয়নি, তবে জাহিদ গিয়েছিল। সে বাংলাদেশ লিবারেশন ফোর্সের (মুজিব বাহিনী) কমান্ডার হিসাবে নড়াইলে মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্ব দিয়েছিল। খুলনার বিএলএফ-এর নেতত্ব দিয়েছিল শেখ কামরুজ্জামান টুকু।আমার মাথার মধ্যে যুদ্ধের ব্যাপারটা ঘুরপাক খাচ্ছিল। পাকিস্তানি সৈন্যদের বিরুদ্ধে সম্মুখ যুদ্ধে নামা এই মুহূর্তে অলীক কল্পনা। বাংলায় একটা হাস্যকর প্রবাদ আছে – ঢাল নেই, তলোয়ার নেই, নিধিরাম সর্দার! তাহলে অবশ্যই গেরিলা যুদ্ধ। কিন্তু আমাদের এই প্রাকৃতিক পরিবেশে সেটা কতটুকু সম্ভব!

কয়েক দিন পর পথে হঠাৎ মতি ভাইয়ের সাথে দেখা হল। বুঝলাম কিছুটা অবাক হয়েছেন, বললেন একা যে?

আমি তো রাজনীতি ছেড়েছি অনেক আগেই, চাকরিও করি তাতো জানেনেই। ছেলেরা কিছু একটা করার চেষ্টা করছে। যশোর রোড বরাবর কয়েক জায়গায় খন্ডযুদ্ধ হয়েছে। ওরা বেতার কেন্দ্রও আক্রমণ করেছিল। খুবই অসম যুদ্ধ, পারেনি। পিছিয়ে গ্রামাঞ্চলে কোথাও আছে অথবাভারতে চলে গেছে, টুকু সেরকমই বলছিল।

সেটা জানি। এই মুহূর্তে কোন ভবিষ্যৎ হয়তো নেই, তবে লেগে থাকলে সাফল্য আসবেই। এ এক অসাধারণ ঘটনা, আমি নিজেও এতটা ভাবিনি। পাকিস্তানিরাও ভাবেনি নিশ্চয়। তবে এখন বুঝে গেল কাজটা ওদের জন্য মোটেও সহজ হবে না। আসলে ওদের সফল হওয়ার মোটেও সম্ভাবনা নেই। হাজার মাইল দূরে বসে পাকিস্তান কতদূর কি করতে পারে, যেখানে আমেরিকাই ভিয়েৎনামে পেরে উঠছে না।

আচ্ছা ভাই, সম্মুখ যুদ্ধের সামর্থ তো আমাদের নেই, আমাদের জন্য একমাত্র বিকল্প গেরিলা যুদ্ধ। কিন্তু এখানে এই সমতল ভূমিতে গেরিলা যুদ্ধ কি করে সম্ভব? কোনো পাহাড়, পাহাড়ী জঙ্গল, হাইড আউটের মত গুহা-টুহা কিছুই তো নেই।

মৃদু হেসে মতিভাই বললেন– আচ্ছা, এই দুঃশ্চিন্তা নিয়ে আছো! বোঝা যাচ্ছে তোমার মাথার মধ্যে কিউবার সিয়েরা মায়েস্ত্রা পাহাড় আর ভিয়েৎনামের পাহাড়ী জঙ্গল ঢুকে বসে আছে। ওটা মাথা থেকে শ্রেফ ঝেড়ে ফেল। আমাদের ভূ প্রকৃতি অনুসারেই আমাদের গেরিলা যুদ্ধ চালবে। আমাদের আছে অসংখ্য প্রশস্ত খরস্রোতা নদীর সুবিধা, ঝোপ-ঝাড়ে ঢাকা অজস্র খাল নালা, গাছপালা বন-জঙ্গল, বিল জলা আর চরের নিরাপদ আশ্রয়। ধাওয়া খেয়েছ তো ওর মধ্যে ঢুকে পড়ো বা তোমার ছিপনৌকা ঢুকিয়ে দাও, তারপর ধাওয়া কাটানোর জন্য এ্যামবুশ পাতো। ওসবের মধ্যে একবার ঢুকে গেলে খুঁজে পায় কার সাধ্য। লুঙ্গী হাঁটু অবধি খুলে গেরিলা থেকে ক্ষেতের চাষী অথবা মাছ ধরার জেলে বনে যাও। আবার প্রয়োজনে চাষী থেকে গেরিলা।

আমি অনেকটাই স্বস্তি এবং বিশ্বাস নিয়ে চলেএলাম।

২৮ মার্চ হযবরল অবস্থার আবর্তে খুলনা শহর

২৮ মার্চ আমি গেটের সামনে দাঁড়িয়ে ভাবছিলাম বের হব কিনা, এমন সময় মোকাদ্দেম বাড়ির সামনে এসে সজোরে সাইকেলে ব্রেক কষে দাঁড়াল, বলল– চলেন ভাই ঘুরে আসি। এখন ভিতরে যেয়ে মায়াম সাইকেলটা আনতে যাওয়া মানে মার সাথে একটা বড়সড় ঝামেলায় জড়িয়ে পড়া। আমি মোকাদ্দেমের সাইকেলে চেপে বসলাম। আসলে এ সময় মার দুঃশ্চিন্তার অন্ত ছিল না। শুধু নিজের পাঁচ মেয়ে নয়, আরো দু চারজন আত্মীয়ের মেয়ে বৌ আমাদের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিল। দুর্ভাগ্যক্রমেআশপাশের আত্মীয় এবং প্রতিবেশীরা কমবেশি পাকিস্তানপন্থী ছিলেন।কেউ কেউএমনও বলতেন– সবারই এখন ইয়ানাফছি অবস্থা, আর তোমরা তো বাড়িতে সরাইখানা খুলে বসেছ, ঝামেলা বাঁধতে কতক্ষণ? মা শুনে বিস্মিত হতেন, এবং সব সময় চেষ্টা করতেন যাতে বাড়িটা কোনভাবেকারো দৃষ্টি আকর্ষণনা করে।

আমাদের বাড়িটা ছিল শহরের দক্ষিণ উপকণ্ঠে বিলের ধারে। ফেরিঘাট রোড থেকে মিয়াপাড়া রোড ধরে দক্ষিণে ছ-সাত মিনিটের হাঁটা পথ। রাস্তার কিছু অংশে খোয়া বিছানো, বেশিরভাগ মাটির। বিরল বসতি। সর্বত্র খানাখন্দ এবং ঝোপঝাড়ের আধিক্য। আর্মিরা প্রথম দিকে এসব এলাকায় কমই আসত। ফলে নিরাপদ বিবেচনা করে শহরের আত্মীয়রা কেউ কেউ এসে আমাদের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিলেন। বাড়িতে লোক সমাগম বেশি হওয়ায় স্বাভাবিকভাবে কিছুটা হৈচৈ লেগেই থাকতো।

মোকাদ্দেমকে বললাম চল সুশান্তদের বাড়িতে যাই। সে বলল– বাপরে! ওটা তো রাজনৈতিক পাড়া, আর্মিরা নিশ্চয়ই নজর রেখেছে। ঠিকই আহসান আহমেদ রোডের শেষ মাথায় পিডিপি প্রধান জলিল সাহেবের বাড়ি, সুশান্তদের বাড়ির সামনে জাহিদের বর্ণালী প্রেস ও অনন্ত বাবুরসুইটহাউজ ছাত্রলীগের আখড়া, মোড় ঘুরে বামে আওয়ামী লীগ অফিস, ডানে আওয়ামী লীগের এমপিএ মোমিনভাইয়ের বাড়ি– রাজনৈতিক পাড়াই বটে। মোকাদ্দেম বলল, ঠিকআছে, চলেন পিছন দিক দিয়ে যাই। আমরা মির্যাপুর দিয়ে ঢুকে ছোট মির্যাপুরের শেষ মাথায় সুশান্তদের বাড়ির পেছনে চলে এলাম। কাকিমা তাড়াতাড়ি দরজা খুলে দিলেন। সুশান্ত বাড়ি ছিলনা। ওর বোন ব্যাকুল হয়ে জিজ্ঞাসা করল– দাদা কি হবে বলেন তো, আমরা কি এখানে থাকতে পারব? কাকিমা বললেন– তুমি তো অনেক কিছু বোঝো বাবা, সবাই বলাবলি করে হিন্দুদের নাকি এদেশে রাখবে না, কচু কাটা করে ছাড়বে, এটা কি সত্যি?

বললাম– কাকিমা এমন কথা তো আমিও শুনি, বিশ্বাস করা কঠিন। দেড় কোটি মানুষ মারা বা তাড়ানো কি এতই সহজ! মনে হয় কেউ গুজব ছড়িয়ে আতঙ্ক সৃষ্টির চেষ্টা করছে। তবে আপনাদের বাড়িটা শহরের একেবারে কেন্দ্রে, আশেপাশে ছাত্রলীগ আওয়ামী লীগ অফিস। আর্মিরা প্রায়ই ঘোরাঘুরি করে। গতকাল এখানে আসতে যেয়ে ওদের গাড়ি দেখে ফিরে গেছি। ওদের পেছন পেছন বিহারী গুন্ডাপান্ডারা আসে, লুটপাটও করে বলে শুনি। সবচেয়ে ভাল হয় আপনারা যদি গ্রামে বা নদীর ওপারে কোন আত্মীয় স্বজনের বাড়িতে কয়েক দিন থেকে আসেন, অবস্থা কিছুটা শান্ত হলে আবার ফিরে আসবেন।

ফিরে আসতে কি পারব? আর বাড়িতে এসে কিছুই কি পাবো? আচ্ছা, তোমার কি মনে হয় যুদ্ধ কি সত্যিই হবে? বাঙালিরা কি পারবে? জানালার ফাঁক দিয়ে মাঝে মাঝে আর্মিদের তো দেখি, কি বিশাল বিশাল শরীর, আর কত রকমের অস্ত্র!

কাকিমা, যুদ্ধ তো শুরু হয়ে গেছে। যশোর রোডে ব্যারিকেড এবং প্রতিরোধের কারণে গতকাল পর্যন্তও নতুন করে কোন আর্মি শহরে ঢুকতে পারেনি। শুনেছি নেতারা অনেকে ভারতে গেছে অস্ত্র সংগ্রহের জন্য। তাছাড়া পৃথিবীর অনেক দেশ গোপনে অস্ত্র বিক্রী করে। ভয় পাওয়ার কিছু নেই। কথাটা বলে হঠাৎ থমকে গেলাম, আমি কিভাবে এমন গ্যারান্টি দিতে পারি। বিশেষকরে আমাদের মত জনবহুল সমভূমির দেশে গেরিলা যুদ্ধে সাধারণ মানুষের পক্ষে ক্ষয়ক্ষতি এড়িয়ে থাকা খুবই কঠিন হবে। তারপর ২৫ মার্চ রাতে আর্মিরা ঢাকায় যা ঘটিয়েছে তা যে গোটা দেশে ঘটাবে না এমন নিশ্চয়তা কোথায়। টিক্কা খান তো ঘোষণা দিয়েই রেখেছে যেখানেই বাধা আসবে তার একশ গজের মধ্যে সব কিছু গুড়িয়ে দেয়া হবে। বললাম– কাকিমা, আসলে নিশ্চিত করে কিছুই বলা যায়না, কেউ কিছু বলতে পারেনা। আমরা তাদেরকে হতাশার সমুদ্রে ভাসিয়ে বেরিয়ে এলাম।

মোকাদ্দেমকে বললাম– এখান থেকে ফারাজীপাড়া বেশ কাছে, রাস্তাটাও সোজা এবং ভিতর দিয়ে। তোমার অসুবিধা না থাকলে চল ঘুরে আসি। ওখানে খালেদ রশীদ স্যারের কাছে আমার একটা বই আছে, গতকাল তাকে বাসায় পাইনি, আজ পাই কিনা দেখি। আমরা বি কে স্কুলের সামনে দিয়ে সোজা ফারাজীপাড়ায় ঢুকে পড়লাম। হতাশ হতে হল, গুরুর ঘরের দরজায় তালাটা একইভাবে ঝুলছে।

ফারাজীপাড়ায় যাওয়ার পথে ধর্মসভা রোড এবং সিমেট্রি রোডে বেশ কিছু লোকজনেরমাথায় ভারি ভারি বস্তা ও তেলের টিন দেখে বিস্মিত হয়েছিলাম। তারা সবাই বাঙালি- দরিদ্র ও শ্রমজীবী শ্রেণীর মানুষ, মাথায় কাঁধে ভারী ভারী মাল নিয়ে দক্ষিণমুখো ছুটছে। এগুলো যে লুটের মাল তা কাউকে বলে দেয়া লাগেনা। মনটা খুবই খারাপ হয়ে গেল। মোকাদ্দেমও কম বিস্মিত হয়নি, ক্রোধের সাথে বলল এরা আসলে কারা!

আমরা কিছুটা অন্যমনস্কভাবে ফারাজিপাড়া থেকে বেরিয়েএলাম। ফেরিঘাট রোডে পড়তেই মোকাদ্দেম বলল– ভাই, দেখেন কি অবাক কান্ড! কয়েকজন বাঙালি হাতে লাঠি সোটা নিয়ে শ্রীশনগর গেট থেকে বেরিয়ে দুজন কাবলিকে ধাওয়া দিছচ্ছ। এ সময় এ দৃশ্য এতটাই অস্বাভাবিক যে অন্যান্য পথচারীরাওভয় ভুলে আমাদের মতই হতবাক হয়ে তাকিয়ে থাকল। আমরা কিছুটা এগিয়ে রামচন্দ্র দাশ লেনের মুখে দাঁড়ালাম। আমাদের খুব কাছেই নিমেষে ঘটনাটা ঘটে গেল। লম্বা ছিপ ছিপে কাবলিটা তীর বেগে ছুটে ধাওয়াকারীদের নাগালের বাইরে চলে যেতে সমর্থ হল। কিন্তু ভারী বয়সের কাবলিটা ওদের ঘেরাওয়ের মধ্যে পড়ে গেল। আমরা কয়েকবার লাঠির ওঠানামাই কেবল দেখতে পেলাম।লোকগুলো যেমন দ্রুত এসেছিল তেমনই দ্রুত আমাদের সামনে দিয়ে শ্রীশ নগর গেটের ভেতর অদৃশ্য হয়ে গেল। কাবলিটা তলপেটের উপর দু হাত চেপে ধরে কেবল পানি পানি বলে কাতরাচ্ছিল। সেখানে চাপ চাপ রক্ত। একজন বলল– দেখলেন, দেখলেন জানোয়ারগুলোর কাণ্ড, কাবলিটার পুরুষাঙ্গ কেটে দিয়ে গেছে। আমরা ফেরিঘাটের দিক থেকে কয়েকজন বিহারীকে দ্রুত এগিয়ে আসতে দেখে সিমেট্রি রোড হয়ে শান্তিধামের দিকে চলে গেলাম।

কাবলিরা ছিল আসলে পেশোয়ারের লোক। চড়া সুদে টাকা খাটাতো। আসলি ফেরত পাওয়ার জন্য তারা কখনো তাগাদা দিত না, তবে নির্দিষ্ট দিনে সুদ পরিশোধের জন্য খাতকের জীবনটাকে নরক বানিয়ে ছাড়তো। ফলে আসলের তিন-চার গুণ টাকা শোধ দেয়ার পরও আসল কখনো শোধ হতনা এবং সুদের উৎপাদন চলতেই থাকত। কাবলিরা আসছে এামন সংবাদে অনক খাতক পালিয়ে বাঁচতো ঠিকই, কিন্তু ঝামেলায় পড়তো বাড়ির বৌ-ঝিরা। তাদেরকে অশ্রাব্য-অশ্লীল কথা শুনতে হতো। এমনও শোনা গেছে দেনা শোধ না করে কেউ মারা গেলে কাবলিরা তার কবরের উপর বেত্রাঘাত করেছে। বলা বাহুল্য তারা সবসময় বেতের ছড়ি নিয়ে ঘুরতো। এদের আর একটা ঘৃণ্য আচরণ ছিল

সমলিঙ্গে জৈবিক তড়না মেটানো। এরা কখনোই পরিবার নিয়ে এদেশে আসত না এবং বছরের পর বছর দেশেও যেতনা। তারা অনেকেই আখরোট কিসমিস দিয়ে স্বাস্থবান কিশোরদের প্রলুব্ধ করত।

বেশ কিছুদিন আগে এক হকার সুইটহাউজে এসে আমাদের কাছে দুই কাবলীর বিরুদ্ধে তার ছেলেকে অপহরণের ব্যাপারে অভিযোগ জানাল। সে ঐ কাবলির খাতক ছিল এবং তার তিন-চার কিস্তি সুদ বাকি পড়েছিল। থানায় যাচ্ছেন না কেন– এমন প্রশ্নের জবাবে সে স্বীকার করল তার ছেলে আখরোট বাদামের লোভে পড়ে খানিকটা বখেও গিয়েছে।

তিন-চার জন ছাত্র পিকচার প্যালেসের মোড়ে গোলচত্বরে যেয়ে হাজির হল। কাবলিরা এখানে বসে বসে খৈনি টিপতো এবং গল্পগুজব করত। এটা ছিল শহরের ব্যস্ত এলাকা, নানা কাজে লোকজনকে এই এলাকা দিয়ে যাতায়াত করতে হত। খাতকের সন্ধানে কাবলিরা সুযোগটা কাজে লাগাতো। ছেলেটার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হলে এক কাবলী নিরুদ্বেগে জবাব দিল– চিন্তা মৎ করো ভেইয়া, উও লন্ডা হামারা সাথ হ্যায়, খোশ দিল মে হ্যায়। শাহজামাল ছিল মেজাজী, তালপাতার সেপাই, তবে তার হাতের পাঞ্জা খুবই সুগঠিত ছিল,বলল– ওকে এনে দে এক্ষুনি।

কাবলিওয়ালা হকারের দিকে ফিরে বলল– তু পহেলে হামারা সুদ দে দে।

শাহজামাল তার শক্ত পাঞ্জা কাবলির মুখের সামনে উচিয়ে বলল- এখুনি ফেরত নিয়ে আয় হারামজাদা শুয়োর, নইলে এক থাপ্পড়ে তোর লন্ডাবাজী ছুটিয়ে দেব।

বেশ আগে থেকেই কাবলিদের উপর হামলা শুরু হয়েছিল। তারা বেপরোয়া ছিল এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনকে প্রকাশ্যেই কটাক্ষ করত। তারা পাকিস্তানের পক্ষে অবস্থান নিয়েছিল, কেননা তাদের হাজার হাজারটাকা এখানে লগ্নি করা ছিল এবং তারা জানত বাংলাদেশ স্বাধীন হলে এর একটি পয়সাও তারা উদ্ধার করতে পারবে না। স্বভাবতই তারা পাকিস্তানের পক্ষ অবলম্বন করেছিল। তবে তারা আক্রমণের লক্ষ্য হয় মূলত তাদের খাতকদের দ্বারাই।

আর্মি ক্রাক ডাউনের পর খুলনা তখনো মোটামুটি বাঙালিদের দখলে, তবে আর্মি কনভয় এবং বিহারী দাঙ্গাকারীদের দেখলে তারা দ্রুত উধাও হয়ে যায়। সাধারণ মানুষ সহসা সংঘাতে জড়াতে চায়না। তবে এ সময় শেরে বাংলা রোডে কাবলিদের ডেরা আক্রান্ত হয়েছিল, যদিও কাবলিরা রাজনীতির ধারে কাছেও ছিলনা। ব্যাপারটা ছিল সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক। ওদের খাতকরাই কাঁধের উপর থেকে দুঃসহ ঋণ ও সুদের বোঝা সরাতেই এসব ঘটিয়ে ছিল। এই ঘটনার পর আর্মিরা কাবলিদের উদ্ধার করে সার্কিটহাউজ আর্মি ক্যাম্পের সামনে মডেল স্কুলে নিয়ে জড় করে। তাদের বাইরে যাওয়া নিষিদ্ধ ছিল, তথাপি সুদে খাটানো টাকার মায়ায় দুই কাবলি কিভাবে যেন ক্যাম্প ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছিল। তারা একপাল নেকড়ের মুখে পড়ে যায়। আর্মিরা অবশ্য প্রথম সুযোগেই কাবলিদের সমুদ্রপথে পশ্চিম পাকিস্তানে পাঠিয়ে দেয়। এই কাবলিরা তাদের লগ্নিকৃত টাকার বড় অংশ হারিয়ে ছিল বটে, কিন্তু তা পুষিয়ে যায় লুটের অপরিমেয় সামগ্রীতে।

আমরা শান্তিধামের মোড়ে পৌঁছে দেখি সেখানেতখনও বেশ বড়সড় জটলা। মোড়ের ফুটপাথে দাঁড়িয়ে লোকজন লুটের তামাশা দেখছে। অবশ্য এখানে লুটের কোন ব্যাপার নেই, লুটের মাল নিয়ে যারা ছুটছে সেদিকেই সবার দৃষ্টি। অনেকে নিরাসক্ত দৃষ্টিতে ওদের দেখছে আবার অনেকেই ছিল গম্ভীর, তারা ব্যথিতভাবে সম্ভবত যে প্রশ্নের জবাব জানা নেই তার জবাব খুঁজছিল– কি ঘট্‌ছে, কি হবে?

গোটা পথে লুটেরারা মাথায় কাঁধে ভারি ভারি মাল নিয়ে দক্ষিণ মুখে ছুটছিল। সেই বাজার-কালিবাড়ি থেকে ছুটে আসছে। এখন অবস্থা এমন যে, সামান্য ধাক্কা খেলেই তারা ছিটকে পড়বে। একজন লোক তার মাথার উপর থেকে ধপাস করে ভারি বস্তাটা ফুটপাতের উপর ফেলল। বস্তার উপর বসে ঘন ঘন শ্বাস নিতে থাকল এবং মাথার উপর আঁটলা বাঁধা গামছা খুলেঘর্মাক্ত ঘাড় মুখ মুছল। পাশ থেকে এক বৃদ্ধ ফোড়ন কাটলেন– দম ফুরাইলো তো সব শ্যাষ মিয়া, তুমি তো কবরে যাইবা, কিন্তু কও দেহি বোঝাখান থুইবা কই!

লোকটা বিড়ি ধরাতে যাচ্ছিল। সেটা কানে গুজে এর ওর কাছে বোঝাটা তার কাঁধে তুলে দেয়ার জন্য অনুনয় বিনয় করতে থাকল, কিন্তু কাউকে গরজ করতে দেখা গেল না। একজন খিচিয়ে উঠল– এত ভারি ভারি বস্তা টিন জোগাড় করতে পারছ, একটা ঠেলা জোগাড় করতে পারো নাই?

লোকটা আক্ষেপের সাথে বলল– সাহেব, ঠেলাগুলান তো বিহারীরা লইছে, মেলামাল লইয়াস্টিশান রোডে ঢুকছে। অগো লগে কেডা পারবো কন!

বল কি! তোমরাতো তাহলে বিহারীদের সাথেমিলেমিশেলুট-পাট করছ! ওরা তোমাদের কিছু বলে নাই?

না সাহেব, ওরাই তো যন্ত্রপাতি দিয়া গদিঘরের দরোজা-সাটার ভাঙছে। এক দুই বস্তা আমাগো মাথায় উঠায়া দিছে। আর ব্যাবাক মাল তারা লইছে ঠেলায়।

কয়টা দোকান ভাঙছ?

কেমনে কই সাহেব, সব দোকান তো ভাঙ্গে নাই। দু-তিনজন লোক আছিল, তারা যেগুলান দেখায়ে দিছে, সেগুলান ভাঙছে। এতক্ষণে লোকটা বিড়ির বিনিময়ে দু জন স্ট্রিটবয়কে দিয়ে বস্তাটা মাথায় তুলে গন্তব্যের উদ্দেশ্যে রওনা দিল।

একজন শক্ত সমর্থ লোককে দেখা গেল তেল ভর্তি টিনটে কানেস্তারা টিন মাথায় নিয়ে টলোমলে পায়ে এগিয়ে আসছে। শক্ত সমর্থ বলে সে এই অসম্ভব ভারি বোঝা নিয়ে কালিবাড়ি থেকে এতটা পথ হেঁটে আসতে পেরেছে। কিন্তু এখন তার অবস্থা শোচনীয়। মাত্রা ছাড়া লোভ তাকে সমস্যায় ফেলেছে। সে আমাদের অতিক্রম করে কয়েক পা মাত্র এগিয়ে যেতে সমর্থ হল। তারপর বারকয়েক এদিক ওদিক টলতে টলতে ধড়াম করে মাথার টিনগুলো পথের উপর ফেলে দিল। টিন ফেটে খেতোয়াত ওয়েল মিলের খাঁটি সরিষার তেল পীচ ঢালা পথের উপর ধীরগতিতে ছড়িয়ে পড়তে থাকল। লোকটা ক্ষণিক দাঁড়িয়ে অসহায় ভাবে দৃশ্যটা অবলোকন করল, তারপর বিড় বিড় করে কিছু একটা বলতে বলতে অবশিষ্ট একমাত্র আস্ত টিনের আংটা ধরে উচু করার চেষ্টা করল। কিন্তু টিনটা এবার তার কাছে অসম্ভব ভারবোধহওয়ায় সেটা ফেলে ঘাড় টানটান করে এদিক ওদিক ঘুরিয়ে কোন দিকে দৃকপাত না করে সে স্খলিত পায়ে বাড়ির পথ ধরল। মোকাদ্দেম বলল– সে লোকটাকে চেনে, টুটপাড়ার দক্ষিণ মাথায় কোথাও থাকে, যোগালের কাজ করে। টাউট বা লুটেরা বলে তো কখনো মনে হয়নি।

আমরা ফিরছিলাম, মির্জাপুর মোড়ে পৌঁছে দেখলামতখনো বেশ কিছু লোক ইউসুফ রো দিয়ে জোর পায়ে উত্তর দিকে ছুটছে, অধিকাংশই বস্তিবাসী, শ্রমজীবী মনুষ। অসামাজিক লোকজনও কম নেই। এ ধরনের লোকের চেহারাই তাদের পরিচয় বলে দেয়।সম্ভবত তারাইএদের উৎসাহ দিয়ে নিয়ে এসেছে এবং গাইড করছে।

মোকাদ্দেম ওদের পাশে চলতে চলতে জিজ্ঞাসা করল কোথায় যাচ্ছেন আপনারা?

কালি বাড়ি। এনারা কচ্ছেন ওখানে চাল ডাল আটা রিলিফ দেচ্ছে। কাজ কাম তো নাই, ঘরে সবই বাড়ন্ত।

যান, গুলি খাওয়ার যখন এতই শখ। ওখাতো লুটপাট হচ্ছে। যে কোন মুহূর্তে আর্মি যেতে পারে, গুলিও করতে পারে।

কি কন? এনারা তো কয় আর্মির লোকেরাই নাকি বিলি বন্টন দেখাশুনা করতিছেন।

মোকাদ্দেম দ্রুত প্যাডেল দাবায়। আমাকে বাড়িতে নামিয়ে দিয়ে উল্টো পথ ধরে। বুঝতে পারি কোথায় যায়, ভেবে আশ্বস্ত হই যে সে ভাল উর্দু জানে, তাকে দেখায়ও অনেকটা বিহারীদের মত। কালিবাড়ি ও ভৈরব স্ট্যান্ড রোডে বরাবর দু পাশে সারি সারি আড়ত ঘর। বেশির ভাগ মাড়োয়ারি এবং বোম্বেওয়ালাদের। বাঙালিদের ছোট ছোট দু'চারটে আড়তও আছে। বস্তাভর্তী চাল, গম, আটা, ডাল, কানেস্তারা টিন ভর্তি সরিষার তেল, নারকেল তেল– সব কিছুই পাইকারী বিক্রয় হয় এসব আড়ত থেকে। ঘর ভর্তি মালামাল। সামনে কঠিন দিন দেখে বেশি মুনাফার আশায় মালামাল হোডিং করে রেখেছিল নিশ্চয় আড়তদাররা। দেখতে দেখতে লুট হয়ে গেল।

মোকাদ্দেম ঘন্টাখানেক পর ফিরে এলো। যা বলল তা হতবাক হওয়ার মত। মাড়োয়ারি এবং বাঙালি হিন্দুদের দোকানগুলো বেছে বেছে লুট হচ্ছে। কয়েকজন লোক উদ্দিষ্ট দোকানগুলো দেখিয়ে দিচ্ছে। শাবল, কুড়াল, রড, কাটার নিয়ে সেগুলোর উপর হামলে পড়ছে লুটেরারা। তারপর ঠেলাগাড়ি এবং মাথায় মাথায়লোপাট হয়ে যাচ্ছে সব মালামাল। মোকাদ্দেম বলল সে এক বিহারী পুলিশের সামনে পড়ে গিয়েছিল, হাতের ইশারায় তাকে থামতে বলে পথের উপর একগাদা পিক ফেলে পুলিশটা খিঁচিয়ে উঠল– আপ কিউ ইধার আয়া? আপকা কেয়া কাম। যাইয়ে,আপচালা যাইয়ে। মোকাদ্দেম সাইকেলে প্যাডেল মারতে মারতে বলল–কিয়া করেগা ভেইয়া, হামারা ভি বিবি বাল-বাচ্চা হ্যায়, উসকো ভি ভুখ লাগতা হ্যায়।

মোকাদ্দেম বিস্মিত হল পুলিশের নাকের ডগায় লুট হচ্ছে, লুটের দৃশ্য ক্যামেরা বন্দীও হচ্ছে, অথচ পুলিশ নির্বিকার, উল্টে তাকে চলে যেতে নির্দেশ দিল। নিশ্চয় এর ভেতর কোন কারসাজি আছে। সে দ্রুত মাথা নিচু করে ফিরে এলো। তারভয়, পাছে লুটেরা হিসাবে ক্যামেরাবন্দী হয়েযায়।কারসাজিটা বুঝতে তাকে অবশ্য তাকে বেশি সময় অপেক্ষা করতে হয়নি। পাকিস্তান ত্বারস্বরে চিৎকার জুড়েদিল আওয়ামী গুন্ডা আর লুটেরারাকিভাবে বিহারি আর বোম্বেওয়াদের দোকানগুলো দেখে দেখে লুট করে নিয়ে যাচ্ছে! পরদিন পাড়ায় জোর গুজব ছড়িয়ে পড়ল গতকাল জয় বাংলার লোকেরা দেখে দেখে বোম্বেওয়ালা আর বিহারীদের আড়তগুলো সব লুট করেছে, ভাংচুর করেছে। বিহারীরা আজ রাতে তার প্রতিশোধ নেবে এবংলুট হওয়া মালের সন্ধানে ঘরে ঘরে আর্মি রেইডও হতে পারে। ভয়ে কুঁকড়ে যাওয়া ইদুঁরগুলো গা ঝাড়া দিয়ে গর্ত থেক বের হয়ে আসা শুরু করেছিল। তারাইগুজবটা ভালমত ছড়িয়ে দিয়ে একটা আতংকজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি করল। অপরাহ্নে মিঃ হাইড

ভোল পাল্টে ডঃ জেকিলের সুরতে বেরিয়ে এলেন–জরুরী এলান, জরুরী এলান– কাউকে দোকান ভাংচুর বা লুটপাট করতে দেখা গেলে তাকে স্পটে গুলি করা হবে।লালনের গানের কলি মনে পড়ল– তুমি সর্প হইয়া দংশন কর, ওঝা হইয়া ঝাড়ো। সত্যি চমৎকার!

শহীদ মুক্তিযোদ্ধা রাশেদ আলম

রাশেদ আলম চাকরি করতেন নিউজপ্রিন্ট মিলে। আমার তাকে চেনার সুযোগ ছিলনা। তার কথা প্রথম শুনি ২৭ মার্চ। দুদিন হল অস্বাভাবিক পরিস্থিতির কারণে আমাদের অফিসে যাওয়া বন্ধ। কিন্তু খালিশপুর ছেড়ে লোকজনের শহরে আসার বিরাম নেই। নুর মামা পিপলস জুট মিলে চাকরি করতেন, মিলের মেসে থাকতেন। সেখান থেকে ভৈরব-আতাই-ভৈরব পার হয়ে মাইলের পর মাইল হেঁটে চরেরহাট দিয়ে পুরানো যশোর রোডে উঠেছেন এবং ভাঙ্গা ভাঙ্গা রিকশায় বিদ্ধস্তপ্রায় অবস্থায় সন্ধ্যা নাগাদ আমাদের বাড়ি পৌছিয়েছেন। এয়ারব্যাগটা রেখে মার সামনে দাঁড়িয়ে শিশুর মত হাউমাউ করে কাঁদতে কাঁদতে বললেন– বু, বিহারিদের ছুরির মুখ থেকে বড় বাঁচা বেঁচে এসেছি!

আমাদের বড় দোলাভাই চাকরি করতেন গোয়ালপাড়া পাওয়ার স্টেশনে, সেজ ভগ্নিপতি প্লাটিনাম জুট মিলে এবং মেজমামা ও নুর মামা পিপলস জুট মিলে। সব কটি মিল খালিশপুরে। দুই বোনও ছেলে-মেয়েদের নিয়েস কে নিয়ে মা'র তখন দুঃশ্চিন্তার অন্ত ছিল না। তারা খালিশপুরে মিলের কোয়ার্টারে থাকতেন, তখনো পর্যন্ত তাদের কোন খবর ছিল না। এই প্রথমে দেখা মিলল নুর মামার। সত্তরের নির্বাচনে নুর মামা যেভাবে প্রকাশ্যে নৌকার পক্ষে কাজ করতেন তাতে দুঃশ্চিন্তা অস্বাভাবিক ছিল না। কোথাও কয়েকজন লোকের জমায়েত দেখলেই মামা দঁড়িয়ে যেতেন, অল্পক্ষণের মধ্যেই দেখা যেত মামা বক্তা, অন্যেরা উৎসাহী শ্রোতা। এমন নয় যে তিনি কোন প্রার্থীর দ্বারা নিয়জিত ছিলেন। তার বাড়ি সাতক্ষীরার নেবাখালি, খুলনার প্রার্থীদের তিনি চিনতেনও না। যা করতেন সবই প্রাণের তাগিদে। প্রায় রোববারে আমাদের বাড়িতে এসে উৎসাহের সাথে তার প্রচারের অগ্রগতি বর্ণণা করতেন। মা উষ্মা প্রকাশ করে বলতেন– নুরো, চাকরি তো করিস পাকিস্তানিদের মিলে, অসুবিধা হবে নাতো রে! নুর মামা তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিতেন, বলতেন– বু চিন্তা কোর না তো, এবার গনেশ উল্টে যাবে, ওরাই আমাদের তোয়াজ করে কুল পাবে না।

নুর মামা ভর সন্ধ্যায় গভীর এক ঘুম দিয়ে উঠলেন, বললেন– মনোয়ার, তুমি তো আর মিলে যাও নি, ভালই করেছ, যা অবস্থা খালিশপুরে! বাঙালিদের মেরে কেটে সব সাফ করে দিচ্ছে। ২৫ মার্চ রাত মিলের মেসেই ছিলাম। সঠিক জানতাম না কি হচ্ছে। ভয় ছিল আবার ভরসাও ছিল, আমাদের মিল ও বিহারী টাউনের মঝে ক্রিসেন্ট, প্লাটিনাম ও দৌলতপুর জুট মিল, সেখানে বাঙালিদের প্রভাব। বিহারীরা সহজে এদিকে আসবে না। কিন্তু ওদের পেছনে যে আর্মি আছে এটা আমাদের মাথায় ঢোকেনি। নানা গুজব এবং দূরে হৈ হল্লার মধ্যে ২৬ তালিখ কাটল। নিউজপ্রিন্ট মিল বিহারী কলোনির একেবারে লাগোয়া, সংবাদ এলো সেখানে বাঙালিদের মেরে সাফ করে দিয়েছে। ক্রিসেন্টের বাঙালিরা তার প্রতিশোধ নিয়েছে। ২৭ তারিখ অবস্থা আরো থমথমে হয়ে দাঁড়ালো।

কি জানি কি হয়, বাড়ি যাব ভেবে ব্যাগ গুছিয়ে নিলাম। আমি মিলের ডিসপেনসারিতে কাজ করি, মেডিসিন স্টোরের চার্জে। বাড়ির পরিবর্তে কাজে যেতে হল, অনেক আহত লোক নাকি ডিসপেনসারিতে এসে কাতরাচ্ছে। ব্যাগ নিয়েই বেরিয়েছি। কিছুক্ষণ পর ড্রামের শব্দ, প্রচণ্ড হৈচৈ এবং বিক্ষিপ্ত গুলির শব্দ ভেসে এলো। আমি ওষুধ ইশূ করা নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম, হঠাৎ সোরগোল উঠল, বিহারীরা নাকি সবখানে ছড়িয়ে পড়েছে। এদিকেও আসছে। দুঃসংবাদ আরো ছিল, পিপলসের বিহারীরাও নাকি তলে তলে আক্রমণের প্রস্তুতি নিয়ে ফেলেছে, যে কোন মুহূর্তে হামলা করতে পারে। কোথায় চিকিৎসা! যে যেভাবে পারল ছুটে পালাল। সবাই ছুটছে ভৈরবের দিকে, মিলের খেয়া নৌকায় উঠে আমরা সেনহাটির ঘাটে এসে নামলাম। এপারে মিলের অনেক শ্রমিক কর্মচারি আছে, সবাই সাহায্য করতে উন্মুখ। এক বাড়িতে আশ্রয় পেলাম। সব জাগায় একই আলোচনা– কি হতে যাচ্ছে, ঢাকার অবস্থাই বা কি? সর্বত্র ক্ষোভ, বাঙালিরা শুধু গলাবাজিই করতে পারে, এত লম্বা লম্বা কথা, ট্রেনিং সব গেল কোথায়? এখনো রুখে দাঁড়াচ্ছে না কেন?

দুপুরের দিকে কিছুটা আশার বাণী শোনা গেল, ওপারে নাকি পাল্টা মার শুরু হয়েছে। নিউজপ্রিন্টের পরিস্থিতিও নাকি ঘুরে গেছে। সেখানে কে এক বাপের ব্যাটা আলম সাহেব নিজের রাইফেল নিয়ে বাঙালি সহকর্মীদের সঙ্গবদ্ধ করে যুদ্ধ করছে, তবে আর্মি এলে কি অবস্থা হবে তা নিয়ে সবাই শংকাগ্রস্ত। কিছু দলছুট পুলিশ ইপিআরও সেনহাটিতে এসেছে। লোকজন তাদের জন্য ডাল রুটি ডাব নিয়ে আসছে। তবে ওপারের অবস্থা যাই হোক না কেন, লোকজনের এপারে আসার কোন বিরাম ছিলনা। চাপ ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। পরিস্থিতি কি হয় কে জানে, আমরা ক'জন একসাথে খুলনার দিকে রওনা দিলাম। দীর্ঘ পথ অথচ হাঁটা ছাড়া গত্যান্তর নেই। সেনহাটি থেকে চন্দনীমহল, সেখান থেকেআতাই নদী পার হয়ে শ্রীফলতলা, আবার বেশ কিছুটা হেঁটে ভৈরব পার হয়ে চরেরহাট। ভেতরের আঁকাবাঁকা পথ ঘুরে পুরানো যশোর রোডে উঠে দেখি কোন যানবাহন নেই, এদিকে পা চলে না। দু একটা রিকশা যা চলছে তাও যাত্রী ও মালপত্রে ঠাসা। উন্মত্তের মত একটা খালি রিকশা ছুটছিল, ঝুঁকি নিয়ে দুহাত মেলে সামনে দাঁড়িয়ে পড়লাম– আমি খুলনায় যাব ভাই, ভাড়া নিয়ে ভেব না।

সে সজোরে ব্রেক কষতে কষতে বলল– আমি খুলনায় যাবো না স্যার। জোড়াগেট বস্তিতে আমার পরিবার আর বাচ্চাকাচ্চারা আছে, তাদের নিয়ে এখুনি রূপসা ছুটতে হবে।

যে পর্যন্ত যাও, দেহাই আল্লার আমাকে নিয়ে চলো, নইলে বিহারীদের হাতে মারা পড়ব।

ওঠেন জলদি। একটা অয়েলট্যাংকার গোয়ালপাড়া পাওয়ার হাউজে তেল খালাস করে এখুনি রওনা দিচ্ছে। চিটাগাং যাবে। তারা ওদিককার সব লোককে উঠিয়ে নিয়েছে। এখন মিল কারখানা চলেনা, বদলী কাজও বন্ধ। বাধ্য হয়ে রিকশা চালাই। মিলে থাকলে ঠিকই সময়মত খবর পেতাম, রাস্তায় কে খবর দেবে? এখন ঘরে ফিরে পরিবার নিয়ে রূপসা থেকে ট্যাংকারটা ধরতে হবে স্যার। নইলে এই বিদেশ-বিভূইয়ে একা মহাবিপদে পড়ে যাব। সে জোড়াগেটের কাছে আমাকে নামিয়ে দিয়ে দ্রুত রুজভেল্ট জেটির পথ ধরল। তাড়াহুড়ার মাথায় নেমে পড়ে মনে হল খুবই ভুল করেছি। উত্তর দিক থেকে তখনো গুলির শব্দ আসছে, আর আমাকে যেতে হবে দক্ষিনে বিহারী অধ্যুষিত ফেরিঘাটের মোড় দিয়ে। সেখানে মৃত্যু মুখ ব্যাদান করে বসে আছে। পা চলতে চায়না, তবুও রুজভেল্ট জেটির পথ ধরলাম। ঘুর পথ হলেও নদীর পাড় ধরে শহরের দিকে যাওয়াই এখন সবচেয়ে নিরাপদ।

আমি নিউজপ্রিন্ট মিলের শহীদ আলম সাহেবের কথা শুনি আরো কিছুদিন পর। তখন আমি মিলে জয়েন করেছি। মাঝেমাঝে প্রসঙ্গ উঠলে কেউ ফিস ফিস করে দু'একটা কথা বলে। আলম সাহেব নিউজপ্রিন্ট মিলের কর্মকর্তা ছিলেন। শ্রমিকরা যখন নিউজপ্রিন্টের কাঁচা মাল গেওয়া কাঠ কাটতে সুন্দরবনে যেত, বনের বাঘ সাপ বুনো শূকর কুমিরের উৎপাত থেকে তাদের নিরাপত্তার বিষয়টা তাকে দেখতে হত। তার কাজ ছিল গভীরজঙ্গলে। অ্যাডভেন্চার প্রিয় মানুষ, শিকারের নেশা প্রচন্ড। নিশানাও অব্যর্থ। বাঘ সাপ কুমির হরিণ প্রভৃতি শিকার করেছেন। তখন এসব শিকারে বিধি নিষেধ ছিল না। তার নিজের ব্যক্তিগত রাইফেলও ছিল।

২৬ মার্চ সকালে বিহারীরা মিলের মধ্যে ঢুকে বাঙালিদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। তারা সম্ভবত তাদের এলাকার আশপাশ বাঙালি শূন্য করতে চেয়েছিল। এদেরঝটিকা আক্রমণে বহু নিরীহ বাঙালি নিহত হয়। প্রাণ বাঁচানোর জন্য অনেকে অসহায়ভাবে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে, অনেকে নৌকায় ওপারে পালিয়ে যেতে চেষ্টা করে। কিন্তু তাতেও রেহাই মেলেনি। বিহারীরা নৌকা নিয়ে নদীর মাধ্যে ফেলে তাদের কুপিয়ে হত্যা করতে থাকে।

ছদ্মবেশী আর্মি ও বিহারী ইপিআরের ছত্রছায়ায় ওদের এ ধরনের আক্রমণ প্রস্তুতির কথা কানাঘুষায় বাঙালিরা আগেই শুনেছিল। কিন্তু করণীয় ঠিক করে উঠতে পারেনি। অথচ এখানে অনেক বাঙালির নিজস্ব বন্দুক ছিল। এখন পরিস্থিতি তাদেরকে প্রতিরোধে নামতে বাধ্য করল। নেতৃত্ব দিলেন রাশেদ আলম। ২৭ মার্চ সকালে তিনি রাইফেল এবং পকেটভর্তী গুলি নিয়ে বেরিয়ে পড়েন। বাচ্চাকে কোলে নিয়ে তার স্ত্রী অপসৃয়মান স্বামীর দিকে অসহায়ভাবে তাকিয়ে থাকেন, তখনো ঘুণাক্ষরেও ভাবতে পারেন নি স্বামীর সাথে এই তার শেষ দেখা।

আলম সাহেবের দলটা যথেষ্ট শক্তিশালী ছিল, অচিরেই মিলের পরিস্থিতি পাল্টে যায়। বিহারীরা শ্রমিকও কর্মচারিদের কলোনিগুলোতে তান্ডব চালিয়েছিল। প্রতিরোধের মুখে তারা মিল ছেড়ে পালিয়ে যায়। কিন্তুশীঘ্রই খুলনা থেকে সামরিক কনভয় এসে মিলের সামনে অবস্থান নিলে পরিস্থিতি আবার তাদের পক্ষে চলে যায়। আলম সাহেব জানতেন আর্মিদের অত্যাধুনিক অস্ত্র ও ট্রেনিংয়ের সামনে তারা বেশিক্ষণ টিকতে পারবেন না। তথাপি তিনি স্থান ত্যাগ করেন নি। দু তিনজন সঙ্গী নিয়ে সর্বশক্তিতে হানাদারদের প্রতিহত করতে থাকেন এবং সবাইকে পরিবার পরিজন নিয়ে দ্রুত নদীর ওপারে নিরাপদ আশ্রয়ে সরে যেতে বলেন। আলম সাহেব এক নির্মিয়মান ভবনের তিনতালায় সুরক্ষিত অবস্থান নিয়ে হানাদারদের উদ্দেশ্যে গুলিবর্ষণ করছিলেন। এতে হানাদারদের বেশ কয়েকজন হতাহত হয়। তারা বুঝে উঠতে পারছিল না কোথা থেকে গুলি আসছে। তারা অন্ধের মত স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র দিয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি বর্ষণ করতে থাকে এবং এক পর্যায়ে গেট ভেঙ্গে মিলের ভিতর প্রবেশ করে। এ সময় মিলের এক অবাঙ্গালী দারোয়ান হানাদার বাহিনীকে আলম সাহেবদের অবস্থান জানিয়ে দেয় এবং বাড়ির পেছন থেকে উপরে ওঠার পথ দেখিয়ে দেয়। আর্মিরা ছাদে উঠে এসে প্রতিরোধকারীদের ঘেরাও করে ফেলে এবং বেয়নেট চার্জ করে নৃশংসভাবে হত্যা করে।

এরপর হানাদার বাহিনী ও বিহারীরা মিলের ভিতর যাকে সামনে পায় নির্বিচারে ও নৃশংসভাবে তাকেই হত্যা করতে থাকে। তখন শোকের সময় ছিল না, আলম সাহেবের স্ত্রী তার শিশু সন্তানদের নিয়ে প্রতিবেশীদের সহায়তায় কোনভাবে ভৈরব পারে হয়ে গ্রামের ভিতরে পালিয়ে যেতে সক্ষম হন। এভাবে এক অসম যুদ্ধে আত্মদানের পর আলম সাহেব ও তার সহযোদ্ধাদের বীরত্বব্যাঞ্জক প্রতিরোধের সমাপ্তি ঘটে।

নিউজপ্রিন্টর মিলের এই প্রতিরোধ যুদ্ধ আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে এক মাইল ফলক হিসাবে চিহ্নিত হয়ে আছে। এ যুদ্ধে শহীদ আলম সাহেবদের আত্মদান বৃথা যায় নি। ৯ মাসের ব্যবধানে ১৭ ডিসেম্বর খুলনার শিরোমনি রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে ভারতীয় নবম ডিভিশনের মেজর জেনারেল দলবীর সিং, মুক্তিবাহিনীর অষ্টম ও নবম সেক্টরের অধিনায়ক মেজর মঞ্জুর ও মেজর জলিলের নেতৃত্বাধীন মিত্রবাহিনীর হাতে পাকিস্তানের শক্তিশালী ৫৭ ব্রিগেডের শোচনীয় পরাজয় ঘটে। ১৬ ডিসেম্বর ইস্টার্ন কমান্ডের আত্মসমর্পণের পরও ব্রিগেডিয়ার মাকমাদ হায়াত গোয়ারের মত যুদ্ধ অব্যাহত রেখেছিলেন। তার হেড কোয়ার্টার ছিল শহীদ রাশেদ আলমের রক্তস্নাত নিউজপ্রিন্ট মিল। মুক্তিযুদ্ধের

সূচনালগ্নের রক্তস্নাত এই মিলেই ১৭ ডিসেম্বর গগনবিদারী জয়বাংলা ধ্বনি এবং পরাজিত পাকিস্তানি হানাদারদের ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্নার মধ্যে ব্রিগেডিয়ার হায়াত ও তার অফিসাররা মিত্রবাহিনীর কাছে ব্যাজ বেল্ট ও অস্ত্র তুলে দিয়ে গ্লানিকর আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়।আত্মসমর্পণ কালে ক্ষুব্ধ সৈন্যরা উচ্চস্বরে অভিযোগ করতে থাকে যে তাদের হিন্দুদের বিরুদ্ধে জ্বেহাদ করার কথা বলে এখানে আনা হয়েছে, কিন্তু এখানে এসে পুরোটা সময় তারা মুসলমানদের হত্যা করেছে, যে জন্য আজ তাদের এই দুর্দশা।

তারা বিহারীদের উপর প্রতিশোধ নিতে কালি সাধন করে এসেছিল

হাজিগ্রাম ও কোলা-পাটগাতির মাঝ দিয়ে বয়ে চলেছে স্রোতস্বিনীআতাই নদী। কোলা-পাটগাতির অবস্থান আতাইয়ের পূবদিকে। নমশুদ্র প্রধান এলাকা। চাষ-বাস তাদের মুখ্য পেশা। পাকিস্তানের দুই যুগ তারা কাটিয়েছে লাঞ্ছনা নির্যাতন হজম করে। দেশজ সাম্প্রদায়িকতা অথবা ভারতে সাম্প্রদায়িকঘটনা– যেটাই হোক না কেন তার তাপ অবশ্যাম্ভাবীভাবে তাদের উপর দিয়ে যেত। খালিশপুরেরবিহারীরা এদের অসহায়ত্বের কথা ভালই জানত এবং সুযোগ নিত। ভৈরব, আতাইয়ের মত খরস্রোতা নদী বিহারীদের নিবৃতকরতে পারত না। সাম্প্রদায়িক কোন ইসু সৃষ্টি হলে লুটপাট, মেয়েদের উপর নির্যাতন এবং খুনের মত ঘটনা তাদের হজম করতে হত অসহায়ভাবে। এপারের গ্রাম ও মিলের কিছু বাঙালিও তাতে সামিল হত। তবে বাঙালিরা একা হামলা করতে সাহস পেত না। দুর্ধর্ষ নমশুদ্রদের তারা ভালই চিনত। গুলেল, ল্যাজা, বল্লম ও রামদার ব্যবহারে তারা যে কতটা পারদর্শী ছিল তা পার্শ্ববর্তী দু'দশ গ্রামের বাঙালি মুসলমানরা ভালই জানত। তবে বিহারীদের ভয় পেত নমশুদ্ররা। বিহারীরা ক্ষিপ্র এবং সাহসী ছিল। তারা হামলা করলে বিষধর সাপের মুখেপড়া খোপেবন্দী মুরগীর দশা হত নমশুদ্রদের।

দীর্ঘ দুই যুগের প্রতিশোধ স্পৃহা পূরণের সুযোগ এলো ২৭ মার্চ। সমর্থ নমশুদ্র পুরুষরা বল্লম, ল্যাজা, তীর ধনুক, জালের কাটি, রামদা, বেতের ঢালে সুসজ্জিত হয়ে আতাই পড়ি দিয়ে দু'মাইল হেঁটে স্টার জুট মিলের মধ্যে ভৈরবের তীরে এসে পৌঁছাল। তারা খালিশপুরে যাবে। তারা সবাইকালি সাধন করে এসেছিল এবং প্রতিশ্রুত ছিল। প্রত্যেকের ললাট সিঁদুর চর্চিত, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা।সকলে ছিল নিঃসঙ্ক ও গম্ভীর, চোখমুখের ভাব সম্পূর্ণ ভিন্ন। থেকে থেকে 'হর হর বোম বোম' আওয়াজ দিচ্ছিল তারা।

তারা খালিশপুরে পৌঁছাতে পারলে সেখানে এক ভয়াবহ ঘটনার জন্ম হত। বিহারীরা অস্ত্রসজ্জিত ছিল এবং তাদের মধ্যে সিভিল ড্রেসে কিছু আর্মি ও মিলিশিয়াও ছিল। তাদের আগ্নোস্ত্রের সামনে এরা ব্যাপক সংখ্যায় হতাহত হত ঠিকই, কিন্তু এরাও জীবন পণকরে এসেছিল ফলে একটা ব্যাপক হানাহানির ঘটনা যে ঘটত তাতে সন্দেহ ছিলনা।

ওদের রণোন্মাদোন সবাইকে হতবাক করেছিল। তারা বুঝল এর পরিণতি ভয়াবহ হবে। রক্তপাত তখন আর তেমন আতংকের বিষয় নয়, সেটা ততক্ষণে শুরু হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সবার ভয় ছিল এই ঘটনার রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া নিয়ে, যা অবশ্যই বাঙালিদের মুক্তিসংগ্রাম ও জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের বিরুদ্ধে চলে যাওয়ার আশংকা ছিল। মুসলিম লীগ জামাত ও ইয়াহিয়া-টিক্কা চক্র সাথেসাথেই একে সাম্প্রদায়িক রূপ দিত এবং বলা বাহুল্যতাদের প্রচারণা ব্যাপক সংখ্যক সাধারণ মানুষকেও প্রভাবিত করত।মিলে তখন ..., শাহজাহান আলী, চঞ্চল সাহা, ইপিআর প্রমুখের মত সচেতন মানুষরা আন্দোলনের পুরোভাগে ছিলেন, তারা সকলে তাদের ফিরে যেতে অনুরোধ করেন। যদিও তারা কালি সাধন করে এসেছিল, বিনা যুদ্ধে বিনা রক্তপাতে তাদের ফেরার পথ ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ তেকে রুদ্ধ ছিল, তবুও পরিস্থিতির গুরুত্ব অনুধাবন করে তারা ফিরে যাওয়াই শ্রেয় মনে করেছিল।

বয়রা: শহরের শেষ প্রতিরোধ

বোমা বানানো হত খয়বার সাহেবের বাগান বাড়িতে। তপন বিনয় প্রমুখ এই কাজে সংপৃক্ত ছিল। সর্বত্র প্রতিরোধ যুদ্ধে এই সব হাত বোমা ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। আর্মিদের দৃষ্টি এড়ানোর জন্য বোমাগুলো নদী ও খাল পথে ডিঙ্গি নৌকায় আনা হত। বোমার উপরে শাক-সবজির বোঝা, ডিঙ্গিগুলোকে সন্দেহের বাইরে রাখতো। ওরা ছিল গ্রামের ছেলে, সহরে থেকে পড়াশুনা করত। ফলে নৌকার চাষী ও মাঝির বেশ ধারণে ত্রুটি হতনা। তারা কয়েকদফা এভাবে প্রতিরোধ যোদ্ধাদের বোমা সরবরাহ করেছিল। ফুলতলা থেকে পিকচার প্যালেস মোড় পর্যন্ত যশোর রোড বরাবর এভাবে ইপিআর পুলিশ রাজনৈতিক কর্মী ছাত্র ও শ্রমিকদের শক্ত প্রতিরোধ গড়ে ওঠে। শহর স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী প্রধান খায়বার সাহেবের পুরানো জীপ গাড়িটা এসময় যোগাযোগ রক্ষার কাজে ভাল অবদান রাখে।

২৮ মার্চ চারদিক আশ্চর্য রকম নিস্তব্ধ। কানাঘুষায় শুনতে পাচ্ছিলাম বয়ড়ার শেষ প্রতিরোধ ভেঙ্গে পড়েছে। আমি দুপুরেরপরভাঙ্গা মায়াম সাইকেলটা নিয়ে বেরিয়েছিলাম। সোজা কিছুটা যেয়ে ডান দিকে মোড় নেয়ার মুখে পাড়ার একজামাত কর্মীর সাথে দেখা হল। তারা

ইতোমধ্যে খোলস ভেঙে বেরিয়ে আসতে শুরু করেছেন। তিনি মুরুব্বী মানুষ,আমাকে দাঁড় করিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন–কি মনোয়ার মিয়া,এই অবেলায় কোথায় যাও?

মোড়ের মাথায় চাচা। একটু কাজ আছে।

কি আর কাজ করতে পারবা বল, সব তো শেষ। শুনেছ নিশ্চয় শহরে ট্রাকের পর ট্রাক আর্মি ঢুকে পড়েছে। দুর্ধর্ষ পাকিস্তানি সেনাদের ঠেকানো কি দুচারটে রাইফেলের কাজ! আমাদের একটা উচিৎ শিক্ষা হল, কি বল। যাকগে এখন বোধহয় বাইরে না যাওয়াই ভাল। কখন আবার হুট করে কার্ফু জারি হয়ে যায়।

এই তো এখুনি ফিরব– বলে সাইকেলে চেপে বসলাম। এনারা এক মাস যাবৎ কচ্ছপের মত নিজেদের খোলের মধ্যে গুটিয়ে নিয়েছিলেন। তখন এমনও মনে হয়েছিল এবার হয়তো মানুষের মত নিজেদের পায়ের উপর দাঁড়ানোর কথা ভাববেন। কিন্তু না, পরিস্কার বুঝিয়ে দিলেন পশ্চিম পাকিস্তানি 'কর্নাল-জার্নাল ভাইদের' ঠেক ছাড়া দাঁড়ানোর কথা তারা ভাবতেই পারেন না। সে সময় মাঝে মাঝে একটা পাঞ্জাবী গান শোনা যেত 'মেরা মাহি কর্নাল নি, জর্নাল নি'– অর্থ আমার প্রেমিক কর্নেল, আমার প্রেমিক জেনারেল। আমার ভাই এয়ার ফোর্সে ছিল, তার কাছে শুনেছি গানটা নাকি পাঞ্জাবী ললনাদের অতি প্রিয়। এটা নিছক পাঞ্জাবীদের আর্মি বন্দনা অথবা পাঞ্জাবী লরনাদের স্বার্থ বন্দনা। নইলে আর্মিতে কর্নেল জেনারেল হতে হতে মাথার চুল পেকে সাদা হয়ে যায়, মুখের চামড়া ঢিলা হয়ে ঝুলে পড়ে, এহেন ব্যক্তি কিভাবে ললনাদের 'মেরা মাহি' হবেন!

আমিকিছুক্ষণ আগে ট্রানজিস্টরেবিভিন্ন স্টেশন ধরার চেষ্টা করছিলাম। হঠাৎ করেরেডিওর নব কোনএক ওয়েভলেনথ স্পর্শ করতেই বিজাতীয় ভাষায় কর্কশ কিছু কথপোকথন কানে ভেসে এল। আর্মি ওয়াকিটকির কথাবার্তা রেডিওতে ধরা পড়ছে। আমি সেলিমের নাম শুনে বিস্মিত হলাম। এই সেলিম ২৭ মার্চে আমাকে তার গাড়িতে কোন এক গোপন বৈঠকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল। আর্মিরা সেলিমকে যেভাবেই হোক জীবীত বা মৃত ধরার জন্য হুকুম জারি করছিল– আরে ভাই উসকো ঢুন্ডো, ... কেয়া? কোই পাত্তা নেহী, হোয়াট এ ননসেন্স!আই হ্যাভ রিপোর্টস হি ইজ মুভিং হিদার এন্ড দিদার। এনিহাউ উসকো পাকড়োঅর শূট হিম এট ফার্স্ট সাইট। কোই ফারাক নেহি পড়তা। ওভার।–

এই অল্প সময়ের মধ্যে সেলিম একটা লিজেন্ড হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সে ভাল মেকানিক, সেই সুবাদে ভাল ড্রাইভার এবং ডেয়ারিং। অস্ত্র আনা নেয়া এবং যোগাযোগ রক্ষার কাজটা সে ঠিকমতইপালন করে যাচ্ছিল নিশ্চয়,নইলে আর্মিরা তার প্রতি এতটা অ্যাটেনশান দিত না। অথচ সে ছিলরাজনীতির সাথে সংশ্রবশূন্য, আলি তারেকের সাথে কিছুটা পরিচয় এবং জাহিদ ও মোখলেসের মটর সাইকেল মেরামত সুত্রে সেছাত্রলীগের ছেলেদের সংস্পর্শে আসে। তবে এখন সবাই তাকে চেনে। আমিভালভাবেই তার ধাত চিনেছিলাম গতকাল সন্ধ্যার পর। আমার বাইরে বেরোনোর মূল কারণ ছিল সতর্কবার্তাটা তার কানে পৌছানোর জন্য কোনো মাধ্যম পাওয়া যায় কিনা দেখতে। হতাশ হতে হল।

আমি যখন ফিরছিলাম পিটিআই মোড়েকলিম ভাই এর সাথে আবার দেখা হল। কাঁধে রাইফেল ঠেকিয়ে মাটির উপর পজিশন নিয়ে আছেন। সামনে একখণ্ড কাঠেরগুড়ি এবং খানকয়েক ইট। তার পাশাপাশি আরো কয়েকজন সহযোদ্ধা। আশ্চর্য! গাজাগুলি খাওয়া মানুষ পারবেন না বলে কয়েকদিন আগে লুট করা বন্দুক ফেরত দিয়ে এসেছিলেন, আজ আবার রাইফেল কাঁধে প্রতিরোধে নেমে পড়েছেন। আমার দিকে চোখ পড়তেই ইশারা করলেন– সাইকেল কেন, রাইফেল কই? আমি অন্যমনস্কভাবে দেখেও না দেখার ভান করলাম এবং দ্রুত পিছিয়ে এলাম।

অপরাহ্ন গড়িয়ে সাঁঝ নামে। শহরে আর্মির দাপট। মুরুব্বিরা নামাজের পাটি ছেড়ে ওঠেন না। মোনাজাত যেন শেষ হয় না। হারিকেনের ম্রিয়মান আলোয় চোখের কোণে জলধারা নামে, কণ্ঠ বাস্পরুদ্ধ হয়, করুণ ভাঙ্গা ভাঙ্গা আর্তি শোনা যায়–আল্লা তুমি রহম কর, জালেমদের হাত থেকে আমাদের রক্ষা কর।

হিন্ডি প্রমুখ

লিখতে হবে

নয়াবাটির মুন্সিবাড়িতে গণহত্যা

মুন্সি সিদ্দিকুর রহমান ছিলেন খালিশপুর আওয়ামী লীগের সভাপতি। জাতি-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের প্রিয় ছিলেন।আর্মি ক্রাকডাউনের পর ২৬ মার্চ খালিশপুরে বিহারী- বাঙালি দ্বন্দ্ব স্থুলভাবে প্রকাশ্যে চলে আসে। একে একে নিউজপ্রিন্ট, ক্রিসেন্ট, পিপলস, প্লাটিনাম জুট মিল,শ্রমিক ময়দান, স্যাটালাইট টাউনসহ সর্বত্র দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ে।এমন বিভৎস হত্যাকাণ্ডমুন্সি সিদ্দিকুর রহমানকে ব্যথিত করছিল, কিন্তু তিনি কোনো

উপায় খুঁজে পাচ্ছিলেন না।অবস্থা শ্রেফ খুনের বদলে খুনের পর্যায়ে চলে গিয়েছিল। তিনি স্থানিয় লোক, খুবই প্রভাবশালী এবং বঙ্গবন্ধু অন্তপ্রাণ। এজন্য বিহারীরা তাকে হত্যার জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে। ২৯ মার্চ থেকে খুলনা খালিশপুর আর্মি নিয়ন্ত্রণে চলে এলে মাস কিলিং স্তিমিত হয়ে আসে, তবে আড়ালে আবডালে বাঙালি হত্যা কখনো বন্ধ হয়নি।

পরিস্থিতির কারণে মুন্সি সিদ্দিকুর রহমান খুবই সতর্ক অবস্থায় থাকতেন। বিহারীরা তাকে ধরার জন্য ফাঁদ পাতে। মিল চালু করা এবং শিল্প এলাকায় শান্তি প্রতিষ্ঠার কথা বলে তারা বাঙালিদের সাথে মিলে মিশে থাকার ইচ্ছা প্রকাশ করে। খালিশপুর স্যাটালাইট টাউনের উত্তরাংশে এবং গোটা খালিশপুরের তিনপাশ জুড়ে তখন প্রচুর নিরীহ বাঙালির বসবাস। তাদের জীবনের কথা ভেবে তিনি বিহারীদের শান্তি প্রস্তাবে আগ্রহের সাথে সম্মত হন। সিদ্দিক সাহেবের বৈঠকখানায় বিহারীদের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন মতিউল্লা সর্দার, ফরিদ মিয়া এবং মোহাম্মদ আলী বিহারী। তারা অশিক্ষিত, দুর্বিনীতও তাগতমান ব্যক্তি। দুর্ভাগ্যক্রমে সে সময়নেতৃত্বে জন্য বিহারী কমুনিটির কাছে এমন লোকেরাই ছিল সেরা পছন্দ।এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে হৃদ্যতাপূর্ণ পরিবেশে শান্তি আলোচনা সম্পন্ন হয়। সিদ্দিক সাহেব যেনঅনেকটাই ভরসা পেলেন।দুপুরে তিনি বাড়িতেই ছিলেন। তার বাড়িতে আগে লোকজন এবং আত্মীয়স্বজনের ভীড় লেগেই থাকতো। শান্তি আলোচনার পর সেদিন অনেকেই ছিলেন। হঠাৎ বাইরে থেকে একজন ছুটে এসে খবর দিল আর্মি এবং বিহারীরা তার বাড়ি ঘিরে পজিশন নিচ্ছে। তিনি মুহূর্তে সবাইকে পালাতে বলে নিজে পিছনের বাগান দিয়ে পালিয়ে গেলেন। সবারই তখন হতবুদ্ধি অবস্থা। দু একজন পালাতে পারলেওঅন্যদের অবস্থা হল ময়াল সাপের দৃষ্টিতে পড়া বানর শাবকের মত, তারা ধরা পড়লেন। সিদ্দিক সাহেবকে না পেয়ে তাদের সব আক্রোশ যেয়ে পড়ল বন্দীদের উপর। বাড়ির আঙ্গিনায় এক বড় গর্তের পাশে তাদের তাদের দাঁড় করিয়ে আর্মিরা যখন রাইফেল তাক করল, লাইনে আপন দুই ভাই ছিল, প্রাণভয়ে ছোট ভাইটি তার বড়ভাইকে দুহাত আঁকড়ে ধরল এবং চাইনিজ রাইফেলের অবিশ্রান্ত গুলিতে একে একে সবাই ঝাঁঝরা হয়ে গেল।ভাগ্যচক্রে গুলি খেয়েও দুজন বেঁচে যায় এবং সিদ্দিক সাহেবের আত্মীয় সহ মোট তের জন 'কওম মুল্‌ক সুলতানাত'-এর নামে পাকিস্তানি নরপশুদের গুলি ও বেওনেটের ডগায় জীবন দিতে হয়। লাশ গর্তের মধ্যে ওভাবেই পড়েছিল। পরে যারা লাশ মাটি চাপা দিতে গিয়েছিল তারা ঐ দুই ভাইকে দেখে অশ্রু সংবরণ করতে পারেনি। তারা তখনো গর্তের মধ্যে পরস্পরকে জড়িয়ে ধরা অবস্থায় পড়ে ছিল। তাদের শরীর শক্ত হয়ে গিয়েছিল এবং তাদেরকে পৃথক করা যায়নি।

বলা বাহুল্য ৭ এপ্রিলের এই হত্যাযজ্ঞের পর উত্তর খালিশপুর খুব দ্রুত বাঙালিশূন্য হয়ে যায়। মাথার উপর ছাদটা সরে গেছে, কেউ আর খালিশপুর এবং আশেপাশের এলাকায় থাকতে সাহস পায়নি।

খালিশপুরের মনসুর ভাই

খালিশপুর স্যাটালইট টাউনের উত্তরাংশ ছিল বাঙালি অধুষিত। এই এলাকায় কিছু ফাঁকা প্লট এবং একই ধাঁচের ছোট ছোট ঘরসহ কিছু প্লট বাঙালিদেরকে স্বল্পমূল্যে বরাদ্দ দেয়া হয় ষাটের দশকের প্রথম দিকে। ঘরসহ প্লটগুলি মূলত দরিদ্র উদ্বাস্তু বাঙালিদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। এদের মধ্যে কলকাতার উর্দুভাষী বাঙালিও ছিল। মনসুর ভাই তখন সবে বাংলাদেশ ব্যাংকে চাকরি পেয়েছেন। একদিন আমাদের বাড়িতে এসে উৎফুল্লভাবে মাকে বললেন, চাচী দোওয়া করবেন, আমি খালিশপুরে ঘরসহ একটা জমি বরাদ্দ পেয়েছি।

তারা দুইভাই খুব ছোটবেলায় পিতৃহীন হন। দেশভাগের পর বসিরহাটের ঘরবাড়ি ফেলে দেবহাটা সেনহাটি হয়ে খুলনায় আসেন। এত দিনে আবার নিজেদের একটা বাড়ি পেয়ে তার আনন্দের সীমা ছিল না, সিদ্ধান্ত নিলেন ওখানেই থাকবেন। সেই ছোটবেলা থেকে তাদের অভিভাবক ছিলেন সেজচাচা। তিনি বললেন– ওখানে অতদূর বিশেষ করে বিহারীদের পাশে তোমরা থাকতে পারবে না, বাড়িটা ভাড়া দিয়ে শহরেই থাকো।

না চাচা আশেপাশের লোকজন খুব ভাল, কয়েকদিন থেকে তো যাচ্ছি, অনেকের সাথে পরিচয়ও হয়েছে, তারাও চায় আমরা ওখানেই থাকি। কোন অসুবিধা হবে না।

দেখো, যা ভাল মনে কর। তবে আমার মনে হয় শহরে আমাদের কাছাকাছি থাকলে ভাল করতে।

মনসুর ভাই দিনের পর দিন তিল তিল করে নতুন বাড়ি সাজিয়ে তুললেন। হিসেবি ছিলেন, বাহুল্য খরচ করতেন না। নির্বিরোধী মানুষ, প্রতিবেশিদের সাথে, তা বিহারী, বাঙালি বা ক্যালকেশিয়ান যাই হোক না কেন, তার সম্পর্ক খুবই ভাল। হয়তো সে জন্যই সাহস করে ২৬ মার্চের পরও বাড়িতে থেকে গিয়েছিলেন। এদিকে নানা গুজবে তার তখন মাথা খারাপ হওয়ার উপক্রম। দক্ষিণের বিহারী কলোনীর মাথা গরম বিহারীরা নাকি বাঙালিদের বিরুদ্ধে মারমুখী হয়ে উঠেছে। মতিউল্লা সর্দারও নাকি বলে দিয়েছে–'আভি বিচ মে কোই নেহি হ্যায়, যো আদমী সরাসর হামলোগকা সাথ নেহি হায় উও জরুর জায়বাংলা হ্যায়, গাদ্দার হ্যায়।' তার উপর জোর গুজব আছে সৈয়দপুর, শান্তাহার, রংপুর, নীলফামারি থেকে তাড়া খাওয়া বিহারীরা নাকি ট্রেন বোঝাই হয়ে খালিশপুরে আসছে।তারা এসে পড়লে অবস্থা যে কি হবে কিছুই

বলা যায় না। তবে শীঘ্রই তাকে মারাত্মক দুঃশ্চিন্তায় ফেলল নয়াবাটির মুন্সিবাড়ির হত্যাকান্ড।এতদিন সিদ্দিক মুন্সির বল-ভরসায় তারা টিকেছিলেন। অথচ সিদ্দিক মুন্সির বাড়িতে বাঙালি-বিহারী শান্তি চুক্তির পরপরই ৮মেআর্মি ও বিহারীরা বাড়ি রেইড করে ১৩ জনকে হত্যা করে বাঙালিদের সাহসের ভিত ধ্বসিয়ে দেয়। পরদিনদুপুরের পর তার প্রতিবেশী দুজন বয়স্ক বিহারী এসে বললেন–'মনসুর সাব, আপ আভি হামারা সাথ চালা আইয়ে, দের হোনেসে খোদা না খাস্তা এঁহাছে নিকালনা বহুত মুসিবত হো যায়গা। শ্রেফ কুছ দিন কি লিয়ে কোই যাগা পর যাইয়ে। ফির সবকুছ নরমাল হেনে কি বাদ জরুর ওয়াপাস আনা। হাম আপকো ঘরকা দেখভাল করুঙ্গা।' মনসুর ভাই জরুরি কিছু জিনিষপত্র নিয়ে প্রকম্পিত হাতে ঘরে তালা দিয়ে তাদের জিম্মায় সব কিছু ছেড়ে স্ত্রী ছোটভাই এবং বাচ্চাদের নিয়ে বেরিয়ে এলেন।

সহরে সেজচাচার বাড়িতে এসে তিনি কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন। বার বার আক্ষেপ করে বলতে থাকেন– এত কষ্টে দিনে দিনে তিনি নতুন করে যা কিছু গড়েছেন, ফিরে যেয়ে সেসব কি আর পাবেন!

সেজচাচা উদ্বাস্তু জীবনের মধ্য দিয়ে যাওয়া পোড়খাওয়া মানুষ, কান্না বিশেষত পুরুষের কান্না মোটেও সহ্য করতেন না, ধমকে উঠলেন– তোমাকে তো আগেই মানা করেছিলাম, ওখানে থেকনা। শোনোনি। এখন কেঁদে কি হবে! যাহোক ঘরে তালা দিয়ে এসেছ তো?

তা দিয়েছি, কাছাকাছি দুই ভদ্রলোককে বলেও এসেছি।

তবে অত ভাবছ কেন ? বিহারীরা সৎ মানুষ, চুরি চামারিতে থাকে না, কথা দিলে কথা রাখে। এখন কদিন ধৈর্য ধর, অবস্থা ভাল হলে ফিরে যাবে।

কিন্তু অবস্থা স্বাভাবিক হয় না। বরং দিনে দিনে খারাপ খবরের সংখ্যা বেড়েই চলে। এপ্রিলের মাঝামাঝিতে তিনি ব্যাংকে জয়েন করেন। ব্যাংকে নানা জায়গা থেকে লোকজন আসে, সেখানে যে খবর পাওয়া যায় তাতে তার রক্ত আরো হিম হয়ে যায়। সৈয়দপুর নীলফামারিতে মার খাওয়া বিহারীরা খালিশপুর ছেয়ে ফেলেছে। তাদের ক্রোধ এবং জিঘাংসা সীমা ছাড়া। অরাজকতা, খুন খারাবী, ধর্ষণ, লুটপাট চরমে উঠেছে। বাঙালিরা সেখানে ঢুকতেই পারেনা। তাদের বাড়ি ঘরের দরজা জানালা পর্যন্ত খুলে নিয়ে বেঁচে দিচ্ছে ওরা। যে খবর এনেছিল তাকে জিজ্ঞাসা করেন– হামারা ঘর কা হালত কেয়া ভাই?

নেহি স্যার, হামলোগ উধার যাতাই নেহি, ক্যায়সে মালুম!সব লোগ বাহার সে আয়া, শুনা হ্যায় শ্রেফ কিলার হ্যায়।

শুনিয়ে ভাই হাম শ্রেফ ঘরকা হালাৎ দেখনে কি লিয়ে একদফা মেরা ঘরপে জাউঙ্গা, আপ কুছ মদত কর সাকেগা কেয়া?

স্যার আপকা দেমাক বিলকুল খারাপ হো গিয়া। উধার কাভি মৎ যাইয়ে, যানেছে আপ ওয়াপাস নেহিআ সাকেগা।

একদিন অফিস থেকে চিন্তিতভাবে বাড়ি ফেরার পর মনসুর ভাই তার স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করেন– প্রাইজবন্ডগুলো কোথায়?

প্রাইজবন্ড! ভাবি চমকে ওঠেন। প্রাইজবন্ড তো তোমার কাছে ছিল।

তা ছিল, কিন্তু তুমি বললে না, মাটিতে পুতে রাখতে। আমি তো উঠানে পুতে রেখেছি, তোমাকে দেখিয়েও রেখেছি জায়গাটা।

দু'জনেই বিবর্ণ হয়ে গেলেন। ভাইয়ের অস্থিরতা বেড়েই চলল, অনেক টাকার প্রাইজবন্ড! শেষপর্যন্ত তিনি চাচার সাথে কথা বললেন– আমিএকটু খালিশপুরে যাব চাচা। বেশ কিছু প্রাইজবন্ড বাড়ির উঠানে পোতা আছে,আনতে ভুলে গিয়েছি, এখন না আনলে বৃষ্টিতে ভিজে নষ্ট হবে। আমার অনেক ক্ষতি হয়ে যাবে।

সেজচাচা শান্ত মানুষ, তথাপি রাগে ফেটে পড়লেন– মাথা খারাপ হয়েছে তোমার! জীবনের চেয়ে প্রাইজবন্ড বড় হয়ে গেল? যাও চুপচাপ ঘরে বসে থাকো, কোথাও যাওয়া চলবে না।

ভাই জানেন, অনুমতি মিলবে না। পরের শনিবার হাফ অফিস। কাউকে কিছু না বলে অফিস থেকে বেরিয়ে সোজা খালিশপুরের দিকে রওয়ানা দিলেন। তিনি একটা হিসাব কষে নিয়েছেন, যেতে যেতে দুপুর গড়িয়ে যাবে, তখন খাওয়া দাওয়া সেরে দিবা নিদ্রা যাওয়ার সময়। ফলে পথঘাট মোটামুটি জনশূন্য পাওয়া যেতে পারে। তিনি যাবেন গোয়ালখালি মোড় হয়ে স্যাটালাইট টাউনের উত্তরে নয়াবাটির মধ্য দিয়ে। রাস্তার ওপাশে বাঙালি বসতি, তবে জানেন না এখন সেখানে কারা আছে। বাড়িতে ঢোকার আগে তাকে অবশ্য বিহারীদের দখলে থাকা কিছু বিক্ষিপ্ত বাড়ি ঘরের মধ্য দিয়েও যেতে হবে, কিছুটা ঝোপ ঝাড়ের আড়াল পাওয়া যাবে হয়ত। তারপরও রিস্ক তো থাকছেই।

তিনি আল্লা ভরসা করে রওয়ানা দিয়েছিলেন, একসময় বাড়ির পিছনে পৌঁছেও গেলেন। বাড়ির সামনের দিকে যাওয়ার প্রশ্ন ওঠে না, পথে লোকজন থাকতে পারে। তিনি পিছনের পাঁচিল টপকে ভিতরে ঢুকে গেলেন। সহসা তার গা কাঁটা দিয়ে উঠল, ঘরের দরজা জানালাগুলো

মড়ার মাথার খুলির অন্ধকার গহ্বরের মত হয়ে আছে। ঘর শূন্য, কুটোগাছটাও নেই। তিনি দ্রুত হাতে মাটি খুড়ে ভিজে নরম হয়ে যাওয়া প্রাইজবন্ড গুলো অতি সাবধানে তুলে নিয়ে পাঁচিল টপকে বেরিয়ে এলেন। তিনি কিভাবে কোন পথে খালিশপুর ছাড়িয়ে গোয়ালখালি ও দৌলতপুর কলেজের মাঝ দিয়ে রেললাইন অতিক্রম করে যশোর রোডে পড়েছিলেন সেটা সঠিকভাবে মনে করতে পারেন নি।

এদিকে বেলা তখন অনেকটাই গড়িয়ে গেছে, মনসুর ভাই ফেরেন নি। সেজচাচাদের বাড়িতে সবাই তখন ঘরবার করছে। স্টেট ব্যাংকে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে যথারীতি দুপুরেই বেরিয়ে গেছেন তিনি। সবার মুখগুলো থমথমে পাংশু। এভাবে নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়ার ঘটনা তো এখন আকসারই ঘটছে। মানুষ চূড়ান্ত খারাপটাই ভাবে। ভেবে ভেবে ভেতরে রক্তক্ষরণে তিলে তিলে শেষ হতে থাকে। ঠিক এমন একটা সময় মনসুর ভাই বিনীত ভঙ্গীতে ঘরে ফিরলেন। সবাই দরজায় ভিড় করে দাঁড়ানো। কিন্তু কেউ কথা বলেনি, ক্ষোভ প্রকাশ করেনি, উচ্ছাসও দেখায়নি। নিরবে আবার যে যার কাজে ফিরে গেছে।সেজচাচা শুধু বললেন–তোমাকে তো মরণে পেয়েছে দেখ্ছি। ঘর বাড়ি জিনিষপত্র তো গেছে, এখন জানটা যাতে যায় সে ব্যবস্থাও তো করে ফেলেছিলে, পেয়েছ প্রাইজবন্ড?

জি, চাচা।

তারা একাত্তরের যন্ত্রণা বিশ্বাস করতেন না। হয়তো ক্ষণিকের জন্য করলেন।

কিছু দিন বাদে মনসুর ভাই আমাদের বাড়ি এলেন, একেবারে ভেঙ্গে পড়েছেন। মাকে বললেন–চাচী, ঘরে কুটো গাছটাও ছিলনা, সব লুট করে নিয়ে গেছে ব্যাটারা। কিন্তু এতদিন তবু বাড়িটা ছিল, এখন সেটাও বেদখল হয়ে গেল। আজ ব্যাংকের এক পিওন বলল, কয়েক দিন আগে আমার বাড়িটা কোন এক বিহারী ফ্যামিলিকে বরাদ্দ দিয়েছে ওদের কি না কি এক কমিটি। আমি একেবারেই শেষ হয়ে গেলাম চাচি।'

মনসুর ভাই এতদিন দোদুল্যমানতায় ভুগছিলেন, এখন স্বাধীনতার পক্ষে গেলেন।

১৭ ডিসেম্বর সকালে খুলনা স্বাধীন হল। মনসুর ভাই সারা দিন ছটফট করে কাটালেন, কিন্তু সেজচাচার কঠোর পাহারাদারীতে ঘর ছেড়ে বেরোতে পারলেন না। ১৮ তারিখ সকাল থেকে তাকে পাওয়া গেলনা। ফিরে এলেন দুপুরে আনন্দে ভাসতে ভাসতে, আমোদিত কণ্ঠে বললেন–চাচা, আল্লার কুদরত বোঝে মানুষের কি সাধ্য! আমার যা গিয়েছিল তার চেয়ে বহুগুন বেশি ফিরে পেয়েছি। বাড়িতে যেয়ে দেখি ভাঙ্গা দরজা জানালাগুলো সব মুলিবাঁশের ঝাঁপ দিয়ে আটকানো। সদর দরজার ঝাঁপ দেয়ালের কড়ার সাথে শিকল দিয়ে বাঁধা, তাতে ভারি তালা লাগানো। ঝাঁপ ভেঙ্গে ভেতরে ঢুকে দেখি সামনের ঘরে রাশি রাশি মালপত্র। কত যে মাল, কত ধরনের যে মাল তার ইয়ত্তা নেই। ব্যাটারা কোথা থেকে লুট করে এনে ঘর ভরে ফেলেছে আল্লাই মালুম। পাশের ঘরে মালপত্রও আছে, খাট পালংও আছে, দরজা জানালাও আছে। শুধু লাগিয়ে নিলেই হবে। চাচা, আমরা কিন্তু আজই ফিরে যাব, অনেকেই গেছে। ওখানে ইন্ডিয়ান আর্মি আছে, মুক্তিবাহিনীও আছে, অসুবিধা হবেনা।

এসব শোনার মত মন মানসিকতা তখন সেজচাচার ছিল না। তিনি টিন শেড বারান্দার কোনায় খুটিতে পিঠ ঠেকিয়ে চুপচাপ বসে ছিলেন। ভিতরে তখনও সেজচাচি থেকে থেকে করুণ সুরে বিলাপ করে যাচ্ছিলেন– এরা যে দেশটাকে হিন্দুস্তান বানালো, এখন আমাদের কি হবে, কোথায় যাব আমরা, আবার তো সেই দেশ ছাড়া হতে হবে, সে যে কি কষ্ট!–

আমি সকালেও একবার বেরোতে যেয়েও ফিরে এসেছি তার কান্নার কারণে। মা এবং সেজচাচী দুই জা, তাদের স্বামীরা আপন চাচাতো ভাই। বসিরহাটে পাশাপাশি বাড়িতে বাস করতেন, এখানেও তাই। মাঝে প্রায় দেড় বছর আমরা সেনহাটি ছিলাম, সেখানেও পাশাপাশি দুই পরিত্যক্ত বাড়িতে বাস করেছি। বসিরহাট ছাড়ার পর মা জোর করেই তার আপন বড়ভাসুরকে ছেড়ে সাতক্ষীরা থেকে খুলনায় সেজচাচার কাছে চলে এসেছিলেন, আমাদের লেখাপড়ার কথা ভেবে। বড়চাচা ইসলামী শিক্ষাভিন্ন কোন শিক্ষা পছন্দ করতেন না, কিন্তু সেজচাচা আধুনিক শিক্ষার পক্ষপাতি ছিলেন। ঘরে ফিরে মাকে বললাম– সেজচাচীর কাছে যান না, তিনি তো সেই সকাল থেকেই কাঁদছেন!

মাকে দেখে সেজচাচী বললেন– কাঁদো ভাবি কাঁদো, কান্না ছাড়া আমাদের কপালে আর কি আছে বল, সব ছেড়ে ছুড়ে আবার তো সেই পথেই বেরোতে হবে।

কেন ভাবি, তোমার এমন ধারণা হল কেন?

দেশটা হিন্দুস্থান হয়ে গেল, ভেবেছ ওরা আমাদের থাকতে দেবে?

কিচ্ছু হবে না, ভেব নাতো, আমাদের বাড়ি আমাদেরই থাকবে, কেউ তাড়াতে আসবে না।

সেজচাচি সরল সাদাসিধা মানুষ। রাজনীতির ধারে কাছেও থকেন না। যেভাবে শুনেছেন, সেভাবেই মনে গেঁথে নিয়েছেন। মা বড়ভাইকে বললেন– তোমরা এভাবেই তোমার মাকে বুঝিয়েছ, তাই না?

বড়ভাই তাচ্ছিল্যের সাথে বললেন– কয়েকদিন অপেক্ষা করেন চাচি, আপনিও বুঝতে পারবেন!

ল্যান্স নায়েক সিদ্দিক ও তার সহযোদ্ধারা

বয়রার প্রতিরোধ ভেঙ্গে গেলে ওরা পিছিয়ে এসেছে। সংখ্যায় ২০-২২ জনের মত হবে।ওদের সংখ্যাটা অরো অনেক বেশী ছিল। অন্যেরা কোথায় ওরা জানে না। আর্মি কনভয়ের বিরামহীন গুলির মুখে সবাই ছত্রভঙ্গ হয়ে যে যেদিকে পারে পালিয়ে বেঁচেছে। ওরা অধিকাংশই পেশাদার সৈনিক ছিলনা। ছাত্র এবং শ্রমিকরা রিট্রিটের নিয়ম কানুন আদৌ জানে না। এর মধ্যেও ২০-২২ জনের একত্র থাকাটা বিস্ময়ের ব্যাপার। এটা সম্ভব হয়েছে ল্যান্স নায়েক সিদ্দিক মিয়ার কারণে। ইউনিফর্ম পরিহিতদের শিক্ষা যে তারা তাদের উর্দ্ধতনকে অনুসরণ করে।এই এলাকা তাদের অপরিচিত। যুদ্ধের প্রায় দু'দিন তারা স্থানীয় লোকদের অকৃত্রিম সহযোগিতা পেয়েছে। কিন্তু তাদের অবিদিত ছিলনা যে আর্মি আগ্রাসনের মুখে স্থানীয়রা সহযোগিতা অব্যাহত রাখতে সাহস পাবে না। তখন ইউনিফর্মসহ অস্ত্র হাতে একা চলাচল করা বোকামো হবে, বরং দল নিয়ে থাকলে প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে অন্তত লড়াই করা যাবে। তার নেতৃত্ব সবাই স্বাভাবিক ভাবেই মেনে নিয়েছিল।

পশ্চাদপসারণ তাদেরকে হতোদ্যম করেনি। তারা আশাবাদী পরিস্থিতি পাল্টাবে এবং তারা ঘরে ফিরবে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর। আশাবাদী না হয়ে তাদের উপায়ও নেই। তারা আনুগত্য ত্যাগ করে এসেছে–এখন ডু অর ডাই।

চট্টগ্রামের মত খুলনা বেতার কেন্দ্র দখলের কথা প্রতিরোধকারীদের অনেকেই ভেবেছিলেন, অন্তত সাময়িকভাবে হলেও। তবে একসাথে দুই ফ্রন্টে যুদ্ধ করার মত সামর্থ তাদের ছিলনা। ফলে প্রতিরোধকারীদের কাছে যশোর ক্যান্টনমেন্ট থেকে খুলনায় রিইনফোর্সমেন্ট আসা ঠেকানোই অগ্রাধিকার পায়। কিন্তু২৮ মার্চপ্রতিরোধ ব্যর্থ হলে ল্যান্স নায়েক সিদ্দিক শহরের দিকে পিছিয়ে আসেন এবং বেতার কেন্দ্র দখলের পরিকল্পনা করেন।

তবে খুলনা ছিল তাদের কাছে অপরিচিত শহর। পিছিয়ে এসে তারা বাগমারা মোতালেব মোড়ের কাছে এক অপরিসর কানা গলির মধ্যেঅবস্থাননিয়েছিলেনএবংছাত্রনেতাদেরসন্ধানেছিলেন। তারা শুনেছেন খুলনা বেতার কেন্দ্র শহর থেকে বেশ দূরে নির্জন এলাকায় এবং অরক্ষিত। বাগমারা মোড়েরএক চায়ের দোকানি ছাত্রলীগ নেতা মানিক ও মোহাব্বাতকে তাদের কথা জানায়। মানিকরা তখনঅসম্ভব ভারী গুলির পেটি মাথায় বয়ে বিল ভেঙ্গে বয়রায়প্রতিরোধ যোদ্ধা কুতুব সাহেবেরকাছে পৌঁছে দিয়ে ঘরে ফিরছিল। তারা ছিল খুবই ক্লান্ত, হতাশএবং বিমর্ষ। বয়রার প্রতিরোধ তখন ভেঙ্গে পড়েছে। তারা গলিতে ঢুকে দলটির সাথে দেখা করে এবং ছাত্রলীগ নেতা জাহিদুর রহমানের কাছে খবর পাঠায়।

জাহিদের বাড়ি ছিল কাছেই সফেদা তলায়। সেদ্রুত মটর সাইকেল নিয়ে বাগমারার মোড়ে চলে আসে। ল্যান্স নায়েক সিদ্দিক তখন নিজের পরিচয় দিয়ে বলেন আমরা আজ রাতেই বেতার কেন্দ্র আক্রমণ করবো, আপনাদের একটু সহযোগিতা দরকার।আপনারা শুধু আমাদের জায়গাটা চিনিয়ে দেবেন।এলাকার একটা ম্যাপ করে দিলে সবচেয়ে ভাল হয়। তবে আগে কিছু খাবার দরকার। প্রায় সারা দিনই সবাই না খেয়ে আছি।

জাহিদ বলল, সে ব্যবস্থা অবশ্যইহবে। কিন্তু আজ রাতে এত অল্প লোক নিয়ে কিভাবে বেতার কেন্দ্র আক্রমণ করবেন? যতদূর জানি ২৬ মার্চ থেকেই ওরা ওখানে শক্তিবাড়িয়েছে। চারপাশে ট্রেঞ্চ কেটেছে। ছাদে বালির বস্তার আড়ালে মেশিনগান ফিট করে পুরো যুদ্ধ প্রস্তুতি নিয়ে বসে আছে। ওটা এখন একরূপ দুর্ভেদ্যই বলা যায়। চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র দখল করে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণা প্রচারের পর থেকেই ওরা সতর্ক হয়ে আছে। এত অল্প লোক নিয়ে কিছু করা যাবেনা, বরং তা আত্মহত্যার সামিল হবে।

– আমাদের উপায় নেই ভাই। আমরা যখন বাহিনী ছেড়ে বেরিয়েছি প্রতিজ্ঞা করেছি স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করব, হয় জয়ী হব নয়তো শহীদ। কোন বিকল্প নেই। আমাদের সাথে আপনাদের আসতে হবে না, শুধু এলাকার একটা স্কেচ করে দিন এবং ওদের শক্তি সম্পর্কে একটা ধারণা দিন।

– শুনুন রেডিও সেন্টার আক্রমণের চিন্তা আমাদের মাথায়ও আছে। খুলনা এখন নিরাপদ নয়, আমরা সবাই রূপসার ওপারে সংগঠিত হওয়ার চেষ্টা করছি। আপনারাও আমাদের সাথে চলেন। ওখানে কামরুজ্জামান টুকু, খায়বার সাহেব সবাই আছে, যা করার একসাথেই করা যাবে।

মা-বোনের চোখের জলে সিক্ত হল যোদ্ধাদের ডাল-রুটি

বয়রার প্রতিরোধ ভেঙ্গে পড়েছিল দুপুরের পরপরই। ল্যান্স নায়েক সিদ্দিকের দলটি পিছিয়ে এসে বাগমারায় আশ্রয় নিয়েছিল। সেখান থেকেতারা মিয়াপাড়ায় এসেছিল জাহিদ ও মানিকের সাথে। সংখ্যায় ২০-২২ জন হবে। এদের মধ্যেঢ্যাঙ্গা মত পেটানো শরীরের সৈনিকটাই সিদ্দিক মিয়া। তার পেশীবহুল হাতের মুঠোয় থ্রিনটথ্রি রাইফেলের নলটা শক্ত করে ধরা। অন্যেরা অপেক্ষাকৃত খাটো। একজন বেশ স্থুল, ভুড়িটা কিছুতেই বেল্টের শাসনে থাকতে চাইছিলনা, তার রাইফেল কাঁধে। পাঁচ মিশালী একটা দল। কেউ ইপিআর, বেশির ভাগই পুলিশ এবং আনসার। তাদের অস্ত্রগুলি খুবই মামুলি- সব কটাই থ্রিনটথ্রি রাইফেল।

দলটা দাঁড়িয়ে ছিল মিয়াপাড়া রোড যেখানে পূব-দক্ষিণে টার্ন নিয়েছে সেই কর্ণারে। মোড়টানির্জন, কোণায় একটা টিনশেড দোকান ঘর,অনেকদিন ধরে বন্ধ। দোকানের পাশে ঘুপচিরমত সামান্য ফাঁকা জায়গা রেখে পশ্চিমে সীমানা প্রাচীর। জায়গাটা অন্ধকার। পাশে পিছনে গাছপালার অধিক্য। প্রায়ান্ধকার ঘুপচির মধ্যে ওরা নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে ছিল। এক একটা লম্বা ছায়া যেন। খুব কাছ থেকে না দেখলে চেহারা বোঝা যায় না।

আমাদের বাড়ি থেকে দুটো বাড়ির পরেই জায়গাটা। আমাকে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে এসেছিল জাহিদ এবং মানিক।জাহিদ লম্বা ছিপছিপে লোকটাকে বলল, সিদ্দিক ভাই এদিকে আসেন। আমার সাথে পরিচয় করিয়ে দিল– ইনি সিদ্দিক সাহেব, ইপিআর-এরল্যান্স নায়েক, বয়রার প্রতিরোধ ভেঙ্গে পড়লে পিছিয়ে এসেছেন। তারা দল ছেড়ে এসেছেন, ফিরবেন না, শেষপর্যন্তলড়বেন।আমরা ওনাদের পেয়েছি বাগমারায় মোড়ে এক কানা গলিতে। তারাখুলনা বেতার কেন্দ্র আক্রমণের প্ল্যান করেছিলেন। আমরা মানা করেছি, বেতার কেন্দ্র খুবই সুরক্ষিত, এত অল্প লোক নিয়ে আক্রমণ আত্মঘাতি হবে। রূপসার ওপারে আমাদের আরো লোক আছে। কাল ভোরে তারাও সেখানে যাবেন, রাতের মত আশ্রয়ের ব্যবস্থা হয়েছে, কিন্তু খাবারের ব্যবস্থা নেই, কোন হোটেলও খোলা নেই। তোমার বাড়িটা ভিতরের দিকে, লোক জানাজানি কম হবে তাই বলা। জাহিদ প্রত্যাশা নিয়ে তাকালো।

মিয়া পাড়ায় আমাদের বাড়িটা শহরের একেবারে দক্ষিণপ্রান্তে। পিছনে দিগন্তপ্রসারী বিল রূপসা নদী ছুঁয়ে থমকে দাঁড়িয়েছে। ভরা জোয়ারে স্টিমারের সার্চ-লাইটের তীব্র আলো সরাসরি আমাদের বাড়ির উপর এসে আছড়ে পড়ে। পাড়াটা একটা ঘোঁচের মত। দু পাশে টুটপাড়া আর বেনেখামারের ভিটে জমি দক্ষিণে বিলের মধ্যে আরো কিছু দূর নেমে গেছে। ফেরিঘাট রোড থেকে একটা মাটির রাস্তা পিটিআই-এর পূবপাশ ঘেষে একে-বেঁকে আমাদের বাড়ির সামনে ত্রিমোহনায় এসে মিশেছে। রাস্তার দুপাশে কয়েক ঘর চাষী, গাড়োয়ান এবং দিনমজুরের বিরল বসতি। সর্বত্র উচু-নিচু মাটি এবং ঝোপঝাড়ের আধিক্য। এখন ধীরে ধীরে নতুন বসতি গড়ে উঠছে। আমরাও এ দলে পড়ি। পাড়াটা নির্জন। এখন সেটা ভৌতিক পর্যায়ে গেছে। এখানে আমাদের বাড়ির আশেপাশে কয়েক ঘর জামাত ও মুসলিম লীগ সমর্থকের বসবাস। তবে প্রথম প্রথম অনিশ্চয়তা থেকে তারাও আর্মির ভয়ে তটস্থ থাকতো। আমাদের ভয় তো সঙ্গত কারণেই। পরে আমাদের ভয়টা হুহু করে বাড়তে থাকে আর্মি তো বটেই, তাদের কারণেও।

সিদ্দিক সাহেববললেন–ভাই, দু দিন যুদ্ধের মধ্যে ছিলাম, খাবার পেতে অসুবিধা হয়নি। তবে ওদের উন্নত অস্ত্রের মুখে আমরা টিকতে পারিনি, আশেপাশের লোকজনও প্রাণভয়ে ভিতরের দিকে পালিয়ে গেছে, হোটেল রেস্টুরেন্টও খোলা নেই। দুটো করে রুটি, সামান্য একটু ডাল হলেই আমাদের চলে যাবে।

এ এমন এক অনুভূতি ব্যাখ্যাতীত, আমাকে কাঁপিয়ে দিয়ে গেল। জাহিদকে নিয়ে দ্রুত বাড়ি ফিরে এলাম। বাবার সাথে কথা বলতে হবে। বেশ কিছু দিন থেকে তার সাথে আমার দূরত্ব। ভয় ছিল, কসাই টিক্কার সব কিছু তাবা করে দেয়ার হুমকি তাকে হয়ত দ্বিধাগ্রস্ত করতে পারে। বিশেষত আমাদের বাড়ির তিনপাশে ডাইহার্ড পাকিস্তানিদের বসবাস। মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য ডাল-রুটি বানানোর ব্যাপারটা মোটেও গোপন থাকবে না।

মার্চের তপ্ত গরমে বাবা পুকুর ঘাটে বসেছিলেন, কথাগুলো তাকে গুছিয়েও বলতে পারিনি। দ্রুত উঠে ঘরে এসে পকেট হাতড়ে যে কটা টাকা ছিল বের করে দিলেন, বললেন–পাড়ায় খুঁজে দেখো, ডিম পাও কিনা, রুটি-ডালেরসাথে ডিম ভাজিও নিয়ে যাও। মাকে বললেন সবাইকে ডাকো, পঞ্চাশ ষাটটা মোটা রুটি, ঘন ডাল এবং ডিমভাজি রেডি করে দিক জলদি, যেন হৈচৈ না হয়।

বাড়িতে তখন অনেক লোক। কিছুটা ভিতরের দিকে হওয়ায় শহর ছেড়ে আত্মীয়রা কেউ কেউ এসে আমাদের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছেন। মেয়ে এবং বাচ্চারাই বেশী।হঠাৎ করে গোটা বাড়ির পরিবেশ বেদনার্ত হয়ে উঠল। ওরই মাঝে নিঃশব্দে হাতে হাতে তাওয়া, খুন্তি, কড়াই, আটা, লবণ, তেল, ডাল, পিঁয়াজ রান্না ঘরে জড় করা হল, চুলো জ্বালানো হল। বোনেরা যেয়ে পাশের বাড়ি থেকে তাওয়া, বেলুন পিড়ে চেয়ে নিয়ে এল। তারা বিস্মিত হল, কিরে তোদের বাড়িতে আরো লোক এসেছে নাকি! ওরা জবাব না দিয়ে নিরব থাকল।

তখন ডিম এত সহজলভ্য ছিলনা। তবেপাড়ার আশেপাশে বেশকিছু মেহনতি মানুষের বসতি ছিল, দুটো বাড়তি পয়সার জন্য তারা হাস মুরগি পুষতো। তিন চার বাড়ি ঘুরে আমি তের চোদ্দটা ডিম পেলাম।এই অসময়ে ডিমের সন্ধান করতে দেখে কেউ বিস্মিত হলনা, বলল–হয়, হুনছি আপনাগো বাড়িত্ মেলা আত্মীয় কুটুম্ব আইয়া উঠছে। যখন ডিম নিয়ে ফিরলাম আমাদের বড়সড় মাটির রান্না ঘরেতখন নিরব ব্যস্ততা। হাত লাগিয়েছে সবাই, বাড়ির মেয়েদের সাথে অতিথি মেয়েরাও।চুলো এবং কুপির ম্রিয়মান আলোয় রান্নাঘর জুড়ে এক মায়াবী কষ্টের পরিবেশ। মাটির অসমান মেঝেতে আলোছায়ার অপরূপ খেলা। কারো মুখে কথা নেই, ভূতগ্রস্থের মত কাজ করছে সবাই। কেবল চুড়ির রিনিঝিনি শব্দ আর অমসৃণ মেঝেতে বেলন-পিঁড়ির খটখট শব্দ ছাড়া কোন শব্দ নেই। কথা বলার উপায়ও নেই হয়ত, সবাই উদ্গত কান্না সামলাতে ব্যস্ত।নাছিম-আমার বোন হঠাৎ বাষ্পরুদ্ধে কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল– ওদের সবাইবেঁচে আছে তো ভাই? ওরা কেউ আহত হয়নি তো? ওরা কি পারবে আর্মিদের সাথে? ওরা কি সারা দিন না খেয়ে আছে?–কত প্রশ্ন!তার কণ্ঠ ধরে এলো, চোখের কোণে অশ্রু ধারা। তারপর হঠাৎ সেডুকরে কেঁদে উঠল।কান্না সংক্রামিত হয়, আগে থেকেই সবার চোখের কোণে অশ্রুবিন্দু টল টল করছিল, মুহূর্তে বাঁধভাঙ্গা কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল সবাই।চোখের সেই লোনাজল আর হৃদয় নিংড়ানো মমতা ভালবাসা সব একাকার হয়ে মিশে গেল অচেনা-চিরচেনা মুক্তি সৈনিকদের জন্য বানানোরুটির খামির, ডাল আর ভাজির সাথে। আমার তো কান্না সাজেনা! দ্রুত রান্নাঘর ছেড়ে বাইরে অন্ধকারে পালিয়ে এলাম।

প্রায় ঘন্টা দুয়েক পরে একটা রিকশা নিয়ে এসে জাহিদ এবং মানিক রুটি ডাল ডিমভাজি নিয়ে গেল। যাবার আগে বলল– জানিনা তুমি কি ভাবছো, তবে আমরা সবাই আপাতত সহর ছেড়ে চলে যাচ্ছি। এখানে তুমিও টিকতে পারবে বলে মনে হয়না। আর্মিরা হয়তো ঘরে ঘরে যেতে পারবেনা, কিন্তু বিহারীরা যাবে। বাঙালিদের মধ্যেও দালাল কম না, কারা কি করে বলা মুশকিল। সাবধানে থেকো, আল্লা ভরসা। কে জানে আবার কখনো দেখা হবে কিনা।

ওরা গর্ত থেকে একপা-দুপা করে বেরিয়ে এলো

২৯ তারিখ থমথমে অবস্থায় কাটল। ৩০ তারিখ সকালে শহরের রাস্তায় আবার কিছু কিছু লোক দেখা গেল। এখানে ওখানে দু'চার জন করে কৌতুহলী মানুষের জটলা। পাড়ায় দু'চার জন জামাত ও মুসলিম লীগ কর্মী আছে। কম লোকই তাদের চিনতো, চুপচাপ কাজ করে। এখন দারুণ তৎপর। মাঝে মাঝে গম গম আওয়াজ তুলে আর্মি ভেহিকেল রাজপথ দিয়ে ছুটছে। নিস্তব্ধ শহরে অনেক দূর থেকে আওয়াজ পাওয়া যায়। পড়ন্ত বেলায় একটা ভারি ট্রাক মাথায় মেশিনগান ফিট করে সদর্পে আমাদের বাড়ির সামনে দিয়ে টুটপাড়ার দিকে চলেগেল,দখলিস্বত্ব কায়েম করে গেল সম্ভবত। গাড়ির শব্দে আমরা সচকিত হই। বিড় বিড় করে সুরা দোওয়া দরুদ পড়তে থাকি।গর্তের জীবগুলোর সাহস বাড়ে। উল্টোটা ঘটে সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে। তারা পাড়ার লোকদের আতঙ্কগ্রস্ত করে তুলতে ভালই অবদান রাখে। ফিস ফিস করে বলে বেড়ায় কাউকে বিশ্বাস করবেন না ভাইজান, কারো কথায় কান দেবেন না, কাউকে কিছু বলতেও যাবেন না। আর্মিরা নাকি লোকজনের মধ্যে এজেন্ট ছড়িয়ে দিয়েছে, তারা খবরাখবর পৌঁছে দিচ্ছে। কেউ প্রশ্ন করেনা এই এজেন্টগুলো কারা। তারা সাহস পায়না। ভয়ে একেবারে চুপসে গেছে। আমি এখন এই জটলাগুলো উপেক্ষা করি।দুর্ভাগ্যক্রশে এদের তৎপরতার ফল একেবারে সরাসরি আমার ঘাড়ের উপর এসে পড়ে।

বাবা মগরিবের নামাজ পড়ে ফিরছেন। সামনে একজন কর্মী, বাবা তাকে ভালই চেনেন, পাড়ার এক নিরীহ ভদ্রলোককে তালিম দিতে দিতে যাচ্ছেন। বাবা সামান্য পেছনে। ভদ্রলোকের মনে সংশয়– সত্যি কি ইন্ডিয়ান এজেন্টরা আসে এখানে!

আসে মানে! আমার স্বচক্ষে দেখা ঐ যে সামনে ডান পাশের বাড়িটা দেখেন না গভীর রাতে ওখানে ইন্ডিয়ান এজেন্ট আসে, একদিন না, দু তিন দিন দেখেছি আমি, নির্বাচনের সময়। স্পাইটাকেও চিনি, হিন্দু, পুলিশের সন্দেহভাজন তালিকায় নাম আছে।

বলেন কি!সামনের ও বাড়িটাতো কায়ছার সাহেবের বাড়ি, তার মত ভাল মানুষ পাড়ায় কজন আছে, আপনার কোথাও ভুল হচ্ছেমনেহয়।

আমি তো কায়ছার সাহেবের কথা বলিনি, উনি ভাল মানুষ, কিন্তু ছেলেদের ওপর ওনার কন্ট্রোল নেই। স্পাই আসে ওনার বড় ছেলের কাছে। ওনার মেজ ছেলে আবার এয়ার ফোর্সে চাকরি করে। বোঝেন অবস্থা, আমাদের এয়ার ফোর্সের খবরাখবরও পাচার হয়ে যায় কিনা কে জানে।

বাবা আতঙ্কে একপা দুপা করে আরো পিছিয়ে অন্ধকারে মিশে যান। ওরা এগিয়ে গেলে ঘরে এসে আমাকে বললেন– এরা কি বল্ছে মনোয়ার!বাড়িতে তো টিকতে দেবে বলে মনে হয়না।

বললাম– আব্বা, এরা নিশ্চয় সুশান্তর কথা বলছে, নির্বাচনের সময় সালাহউদ্দিন ভাই মাঝে মাঝে জরুরি কাজের জন্য তাকে আমার কাছে পাঠাতেন। দু দিন সে বেশ রাতকরে এসেছিল, এখন লোকটা সেটাকে এভাবে কালার দিচ্ছে। আব্বা আপনি বরং সেজচাচাকে বলে রাখেন,তিনি বলে দিলে এরা উল্টপাল্টা কথা বলা বন্ধ করতে পারে।সেজচাচা মুসলিম লীগ সমর্থক এবং সবুর সাহেবের সাথে তার ভাল সম্পর্কের কথা সবাই জানে। ত সত্ত্বেওআমাকে বেশ কয়েকদিন টেনশানে কাটাতে হল, সেজচাচার ধমকও খেতে হল।

আলতাপ গলির গণহত্যা

হিন্দুদের উপর জাতিগত নিপীড়ন শুরু হতে যাচ্ছে–এমন একটা গুজবখুব দ্রুত চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল।পূর্বপাকিস্তানের পবিত্র মাটিতে ওদের স্থান হবে না। এটা সত্য না গুজব সে সম্পর্কে কেউই নিশ্চিত ছিল না। স্বভাবতই হিন্দুরা আতঙ্কিত হল এবং একে ওকে ডেকে কথাটা কতদটুকু বিশ্বাসযোগ্য জানতে চাইল। যাদের জিজ্ঞসা করা হল তারাও নিশ্চিত জানেনা, তবে শুনেছে। ১ এপ্রিল প্রথম প্রহরে অবশ্য সব জল্পনা কল্পনার অবসান ঘটল। গত রাতে একটা আমি ভ্যান এসে দাড়িয়েছিল সাউথ সেন্ট্রাল রোডে নকুলেশর সাহার বাড়ির সামনে।বাড়ির নিচ তলায়ভাড়া থাকতো মাখন লাল রায়। স্টার জুট মিলে আমাদের সাথে চাকরি করত। কম্পটিস্ট ছিল, তবে তার কাজের উপর আস্থা রাখা যেতনা।তাকে সরল ও বোকাটে টাইপের মনে হত এবং মিলের অফিসার মহলে তার বিশেষ খাতির ছিল।সে সবার সাথে মিশত এবং সর্বত্র তার অবাধ যাতায়াত ছিল। নিষিদ্ধ রমনী, বিদেশী মদ, সিগারেট ও জাপানি শাড়িতখন বেশদুর্লভ।তবে সে এসবের হদিস রাখত। মাঝরাতে দরজায় ধাক্কাধাক্কি ও বিজাতীয় কণ্ঠস্বর শুনে রায় দ্রুত দরজা খুলে সামনে আর্মি দেখে পাক্কা মুসলমানের মত সালাম দিয়ে সে তাদের ভেতরে আহ্বান জানালো।

তারা বসার জন্য আসেনি, বিকৃত উচ্চারণে নকুলেশ্বরসাহার কথা জানতে চাইল।

হা ঠিক হ্যায়, ইয়ে মাকান কা মালিক। উপার মে রাহেতে হ্যায় স্যার?

তোম কোন?

মাখন লাল রায় স্যার, ইয়ে ঘরমে কেরায়া রাহাতা হ্যায়।

ঠিক হ্যায়, জলদিজামা পিন্ধকে আও, আউর মালিককি পাসচলো।

নকুলেশ্বর বাবুকে পাওয়া গেলনা। ওরা সব কটা ঘর খুঁজল।ঘরে নকুলেশ্বর সাহার স্ত্রী, তার দুই ছেলে এবং তাদের স্ত্রীরা ছিলা। রাজনীতির সাথে তাদের কোন সম্পর্ক ছিলনা। কিন্তু তারা নকুলেশ্বর সাহার দুইপুত্রঅজিত, সুজিত এবং রায়কে উঠিয়ে নিয়ে গেল। নকুলেশ্বর বাবুরস্ত্রী আকুল হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন– ওদের কোথায় নিচ্ছেন বাবা?

ডরো মৎ, কর্নেল সাব সালাম দিয়া। আপকা কমুনিটিকা সাথ কুছ বাৎচিৎ করেগা। জলদি ওয়াপাস আ জায়গা আপকা লাড়কা। ওরা একটা লিষ্ট বের করল এবং রায়কে বলল– ইয়ে সব আদমীকা পাস লে চলো।রায় খুব সিগারেট খেত।ভ্যানের পিছনে ওঠার আগে সে সিগারেট ধরালো এবং পিছনেপ্রহরারত মধ্যবয়সী গার্ডকে সিগারেটের প্যাকেট অফার করল।এক সুঠামদেহী লোক ভ্যানের এক কোণে চুপচাপ বসা ছিলেন। পরিচয় করতে চেষ্টা করেও রায় ব্যর্থ হল এবং হাল ছেড়ে দিল। তারা শহরের বিভিন্ন স্থানে ঘোরাঘুরি করেআরো জনা তিনেক হিন্দুকে পেল। এরাকেউই রাজনীতি করতেন না।এদের মধ্যে একমাত্র সুপরিচিত ব্যক্তি ছিলেন মহাদেব চক্রবর্তী। তিনি আবার মুসলিম লীগ নেতা খান সবুরের অনুচর বলে পরিচিত ছিলেন। লোকে বলত গ্লাস পার্টনার। তার বাড়ি ছিল একই রাস্তায়। রায় তাকে বলল– আসেন কাকা, কর্নেল সাহেব ডেকেছেন, আমাদের কমুনিটির সাথেআলোচনা করবেন। মহাদেব চক্রবর্তী ব্যাচেলর ছিলেন, কিছুটা বিস্মিত হলেন।

জিপটা শহরের বিভিন্ন এলাকা ঘুরে ফের সাউথ সেন্ট্রাল রোডে আলতাফ গলির মুখে এসে দাঁড়ালো। মোড়ের মাথায় পশ্চিমে কিছুটা ফাঁকা জায়গা।গলির বিপরীতে দাউদ ফার্নিচারের পাশে সংকীর্ণ ড্রেন। ওরা সবাইকে ভ্যান থেকে নামিয়ে ড্রেনের পাশে দাড় করালো।আর্মিরা নেমে আশে পাশে ছড়িয়ে পড়েছিল। ক্যাপ্টেনওয়াকিটকিতে কারো সাথে দুর্বোধ্য ভাষায় কথা বলছিল। তদেরকারোর মধ্যে আগেকার সহজ ভাবটা ছিলনা। তারা ক্রমাগত দুঃশ্চিন্তার মধ্যে তলিয়ে যাচ্ছিল। একজন আর্মি হঠাৎ বলে উঠল– এতনা গমগিন কিউ, হাসো আরে ভাইহাসতে রহ। হাসার হুকুম হয়েছে, তারা হে হে করে হাসতে চেষ্টা করল। সেটা শোনালো কাষ্ঠ হাসির মত।

ওয়াকিটকিতেকথা শেষ করে ক্যাপ্টেন হঠাৎ ওদের দিকে তাকিয়ে ক্রুদ্ধ গলায় হুকুম দিল– ফল ইন! দুজন সৈন্য সাথে সাথে রাইফেল নিয়ে পজিশন নিল। রায় ফল ইনের অর্থ বোঝেনি, সে ফ্যাল ফ্যাল করে মহাদেব চক্রবর্তীর দিকে তাকালো। তিনি বললেন– ভগবানের নাম কর বাবা, আমাদের বোধহয় ওপারের ডাক এসেছে। সৈন্যরা টেনে হিচড়ে ওদের লাইনে দাঁড় করালো। রায় শুধু দেখলো সেই মাঝবয়সী সৈন্যটা

ক্রুদ্ধভাবেছুটে এলো এবং তার তলপেটে সজোরে বুটের লাথি হাঁকিয়ে চিৎকার করে উঠল– ঠিকছে খাড়েরহো শালে। তারপর একটানা গুলির শব্দ।রায় আর কিছু জানেনা।

শেষ রাতের দিকে শীতল বাতাসের স্পর্শে তারজ্ঞান ফিরল। সে অনুভব করল তার গায়ের উপর ভার চেপে আছে। চোখ মেলে শরীরের উপর মানুষ দেখে সে চমকে উঠল। সে তাহলে মরেনি। ধীরে ধীরে গত রাতের সব ঘটনাই তার মনে পড়ল। এক প্যাকেট সিগারেট তার জীবন বাঁচিয়েছে। সৈন্যটা নিমক হারামী করে নি, গুলি করার আগে লাথি মেরে ফেলে দিয়ে তাকেবাঁচিয়েছে।

রায় শরীরের উপর থেকে লোকটাকে সরানোর চেষ্টা করল, কাঠ কাঠ হয়ে আছে দেহটা। রক্ত শুকিয়েদুজনের শার্ট প্যান্টজাগায় জাগায় শক্ত হয়েজুড়ে আছে। সেসোজা হয়ে দাঁড়ানোর সাহস পেল না। প্রায় হামাগুড়ি দেয়ার মত করে কোনভাবে রাস্তা পার হয়ে কাটা তারের বেড়ার ফাঁক গলে সে ওপাশের বাগানে ঢুকে পড়ল। তখন শহরে সর্বত্র প্রচুর ঝোপ জঙ্গল ছিল। সেতার মধ্য দিয়ে দক্ষিণ দিকে পালিয়ে যেতে চেষ্টা করল। প্রথমে দিশেহারা হলেও ধীরে ধীরে তার মাথা কাজ করতে শুরু করেছিল। সে নিশ্চিত ছিলনা কিভাবে কখন গোরস্থানের পাশে এসে পড়েছে। সে দ্রুত গোরস্থানে ঢুকে পড়ল এবং পুকুরের শীতল জলে অনেক্ষণ গলা পর্যন্ত ডুবিয়ে নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে থাকল। ভোরের আজানের শব্দে তার সম্বিত ফিরল। দ্রুত জামা কাপড় ডলে রক্ত পরিস্কার করে সে উঠে এলো এবং হাজী মহসীন রোডের দিয়ে তার বাসার উদ্দেশ্যে পা বাড়াল। কিন্তুশীঘ্রই সে প্রচন্ড দোটানার মধ্যে পড়ে গেল। সাউথ সেন্ট্রাল রোডের গত রাতের দুঃসহ স্মৃতি তাকে তাড়া করে ফিরছিল,পাশাপাশিনকুলেশ্বর সাহার স্ত্রী ও তার পুত্রবধুদেরসামনে দাঁড়ানোর চিন্তা তাকে সবচেয়ে বেশি আতঙ্কিত করে তুলেছিল। সে সিদ্ধান্ত পাল্টালোএবং অবনত মস্তকেপিছন ফিরে ধীরে ধীরে রূপসা ফেরিঘাটের দিকে রওনা দিল। আমরা এই ঘটনার কথা আমরা জানতে পারি বিস্ময়করভাবে বেঁচে যাওয়া রায়ের মুখে যখন বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর সে মিলের চাকরিতে ফিরে এসেছিল।

এখন আর কেউ কাউকে সুধানোর প্রয়োজন মনে করল না যে গুজবটা সত্য কিনা। ৫টা লাশ তখনো পথের পাশে কালচে রক্তের মধ্যে এলো মেলো পড়ে আছে। গত মধ্য রাতে যারা গুলির শব্দ শুনেছিল তারা বিস্মিত হয়েছিল। এ শব্দ থ্রিনটথ্রি রাইফেলের ট্যাশ ট্যাশ শব্দ ছিলনা, ছিল কোন স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রের যার সাথে খুলনাবাসীর কমই পরিচয় ছিল। ভোরে সাহস করে কেউ কেউ শব্দের উৎসের সন্ধানে বেরিয়ে আলতাপ গলির মুখে লাশগুলো দেখতে পেল। তারা যার পরনাই ভীত এবং বিমর্ষ হয়ে পড়ল। একমাত্র হিন্দু হওয়া ছাড়া এই নির্বিরোধ মানুষগুলোরহত্যাকাণ্ডের পিছনে আর কোনো কারণ খুঁজে পেলনা কেউ। এখন সবাই নিশ্চিত যে আর্মিরা হিন্দু কমুনিটির কাছে সেই ভয়াবহ ম্যাসেজটাই পৌঁছে দিয়েছে।

সেদিন কোন হিন্দুর বাড়িতে উনুন জ্বলল না। তারা অশ্রুজল মুছতে মুছতে অতি প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র গোছগাছ করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল এবং যে যত দ্রুত পারে বাড়িঘরে তালা দিয়েশহর ছেড়ে বেরিয়ে গেল। কোন কোন পাড়া একেবারে ফাঁকা হয়ে গেল।এক অদ্ভুৎ নৈশব্দের মধ্যে খুলনার ভেতরের পথ-ঘাট, অলি-গলি অস্বাভাবিক রকম চঞ্চল হয়ে উঠল। কাঁধে মাথায় কাঁকে যে যতটুকু পারে বোঁচকা বুঁচকি বাচ্চা-কাচ্চা নিয়ে নারী পুরুষ বৃদ্ধ বৃদ্ধা শিশু কিশোর সবাই ছুটল ভৈরব, রূপসা, কাজীবাছা নদীর ওপারে তেরখাদা, রূপসা, ডুমুরিয়া, বটিয়াঘাটার দিকে। পালাতে হবে। নদীর ওপারে বা গ্রামে গেলে হয়তো বা বাঁচা যাবে।খুলনা নিস্তব্ধ হয়ে গেল।আমাদের বাড়ির সামনে পলায়নপর মানুষের কাফেলা। লোকজন অবিরাম ছুটছেরূপসার দিকে। আর্মির ভয়ে মূল রাস্তা ফেলে বেনেখামার-মিয়াপাড়া-টুটপাড়ার ভেতরের পথ বেছে নিয়েছেসবাই। তবে কেউই তখন আর্মিদের সহজ-সরলবার্তাটা বুঝতে পারেনি, এতটাইঅবিশ্বাস্য ছিল বার্তাটা। যদি পারত এদিক-ওদিক ছোটাছুটি না করে সবাই তখন সোজা সীমান্তের পথ ধরত।

শংকা এবং গভীর দুঃশ্চিন্তা নিয়ে বেরিয়ে এলাম। পিটিআই মোড়ে পৌছে দেখি ফেরিঘাট রোডে তুলনা মূলকভাবে লোকজন কম। কিছু রিকশা ব্যস্তভাবে সওয়ারী ও মালপত্র নিয়ে রূপসা ঘাটের দিকে ছুটছে। মোড়ের মাথায় দাঁড়িয়ে কিছু লোক গতরাতের অভাবিত ঘটনা নিয়ে চাপাস্বরে আলোচনা করছে। যারা পাকিস্তানপন্থী তারাও বিষয়টি মেনে নিতে পারেনি। সবার ললাটে দুঃশ্চিন্তার বলি রেখা- কি আছে ভবিষ্যতে। আহসান আহমদ রোড দিয়ে এগিয়ে গেলাম। করনেশন গার্লস স্কুলের সামনে এসেসাউথ সন্ট্রল রোডের দিকে টার্ন নিলাম। আমি চিন্তাক্লিষ্ট ছিলাম,আহত রক্তাক্ত মানুষ দেখলে আমার মাথা ঘুরে যায়, সেখানে গুলিতে ঝাঁঝরা হওয়া ৫-৬ টা লাশ জমাটবাঁধা রক্তের মধ্যে পড়ে আছে এমন দৃশ্য আমার অনেক রাতের ঘুম হারাম করে দিতে পারে। আমি ভয় পেলাম এবং দিক পাল্টে কমার্স কলেজের সামনে দিয়ে আহসান আহমদ রোডে ফিরে এলাম। আমার লক্ষ্য সুশান্তদের বাড়ি।

একটা বিষয় আমাকে খুবই অবাক করল। এতবড় ঘটনার পরও শহরে কার্ফু দেয়নি আর্মিরা এবংপথে বেরিয়ে আজই প্রথম ওদের টহল চোখে পড়ল না। তারা কি এটাই চায় যে, সবাই লাশগুলো দেখুক এবং শহর– নাকি দেশ ছাড়ুক?–সব কেমন জানি অবিশ্বাস্য মনে হয়!হঠাৎ বিদ্যুৎ চমকের মত আমাদের মিলের বেল্লাল সহেবের নির্বাচন পরবর্তী একমন্তব্য আমার মনে উদয় হল। সে বলেছিল– হিন্দু ভোটের জোরে আওয়ামী লীগ জিতেছে, পাকিস্তানের তরক্কি হোক ওরা কখনো চায় না, অতএব ভারতের দালাল আওয়ামী লীগকেই তারা ভোট দিয়ে যাবে এবং আপনারাই জিততে থাকবেন।

বললাম আপনি নিশ্চয় কাগজে বিভিন্ন দলের প্রাপ্ত ভোটের হিসাব দেখেছেন। আওয়ামী লীগ শতকরা পচাত্তর ভাগ ভোট পেয়ে জিতেছে। আর দেশে হিন্দুর সংখ্যা সর্বোচ্চ পনেরো ভাগ। অতএব ভেবেচিন্তে মন্তব্য করা ভাল।

তার একই জবাব– হিন্দুরা যতদিন এ দেশে আছে আপনাদের হারায় কে ? এখন মনে হল কথাটা মোটেও একজনতুচ্ছ বেল্লালের নয়, এর শেকড়অনেক গভীরে প্রোথিত।

সুশান্তদের বাড়ির সামনে এসে দেখলাম দরজায় বিশাল এক তালা ঝুলছে।প্রচণ্ড ধাক্কা খেলাম। তালার দিকে নিষ্পলক তাকিয়ে ছিলাম। পাশে টিনের ঘরে হাসিবরা ভাড়া থাকতো, বেরিয়ে এসে আমার হাতে একটা চিঠি দিয়ে বলল– ডাবলু আপনাকে দিতেবলে গেছে,খুবই তাড়াহুড়া করে বেরিয়ে গেছে ওরা। পেন্সিলে লেখা– ভাই, আপাতত নদীর ওপারে মায়ের এক আত্মীয়ের বাড়িতে যাচ্ছি, ঠিকানা পাঠাব, যত তাড়াতাড়ি পারেন দেখা করবেন। আমাদের কপালে কি আছেভগবানজানেন!

আশ্চর্য ক্ষিপ্রতার সাথে খুলনা শহর প্রায় হিন্দুশূন্য হয়ে গেল। মূল স্রোত পূবে রূপসার দিকে। উত্তরে তেরখাদার দিকে যাচ্ছে বহু লোক, যার যেখানে আত্মীয়-স্বজন বা পরিচিত জনরা আছে। হঠাৎ জোরে শোরে শহরে গুজব ছড়িয়ে পড়ল শুধু হিন্দু নয়, আওয়ামী লীগ-ছাত্রলীগের লোকজনও শহরে মোটেও নিরাপদ নয়। বিশেষকরে যুবকরা যারা প্রতিরোধ ও বেরিকেড দেয়ার কাজে অংশ নিয়েছিল তাদের নাম-ধাম পৌঁছে দেয়া হচ্ছে আর্মিদের কাছে।আর্মি এবং বিহারীরা আজ রাতেই নাকি অপারেশনে নামবে। তখন আর সত্যমিথ্যা যাচাইয়ের সুযোগ ছিলনা।

প্লাটিনাম জুট মিলের অনেক বাঙালি স্টাফ অফিসার নদী পার হয়ে প্রথমে সেনহাটি-চন্দনীমহল এবং পরে ফকিরহাটের সৈয়দমহল্লায় আশ্রয় নিয়েছিল।আমার সেজ ভগ্নিপতি নুরুল ইসলামও সেখানে একটা বাড়ি ভাড়া নেয়। প্লাটিনামের এক শ্রমিক খুলনায় এসে খবর দিয়েছিল, অসুবিধা হলে আমরা যেন সেখানে চলে যাই। আনোয়ার এয়ারফোর্সে ছিল, আগেই ফকিরহাটে চলে গিয়েছিল। এতবড় গুজবের পর আমিও শহরে থাকার সাহস পেলাম না।আমাদের নিয়ে বাড়িতেদুঃশ্চিন্তার শেষ ছিলনা। এ যেন উভয় সংকটে পড়া! আমি দুপুরের পরপরই এয়ার ব্যাগ কাঁধে ঝুলিয়ে বেরিয়ে পড়লাম।

অপরাহ্নে তখন রূপসামুখী মানুষের ঢল কিছুটা পাতলা হয়েছে, কিন্তু বন্ধ হয়নি। আমি নিরাপত্তার খাতিরে সবার মত ফেরিঘাট রোড পরিহার করেছিলাম এবং টুটপাড়ার ভিতর দিয়ে ঘুরপথ বেছে নিয়েছিলাম। সামনে এক পৌড়া মাথায় বড়সড় পোটলা নিয়ে নিঃসঙ্গ হাঁটছিলেন এবং ক্রমাগত পিছিয়ে পড়ছিলেন। বললাম আপনি একা, ছেলে মেয়ে নেই?

আছে বাবা। তারা এগিয়ে গেছে। আমি বুড়ো মানুষ, ওদের সাথে পাল্লা দিয়ে পারিনে।

যাবেন কোথায় ঠিক আছে ?

হ, আছে।

বললাম এত সব জিনিস নিয়েছেন কেন ? ওকড়া পর্যন্ত বাদ দেননি, আপনার সাধ্যের বাইরে বোঝা টানছেন।

কি করব বাবা। ঘর সংসার করতি কত জিনিস লাগে। থুয়ে গেলি ফিরেতো আর পাবুনি। খোকারা তো এসব জিনিস সহজে যোগাড়ও করতে পারবেনি, আমরা গরিব মানুষ বাবা।

প্রথমে কিছুটা রেগে গিয়েছিলাম। বুড়ির কথায় সম্বিত ফিরল। বোধ হয় এদের কথা ভেবেই রবি ঠাকুর লিখেছিলেন– 'অল্প লইয়া থাকি তাই মোর যাহা যায় তাহা যায়।'

বললাম দেন বোঝাটা। কিছুক্ষণ পর বুঝলাম কাজটা ভাল করিনি। এটা আমার অনভ্যস্ত কাধের জন্য অসম্ভব ভারি ছিল। এরকম ভার আরো কেউ কেউ বইছিল। সামনে একজন ধপাস করে মাথার বোঝাটা ফেলে দিয়ে সতৃষ্ণ নয়নে সেটার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল, তারপর খালি হাতে কাফেলার সাথে মিশে গেল। পথের পাশে এরকম আরো দু চারটে পরিত্যক্ত বোঝা দেখে আমার ভিতরও তেমন একটা ইচ্ছা তীব্র হয়ে উঠেছিল। কিন্তু ঐ যে রবি ঠাকুরের কবিতা! পথে দু চারটে রিকশার দেখা মিললেও তার সবই ছিল লোকজন এবং মালপত্রে ঠাসা। তবে শীঘ্রই ভাগ্য সুপ্রসন্ন হল, ফিরতি একটা রিকশাকে অতিরিক্ত পয়সা কবুল করে বোঝাসহ প্রৌড়াকে তাতে উঠিয়ে দিলাম।

আমরা বাগেরহাট লাইনের ধীরগতি ট্রেনে চেপে ঘাটভোগে পৌঁছালাম সন্ধ্যার পর। কাছেই সৈয়দমহল্লা। রাতে খবর পেলাম টুকু জাহিদ সহ সবাই আছে রূপসায়। সেখানে সংগঠিত হচ্ছে। পরদিন ভোরে রূপসায় এলাম। দিনের বেলাটা রূপসায় কাটত, রাতে থাকার জন্য ফিরে যেতাম সৈয়দমহল্লায়। পুরোনো বন্ধুদের সাথে আবার যোগাযোগ গড়ে উঠল, তবে সৃষ্ট দূরত্বটা কাটিয়ে ওঠা কঠিন ছিল।

৩ এপ্রিল টুকু বলল– খুব খোলামেলা জায়গায় আছি আমরা, খুলনা ইপিআর ক্যাম্পের মর্টার রেঞ্জের মধ্যে। যে কোন মুহূর্তে হামলা হতে পারে, তাতে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়ে যাবে। বাগেরহাটও নিরাপদ নয়। বৃহত্তর প্রস্তুতির জন্য আমাদের সীমান্ত পাড়ি দিতে হবে। যদি রাজি থাকো দ্রুত রেডি হতে হবে, হাতে বেশি সময় নেই। আমার সামনে বিকল্প ছিলনা।জানি শহরে আমি বাঁচতে পারব না, যুদ্ধে হয়তো পঞ্চাশ ভাগ সম্ভাবনা থাকবে। বুঝতে পারছিলাম আমি এখন সেই প্রক্রিয়ার মধ্যে পড়ে গেছি,যখন মানুষ সব ভয় এবং পিছুটান অতিক্রম করে যায় অথবা যেতে বাধ্য হয়। টুকুর সাথে কথা বলে আমি বাড়তি কিছু কাপড় এবং টাকা-পয়সার জন্য বিকালে বাড়ি গেলাম। এটা ভাল সিদ্ধান্ত ছিল না। আমি ব্যাগ গুছাতে গুছাতে বাড়িতে আমার অবস্থা ব্যাখ্যা করলাম– এখানে থাকলে বাঁচা কঠিন, ওপারে গেলে হয়ত পঞ্চাশ ভাগ সম্ভাবনা থাকবে।

মা ভেঙ্গে পড়েছিলেন, এক দিকে আমার জীবন অন্যদিকে বড় একটা পরিবার, বললেন– কেন যে রাজনীতিতে ঢুকেছিলি, আমরা এখন কিভাবে বাঁচব? মা হয়তো আমার চাকরির কথা ভাবছিলেন।

বললাম, হাজার হাজার বাঙালির কথা ভাবেন। তাদের মত করে আপনারাও বাঁচবেন। তখন অবশ্য কেউ ধারণাও করতে পারেনি মুক্তিযুদ্ধে যাওয়া একটা যুবকের পরিবারকে– বিশেষ করে তার বাড়ির যুবতী মেয়েদের কতভাবে নিগ্রহ করার পথই না জানে পাকিস্তানি পারভার্টেড জানোয়ারগুলো।

আমি সবার মুখের দিকে চেয়ে রাতটা বাড়িতে থেকে গেলাম। ভোর রাতে অবিশ্রান্ত গুলির শব্দে ধড়ফড় করে জেগে উঠলাম। এটা ছিল এক নতুন অভিজ্ঞতা, ভয় ধরানো। এত অবিশ্রান্ত গুলি আগে কখনো শুনিনি। মনে হল টুকুর আশংকায়ই বুঝি সত্য হল, আর্মিরা ইপিআর ক্যাম্প থেকে রূপসা মুক্তিযোদ্ধাদের অবস্থানে হামলা চালিয়েছে। একটু ধতস্ত হতে বোঝা গেল যে গুলির শব্দ আসছে রূপসা নয়, বিপরীত দিক থেকে। কি হতে পারে বোধে এল না। তবে এটা যে আর্মি এবং মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে যুদ্ধ তা পরিস্কার হল দু'ধরনের গুলির শব্দে। একদিকে থ্রিনটথ্রি রাইফেলের গুলি এবং হাতে বানানো বোমার শব্দ, অন্যদিকে স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রের বিরামহীন গুলি এবং সম্ভবত মর্টার দাগার শব্দ। ভোরের দিকে গুলির শব্দ স্তিমিত হয়ে এলো। বেলা কিছুটা বাড়লে পরিস্কার হল ভোররাতে যুদ্ধটা হয়েছে গল্লামারি বেতার কেন্দ্রে। মুক্তিবাহিনী খুলনা বেতার কেন্দ্র দখলের ব্যর্থ চেষ্টা নিয়েছিল।

বেতার কেন্দ্র আক্রমণ

খুলনা বেতার কেন্দ্র ছিল শহর থেকে বেশ দূরে। গল্লামারী ব্রীজ ছাড়িয়ে এখন যেখানে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়, সেখানেই ছিল বেতার কেন্দ্র। এই এলাকা তখন নদী খালবিলে ভরা ছিল, লোক বসতি ছিলনা বললেই চলে। একমাত্র পাকা সড়ক ফারাজীপাড়ার মোড় থেকে বেতার কেন্দ্র পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ব্রীজ পার হয়ে একটি সড়ক বটিয়াঘাটা এবং মূল সড়কটি ডুমুরিয়া চুকনগর অভিমুখে চলে গিয়েছিল। তবে নদী ও খালের আধিক্যে এ পথে তখন যানবাহন চলাচল শুরু হয়নি।

খুলনায়আর্মি স্বল্পতার কারণে বেতার কেন্দ্র খুব বেশি সুরক্ষিত ছিলনা। এমন একটা সংবাদে ল্যান্স নায়েক সিদ্দিক সুযোগটা কাজে লাগাতে চেয়েছিলেন এবং বয়রার প্রতিরোধ ভেঙ্গে গেলে ২০-২২ জন যোদ্ধা নিয়ে বেতার কেন্দ্র আক্রমণের কথা ভেবেছিলেন। কিন্তু ভবিষ্য প্রস্তুতির কথা বলে তাকে নিবৃত করা হয়। কেননা এত স্বল্প শক্তি নিয়ে বেতার কেন্দ্র আক্রমণ আত্মঘাতী ব্যাপার হত।তাদেরকে ভোরে রূপসার ওপারে মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়ার কথা বলা হয়। রাতের মততাদের আশ্রয়ের ব্যবস্থা করা হয় টুটপাড়ায় অ্যাডভোকেট আব্দুল মালেকের কাঠের দোতালাবাড়িতে। খবরটা পাড়ার চপলমতি কিছু ছেলে জেনে গিয়েছিল। ভোররাতেতারা কয়েকজন নিছক মজা করার জন্য কোন হ্যায়, কিধার হ্যায় বলে চিৎকার করে ওঠে।মুক্তিসেনারা সতর্ক ছিল, তারা দ্রুত শয্যা ছেড়ে উঠে পড়ে এবং রাইফেল নিয়ে পজিশন নেয়। তবেঅল্পের জন্য কোন বিপর্যয় ঘটেনি। মানিক ও মোহাব্বত রাতেমুক্তিযোদ্ধাদের সাথে ছিল। তারা দ্রুত বিষয়টা সামলে নেয় এবং মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে শ্মশান ঘাট হয়ে রূপসার নৈহাটি স্কুলে মুক্তিযোদ্ধাদের ঘাটিতে চলে আসে।

২৫ মার্চ যখন আর্মি ক্রাক ডাউন শুরু হয় খুলনায়পাকিস্তানিদের শক্তি কম ছিল।ফলে ঐ রাতে খুলনায় দায়সারা গোছের অপারেশন চালায় হানাদার পাকিস্তানিরা, এমনকি শহরের সর্বত্রকারফিউ কার্যকর করার উদ্যোগ নিতেও তারা সমর্থ হয়নি। কিন্তু ২৬ মার্চ চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে চলে গেলে এবং সেখান থেকে উপর্যুপরি বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণা প্রচারিত হতে থাকলে দেশব্যাপী যে উদ্দীপনার সৃষ্টি হয় তাতে সামরিক কর্তৃপক্ষসতর্ক হয়ে যায়। তারা দ্রুত সকল বেতার কেন্দ্র সুরক্ষার ব্যবস্থা নিয়েছিল।খুলনা বেতার কেন্দ্রও কাঁটা তারের বেড়া দিয়ে সুরক্ষিত করা হয় এবং ছাদের উপর বালির বস্তার আড়ালে মেশিনগান ও মর্টার পোস্ট বসানো হয়। ফলে বেতার কেন্দ্রটি দুর্ভেদ্য হয়ে ওঠে। দুর্ভাগ্যক্রমে বিষয়টি অনুধাবন করতে মুক্তিযোদ্ধারা ব্যর্থ হয়।

ল্যান্স নায়েক সিদ্দিক ছাড়াও বেতার কেন্দ্র দখলের কথা অনেকেই ভেবেছিলেন। চিতলমারি থেকে আর্মির অবসরপ্রাপ্ত সুবেদার মেজর জয়নাল আবেদিনকয়েকজন মুক্তিযোদ্ধাসহ রূপসায় এসে নৈহাটি মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্পে যোগ দেন। তার স্ত্রী তখন সন্তানসম্ভবা।কিন্তু সবকিছু তুচ্ছ করে তিনিআর এক অমিত সম্ভাবনার স্বপ্নে বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে আসেন।

জয়নাল আবেদিনব্রিটিশ আর্মি থেকে পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়েছিলেন, পোস্টিং ছিল পশ্চিম পাকিস্তানে। ভাল ট্রেনার ছিলেন। তবে বাঙালি ছিলেন বিধায় তার প্রমোশন হত না। প্রায়ই বলতেন আমি আজ যাদের ট্রেনিং দিয়ে ছেড়ে দিচ্ছি কাল তারাই আমার মাথার উপর বসে আমাকে কমান্ড করছে, পাকিস্তানেএটাই হচ্ছে বাঙালিদের নিয়তি।দীর্ঘ দিন থেকে তিনি পাকিস্তানি নাগপাশ থেকে মুক্ত হওয়ার স্বপ্ন দেখতেন। চাকরি থেকে অবসর গ্রহণের পর তিনি শেখ মুজিব এবং কর্ণেল ওসমানিকে চিঠিও লিখেছিলেন।

তিনিসবসময় কিছু একটা করার তাগিদ অনুভব করতেন,প্রায় চুপচাপএকা একা ঘুরতেন, বলতেন লোকজন আমাদের ভালবেসে খেতে দিচ্ছে, অথচ প্রায় কিছুই করতে পারছিনা আমরা। বঙ্গবন্ধুর ডাকে ঘর ছেড়ে বেরিয়েছি, স্ত্রী সন্তানসম্ভবা, কিন্তু আমাদের সামনে এখন দুটি মাত্র বিকল্প– বাংলাদেশের স্বাধীনতা অথবা মৃত্যু। রেডিও সেন্টার আক্রমণ পরিকল্পনা তাকে আগ্রহী করে তোলে।

শেখ কামরুজ্জামান টুকু, জাহিদুর রহমান প্রমুখ খুলনার মুক্তিযোদ্ধারা খুলনা বেতার কেন্দ্র দখলের কথা ভেবেছিলেন। চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্রের দখলের ঘটনা তাদের অনুপ্রণিত করেছিল। কিন্তু প্রস্তুতি নেয়ার আগেই ২৬ মার্চ পাকিস্তান আর্মি বেতার কেন্দ্রের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা শক্তিশালী করে তোলে। তথাপি তারা বেতার কেন্দ্র দখলের আশা ছাড়েনি। এ সময় বাগেরহাটের এমপিএ আব্দুর রহমানএবং পাকিস্তান আর্মির দলত্যাগী মেজর বরিশালের আব্দুল জলিল রূপসায় এসে মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে মিলিত হন। তিনি ছুটিতে দেশে এসেছিলেন, মাতৃভূমির মুক্তির তাগিদে পাকিস্তানে ফিরে না যেয়ে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ সংগঠিতকরার কাজে আত্মনিয়োগ করেন।তারও মাথায় ছিল খুলনা বেতার কেন্দ্র দখলের পরিকল্পনা। এজন্য বরিশাল থেকেসহযোদ্ধাদেরনিয়ে তিনি রূপসাএসেছিলেন।রূপসায় তখন প্রায়দুইশতযোদ্ধাসমবেত হয়েছিল যাদেরঅধিকাংশই ছিলছাত্র। তবে শ্রমিক এবং দলত্যাগী ও অবসরপ্রাপ্ত সৈন্য, ইপিআর, পুলিশ এবং আনসারের সংখ্যাও কম ছিলনা। দুর্ভাগ্যক্রমে তাদের কাছে থ্রিনটথ্রি রাইফেল, বন্দুক এবং স্থানীয়ভাবে তৈরি হাতবোমার অতিরিক্ত কোন অস্ত্র ছিলনা। অসাধারণ মনোবল এবং স্বাধীনতার স্পৃহা তাদেরকে বেতার কেন্দ্র দখলের মত এক অসম যুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করেছিল।

নৈহাটি স্কুলে বসে বেতার কেন্দ্র আক্রমণের অপারেশন প্ল্যান প্রস্তুত করেন মেজর আব্দুল জলিল, খুলনা বিপ্লবী পরিষদের চেয়ারম্যান শেখ কামরুজ্জামান টুকু এবং সুবেদার মেজর জয়নুল আবেদিন। আক্রমণের সময় নির্ধারণ করা হয় ৪ এপ্রিলের সূচনা লগ্নে রাত ১২টা ১ মিনিটে। যোদ্ধাদেরকে তিনটি দলে ভাগ করা হয়। জয়নুল আবেদিনের নেতৃত্বে কাট অফ পার্টি গল্লামারির পথে সিটি কলেজ হোস্টেল এলাকায় অবস্থান নেবে যাতে শেরেবাংলা রোড ও সফেদাতলা দিয়ে পাকিস্তানিরা কোনভাবে রেডিও স্টেশনে রিইনফোর্সমেন্ট পাঠাতে না পারে।এবং কামরুজ্জামান টুকু ও ল্যান্স নায়েক সিদ্দিকের বাহিনী দক্ষিণ ও পশ্চিম দিক থেকে বেতার কেন্দ্র আক্রমণ করবে। উত্তর দিকে ছিল পথ-ঘাট শূণ্য বিস্তীর্ণ বিল জমি। এই যুদ্ধে মেজর জলিল অপারেশন প্ল্যান দিয়েছিলেন, কিন্তু যুদ্ধেরনেতৃত্ব দেননি। যোদ্ধাদের সাথে যোগাযেগেরওকোন ব্যবস্থা ছিলনা। মারাত্মক ভুল ছিল- যথাযথভাবে বেতার কেন্দ্র রেকি করা হয়নি এবং নদীপথে বেতার কেন্দ্রে পৌঁছাতে কত সময় লাগতে পারে সে হিসাবও করা হয়নি।

মুক্তিযোদ্ধারা রাতের অন্ধকারে তীব্র উত্তেজনার মধ্যে রূপসা নদী পথে অগ্রসর হন। প্রথমেই এক দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা ঘটে। পথিমধ্যেএক আনসারের অসতর্কতায় তার রাইফেল থেকে গুলি ছুটে গেলে নৌকার মাঝি নিহত হন। ঘটনাটি সবাইকে গভীরভাবে স্পর্শ করে। কিন্তু হতোদ্যম না হয়ে তারা এগিয়ে যান। শেষ রাতের নিস্তব্ধতা ভেঙ্গে সহসা মুক্তিযোদ্ধাদের শত শত রাইফেল গর্জে ওঠে। কিন্তু পাকিস্তানিদের অটোমেটিক চাইনিজ রাইফেল, মেশিনগান এবং মর্টারের অবিশ্রান্ত গোলা গুলির গর্জনে অচিরেই তা চাপা পড়ে যায়।তা সত্ত্বেও অকুতোভয় মুক্তিযোদ্ধারা অনেকেই জীবন বাজি রেখে বেতার কেন্দ্রে দেয়ালের পাশে পৌঁছে যেতে সমর্থ হয়। দেয়ালের উপর ছিল শক্ত তারকাঁটার বেড়া। গেট ভিতর থেকে শক্ত করে আঁটকানো এবং তারকাঁটায় মোড়া ছিল। কিন্তু তাদের অপারেশন প্ল্যানে অয়ার কাটার এবং দেয়াল ভাঙ্গার মত এক্সপ্লোসিভ অন্তর্ভুক্ত ছিলনা। তারা তা নিয়েও আসেন নি। এদিকে খানসেনারা গেট রক্ষার জন্য মরিয়া হয়ে গুলি চালাতে থাকে যাতে মুক্তিযোদ্ধারা গেটের ধারে কাছে ঘেষতে না পারে, অন্যদিকে মুক্তিযোদ্ধারা গেট খোলার জন্য মরিয়া। এর মধ্যে দাদা ম্যাচ ফ্যাক্টরির কর্মচারি অকুতোভয় যোদ্ধা হাবিবুর রহমান তারকাটা টপকে ভিতরে নেমে গেট খুলে দেয়ার মরিয়া চেষ্টা করেন। তার সফল হওয়ার সম্ভাবনা প্রায় শূন্য ছিল। হঠাৎ করে এ সময় পাকিস্তানিরা ট্রেসার বল ফায়ার করে। দিনের মত উজ্জ্বলআলোয় হাবিরের অবস্থান ধরা পড়ে এবং অজস্র গুলিতে তারকাঁটার গায়ে ঝুলন্ত অবস্থায় সে শহীদ হয়। পরিণতি জেনেওএকই উদ্যোগ নিয়েছিলেন মুজাহিদ বাহিনীরমোসলেম।তিনিও শহীদ হন। দুর্ভাগ্যক্রমে তাদের লাশ উদ্ধার করা যায়নি।

বেতার কেন্দ্র দখলের উচ্চাভিলাষী উদ্যোগব্যর্থ হয়। এদিকে ভোর হয়ে আসায় পাকিস্তানি সৈন্যদের সহজ টার্গেট হওয়ার হাত থেকে বাঁচার জন্য মুক্তিযোদ্ধারা পিছিয়ে যেতে বাধ্য হন।তবে এই পশ্চাদপসারণ সুশৃঙ্খল হয়নি, কেননা এ সম্পর্কেসঠিক কোনো নির্দেশনা ছিলনা।ফলে আক্রমণ ব্যর্থতার পর অধিকাংশ যোদ্ধা যে যেদিকে পারে পালিয়ে যায়। তারা অনেকেই আর ক্যাম্পে ফেরেনি। শেখ কামরুজ্জামান টুকু এবং

ল্যান্স নায়েক সিদ্দিকের নেতৃত্বে কিছু মুক্তিযোদ্ধা বটিয়াঘাটার বিল ভেঙ্গে নদী পার হয়ে অনেক কষ্টে নৈহাটি ক্যাম্পে ফিরে আসেন। তবে নিরাপত্তার খাতিরে শীঘ্রই তারা প্রায় ২০ মাইল পিছিয়ে বাগেরহাটে নাগেরবাড়িতে নতুন ক্যাম্প স্থাপন করেন। আবার বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়া বেশ কিছু ডেডিকেটেড ছাত্র, পুলিশ ও ইপিআরউচ্চতর ট্রেনিং ও আধুনিক অস্ত্রের আশায় বিভিন্ন পথে ভারত সীমান্ত পার হন।

এই অপারেশনের সামরিক দিক দেখার মূল দায়িত্ব ছিল সুবেদার মেজর জয়নাল আবেদিনের। তিনি কাট অফ পার্টিরও নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন। গল্লামারী রোডের উপর গাছের গুড়ি, ইট-পাটকেল প্রভৃতি ফেলে বেরিকেড দেয়া হয় যাতে আর্মি কনভয় রেডিও সেন্টারের দিকেঅগ্রসর হতে না পারে। পথে ব্যরিকেড দিয়ে তারা সিটি কলেজ হোস্টেল সহ নিকটবর্তী কয়েকটি স্থানে পজিশন নেন। শেষরাতের দিকে আর্মি কনভয় রেডিও সেন্টারের দিকে অগ্রসর হতে চেষ্টা করলে তারা আচমকা মুক্তিবাহিনীর আক্রমণের মুখে পড়ে। তাদের ট্রাক ধ্বংসহয় এবং কয়েকজন সৈন্য নিহত ও আহত হয়। কিন্তু এটা ছিল খুবই অসম এক যুদ্ধ। থ্রিনটথ্রি রাইফেল মেশিনগান মর্টারের মোকাবেলা করতে পারেনা। যুদ্ধরত অবস্থায় সুবেদার মেজর জয়নুল আবেদিন পজিশন বদল করতে যেয়েসিটি কলেজ হোস্টেলের সিঁড়িতে গুলিবিদ্ধ হয়ে শহীদ হন। খুলনা বেতার কেন্দ্র আক্রমণ প্রচেষ্টা আপাত ব্যর্থতার মধ্যে শেষ হয়। কিন্তু এই আক্রমণ পাকিস্তানি হানাদারদের জন্য একটা ম্যাসেজ রেখে যায়–বাঙালিরা আক্রমণে আসার ক্ষমতা রাখে এবং আসবে।

আর্মিরা প্রতিবন্ধকতা অপসরণ করে দ্রুত বেতার কেন্দ্রে চলে যায়। এলাকাটি চল্লিশের দশকে খান সবুরের উত্থানের সময়কাল থেকে মুসলিম লীগের শক্ত ঘাঁটি হিসাবে গন্য হত। এর পেছনে স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তি রাখাল হাজী সাহেবের বিশেষ অবদান ছিল। ৬-দফা আন্দোলনেরপ্রভাবে এই বন্ধ্যত্ব ধীরে ধীরে কাটতে থাকে। তবেআর্মি ক্রাকডাউনের পর এলাকাবাসী অনেকেই তাদের পুরানো পরিচয়টাকে আত্মরক্ষার উপায় হিসাবেনতুন করে আঁকড়ে ধরে। কে বেশি পাকিস্তানপন্থী তা প্রমাণের জন্য আশেপাশের কিছু লোকশহীদ জয়নুল আবেদিনের লাশ নিয়ে এক অদ্ভুৎ খেলায় মেতে ওঠে। তারা তাকে গাদ্দার বলে অভিহিত করে এবং ইসলামী রাষ্ট্রে তার কবর জায়েজ হবেনা বলে ঘোষণা করে। ২৪ ঘন্টার বেশি সময় লাশটি ওভাবেই পড়ে থাকে। শেষে একজন মওলানা সাহেব সাহসে ভর করে বলেন, যেহেতু তিনি মুসলিম নামধারী তার জানানা পড়া এলাকা বাসীর জন্য ফর্‌জে কেফায়া, তার মাটিও হতে হবে। এরপর যা করার তা একমাত্র আল্লারই এখতিয়ার।পর দিন কিছু সংখ্যক এলাকাবাসীর উদ্যোগে হোস্টেল প্রাঙ্গনেরপিছন দিকে তাকে কবর দেয়া হয়।

তার মৃত্যু সংবাদ বাড়িতে পৌঁছান মাত্র সেখানে আর এক হৃদয়বিদারক ঘটনা ঘটে। তারস্ত্রী হাজেরা বেগম ছিলেনসন্তানসম্ভবা। তিনি সাথে সাথে জ্ঞান হারিয়ে পড়ে যান। তার জ্ঞান আর ফেরেনি। অনাগত সন্তানসহ মা এবং বাবার মত্যু। এতিম হয়ে গেল...সন্তান।

নিরালায় পাকিস্তানি সৈন্যদের একটাট্রুপ মুক্তিযোদ্ধদের চোরাগোপ্তাহামলার মুখে পড়ে। তাদেরএকজন সৈন্য নিহত হয়।এই ঘটনায় তারা ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। তারা ধরে নেয় এক বিপুল সংখ্যক মুক্তিযোদ্ধা বেতার কেন্দ্রের উপর আক্রমণ চালিয়েছে এবং তারা এখনো অ্যাম্বুশ পেতে বসে আছে।তারা এলাকা শত্রুমুক্ত করার জন্য বেতার কেন্দ্রের চারপাশে নির্বিচারে মর্টার শেলিং করতে থাকে। এতে অনেক নিরীহ মানুষ আহত হয়। আমাদের এক ঘনিষ্ট আত্মীয় ডালিয়া বাগমারার বাড়িতে মর্টার শেলের স্প্লিন্টারে আহত হয়। ভয়ে তারা সবাই বিলের কাদা-পানি ভেঙ্গে পিছন দিক দিয়ে আমাদের বাড়িতে চলে আসে। ডালিয়াকে দ্রুত সদর হাসপাতালে নেয়া হয়। কিন্তু ব্যাপক গোলাগুলির কারণে শহরে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে,ডাক্তাররা কেউডিউটিতে আসেনি। রেসিডেন্ট ডাক্তারদের সম্ভবত আর্মি ফিল্ড হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, যা পাকিস্তানিদের পক্ষে বড় রকমের হতাহতের প্রমাণ দেয়। ডালিয়াকে শেষপর্যন্ত বিশ মাইল দূরে বাগেরহাটে নেয়া হয়। তখনো পর্যন্ত বাগেরহাট ছিল মুক্ত এলাকা, তবে রিকশা ছাড়া কোন যানবাহনচলাচল করছিলনা।

ব্যাপক মর্টার শেলিংয়ের পর ক্রুদ্ধ আর্মিরা 'মিসক্রিয়েন্টদের খোঁজে নিকটবর্তী গ্রামে ছড়িয়ে পড়ে। বেতার কেন্দ্রের আশেপাশে তখন বিক্ষিপ্ত কয়েকটি ঝুপড়ি ছাড়া কোন বসতি ছিলনা। এসব ঝুপড়ির লোকজন যুদ্ধের শুরুতেই পালিয়ে গিয়েছিল। আর্মিরা লোকালয়ের সন্ধান পায় বাগমারায় এসে। তারা বিভিন্ন বাড়ি বাড়ি ঢুকে তান্ডব চালায় এবং আট-দশ জন তরুণ ও যুবককে ধরে এনে চেয়ারম্যান বাড়ির মোড়ে ফলইন করায়। চেয়ারম্যান মোতালেব সাহেব ছিলেন খুবই জনপ্রিয়।আর্মিরা তাকেও ধরে নিয়ে আসে। নিজের পরিচয় দিয়েতিনি বলেন যে, তিনি মুসলিম লীগ করেন এবং পাকিস্তানের একজন খাদেম। তারপিতা খান আব্দুস সবুর খান সাহেবেরলিডারশিপে পাকিস্তানের জন্য লড়াই করেছেন।পিতার মত তিনিও পাকিস্তানের জন্য জান কুরবান করতে প্রস্তুত আছেন।তার এলাকায় কোনো মিসক্রিয়েন্ট নেই, এটা মুসলিম লীগ এলাকা। এইসব ছেলেরা কেউ গাদ্দার নয়, জীবনে বন্দুকও ধরেনি।বাইরে থেকে মিসক্রিয়েন্টরা এসে কাপুরুষের মত গুলি করে পালিয়ে গেছে। আপনাদের এক জোয়ান শহীদ হয়েছেন। তিনি আমাদের আপন জন। আমাদের জন্যই তিনি জান কুরবান করেছেন, আল্লাহ তার জন্য বেহেস্ত নসিব করুন। কিন্তু স্যার এইসব ছেলেরা পাকিস্তানের ভক্ত, তারা বাড়িতেই থাকে।এখন আপনাদের হাতে যদি তাদের মৃত্যু হয় তবে স্যার সেটা হবে খুবই কষ্টের– পাকিস্তানিদের হাতে পাকিস্তানিদের মৃত্যু!

চেয়ারম্যান একজন রূঢ় অর্ধোন্মাদ সেনা কর্মকর্তার উদ্দেশ্যে জোড় হাতে ভাঙ্গা ভাঙ্গা উর্দু- ইংরাজিতে কথাগুলো বলে তার মুখের দিকে চেয়ে থাকেন। আর্মিরা তাদের সহযোদ্ধার মৃত্যুতে রাগে ফুঁসছিল। আট-দশজন বিভিন্ন বয়সী তরুণ ও যুবক রাইফেলের ডগায় বোধশূন্য দৃষ্টিতে লাইনে দাঁড়িয়ে বিড় বিড় করে দোয়া-দরুদ পড়ছিল। চেয়ারম্যানের মনে হল সময়টা অনন্তকাল ধরে ঝুলছে এবং আশা করার মত কিছু

নেই। এখানে ক্ষমা ভিক্ষা যে নিরর্থক তা পাগলেও বোঝে, কিন্তু এতগুলো নিরীহ ছেলের জন্য তিনি কিভাবেই বা হাল ছাড়বেন!হঠাৎ কর্কশ চিৎকারে তার সম্বিত ফিরল– ইউ বাস্টার্ড, গো এন্ড উও শালে গাদ্দার লোগকো ঢুড়ো। আই ওয়ান্ট টু সি দেয়ার শাকল উইদিন টুয়েলভ আওয়ার্স টাইম!

আর্মি কনভয় চলে গেল। চেয়ারম্যান চাপা স্বরে বললেন, মনে রেখো সুযোগ দু বার আসেনা!

দেখতে দেখতে বাগমারা ও আশপাশের এলাকা তরুণ ও যুবক শূন্য হয়ে গেল।

চরেরহাট

আর্মিদেরঅন্ধের মত যত্রতত্র মর্টার শেলিংয়ের কারণেশহরের সর্বত্র আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছিল।মাত্র কয়েক দিন আগে গভীর রাতে সাউথ সেন্ট্রাল রোডে আলতাপ গলির মুখে কয়েকজন নিরীহ হিন্দুরহত্যাকাণ্ডের রেশ তখনো কাটে নি। সে সময় সকাল থেকে সন্ধ্যার মধ্যেই শহর প্রায় হিন্দু শূন্য হয়ে গিয়েছিল। এবার আর্মিদের নির্বিচারেমর্টার ও গুলি বর্ষণের কারণে মুসলমানরাও শহর ছাড়তে বাধ্য হয়। রাজনৈতিক দল-মত নির্বিশেষে কেউইশহরে থাকা নিরাপদ মনে করেনি। আর্মিদের মতিগতি এমনকি জামাত মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দকেও সন্দিগ্ধ করে তোলে। তারাও সুযোগ-সুবিধা মত একে একে শহর ছাড়তে থাকেন। অ্যাডভোকেট আউয়ুব হেসেন ছিলেন খুলনা মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক। খুলনার রাজনীতিতে প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী আমজাদ হেসেন গ্রুপের সাথে যুক্ত এবং মোনায়েম খান ক্ষমতাসীন থাকাপর্যন্ত খুবই প্রভাবশালী ছিলেন। তিনি নিজেওস্বপরিবারে নড়াইলের রঘুনাথপুরে যেয়ে আশ্রয় নেন। প্রায় ১ মাস পর শহরের পরিস্থিতি অনুকূলবিবেচনা করে ৮ মে তারা আবার স্বপরিবারে লঞ্চযোগে শহরে ফিরছিলেন। পাকিস্তান রেডিও এবং শান্তিকমিটির প্রচার প্রচারণা তাকে পরিবারের সকলকে নিয়ে শহরে আসতে প্রভাবিত করেছিল।

তাদের লঞ্চটি নির্বিঘ্নে খালিশপুরের চরেরহাট পর্যন্ত পৌঁছাতে সমর্থ হয়। চরেরহাট ভৈরব ও আতাই নদীর সংগম সঙ্গম স্থলে অবস্থিতশিল্প ও বাণিজ্য এলাকা। পাশেইপিএনএস তিতুমীর নৌঘাঁটি। লঞ্চটি চরেরহাটে পৌঁছালে নেভী গানবোটের বাধার মুখে পড়ে। তারালঞ্চটিকে পার্শ্বস্থ মাছ কোম্পানির জেটিতে ভেড়ানোর নির্দেশ দেয়।তারা আরো একটি যাত্রীবাহী লঞ্চকে একইভাবে থামায় এবং উভয় লঞ্চের যাত্রীদের লঞ্চ থেকে জেটিতে নামতে বাধ্য করে। তারা পুরুষদের আলাদা লাইনে দাঁড় করায়। আইয়ুব হোসেন অবস্থা বুঝতে পেরে নিজের পরিচয় দেন এবং তারা যে খাঁটি পাকিস্তানি এবং পাকিস্তানি সৈন্যদের একান্ত আপনজন ভাবেন সেটা বুঝাতে প্রাণপণ চেষ্টা করেন, কিন্তু সবকিছুই ব্যর্থ হয়।

মাত্র তিন দিন আগে ৫ মে মেজর জলিল ভারত থেকেএমএল সোহাগপুর ও আনোয়ারা লঞ্চ যেগে বিপুল পরিমান অস্ত্র ও মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে সাতক্ষীরার শ্যামনগর হয়েবরিশালে ফিরছিলেন। তখনো ভারত মুক্তিযোদ্ধাদের পর্যাপ্ত অস্ত্র সরবরাহ শুরু করেনি। এসব অস্ত্র ছিল ইপিআর ও পাকিস্তান আর্মির যা মেজর আবু ওসমান চৌধুরী কুস্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা ও যশোর থেকে দখল করেএনেছিলেন। মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে এই অস্ত্র ছিল দুর্মূল্য। মেজর আবু ওসমান ছিলেন বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের বিশাল এলাকা নিয়ে গঠিত ৮ নং সেক্টরের অধিনায়ক। জেনারেল ওসমানী মে মাসের শুরুতেএই সেক্টরকে দুভাগ করে খুলনা বরিশাল ও পিরোজপুরের অংশবিশেষ নিয়েনবম সেক্টর গঠন করেন এবং মেজর জলিলকে অধিনায়ক নিযুক্ত করেন।এই নব গঠিত সেক্টরকে অস্ত্র সজ্জিত করা হয় মেজর আবু ওসমান চৌধুরীর অস্ত্র-ভান্ডার থেকে।

দুর্ভাগ্যক্রমে মেজর জলিল ইছামতির ঘাটে প্রকাশ্য দিবালোকে দীর্ঘ সময় ধরে এই বিপুল পরিমান অস্ত্র লঞ্চে বোঝাই করেন।নদীর ওপারে পাকিস্তান থেকে এই দৃশ্য অবলোকন করা কঠিন ছিলনা। পাকিস্তান আর্মির কাছে এমন লোভনীয় সংবাদ পৌঁছাতে বিলম্ব হয়নি। তাছাড়া বরিশালের এক মুক্তিযোদ্ধা ঠিক এসময় তার অসুস্থ মাকে দেখার জন্য ছুটি নিয়ে দেশে ফেরেন। শোনা যায় এক পরিচিত জনের সাথে দেখা করার জন্য তিনি গাবুরাতে থেমেছিলেন। গাবুরা মুসলিম লীগ প্রভাবিত এলাকা।তিনিআর বাহিনীতে ফেরেন নি। এসব ঘটনা ছিল অশনি সংকেতের মত।কিন্তু কমান্ডার মেজর জলিল তা অনুধাবন করতে ব্যর্থ হন।

আর্মিরা গানবোট নিয়ে গাবুরা-পাতাখালিতে অ্যাম্বুশ পেতে লঞ্চ দুটির জন্য অপেক্ষা করতে থাকে। কিছুটা ঝোড়ো আবহাওয়ার কারণে মুক্তিযোদ্ধারাতখন বেশ নিশ্চিন্তে ঘুমে আচ্ছন্ন। এ অবস্থায় আড়পাঙ্গাশিয়া পার হয়ে গভীর রাতে লঞ্চ দুটি গাবুরায় পৌঁছানো মাত্র পাকিস্তানি গানবোটের গুলির সম্মুখীন হয়। দিশেহারা অবস্থার মধ্যে সারেং দ্রুত লঞ্চ তীরে ভিড়ালে মুক্তিযোদ্ধারা লঞ্চ ছেড়ে ওয়াপদা ভেড়িবাঁধের আড়ালে আশ্রয় নেন।উভয় পক্ষে প্রচণ্ড গোলাগুলি শুরু হয়। কিন্তু মুক্তিযোদ্ধারা তাদের প্রায় সব অস্ত্রই লঞ্চে ফেলে এসেছিল, তারা ধীরে ধীরে রাতের অন্ধকারে পিছিয়ে যেতে শুরু করে। মেজর জলিলসহ কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা নিরাপদ আশ্রয়ে সরে যেতে সক্ষম হন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে বেশ কিছু মুক্তিযোদ্ধা স্থানীয় দালারদের হাতে ধরা পড়ে এবং তাদের আর্মিদের হাতে তুলে দেয়া হয়।

অস্ত্র বোঝাই লঞ্চদুটি আর্মিরা দখল করেনেয়। এটা ছিল তাদের জন্য একটা গুড ক্যাচ। তবেমুক্তিযোদ্ধাদের হাতে লঞ্চ বোঝাই বিপুল পরিমান ভারী অস্ত্র-শস্ত্র পাকিস্তানি সামরিক কর্তৃপক্ষকের দুঃশ্চিন্তায় ফেলে। তাদের বদ্ধমূল ধারণা হয় এভাবে আরো অনেক লঞ্চ আধুনিক অস্ত্র ও মুক্তিযোদ্ধাদেরনিয়ে দেশে প্রবেশ করতে পারে। তারা তাদের নৌবাহিনীকে কঠোরভাবে সতর্ক থাকার নির্দেশ দেয়।

এই ঘটনাই চরেরহাট ট্রাজেডির অনুঘটক হিসাবে কাজ করে। এর মাত্রদু-তিন দিন পর আয়ুব হোসেন এবং তার পিতা হাতেম আহমেদ স্বপরিবারে লঞ্চযোগে খুলনায় ফিরছিলেন। লঞ্চে খুলনা ভাসানী ন্যাপের আবু বকর সিদ্দিক সহ আরো অনেকেই ছিলেন। হাতেম আহমেদ ছিলেন প্রাক্তন পুলিশ অফিসার।তিনি তার নিজস্ব বন্দুকটি সাথে নিয়েছিলেন। তখন অবশ্য বাঙালিদের জন্য বন্দুক নিয়ে চলাফেরা করা বিপদজনক ছিল, কিন্তু নিজেদের রাজনৈতিক পরিচয় তাদের সাহস যুগিয়েছিল। তাছাড়া তখন পথেঘাটে ডাকাতি ও লুটপাটের ঘটনাও কম ছিলনা। নৌ সেনারা লঞ্চ সার্চ করে বন্দুকটি পেয়ে যায়। একটি মাত্র বন্দুক, তথাপি তারা উগ্র মূর্তি ধারণ করে এবং পুরুষযাত্রীদের সবাইকে মুক্তি বলে চিহ্নিত করে ফলইন করায়। আইয়ুব হোসেন শত চেষ্টা করেও তাদের বোঝাতে পারেননিযে মুক্তিরা কখনো বিবি-বাচ্চাদের নিয়ে পথে বেরোয় না।তিনি সবুর সাহেব, আমজাদ সাহেবের রেফারেন্স দিয়েও পার পাননি। স্থুলবুদ্ধি আর্মিরা পৈশাচিক উল্লাসে আইয়ুব হোসেন সহ দুই লঞ্চের সবাইকে ব্রাশ ফায়ার করে হত্যা করে।এই ঘটনায় ব্রাশ ফায়ারের মুখে দাঁড়িয়েও ভাগ্যচক্রে দুচারজন বেঁচে গিয়েছিলেন। তবে আইয়ুব হেসেনের পরিবার হারিয়েছিলেন বারো-তের জন সদস্যকে।

নেভাল ফের্সের হাতে বিশেষ করেমুসলিম লীগের জেনারেল সেক্রেটারি আইয়ুব হেসেন এবং তার বাবা ও ভাইদের এরূপ অসহায় মৃত্যু খুলনা মুসলিম লীগ ও শান্তি কমিটির মধ্যে ক্ষোভের জন্ম দেয়। সে সময় শোনা গেছে যে এই ঘটনা নিয়ে খুলনার সামরিক কমান্ডার কর্নেল শামস্ ও নেভী কমান্ডার গুলজেরিন খানের মধ্যে তীব্র বাদানুবাদ হয়। গুলজেরিন খান ছিলেন বাঙালিদের প্রতি বিদ্বিষ্ট এক উন্মাদ প্রকৃতির কমান্ডার, বিহারীরা তাকে পছন্দ করতো। সম্ভবত সে কারণে কর্নেল শামস্কেসাময়িকভাবেখুলনাছাড়তেহয়। কর্নেল ডিন তার স্থলাভিষিক্ত হন।কর্নেল ডিন ছিলেন গুলজেরিনের মতই উগ্র প্রকৃতির,চার্জ নিয়েইশামসকেবললেন– হোয়াইল কামিংয় আই স অলবিল্ডিংস্ইন খুলনা আর ইনট্যাক্টএন্ড ইন স্টান্ডিং পজিশন!

সো?

ইট শোজ নোসাবভার্সিভ অ্যাকটিভিটিজ অকার্ড হিয়ার ইন খুলনা!

কর্নেল শামস্ ক্রোধের সাথেজবাব দিলেন– ডোন্ট ওরি! দেয়ার ইজ, এন্ড আই কিপ দ্য জব পেন্ডিং ফর ইউ। (বেদুইন সামাদ-১০১)

পাকিস্তান নেভির হাতে মুসলিম লীগ নেতা অ্যাডভোকেট আইয়ুব হোসেন প্রমুখের হত্যাকান্ডের পেছনে দায়ী ছিল সামরিক কর্তৃপক্ষের প্রতি তাদের অগাধ বিশ্বাস। দেশের পরিস্থিতি নরমাল এবং সব কিছুইএখন সামরিক সরকারের নিয়ন্ত্রণে এমন বিশ্বাসে তারা সদলবলে সহরে ফিরছিলেন। তাদেরকে মর্মান্তিকভাবে এই ভুলের মাসুল গুনতে হয়।

এর মাত্র দু সপ্তাহ আগে এমন আর একটি ঘটনা ঘটেছিল বাগেরহাটের কাড়াপাড়ার। পাকিস্তানের প্রতি অতি ভক্তি ও আনুগত্যের পরিচয় দিতে যেয়েআর্মিদের গুলিতে জান খুইয়ে বসেন মুসলিম লীগের দুই প্রবীন ব্যক্তিত্ব। তাদের একজন মোনায়েম খানের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী আমজাদ হোসেনের পিতা এস এম ইসমাইল হোসেন। তিনি রিটায়ার্ড পুলিশ অফিসার। আর্মি ক্রাকডাউনের পর শহরের বৈরী পরিস্থিতির কারণে শহর ছেড়ে বাগেরহাটের কাড়াপাড়ার তার বেয়াই মুসলিম লীগ নেতা শেখ আজিজুল হকের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিলেন।তবে তারা ছিলেন মুক্তিযুদ্ধের ঘোর বিরোধী। স্বভাবতই নির্বাচন কাল থেকে এযাবৎ তারা হতাশ এবং ম্রিয়মান অবস্থায় গৃহকোণে নিজেদের একরূপ বন্দী করে রেখেছিলেন। কিন্তু ২৪ এপ্রিল কাড়াপাড়ায় পাকিস্তান আর্মি নামলে তাদের মধ্যে আনন্দের জোয়ার বয়ে যায়। রূপসা থেকে বাগেরহাট পর্যন্ত পথে পথে ব্যারিকেড থাকায় আর্মিরা আসে নদীপথে গানবোটে এবং কাড়াপাড়ায় আজিজুল হকের বাড়ির কাছেই নামে। আনন্দে আত্মহারা হয়ে এই দুই বয়স্ক ভদ্রলোক দ্রুত পাজামা-পাঞ্জাবি এবং জিন্না টুপি পরে বাড়ির ছাদে উঠে পাকিস্তানি পতাকা উড়িয়ে দেন এবং আর্মিদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য আকাশের দিকে গুলি ছুড়তে থাকেন। তারা দেখাতে চেয়েছিলেন তারা আছেন, পাকিস্তান ভক্তরা আছে, মুসলিম লীগ জিন্দা আছে।

নিরেট পাকিস্তান আর্মিরা এহেন অযাচিতঅভ্যর্থনায় জন্য ...। তারা এলাকাটা দখল করতে এসেছিল। গুলির শব্দে

নয়াবাটি মুন্সিবাড়ির গণহত্যা

মুন্সি সিদ্দিকুর রহমান ছিলেন খালিশপুর আওয়ামী লীগের সভাপতি। নয়াবাটির বিশাল মুন্সিবাড়ি তাদের পৈতৃক নিবাস। বড় পরিবার।আর্মি ক্রাকডাউনের পর ২৬ মার্চ খালিশপুরে বিহারী- বাঙালি দ্বন্দ্ব স্থুলভাবে প্রকাশ্যে চলে আসে। মিল, কারখানা, শ্রমিক বস্তি, স্যাটালাইট টাউন

পথ-ঘাটসহ সর্বত্র দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ে। এমন বিভৎস হত্যাকাণ্ড কারোকাম্যছিলনা, কিন্তু নিয়তির অমোঘ নিয়মে সেটাই ঘটছিল। সিদ্দিক সাহেব কোনো উপায় খুঁজে পাচ্ছিলেন না। অবস্থা শ্রেফ খুনের বদলে খুনের পর্যায়ে চলে গিয়েছিল। তিনি স্থানিয় লোক, খুবই প্রভাবশালী এবং বঙ্গবন্ধু অন্তপ্রাণ। এজন্য বিহারীরা তাকে হত্যার জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে। ২৯ মার্চ থেকে খুলনা খালিশপুর আর্মি নিয়ন্ত্রণে চলে এলে প্রকাশ্য হত্যাকান্ড কিছুটা কমে আসে, তবে আড়ালে আবডালে বাঙালি হত্যা কখনোই বন্ধ হয়নি।

পরিস্থিতির কারণে মুন্সি সিদ্দিকুর রহমান খুবই সতর্ক অবস্থায় থাকতেন। বিহারীরা তাকে ধরার জন্য ফাঁদ পাতে। মিল চালু করা এবং শিল্প এলাকায় শান্তি প্রতিষ্ঠার কথা বলে তারা বাঙালিদের সাথে মিলে মিশে থাকার ইচ্ছা প্রকাশ করে। খালিশপুর স্যাটালাইট টাউনের উত্তরাংশে এবং গোটা খালিশপুরের তিনপাশ জুড়ে তখন প্রচুর নিরীহ বাঙালির বসবাস। তাদের জীবনের কথা ভেবে তিনি বিহারীদের শান্তি প্রস্তাবে আগ্রহের সাথে সম্মত হন। সিদ্দিক সাহেবের বাড়িতে৭ এপ্রিল বৈঠক বসে। বিহারীদের পক্ষে উপস্থিত ছিল মতিউল্লা সর্দার, ফরিদ মিয়া এবং মোহাম্মদ আলী বিহারী। তারা অশিক্ষিত, দুর্বিনীত ও শক্ত প্রকৃতির মানুষ। দুর্ভাগ্যক্রমে সে সময় নেতৃত্বে জন্য বিহারী কমুনিটির কাছে এমন লোকেরাই ছিল সেরা পছন্দ। তথাপি হৃদ্যতাপূর্ণ পরিবেশে শান্তি আলোচনা সম্পন্ন হয়। সিদ্দিক সাহেব অনেকটাই ভরসা পেলেন।

ঐ দিনদুপুরে তিনি বাড়িতে ছিলেন। আত্মীয়স্বজন এবংপ্রতিবেশীরাও ছিল। এত দিন পর একটা শান্ত নিরুদ্বেগ পরিবেশের সম্ভাবনায় সবার মধ্যে কিছুটা হলেও স্বস্তি ফিরে এসেছে। এমন সময়, দুপুরের পর হঠাৎ বাইরে থেকে একজন ছুটে এসে খবর দিল আর্মি এবং বিহারীরাতার বাড়ি ঘিরে ফেলেছে। সিদ্দিক সাহেব বুঝলেন তাকেআসলে ট্রাপে ফেলা হয়েছে, সবাইকে পালাতে বলেনিজে দ্রুত পিছনের বাগান দিয়ে পালিয়ে গেলেন। সবার তখন হতবুদ্ধি অবস্থা। দু একজন পালাতে পারলেও অন্যদের অবস্থা হল ময়াল সাপের দৃষ্টিতে পড়া বানর শাবকের মত, তারা স্থানুবৎ হয়ে গেল। তাছাড়া তারা ভাবতেও পারেনি যে তাদের মেরে ফেলা হবে। তাদের ধরে এনে বাড়ির আঙ্গিনায় এক বড় গর্তের পাশে দাঁড় করালো আর্মিরা। যখন রাইফেল কক করল, লাইনে দাঁড়ানো এক কিশোর প্রচণ্ড ভয়ে আর্তনাদ করে উঠলো এবংতার বড়ভাইকে দুহাতে আঁকড়ে ধরল। কিন্তু শ্বাপদগুলো তাকেও রেহাই দিলনা। নির্দয়ভাবে চাইনিজ রাইফেলের অবিশ্রান্ত গুলিতে মুহূর্তের মধ্যে ঝাঁঝরা করে ফেরল সবাইকে। ভাগ্যচক্রে গুলি খেয়েও দুজন বেঁচে যায়।

সিদ্দিক সাহেবের আত্মীয় সহ মোট তের জনকে চরম শঠতা করে সেদিন পাকিস্তানি নরপশুরা হত্যা করে। এরপর বাড়ির মেয়ে এবং শিশুরা প্রাণভয়ে পালিয়ে যায়।লাশগুলো ওভাবেই গর্তের মধ্যে পড়েছিল। পরে যারা লাশ মাটি চাপা দিতে গিয়েছিল তারা ঐ দুই ভাইকে দেখে অশ্রু সংবরণ করতে পারেনি। তারা তখনো গর্তের মধ্যে পরস্পরকে জড়িয়ে ধরা অবস্থায় পড়ে ছিল। তাদের শরীর শক্ত হয়ে গিয়েছিল এবং তাদেরকে পৃথক করা যায়নি। কবরের সামনে তের শহীদের স্মৃতি ফলক আজো ইসলামের ধ্বজাধারী পাকিস্তানিদের শঠতা ও কাপুরুষতার স্বাক্ষ্য বহন করছে।

বলা বাহুল্য ৭ এপ্রিলের এই হত্যাযজ্ঞের পর উত্তর খালিশপুর খুব দ্রুত বাঙালিশূন্য হয়ে যায়। মাথার উপর ছাদটা সরে গেছে, কেউ আর খালিশপুর এবং আশেপাশের এলাকায় থাকতে সাহস পায়নি।

মনসুর ভাইকষ্টের ঘরবাড়ি ছেড়ে পালিয়ে এলেন

খালিশপুর স্যাটালইট টাউনের উত্তরাংশ ছিল বাঙালি অধুষিত। ষাটের দশকের প্রথম দিকে বেশ কিছু ফাঁকা প্লট এবং একই ধাঁচের ছোট ছোট ঘরসহ কিছু প্লট বাঙালিদেরকে স্বল্পমূল্যে বরাদ্দ দেয়া হয়। ঘরসহ প্লটগুলি মূলত দরিদ্র উদ্বাস্তু বাঙালিদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। এদের মধ্যে কলকাতার উর্দুভাষী বাঙালিও ছিল। মনসুর ভাই বসিরহাটের উদ্বাস্তু, ছেলেবেলা থেকে পিতৃহীন। অতি কষ্টে লেখাপড়া শিখে তখন সবে বাংলাদেশ ব্যাংকে চাকরি পেয়েছেন। একদিন আমাদের বাড়িতে এসে উৎফুল্লভাবে মাকে বললেন, চাচী দোওয়া করবেন, আমি খালিশপুরে ঘরসহ একটা জমি বরাদ্দ পেয়েছি।

তারা দুইভাই দেশভাগের পর বসিরহাটের ঘরবাড়ি ফেলে দেবহাটা সেনহাটি হয়ে খুলনায় আসেন। এত দিনে আবার নিজেদের একটা বাড়ি পেয়ে তার আনন্দের সীমা ছিল না, সিদ্ধান্ত নিলেন ওখানেই থাকবেন। সেই ছোটবেলা থেকে তাদের অভিভাবক ছিলেন সেজচাচা। তিনি বললেন– ওখানে অতদূর বিশেষ করে বিহারীদের পাশে তোমরা থাকতে পারবে না, বাড়িটা ভাড়া দিয়ে শহরেই থাকো।

না চাচা আশেপাশের লোকজন খুব ভাল মানুষ, কয়েকদিন থেকে তো যাচ্ছি, অনেকের সাথে পরিচয়ও হয়েছে, তারাও চায় আমরা ওখানেই থাকি। কোন অসুবিধা হবে না।

দেখো, যা ভাল মনে কর। তবে আমার মনে হয় শহরে আমাদের কাছাকাছি থাকলে ভাল করতে।

মনসুর ভাই দিনের পর দিন তিল তিল করে নতুন বাড়ি সাজিয়ে তুললেন। হিসেবি ছিলেন, বাহুল্য খরচ করতেন না। নির্বিরোধী মানুষ, প্রতিবেশিদের সাথে, তা বিহারী বাঙালি বা ক্যালকেশিয়ান যাই হোক না কেন সবার সাথেই তার সুসম্পর্ক। হয়তো সে জন্যই সাহস করে ২৬ মার্চের পরও বাড়িতে থেকে গিয়েছিলেন। এদিকে নানা গুজবে তার তখন মাথা খারাপ হওয়ার উপক্রম। দক্ষিণের বিহারী কলোনীর মাথা গরম বিহারীরা নাকি বাঙালিদের বিরুদ্ধে মারমুখী হয়ে উঠেছে। মতিউল্লা সর্দারও নাকি বলে দিয়েছে–'আভি বিচ মে কোই নেহি হ্যায়, যো আদমী সরাসর হামলোগকা সাথ নেহি রাহেগা উও জরুর জয়বাংলা হ্যায়, গাদ্দার হ্যায়।' তার উপর জোর গুজব আছে সৈয়দপুর, শান্তাহার, রংপুর, নীলফামারি থেকে তাড়া খাওয়া বিহারীরা নাকি ট্রেন বোঝাই হয়ে খালিশপুরে আসছে।তারা এসে পড়লে অবস্থা কি হবে কিছুই বলা যায় না। তবে তাকে সবচেয়ে দুঃশ্চিন্তায় ফেলল নয়াবাটির মুন্সিবাড়ির হত্যাকান্ড। এর মধ্যে এক সন্ধ্যায় তার পরিচিত দুজন বয়স্ক বিহারী প্রতিবেশী এসে বললেন–'মনসুর সাব, আপ আভি হামারা সাথ চালা আইয়ে, দের হোনেসে খোদা না খাস্তা এঁহাছে নিকালনা বহুত মুসিবত হোগা। শ্রেফ কুছ দিন কি লিয়ে কোই যাগা পর যাইয়ে। ফির সবকুছ নরমাল হেনে কি বাদ জরুর ওয়াপাস আনা। হাম আপকো ঘরকা দেখভাল করুঙ্গা।' মনসুর ভাই প্রকম্পিত হাতে ঘরে তালা দিয়ে তাদের জিম্মায় সব কিছু ছেড়ে স্ত্রী ছোটভাই এবং বাচ্চাদের নিয়ে বেরিয়ে এলেন।

সহরে সেজচাচার বাড়িতে এসে তিনি কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন। বার বার আক্ষেপ করে বলতে থাকেন– এত কষ্টে দিনে দিনে তিনি আবার সব কিছু গড়েছেন, ফিরে যেয়ে সেসব কি আর পাবেন!

সেজচাচা পোড়খাওয়া মানুষ, কান্না বিশেষত পুরুষের কান্না মোটেও সহ্য করতেন না। বসিরহাট মহকুমার লব্ধপ্রতিষ্ঠ মোক্তার এবং মহকুমা মুসলিম লীগের সম্পাদক সেজচাচা তখনউদ্বাস্তু জীবনের কঠিন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলেন, ধমকে উঠলেন– তোমাকে তো আগেই মানা করেছিলাম, ওখানে থেকনা। শোনোনি। এখন কেঁদে কি হবে! যাহোক ঘরে তালা দিয়ে এসেছ তো?

তা দিয়েছি, কাছাকাছি দুই ভদ্রলোককে বলেও এসেছি।

তবে অত ভাবছ কেন ? বিহারীরা সৎ মানুষ, চুরি চামারিতে থাকে না, কথা দিলে কথা রাখে। এখন কদিন ধৈর্য ধর, অবস্থা ভাল হলে ফিরে যাবে।

কিন্তু অবস্থা স্বাভাবিক হয় না। বরং দিনে দিনে খারাপ খবরের সংখ্যা বেড়েই চলে। এপ্রিলের মাঝামাঝিতে তিনি ব্যাংকে জয়েন করেন। ব্যাংকে নানা জায়গা থেকে লোকজন আসে, সেখানে যে খবর পাওয়া যায় তাতে তার রক্ত আরো হিম হয়ে যায়। সৈয়দপুর নীলফামারিতে মার খাওয়া বিহারীরা খালিশপুর ছেয়ে ফেলেছে। তাদের ক্রোধ এবং জিঘাংসা সীমা ছাড়া। অরাজকতা, খুন খারাবী, ধর্ষণ, লুটপাট চরমে উঠেছে। বাঙালিরা সেখানে ঢুকতেই পারেনা। তাদের বাড়ি ঘরের দরজা জানালা পর্যন্ত খুলে নিয়ে যাচ্ছে ওরা। যে খবর এনেছিল তাকে জিজ্ঞাসা করেন– হামারা ঘর কা হালত কেয়া ভাই?

নেহি স্যার, হামলোগ উধার যাতাই নেহি, ক্যায়সে মালুম!সব লোগ বাহার সে আয়া, শুনা হ্যায় শ্রেফ কিলার হ্যায়- কিলার!

শুনিয়ে ভাই হাম শ্রেফ ঘরকা হালাৎ দেখনে কি লিয়ে একদফা মেরা ঘরপে জাউঙ্গা, আপ কুছ মদত কর সাকেগা কেয়া?

স্যার আপকা দেমাক বিলকুল খারাপ হো গিয়া। উধার কাভি মৎ যাইয়ে, যানেছে আপ ওয়াপাস নেহিআ সাকেগা।

একদিন অফিস থেকে বাড়ি ফেরার পর মনসুর ভাই তার স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করেন– প্রাইজবন্ডগুলো কোথায়?

প্রাইজবন্ড! ভাবি চমকে ওঠেন। প্রাইজবন্ড তো তোমার কাছে ছিল।

তা ছিল, কিন্তু তুমি বললে না, মাটিতে পুতে রাখতে। আমি তো উঠানে পুতে রেখেছি, তোমাকে দেখিয়েও দিয়েছি জায়গাটা।

দু'জনেই বিবর্ণ হয়ে গেলেন। ভাইয়ের অস্থিরতা বেড়েই চলল,প্রাইজবন্ডগুলোতাদের কাছে অমূল্য। অনেক ভেবেচিন্তে তিনি সেজচাচাকে বললেন– আমিএকটু খালিশপুরে যাব চাচা। বেশ কিছু প্রাইজবন্ড বাড়িতেউঠানে পোতা আছে,আনতে ভুলে গিয়েছি, এখন না আনলে বৃষ্টিতে ভিজে নষ্ট হবে। আমার অনেক ক্ষতি হয়ে যাবে।

সেজচাচা শান্ত মানুষ, তথাপি রাগে ফেটে পড়লেন, মাথা খারাপ হয়েছে তোমার! জীবনের চেয়ে প্রাইজবন্ড বড় হয়ে গেল? যাও চুপচাপ ঘরে বসে থাকো, কোথাও যাওয়া চলবে না।

ভাই জানেন, অনুমতি মিলবে না। পরের শনিবার হাফ অফিস। কাউকে কিছু না বলে অফিস থেকে বেরিয়ে সোজা খালিশপুরের দিকে রওয়ানা দিলেন। তিনি একটা হিসাব কষে নিয়েছেন, যেতে যেতে দুপুর গড়িয়ে যাবে, তখন খাওয়া দাওয়া সেরে দিবা নিদ্রা যাওয়ার সময়।

ফলে পথঘাট মোটামুটি জনশূন্য পাওয়া যেতে পারে। তিনি যাবেন গোয়ালখালি মোড় হয়ে স্যাটালাইট টাউনের উত্তর সাইড দিয়ে। রাস্তার ওপাশে বাঙালি বসতি, তবে জানেন না এখন সেখানে কারা আছে। বাড়িতে ঢোকার আগে তাকে অবশ্য বিহারীদের দখলে থাকা কিছু বিক্ষিপ্ত বাড়ি ঘরের মধ্য দিয়েও যেতে হবে, কিছুটা ঝোপ ঝাড়ের আড়াল পাওয়া যাবে হয়ত। তারপরও রিস্ক তো থাকছেই।

তিনি আল্লা ভরসা করে রওয়ানা দিয়েছিলেন, একসময় বাড়ির পিছনে পৌঁছেও গেলেন। বাড়ির সামনের দিকে যাওয়ার প্রশ্ন ওঠে না, পথে লোকজন থাকতে পারে। তিনি পিছনের পাঁচিল টপকে ভিতরে ঢুকে গেলেন। সহসা তার গা কাঁটা দিয়ে উঠল, ঘরের দরজা জানালাগুলো মড়ার মাথার খুলির অন্ধকার গহ্বরের মত হয়ে আছে। ঘর শূন্য, কুটোগাছটাও নেই। তিনি দ্রুত হাতে মাটি খুড়ে ভিজে নরম হয়ে যাওয়া প্রাইজবন্ড গুলো অতি সাবধানে তুলে নিয়ে পাঁচিল টপকে বেরিয়ে এলেন। তিনি একরূপ ঘোরের মধ্যে ছিলেন এবং খালিশপুর ছাড়িয়ে গোয়ালখালির মাঝ দিয়ে রেললাইন ক্রস করে যশোর রোডে উঠে বেবিট্যাক্সি থামিয়ে কিভাবে যে তাতে উঠে পড়েছিলেন তা তার কাছে অনেকদিন পর্যন্ত বিস্ময়ের ব্যাপারছিল।

এদিকে বেলা তখন অনেকটাই গড়িয়ে গেছে, মনসুর ভাই ফেরেন নি। সেজচাচাদের বাড়িতে সবাই তখন ঘরবার করছে। স্টেট ব্যাংকে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে যথারীতি দুপুরেই বেরিয়ে গেছেন তিনি। সবার মুখগুলো থমথমে পাংশু। এভাবে নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়ার ঘটনা তো এখন আকসারই ঘটছে। মানুষ চূড়ান্ত খারাপটাই ভাবে। ভেবে ভেবে ভেতরে রক্তক্ষরণে শেষ হতে থাকে। ঠিক এমন একটা সময় মনসুর ভাই বিনীত ভঙ্গীতে ফিরে এলেন। সবাই দরজায় ভিড় করে দাঁড়ালো। কেউ কথা বলেনি, ক্ষোভ প্রকাশ করেনি, উচ্ছাসও দেখায়নি। নিরবে আবার যে যার কাজে ফিরে গেছে।সেজচাচা শুধু বললেন–তোমাকে তো মরণে পেয়েছে দেখ্ছি। ঘর বাড়ি জিনিষপত্র সব তো গেছে, এখন জানটাও যাতে যায় সে ব্যবস্থা তো করে ফেলেছিলে। প্রাইজবন্ডপেয়েছ?

জি, চাচা।

তারা একাত্তরের যন্ত্রণা বিশ্বাস করতেন না। হয়তো ক্ষণিকের জন্য করলেন।

কিছু দিন বাদে মনসুর ভাই আমাদের বাড়ি এলেন, একেবারে ভেঙ্গে পড়েছেন। মাকে বললেন–চাচী, ঘরে কুটো গাছটাও ছিলনা, সব লুট করে নিয়ে গেছে বাস্টার্ডগুলো। কিন্তু এতদিন তবু বাড়িটা ছিল, এখন সেটাও বেদখল হয়ে গেল। আজ ব্যাংকের এক পিওন জানাল, কয়েক দিন আগে আমার বাড়িটাশান্তাহারথেকে আসা কোনো এক বিহারী ফ্যামিলিকে বরাদ্দ দিয়েছে ওদের কি না কি এক কমিটি। একেবারেই শেষ হয়ে গেলাম চাচি।'

মনসুর ভাই এতদিন দোদুল্যমানতায় ভুগছিলেন, এখন স্বাধীনতার পক্ষে গেলেন।

১৭ ডিসেম্বর সকালে খুলনা স্বাধীন হল। মনসুর ভাই সারা দিন ছটফট করে কাটালেন, কিন্তু সেজচাচার কঠোর পাহারাদারীতে ঘর ছেড়ে বেরোতে পারলেন না। ১৮ তারিখ সকাল থেকে তাকে পাওয়া গেলনা। ফিরে এলেন দুপুরে, আমোদিত কণ্ঠে বললেন–চাচা, আল্লার কুদরত বোঝে মানুষের কি সাধ্য! আমার যা গিয়েছিল তার চেয়ে অনেক বেশি মালপত্রে ঘর ঠাসা। বাড়িতে যেয়ে দেখি ভাঙ্গা দরজা জানালাগুলো সব মুলিবাঁশের ঝাঁপ দিয়ে আটকানো। ঝাঁপ ভেঙ্গে ভেতরে ঢুকে দেখি ঘরে রাশি রাশি মালপত্র। কত যে মাল তার ইয়ত্তা নেই। ব্যাটারা কোথা থেকে লুট করে এনে ঘর ভরে ফেলেছে আল্লাই মালুম। ভাবছি প্রমাণসহ কেউ দাবী করলে ফেরত দেব। খাট পালং, দরজা জানালাও আছে। কয়েকটা দরজা জানালা লাগিয়ে নিতে হবে। বিহারীদের ছেড়ে যাওয়া সব বাড়িতেই একই অবস্থা। চাচা, আমরা কিন্তু কালই ফিরে যাব, অনেকেই গেছে। ওখানে ইন্ডিয়ান আর্মি আছে, মুক্তিবাহিনীও আছে, অসুবিধা হবেনা।

এসব শোনার মত মন মানসিকতা তখন সেজচাচার ছিল না। তিনি টিন শেড বারান্দার কোনায় খুটিতে পিঠ ঠেকিয়ে চুপচাপ বসে ছিলেন। ভিতরে তখনও সেজচাচি থেকে থেকে করুণ সুরে কাঁদছিলেন– এরা যে দেশটাকে হিন্দুস্তান বানালো, এখন আমাদের কি হবে, কোথায় যাব আমরা?একবার দেশ ছেড়ে এসেছি, আবার তো সেই দেশ ছাড়া হতে হবে, এত কিছু দেখাও আমাদের কপালে ছিল!–

আমি সকালেও একবার বেরোতে যেয়ে বেড়ার গেট থেকে ফিরে এসেছি তার করুণ বিলাপের কারণে। মা এবং সেজচাচী দুই জা, ঘনিষ্ট বন্ধুও বটে। বসিরহাটে পাশাপাশি বাড়িতে থাকতেন, এখানেও তাই। মাঝে প্রায় দেড় বছর আমরা সেনহাটি ছিলাম, সেখানেও পাশাপাশি দুই পরিত্যক্ত বাড়িতে বাস করেছি। বসিরহাট ছাড়ার পর মা জোর করেই তার আপন বড়ভাসুরকে ছেড়ে সাতক্ষীরা থেকে খুলনায় সেজচাচার কাছে চলে এসেছিলেন, আমাদের লেখাপড়ার কথা ভেবে। বড়চাচা ইসলামী শিক্ষার বাইরে ভিন্ন কোন শিক্ষা পছন্দ করতেন না, কিন্তু সেজচাচা আধুনিক শিক্ষার পক্ষপাতি ছিলেন। ঘরে ফিরে মাকে বললাম– সেজচাচী তো সেই সকাল থেকে কাঁদছেন! আপনি তো তাকেএকটু দেখে আসতে পারেন।

মা বললেন সে কি রে! কাঁদছে কেন, আর এতক্ষণ বলিস নি কেন?

মাকে দেখে সেজচাচী কান্না জড়িত কণ্ঠে বললেন– কাঁদো ভাবি কাঁদো, কান্না ছাড়া আমাদের কপালে আর কি আছে বল, সব ছেড়ে ছুড়ে আবার তো সেই পথেই বেরোতে হবে।

কেন ভাবি, তোমার এমন ধারণা হল কেন?

দেশটা হিন্দুস্থান হয়ে গেল, ভেবেছ ওরা আমাদের থাকতে দেবে?

কে বলল দেশটা হিন্দুস্তান হয়ে গেল? ও সব অলুক্ষণে কথা ভেব নাতো, আমাদের বাড়ি আমাদেরই থাকবে, কেউ তাড়াতে আসবে না।

সেজচাচি সরল সাদাসিধা মানুষ। রাজনীতির ধারে কাছেও থকেন না। যেভাবে শুনেছেন, সেভাবেই মনে গেঁথে নিয়েছেন। মা বড়ভাইকে বললেন– তোমরা বুঝি এভাবেই তোমাদের মাকে বুঝিয়েছ?

বড়ভাই তাচ্ছিল্যের সাথে বললেন, ক-দিন অপেক্ষা করেন চাচি, আপনিও বুঝতে পারবেন!

৩. টুকুরা দেশে ঢোকে ...মাসে। সিরাজ ভাই হিঙ্গলগঞ্জ বডারে শুভেচ্ছা জানাতে এসেছিলেন। অস্ত্র ও আর্মি ব্যাগের সাথে টুকুর কাঁধে দ্বিতীয় একটি এয়ার ব্যাগ দেখে প্রশ্ন করেন কি ওতে?

সার্টিফিকেট, বাবা-মায়ের ছবি, পুরনো ডায়রি এ ধরনের কিছু জিনিষপত্র আছে।

চেহারায় একরাশ হতাশা ফুটিয়ে সিরাজভাই বললেন, এখনো পিছুটান!

টুকু এয়ার ব্যাগটা কাঁধ থেকে বের করে ছুড়ে দিল ইছামতির বুকে, প্রবল স্রোতে মুহূর্তে দৃষ্টিপথ থেকে উধাও হয়ে গেল সেটা। না, টুকুদের কোন পিছুটান থাকতে নেই, মাতৃভূমির মুক্তির জন্য তারা উৎসর্গীত।

খাবার পানি

বাবার সামান্য কটা টাকাও হাত-সাফাই করল আর্মিরা

একাত্তর সালে মিয়াপাড়া যতটা না উপশহর তার চেয়ে বেশি গ্রাম। ফেরিঘাট রোড থেকে বেরিয়ে পিটিআই ঘেষে বাঁকাচোরা যে রাস্তাটা দক্ষিণমুখে চলে গেছে ওটাই মিয়াপাড়া রোড। ঐ রোড বরাবর ৬-৭ মিনিট হাঁটলে আমাদের বাড়ি। পিটিআই মোড় থেকে রাস্তার অর্ধেকটা খোয়া বিছানো, পাড়ার আদি বাসিন্দা দেনাতুল্লার বাড়ির মোড়ে যেয়ে শেষ হয়েছে, বাকি অর্ধেক মাটির। এ ধরনের বেশ কিছু রাস্তা ফেরিঘাট রোড থেকে বেরিয়ে দক্ষিণে দোলখোলা, মৌলবীপাড়া, টুটপাড়ার মধ্যে চলে গেছে। ফেরিঘাট রোড শহরের দক্ষিণ প্রান্তের মূল সড়ক যাযশোর রোড এবং রূপসা ঘাটের মধ্যে সংযোগ ঘটিয়েছে। আর্মি কনভয়গুলো এই পথ দাপিয়ে বেড়ায়। কিন্তু তারা পারতপক্ষে দক্ষিণমুখী সংকীর্ন শাখা পথগুলোমাড়ায় না। ফলে পিটিআই মোড় থেকে আমাদের বাড়িটা মাত্র ছয় সাত মিনিটের দূরত্বে হলেও অনেকটা নিরাপদ। এ কারণে শহরের কয়েক ঘর আত্নীয় স্বজন নিরাপত্তার আশায় আমাদের বাড়িতে সাময়িক আশ্রয় নিয়েছে। পুরুষের সংখ্যা কম, মেয়ে এবং শিশুরাই বেশী। আমার দুই ভগ্নিপতি খালিশপুরে চাকরি করতেন, তারা নদী পার হয়ে নানা জায়গা ঘুরে মিয়াপাড়ায় চলে এসেছেন। বাড়িতে কিছুটা হলেও স্বস্তি ফিরেছে, কিন্তু অন্নের চিন্তা বেড়েছে। মাসের শেষ,বাবার হাত একদম খালি।

এদিকে ঢাকা রেডিও থেকে ক্রমাগত চাকরিতে যোগদানের জন্য জরুরি এলান জারি হচ্ছে। কিন্তু কেউ তা আমলে নিচ্ছে না। বাবা এক সময় মাকে ফিস ফিস করে বললেন– আমার তোনিজের গরজে এখন অফিসে যেতে হয়, মাস শেষ হয়ে গেছে এতগুলো মুখের ডাল-ভাতের ব্যবস্থা করতে তো বেতন দরকার। অফিসে না গেলে বেতন হবে না।পাড়ায়তখন বাড়ি-ঘরের চেয়ে গাছ-পালা ঝোপ-ঝাড়ের সংখ্যা বেশি। প্রতিবেশী কয়েক ঘর লোকের মধ্যে চাকরিজীবীর সংখ্যা কম, তাদের তাগিদও সম্ভবত কম।

বাবা ৬ তারিখ সকালে অফিসের উদ্দেশ্যে রওনা দিলেন। ৪ তারিখ ভোর হওয়ার আগেই মুক্তিযোদ্ধাদের রেডিও সেন্টার দখলের উদ্যোগ ব্যর্থ হয়েছে। সেই থেকে শহরের অবস্থা আরো থমথমে। রাস্তায় লোকজন নেই বললেই চলে। এদিন আমাদের বাড়িতে ভোর হল ফজরের আজানের সাথে সাথে। সবাই বিষন্ন। বড়দের বিষন্নতা ছোটদের মাঝেও সংক্রামিত হয়েছে। জায়নামাজ থেকে উঠছে না কেউ। সবাই দোয়া দরুদ কেতাব কোরান পাঠে ব্যস্ত। একটা বিশেষ দোয়া তখন সবার মুখে মুখেফিরতো–'লা ইলাহা ইল্লাআন্তা ইন্নি কুন্তু মিনাজ জলেমিন'– হে

আল্লাহ, জালেমদের হাত থেকে আমাদের রক্ষা করো। বাবা সাড়ে নয়টায় রওনা দিলেন।পথে একটা রিকশাও নেই, একটা মানুষও নেই। বারোয়ারিকুকুরটারাস্তায় মাঝখানে শুয়ে অবাক দৃষ্টিতে ক্ষণিক বাবাকে দেখল, তারপর গা ঝাড়া দিয়ে উঠে বাবার পিছু পিছু কিছুদূর হেঁটে আবার স্বস্থানে ফিরে এলো। সোজা রাস্তায় যতদূর দৃষ্টি যায়, বেড়ার মুখে দাঁড়িয়ে আমরা বাবাকে দেখলাম। তখন সময়টা এমন যে, কেউ নিশ্চত না, বাবা ঠিকমত অফিসে পৌঁছাবেন কিনা, ঠিকমত ফিরতে পারবেন কিনা। একটা গুমোট ভাবসারাদিন বাড়িটাকে আচ্ছন্ন করে রাখল। দুপুরের পর বাবা ফিরে এলেন। ঘামে পাঞ্জাবীর পিঠটা ভিজে শপ শপ করছে। ক্লান্ত,কিন্তু চোখেমুখে স্বস্তির ভাব, বললেন– আজ প্রথম অফিস, লোকজন কম। জজ সাহেব আগেভাগে ছুটি দিয়ে দিলেন। কাল থেকে অবশ্য পুরো সময় অফিস হবে। হোটেল- রেস্তরা খোলেনি, দুপুরের খাবারও সঙ্গে নিতে হবে।

আর্মিদের সামনে পড়েননি তো– মা উৎসুক হয়ে জানতে চাইলেন।

আমি সার্কিট হাউজ মাঠের পাশ দিয়ে যাইনি। ওখানে আর্মি ক্যাম্প, অনেক সৈন্য। কে কি করে বসে ঠিক নেই। গিয়েছিলাম স্টেট ব্যাংকের সামনের রাস্তাদিয়ে।তবে ব্যাংকের গেটেও আর্মি মোতায়েন আছে, ওদের সামনে পড়েছিলাম। কিন্তুযা শোনা যায় তেমন তো মনে হলনা। আচমকা সামনে পড়ে প্রচন্ড ভয়ে কি করবো গুলিয়ে ফেলেছিলাম। এক এক জনের দশাসই চেহারা, আমাদের দুজনকে এক করলেও সমান হবে কিনা সন্দেহ। তবে তারা বেশ আময়িক, আমি কিছু বলার আগেই আমাকে সালাম দিল। থতমত খেয়ে জবাব দিতেও ভুলে যাচ্ছিলাম প্রায়।জিজ্ঞেস করল - কাহা জায়েগা মওলানা সাব?

বললাম– অফিস মে, থোড়া দূর জজ কোর্ট হ্যায়, ওহি মেরা অফিস। সরকার বাহাদুর নে এলান কিয়া জয়েন করনেকি লিয়ে। ইসি লিয়ে অফিস যাতা হু। হাম স্যার সাচ্চাপাকিস্তানি হু।

ঠিক হ্যায় ঠিক হ্যায়, উও তো হাম সামাঝ লিয়া।আপ যাইয়ে। আউর সব আদমীকো বোলিয়ে অফিস যানেকি লিয়ে। ঘারড়ানেকা কোই বাত নেহি।

দু'পা এগিয়ে যেতেই আবার ডাকল, শুনিয়ে মওলানা সাব, আপকা পাস ডান্ডি কার্ড হ্যায়?

আমাকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকতে দেখে তারা ব্যাখ্যা দিতে চেষ্টা করল– আপকা তাসবির, নাম, পাত্তা সব কুচ লিখা হুয়া কোহি কার্ড। আব্বা বুঝে যান তারা কি বলছে, বলেন– জ্বী নেহি স্যার।

অফিস সে জলদি জলদি একঠো মাঙ্গোয়া লিজিয়ে, আউর হর রোজ সাথ সাথ রাখনা। ঠিক হ্যায় যাইয়ে।

চার দিনের দিন বাবা যখন ফিরলেন তার কপালে দুঃশ্চিন্তার বলি রেখা। দু দিন পর্যন্ত বাংলাদেশ ব্যাংকের মোড়ে আর্মি পোস্টে তার ভয় পাওয়ার মত কিছু ছিলনা। বরং ওরাই আগ বাড়িয়ে সালাম দিয়েছে, সম্মান দেখিয়েছে। ওদের আচারণে আর্মি সম্পর্কে বাবার ধারণা প্রায় পাল্টে যেতে বসেছিল। বিপত্তি ঘটল চতুর্থ দিনে। সালামের বদলে অকস্মাৎ অতি কর্কশ চিৎকারে তিনি চমকে উঠলেন- হল্ট!

কেয়া নাম ?কাঁহা যাতা ?

ডান্ডি কার্ড নিকালো, জেব মে কিয়া হ্যায় সব কুছ নিকালো।

বাবা বিস্মিত হলেন- এরা রোজই তাকে দেখে! তবু ঝামেলা এড়াতে একে একে তাদের সব হুকুম তামিল করলেন। তিনি স্বল্প বেতনভুক কর্মচারী। ৭ এপ্রিল বেতন পেয়ে চাল ডাল আটা সরর্ষের তেল কেরাসিন তেল কিনে, মুদিখানার ধার-দেনা শোধ করে তার পকেটে গোটা পঞ্চাশেক টাকা ছিল। বড় ধরণের দুঃশ্চিন্তাও ছিল এই টাকায় কিভাবে গোটা মাস চালাবেন।

সৈন্যটা বাবার আইডেনটিটি কার্ড, চিঠি, হিসাব লেখা কয়েক টুকরো কাগজ এবং টাকা গুলো হাতে নিয়ে মনোযোগ দিয়ে উল্টেপাল্টে দেখল এবংপাশ ফিরে পঞ্চাশ টাকার খুচরো নোটগুলো বুক পকেটে ভরে ফেলল। তার হাতসাফাই নেহায়েতই কাঁচা ছিল। সে কাগজগুলো বাবাকে ফেরত দিয়ে বলল, ঠিক হ্যায় যাও।

বাবা বলবেন না বলবেন না করেও শেষপর্যন্তঅস্ফুট স্বরে বলে ফেললেন– স্যার রুপিয়া ?

রুপিয়া! কেয়া রুপিয়া ! সে যেন আকাশ থেকে পড়ল, তোমাহারা রুপিয়া মুঝে কেয়া মালুম ?

স্যার, হাম ডান্ডি কার্ড পোস্ট কার্ড আউর কুছ পেপার কা সাথ পঁচাশ রুপিয়া আপকা হাত মে দিয়া থা।

মুঝে দিয়া? কব দিয়া? মৌলবী সাব ইয়ে তো আজিব বাত হ্যায়!আপ খামাখা হামারা উপার এনজাম লাগাতা হ্যায়।

হৈ চৈ শুনে গেটের ওপাশ থেকেদশাসই চেহারার এক সৈন্য বেরিয়ে এলো– কা হুয়া রমজান?

দেখিয়ে না হাবিলদার স্যার, হ্যাম উসকো ডাভিকার্ড চেক কিয়া, ওয়াপেস ভি দে দিয়া, আব পুছতা হ্যায় রুপিয়া কাহা। মুঝে ক্যায়সা মালুম উনকি রুপিয়া কাহা।

সহি বোলা। মাগর উনকো শরিফ আদমি লাগতা হ্যায়, দেখা দো ভেইয়া, তোমাহারা জেব দেখা দো।

ঠিক হ্যায় দেখিয়ে, দেখ লিজিয়ে মওলবী সাব, আর্মিটা তার পাতলুনের শূন্য পকেট দুটো উল্টেপাল্টে দেখিয়ে দিল। কিন্তু জামার বুক পকেট দেখাল না। টাকাগুলো সে সেখানেই রেখেছিল।

হাবিলদার এবার কঠোরভাবে বাবার দিকে তাকিয়ে বলল– কেয়া মওলবী সাব, আব তো একিন হুয়া? ইয়াদ রাখনা হামারাসবজোয়ান সাচ্চা মুসলিম হ্যায়, অ্যায়ছা বুরা কাম কাভি নেহি করেগা। আয়েন্দা এয়সা ঝুটমুটকমপ্লেইন মৎকিজিয়ে, ঝামেলামে গির জায়েগা।

গলতি হো গিয়া স্যার, গলতি হো গিয়া – বলতে বলতে বাবা পালিয়ে বাঁচেন।

বাড়ি ফিরে বাবা বললেন খুব কাঁচা হাতে তারা লুটের কাজটা করল। তাদের হাতে খড়ি হল কিনা কেজানে।

পরদিন বাবা ফিরলেন রীতিমত বিদ্ধস্ত হয়ে। ব্যাংকের কাছে আর্মিরা সেদিনও তাকে আটকালো। তার কাছে কোন টাকা ছিলনা। হয়তো সেকারণে চেকিংটা হল কড়াকড়ি ধরনের। পরদিন বাবার অফিসের পথ বাড়লো। স্টেট ব্যাংকের চেকপোস্ট এড়ানোর জন্য আহসান আহম্মদ রোড থেকে বাম দিকে টার্ন নিলেন এবং হাদিস পার্কের ভিতর দিয়ে কেডি ঘোষ রোডে উঠলেন।

পেয়েও হারালাম ডাবলুদের

সুশান্তরা রূপসা পার হয়ে গ্রামে গিয়েছিল তার বাবার এক বন্ধুর বাড়ি। জানা ছিলনা সেটা কোথায়।

এক সপ্তাহ যেতে পারেনি, আমি একটা চিরকুট পেলাম, গোটা শরীর ঝিম ঝিম করে উঠল। ডাবলু লিখেছে ভাই যে বাড়িতে ছিলাম, সেখানে ডাকাতি হয়েছে, পরনের জামা-কাপড় ছাড়া সব কিছুই লুট হয়ে গেছে। পারলে কিছু জামা-কাপড় পাঠাবেন, সম্ভব হলে কিছু টাকা। হয়তো ভারতে চলে যাবো, কি হবে কিছুই জানিনা।

ছেলেটাকে বললাম, কি জানো বলোতো। চিঠিতে তো বিশেষ কিছুই লেখেনি। বাড়িতে তো মেয়েরা ছিল। কাউকে মারধর করেনি তো।

না, দাদা। লেখার মত অবস্থা কি কারো আছে! ডাকাতরা বোধ হয় পরিচিত ছিল। মাঝ রাতে বাড়ির উঠানে এসে দাঁড়াল। মুখে কালো কাপড় বাঁধা। বলল, নরেন কাকা আপনার বাড়ি ভর্তি লোক। ঘরে মেয়েরা আছে। কথা দিচ্ছি ঘরে ঢুকব না। দাওয়ায় গামছা পেতে দিলাম, টাকা-পয়সা গয়নাগাটি যা আছে দিয়ে দেন। দেরি না করে দিয়ে দেন, নইলে ছেলেরা ঘরে ঢুকে কি করে বসে ঠিক নেই।

নরেন বাবু ভিতর থেকে জানতে চান কথা ঠিক থাকবে তো ?

জবান যখন দিচ্ছি ঠিক থাকবে। ভেতরে ফোঁপানির শব্দ শোনা যায়। নরেন বাবু দরজা খুলে বেশকিছু গয়না এবং টাকা এনে গামছার উপর রেখে দিলেন, পেছনে দরজার পাশে বল্লম হাতে দু'জন নরেন বাবুকে পাহারা দিচ্ছিল।

এই সব ? আর কিছু নেইতো কাকা ?

থাকবে না কেন, মেয়েদের গলায় হাতে ছোটখাটো দু'চারটে গয়না আছে। বললে ওগুলোও খুলে দেবো, তবে কান্নাকাটি তো শুনতে পাচ্ছো।

না থাক। তবে বল্লম দুটো দেন। দিনকাল খারাপ। ও দিয়ে নিজেদের ঠেকাতে পারবেন না, মাঝখানে ঝামেলায় জড়াবেন। জীবন হানিও ঘটতে পারে।

সর্দার ধীরে সুস্থে গয়নাগুলো গামছায় বেধে বল্লম দুটো তুলে নিয়ে পিছিয়ে আসে। বলে– একটা কথা বলি কাকাবাবু, আপনারা মানিলোক। দলতো একটা না। আগাছার মত অনেক দল গজিয়েছে। ধান-চাল, চালের টিন, ঘরের দরজা-জানালাগুলো নিয়ে হয়তো দু'চার দিন ঠাণ্ডা

থাকবে, কিন্তু তারপর তো ঘরের মেয়েদের নিয়ে টানা হেচড়া শুরু করবে। ওর চেয়ে নিজেদের মান-ইজ্জত, জান- মাল নিয়ে চলে যাওয়াই ভাল।

সাহেব, চেনা ডাকাত নিশ্চয়, নইলে কালো কাপড়ে মুখ ঢেকে রাখবে কেন ? সে গলা নামিয়ে ফিস ফিস করে বলল নকশালও হতি পারে, নইলে ডাকাতি করতে এসে কে অমন ভাল ব্যবহার করে কন। তবে আমার ভুলও হতি পারে। দাদা, আমিতো আমি এখুনি ফিরে যাব, অনেক পথ হাঁটতে হবে, কিছু কি করা যাবে?

করতে তো হবেই, দু মিনিট বস।

সে যাওয়ার সময় বললাম– সুশান্তকে বোলো অবস্থা যা দেখি তাতে মনে হয় সুসময়ের অপেক্ষায় কিছু দিনের জন্য হলেও ভারতে চলে যাওয়া ভাল। অনেকেই যাচ্ছে বলে শুনি। আর শোনো, আমি একবার ওদের সাথে দেখা করতে চাই, নিয়ে যেতে পারবে, আমার সাইকেল আছে।

পারব, কবে যাবেন বলেন, তবে আমি ওপারে থাকব, এপারে আসতে সাহস পাইনে, লোকে নানান কথা জিজ্ঞাসা করে– কে যায়, কনে যাও, কাগো বাড়ি, কি দরকার, তোমাগো বাড়ি কনে– নানা প্রশ্ন। তবে ওপারেও বেপদ আছে, সাইকেল কাড়ি নিতি পারে।

আমার মায়াম সাইকেলটা পুরানো, ভাঙ্গাচোরা, তেমন একটা ক্ষতি হবে না।

নির্দিষ্ট দিনে ওপারে যেয়ে ছেলেটাকে পেলাম না, চায়ের দোকানটাও বন্ধ।

তার কথিত পথ ধরে চলতে থাকলাম। ধূলা ওড়া দীর্ঘ মাটির পথ, আশ্চর্য রকম নিরব, সুনসান। ভয় ধরে যায়। আমি দশটায় রূপসার ওপার থেকে রওনা দিয়েছিলাম মায়াম সাইকেলে চেপে। স্বপ্নেও ভাবিনি রাস্তা এতটা জনশূন্য হবে। রূপসা ঘাটে দু'চারজন লোক পেয়েছিলাম পথের হদিস দিয়েছিল। সরল বর্ণনা, মাটির পথ ধরে সোজা চলে যান, আধ ঘণ্টা খানেক লাগতে পারে। মাঝে মাঝে ডানে বামে মেঠো পথ নেমে গেছে। দিশেহারার মত মূল রাস্তা ধরেই এগিয়ে চললাম।কিছুটা যেতেই এক লোকের দেখা মিলল– নওয়াপাড়া যাইবেন। আগে তো কখনো দেখিনি ইদিকে।

আসা পাড়েনি। শহরে থাকি।

যাইবেন কার বাড়ি?

নরেন বাবুর বাড়ি। ওখানে আমার এক বন্ধু, তার বাবা-মা, ভাই-বোন আশ্রয় নিয়েছে, তাদের দেখতে যাচ্ছি।

যাওয়াটা ব্রেথা হইবে, তেমু যদি যাতি চান এই রাস্তা বরাবর গেলে তেমাথায় বড় টিনের ঘর পাইবেন। পথে কারো লগে কথা কওনের দরকার নাই, কেউরে জিগানোরও দরকার নাই।কি যে হইল, অহন কার মনে কি আছে স্বয়ং ভগমানও কইতে পারেনা।

আমি যখন তেমাথায় পৌঁছালাম শূন্যতা আমাকে গ্রাস করল। টিনের চৌচালা ঘরের বদলে সামনে খাঁখাঁ করা একটা বড়সড় বাড়ির কাঠামো দেখতে পেলাম। চালের টিন, ঘরের দরজা জানালা সবই অপসৃত। পাশের গোলে ছাওয়া কুড়েঘর থেকে এক বুড়ো বেরিয়ে এল বলল– বাবু, সবাই তো চলে গেছে। কনে গেছে কতি পারিনে। তয় মনিন্দ্র বাবুর বড় ছেলে আগের রাতে তিন বোনেরে নিয়া এক দলের সাথে গেছে, বাকিরা গেছেআর এক দলের সাথে, পরদিন।

এভাবে গেল কেন ? কোথায় বা গেল ? স্বগোক্তির মত বেরিয়ে এল কথাগুলো।

তাতো কতি পারিনে বাবু।

সুশান্তদের জন্য আমি উৎকণ্ঠার মধ্যে ছিলাম। প্রায় দুমাস পর তার দাদা মলয়ের চিঠি পেলাম। লাইনটানা খাতার অর্ধ পৃষ্ঠায় ছোট ছোট করে লেখা কষ্টের কথা। তিন বোনকে বাঁচানোর জন্য সে একটা বড় দলের সাথে লঞ্চে তালমায় চলে আসে। জোর গুজব ছিল ঐ রাতে নোয়াপাড়ায়হামলা হবে এবং হিন্দু মেয়েদের ধরে নিয়ে যাওয়া হবে। ফলে যাদের ঘরে বয়স্ক মেয়ে ছিল নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য বাড়ি ছাড়ে।তারপর থেকে অন্যদের খবর জানিনা। আমরা দেশের একেবারে মধ্যে এসে পড়েছি, এখান থেকে মীমান্ত অনেক দূর। এলাকাটা এখনো পর্যন্ত নিরাপদ, আমরা এক হৃদয়বান মুসলমান ভদ্রলোকেরবাড়িতে আছি। কিন্তু এখানেও আর্মি রাজাকাররা আসবে বলে জোর গুজব। এখান থেকে হয়তো শীঘ্রই সরে যেতে হবে, কিন্তু আমরা একেবারেই কপদর্ক শূন্য। চিরকুটটা আমাকে দিয়েছিল মিলের একজন উইভার আব্দুল মালেক, তার বাড়ি ছিল কাশিয়ানিতে। তাকে আমি চিনতাম না, মলয়ের চিঠিতে জানলাম যে তালমায় যে বাড়িতে তারা

আশ্রয় নিয়েছে মালেক ছিল তার ভাগনে। মলয় শেষে লিখেছে সে জানেনা চিঠিটা আমার হাতে পৌছাবে কিনা, তবে ডুবন্ত মানুষ তো খড়-কুটোকেও আশ্রয় করে বাঁচতে চায়!

মাথা ঝিম ঝিম করে উঠল, একটা ঢলঢলে মুখ আমার চেতনাকে অশান্ত ঢেউয়ের মধ্যে নিক্ষেপ করল, নিজেকে সামলে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম– মান্নান, তালমা কত দূর, কিভাবে যেতে হয়?

আপনি যাবেন স্যার! অসম্ভব। কিছু কিছু পথ নৌকায় যাওয়া যায়, বেশিরভাগই হাঁটা পথ। সবখানে এখন নানা দল হয়েছে, সহরের মানুষ দেখলেই তারা সন্দেহ করবে, এক গাদা প্রশ্ন করবে, ধরেও নিয়ে যেতে পারে স্যার।

তাহলে বল আমি কিভাবে তাদের কাছে কিছু টাকা পাঠাতে পারি?

আমি যেতে পারি স্যার, যদি আমার ছুটি আর সামান্য কটা টাকার ব্যবস্থা করে দেন। অনেক দিন আপরাদের বৌমা আর বাচ্চাটাকে দেখিনা।

আমি যেন আকাশের চাঁদ হাতে পেলাম। ডিসপেন্সারি থেকে অ্যাডহিসিভ টেপ জোগাড় করে কিছু টাকা এবং একটি চিরকুট তার উরুতে ভালভাবে আঁটকে দিলাম। আমার পরামর্শমত সে সহজেই তার অবাঙ্গালী সুপারভাইজারের কাছে ছুটির দরখাস্ত দিয়ে বলেছিল যে আগে সে ভুল বুঝেছিল, কিন্তু এখানে এসে সে দেখে অবস্থা খুবই নরমাল। এখন সে পরিবার আনার জন্য দেশে যেতে চায়। এতে সে ভালভাবে কাজে মন দিতে পারবে।

সে না ফেরা পর্যন্ত আমি খুবই উদ্বিগ্ন ছিলাম। তার যদি কিছু একটা হয়ে যেত, ঠগির উপদ্রবের মত পথে-ঘাটে তখন সেটাই ছিল অতি সাধারণ ঘটনা, নিজেকে ক্ষমা করা কঠিন হত। সে কদিন আমি যে তার জন্য কত দোয়া দরুদ পড়েছি তার ইয়ত্তা নেই। তবে অনেক ঝামেলা কাটিয়ে সে সময় মতই ফিরে এসেছিল। সে যে বর্ণণা দিয়েছিল তা রোমহর্ষক।

ডাবলুরা হাটছে। ক্লান্ত বিদ্ধস্ত চেহারা। পা চলতে চায়না। ছোট চার-পাঁচ বছরের বোনটা পথের উপর বসে পড়ে, দাদার কোলে ওঠার জন্য জেদ ধরে। সে জানে মার কোলে ওঠার ভাগ্য তার নেই, সেখানে দখল কায়েম করে বসে আছে তার চেয়ে ছোট ভাইটা। ডাবলু নির্দয়ভাবে ধমক দেয়, বলে– হাঁট্‌লি হাট্ নইলে ফেলে চলে যাব কিন্তু। অথচ চেহারায় সাদৃশ্যের কারণে এই বোনটা তার সবচেয়ে প্রিয়। মা বিমর্ষ চিত্তে দাঁড়িয়ে পড়ে ক্রন্দনরত মেয়েটার দিকে হাত বাড়িয়ে দেন। ডাবলু মার হাতটা ঠেলে দিয়ে বোঁচকাটা এক হাতে ঝুলিয়ে বাচ্চাটাকে কাঁধে তুলে নেয়, বলে– এই পথে হাটলি না, সামনে যখন জলা আর হাবড় পড়বে তখন কি হবে রে, তখন তো আমি আর কোলে নিতে পারব না। এর মধ্যেদাওয়ায় বসে হুক্কা টানতে টানতে ভরাট গালায় এক গেরস্তজিজ্ঞাস করে– কারা যায়? কন্‌থে আসা হচ্ছে? কনে যাতি হবে? সমিস্যা কি?

আজ সকাল থেকে ডাবলুরা অন্তত ১৫-২০ বার এ প্রশ্নের উত্তর দিয়েছে। এখন বিরক্ত। সে বিড় বিড় করে বলে– তোর কি দরকার রে শালা?

কি কলেন শোনা গেল না।

পেটে কিছু থাকলি তবে তো গলা দিয়ে স্বর বেরোবে। কইছিলাম কি, আমাদের এই জনা চল্লিশেক লোকরে দুপুরে দুটো ডাল-ভাত খাওয়াতি পারেন?।

গেরস্ত লোকটা উৎসাহ হারায়, নিমিলিত চোখে জোরে জোরে হুকো টানতে থাকে।

দুদিন পর নওয়াপাড়া থেকে একদল লোক অনির্দিষ্টের পথে যাত্রা করল। ওই দলের মধ্যে ডাবলুর বড়ভাই ও তিন বোনও ছিল। কয়েক দিন থেকে কানাঘুষা- কি এক শান্তিবাহিনী নাকি তৈরী হয়েছে,তারা সুদর্শন যুবতী মেয়েদের ধরে নিয়ে যাচ্ছে। দু চার দিন নিজেদের কাছে রাখে তার পর নাকি আর্মিক্যাম্পে দিয়ে আসে। এই গুজব এখন আর অবিশ্বাস্য মনে হয় না। প্রায় দিনই এ ধরনের দু একটা ঘটনার কথা শোনা যাচ্ছে। এত সব ভয় ভীতির কারণে তাড়াহুড়া করে লঞ্চ ভর্তী হয়ে বড় একটা দল চলে গেল। ডাবলু তার বয়স্ক বোনেদের দায়িত্ব থেকে রেহাই পেল বটে, কিন্তু দাদারা যে বর্ডারের দিকে না যেয়ে দেশের আরো ভিতরে ফরিদপুরের দিকে গেল এটা তার মনের ভিতর কাঁটার মত খচ খচ করে বিধতে থাকল। ডাবলু তার বাবা-মা ও ছোট ভাইবোনদের নিয়ে বেশ আগেভাগেই সীমান্ত পাড়ি দিতে পেরেছিল, কিন্তু বড় বোনেদের নিয়ে তার দাদা সীমান্ত পার হয়েছিল অনেক পরে।

ক্যাপ্টেন, পামিস্ট এবং কালের স্বাক্ষী এক অশ্বথ গাছ

বাবা গাছ ভালবাসতেন। উদ্বাস্তু কাল কাটিয়েযখন আমাদের বিল-জমি কেনা হয়, সেটা ভরাট করে বাবা সেখানে একের পর এক গাছ লাগিয়েছেন।আমি অনেকবার জজকোর্টেবাবার অফিসে গিয়েছি। কোর্টের প্রবেশ পথে ডান দিকেএক প্রাচীন অশ্বথ গাছকালের স্বাক্ষীর মত ঠায় দাঁড়ানো দেখেছি। আগে কখনো মনে হয়নি পরিবারের বয়ঃবৃদ্ধমানুষটার মত গাছটাও কোর্ট পরিবারের অতি প্রয়োজনীয় একজন। কেউ তাকে নিয়ে কৌতুহলী হয়না, অথচ সে আছে মাথার উপর বিশাল ছায়া হয়ে। গাছের নিচে কত ধরনের ধান্দা। উকিল সাহেব নিচুস্বরেতার মক্কেলের সাথে জরুরী আলাপ সেরে নিচ্ছেন, বাদী তার স্বাক্ষীর স্বাক্ষ্যটা শেষবারের মত ঝালিয়ে দিচ্ছে। মেছেতা বিন্দু শোভিত ফর্সা গোলগাল মুখের বেদেনী, কেউ বলে ইরানিও তার মা নানাকিসিমের পসরা সাজিয়ে বসেছে। তাদের সামনে ভীড় বেশি।বিশাল অশ্বথের গোড়ায় রোজকার মত চৌকি পেতেবসেছেন– মীর শরাফত আলী, হস্তরেখা বিশারদ।তার নুরানি চেহারা ও সফেদ লেবাসসমীহজাগায়।চৌকির উপর খানদানি সোলাপুরি জাজিম বিছানো। তার উপর কাঁচের ফ্রেমে বাঁধানো দুর্বোধ্য রেখা ও সংখ্যা সম্বলিত হাতের পাঞ্জার ছবি, ম্যাগ্‌নিফাইং গ্লাস, পুরনো দুটো টিনের কৌটায় রং বেরঙয়ের ছোটবড় কিছু পাথর এবং তামা রূপার আংটি। পাশে হস্তরেখা বিষয়ক ঐতিহ্যবাহী গোটা তিনেক বই।চৌকির সামনে ছোট ছোট দুটো টুল–প্রায় সময় কারো না কারো দখলে থাকে। বোঝা যায় বাদী-বিবাদী দুপক্ষেরই তার ওপর সমানআস্থা। আমি শেষবার যখন বাবার অফিসে গিয়েছি সব কিছুই আগের মত একই রকম দেখেছি।

তবে এখনকার পরিস্থিতিভিন্ন। বাবার কাছে শুনেছি কোর্টে লোকসমাগম খুবই কম। উকিল মোক্তাররা অনেকেই রাজনীতির সাথে যুক্ত, তারাআসেন না। মক্কেলরা বেশিরভাগই দূরের লোক। অনেকেই দেশ ছেড়েছেন। যারা আছেন– যাতায়াতের সমস্যা, পথেঘাটে জীবনের ঝুঁকি এবংপরিস্থিতির কারণে মামলা লড়ার উৎসাহ হারিয়েছেন। তবে ইদানিং শহর ও আশেপাশের কিছু ছাপোষা উকিল, মোক্তার, মোহরারও মক্কেলেরআনাগোনা শুরু হয়েছে। অফিসের কর্মচারিদেরও উপস্থিতি বেড়েছে।শুধু চাকরি হারানোর ভয়ে নয় তারা ছাপোষা মানুষ, মাস গেলে মাইনে না পেলে তাদের সংসার চলেনা। গরজ বড় বালাই।

জুন মাসের দিকেঅবস্থার পরিবর্তন ঘটল। উকিল মক্কেলেরভীড় বাড়ল। নতুন নতুন সব মক্কেল। দীর্ঘশ্বাস ফেলে বাবা বললেন,দুঃসময় কারো কারো জন্য আশীর্বাদ হয়ে আসে।এদের এখন পোয়াবারো, লুটপাট জায়েজ করার ধান্ধায় তারা নিয়মিত কোর্টে হাজিরা দেয়। বেশকতকগুলোপানবিড়ির দোকান,হোটেল, রেস্তরা খুলেছে। ধন্বন্তরী ওষুধ, শেকড়বাকড়, চশমা, দঁতের মাজনের হকাররাওআশেপাশে ভীড় জমিয়েছে। হস্তরেখা বিশারদ শরাফত আলীও এসেছেন। পেটের দায় সবারই আছে। ভেবেছিলাম গোলগাল মুখের বেদেনিটার কথা জিজ্ঞাসা করি। জিজ্ঞাসা করা হয়নি, বাবাও বলেন নি।

এক শনিবারে বাবা বাড়ি ফিরলেন বিমর্ষচিত্তে। অবশ্য একাত্তরের দিনগুলিতে বাবা খুব কমই স্বাভাবিকভাবে বাড়ি ফিরতে সমর্থ হতেন। কোর্টের সরাসরি সামনে হেলিপোর্টে মুক্তি সন্দেহে বাঙালিদের আড়কাঠে ঝুলিয়ে আর্মিরা নৃশংসভাবে নির্যাতন করত, সে ভয়াবহ দৃশ্য এবং হতভাগ্যদের বুকফাটা আর্তনাদ বিবেকবান কোনো মানুষকে স্বস্তিতে থাকতে দিত না। মা জিজ্ঞাসা করলেন আপনার কি শরীরখারাপ?

না, হেলিপোর্ট থেকে একআর্মিক্যাপ্টেন কয়েকজন সৈন্য নিয়ে অফিসে এসেছিল।বক্তৃতাও করল। চেহারা ছবি ভাল, কিন্তু এত জঘন্য ভাষা ভাবা যায়না। আস্ত হারামজাদা একটা!সবাইকে এক এক করে দেখলো, সাপের মতচাউনি। প্রথমেই জজ সাহেবকে জিজ্ঞাসা করল, হিন্দু মালাউন আর এনিমি পার্টিরকতজন জয়েন করেছে। জজ সাহেব শ্রেফ না বলে দিয়েছেন। খুশি হয়ে বলল– বহুত আচ্ছা! উন্‌লোগ সব গাদ্দার হ্যায়, বাগি আদমী। হামারা পাকিস্তানউন্‌লোগকো লিয়ে নেহি,পাকিস্তানমে উনলোগকো নোক্‌রিভি নেহি। এয়ছা কোই আনেছেজরুর হামারা ক্যাম্পমে এত্তেলা দেনা, ইয়ে আপকা ফরজ্‌কাম হ্যায়। যাওয়ার আগে হাড়বজ্জাতটা লোকজনকে উসকে দিয়ে গেছে–যোকুরসি খালিহোগা তোমহারা ভাই-ব্রাদারকো বয়ঠা দো, এপয়েন্টমেন্ট মিল যায়েগা।

বাবা গভীর দুঃখের সাথে বললেন– এরপর এতদিন যা হয়নিসেটাই হবে, নিজের লোককে চেয়ারে বসানোর জন্য একজন আর একজনের পিছনে লেগে যাবে। কয়েকজন হিন্দু কাজে যোগ দিয়েছে, তারা আজো অফিসে এসেছিল। তাছাড়া গত নির্বাচন এবং অসহযোগ আন্দোলনে আওয়ামী লীগ, জয়বাংলাকরেনি কে?এখন তো সবাই ভয়ে ভয়ে থাকবে, আর গুটিকয়েক পাকিস্তানপন্থী যারা এতদিন গুটিয়ে ছিল খোলস ছেড়ে বেরিয়ে আসবে। সেটা এর মধ্যে শুরুও হয়ে গেছে।মুন্সেফ কোর্টের পিওন ননী বিশ্বাস– সেই প্রথমকাজে যোগদিয়েছিল পরে একে একে আরো কয়েকজন এসেছে। ননী যেদিন আসে সবাই অবাক হয়ে গিয়েছিল, উদ্বিগ্নও হয়েছিল। কিন্তু বাধা দেয়নি কেউ। বড় সাহেবকে সে বলেছিল– কি করব হুজুর, মেয়েটা বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে বাড়িতে এসে উঠেছে, জামাইয়ের আজঅব্দি খবর নেই। কাজ না করলে এতগুলো মুখের ভাত যোগাব কিভাবে। ননী এখন নুরু মিয়া।

এতদিন কোন অসুবিধা হয়নি। কিন্তু আর্মিরা যেতে না যেতেই অফিসে গুঞ্জন উঠলো- এই দু চারজন হিন্দুর জন্য আমরা সবাই মারা পড়ব নাকি? এরা যে অফিসে আসে একশ গজ দুরে আর্মি ক্যাম্পে খবর পৌঁছাতে কতক্ষণ। যারা প্রশ্নটা তুলল তারা মুখচেনা, কিন্তু খুব দ্রুত তা অনেককেই প্রভাবিত করল। তারা বললেন– ননী তোমরাই ভেবে দেখো কি করবে, আর্মি টের পেলে তোমরা তো বাঁচতেই পারবে না, মধ্যে

পড়ে তোমাদের কথা গোপন করার জন্য আমাদের জান নিয়েও টানাটানি পড়বে। তার চেয়ে দুকুল রক্ষা হয় তোমরা যদি চলে যাও ভাই। সবাই তো এখন ওপারে যাচ্ছে। শুনেছি ওখানে থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা নাকি খারাপ না।

ননীরা পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করে, নিরঞ্জন বাবু বলেন– আবুল সাহেব, এত দিন এক সাথে কাজ করলাম, কারো সাথে মুখ কালাকালি পর্যন্ত হয়নি, কে বলে দিতে যাবে আমাদের কথা বলেন! তাছাড়া মুসলমান নাম নিয়ে আছি, বাইরের লোকজন তো বুঝতে পারবে না।

কে বলতে যাবে তা আমি কিভাবে জানব? মনে হল আপনাদের সতর্ক করা দরকার, তাই করলাম। এখন আপনারা কি করবেন আপনারাই ভাল জানেন। নিরঞ্জন বাবুরা তিন-চারজন অবসন্নভাবেকোর্টের পিছন দিয়ে ধীরে ধীরে জেলখানা ঘাটের দিকে চলে গেলেন। অসহায়ভাবে তাকিয়ে দেখা ছাড়া কারোর কিছু করারছিলনা।

কোর্টে আচমকা আর্মির উপস্থিতি শরাফত আলীকে বিস্মিত করেছিল। তার শ্মশ্রুমণ্ডিত সম্ভ্রান্ত চেহারা, সফেদ লেবাস এবং রাজনৈতিক দর্শন সবই সময়ের অনুকূল ছিল। তথাপি এদের আচরণ সম্পর্কে তিনি এতটাই অনিশ্চিতছিলেন যে আর একদণ্ড এখানে থাকা নিরাপদ কিনাতা নিশ্চিত হতে পারছিলেন না।চিন্তার ঘোর না কাটতেই আর্মি গাড়ি দুটো যেভাবে এসেছিল সেভাবে হুসকরে বেরিয়ে গেল।মোড় ঘোরার মুখেজীপের আরোহীকে পরিস্কার দেখতে পেলেন তিনি– ফর্সা একহারা চেহারা, গম্ভীর। অথচ নৃশংস বলে ভয়াবহ দুর্নামকুড়িয়েছে এরা। প্রমাণেরও অভাব নেই। হেলিপোর্ট থেকে হতভাগ্য মানুষের হৃদয়চেরা আর্তনাদ প্রায়ই শুনতে হয় তাদের, দেখতে না চাইলেও এমনসব দৃশ্য চোখে পড়ে যা শুধু ভিতরে রক্তক্ষরণই ঘটায়। শরাফত আলী দ্রুত চোখ নামিয়ে নেন।ক্যাপ্টেন তার দিকে ঠায় তাকিয়ে আছে। সে দৃষ্টির তল খুঁজে পাওয়া ভার।

আধঘন্টাও যেতে পারেনিজরুরি তলব পেয়েশরাফাত আলীকে ছুটতে হল আর্মি ক্যাম্পে। শরাফাত আলী বুঝলেন একটা বড় ভুল করে বসেছেন, চলে না যেয়ে। এখন কিভাবে ভুলের মাসুল গুনতে হয় কে জানে!

সেই দুঃসময়ে কোনো বাঙালিকেআর্মি ক্যাম্পে তলব আজরাইলের তলব বলেই ধরে নেয়া হত, জীবন্ত ফিরে আসা ছিল অনিশ্চিত।বার্তবহ একজন মিলিটারি পুলিশ। শরাফাত আলী হতাশভাবে তাকেজিজ্ঞাসা করেন–হুজুর,আপকো কুছ মালুম হ্যায়ক্যাপ্টেন সাব কিউ বোলায়া ? ম্যায় তো কুছ কসুর নেহি কিয়া। ম্যায় এক মোহাজের হু, সাচ্চা পাকিস্তানি হু।

আপ পামিস্ট হ্যায় না, কেতাব উতাব লেকর চালিয়ে, হোগা হাত দেখায়গা সাহাব।

ক্যাপ্টেনতার অফিসে অলসভঙ্গিতে টেবিলের উপর গোলাকার পেপারওয়েট বনবন করে ঘোরাচ্ছিলেন। শরাফত আলীকে দেখে বললেন– আইয়ে পামিস্ট সাব, বয়ঠিয়ে, ম্যায় তো আপকা এনতেজার মে হু। কেয়া পিয়েগা চায়ে না কফি?

আপকা বহুত মেহেরবানী, ম্যায় তো থোড়া পহেলে চায়ে পি লিয়াস্যার।

তো কিয়া! দো কাপ চায়ে জেয়াদা তো নেহি হোগা। তিনি চায়ের ফরমাশ দিয়ে বললেন, ওয়েল মিস্টার পামিস্ট,পহেলে তো ইয়ে বাতাইয়ে– আপলোগ কেয়াহ্যায়– পামিস্ট অর কোইহামবাগ!

শরাফত আলী বিনয়ের সাথেবললেন, জি নেহি স্যার।তব আপ মালিক হ্যায়, আপকাইয়ে বাতানা ফরজ্ হ্যায় কি ম্যায় নে সির্ফ আন্দাজ কর সাকতা হু, অ্যাকচুয়ালি কেয়া হোগাআউর নেহি হোগা উও তো স্যার খুদ আলিমুল গায়েবআল্লাহ্ কিএখতিয়ার মে হ্যায়।

ঠিক হ্যায়! ঠিক হ্যায়! তো দেখো মেরা হাত–আল্লা মিয়ানে কেয়া লিখ্যা হ্যায়।

বিনয়ের সাথে ক্যাপ্টেনের বাড়ানো হাত ধরে কয়েক সেকেন্ড পাঞ্জার এপিঠ ওপিঠ পরখ করলেন শরাফত আলী। তারপর ম্যাগ্‌নিফাইং গ্লাসটা হাতের তালুর উপর ঝুলিয়ে রেখে ধীরে ধীরে তার ভূত ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কিছু মন্তব্য করে গেলেন। কখনো মাথা দুলিয়ে কখনো ভ্রু কুঞ্চিত করেক্যাপ্টেন কথাগুলো শুনে গেল। শরাফত আলী বললেন– একঠো ক্যাটস্-আই লিজিয়ে স্যার, আচ্ছা হোগা। মেরে পাস জেনুইন স্টোন হ্যায় স্যার।

ক্যাটস্-আই কিউ?

ইয়ে পাথরকা বহুত মরতবা স্যার, ইয়ে আপকো বালা-মুসিবতছেতফাতরাখেগা। পাকিস্তান আউর ইসলামকি খাতেরমে আপলোগকো হররোজ কেতনা রিস্ক লেনা পড়তা হ্যায়, ইয়ে পাথর আপকা লিয়ে বহুত হেল্পফুল হোগা। কিম্মত ভি জেয়াদা নেহি।

ক্যাপ্টেন খরখরে চোখে কয়েক সেকেন্ড শরাফাত আলীর দিকে তাকিয়ে থেকে ঝট্‌কা মেরে হাতটা টেনে নেন– তো এহি বাত মিস্টার পামিস্ট! ঠিক হ্যায় তোম ফিকর মৎ করো, হাম জরুর ক্যাটস্‌-আই ঢুন্ড লুঙ্গা, আসলি ক্যাটস-আই। ঠান্ডি পাথর মেরা বিলকুল পসন্দ নেহি। মেরা পছন্দ হট ফ্লেশ–ইয়াং এন্ড বিউটিফুল, ক্যাটস-আই অর ব্লু-আইড্‌ ব্লন্ডে–যো মিল যায়ে, কোই ফারাক নেহি পড়তা। ইওর কান্ট্রি হ্যাজ প্লেন্টি অব দেম! সে অশ্লীলভাবে ঠা ঠা করে হাসতে থাকে।

শরাফত আলীর কান ঝা ঝা করতে থাকে, গভীর উদ্বেগের সাথে নিজের ললাটের লিখন পড়তে করতে চেষ্টা করেন।তার মনে হয়ক্যাপ্টেন তাকে নিয়ে ইন্দুর-বিড়াল খেলছে।তিনি ভয়ে শিটিয়ে থাকেন। তবে শীঘ্রই তার ছাড়পত্র মেলে– ওয়েল মি. পামিস্ট, ইউ মে গো নাও।

বাবা শনিবার দুপুরে ডিউটি শেষে যখন অফিস ছেড়েছিলেন বিশাল অশ্বথ গাছটাকে মাথা উচু করে দাঁড়ানো দেখে গিয়েছিলেন। মাত্র দেড় দিনের ব্যবধানে অফিসে ঢোকার মুখে তিনি হতবাক হয়ে থমকে দাঁড়ালেন। একই অবস্থা হল সবার।গাছটা নেই। গাছের বিশাল বিশাল খণ্ডগুলোবেখাপ্পাভাবে মাঠের উপর ছড়িয়ে পড়ে আছে। ক্লান্ত শ্রান্ত কাঠুরেরা এখনো নিরবে করাত কুঠার নিয়ে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। ভারী ট্রাক কাটা টুকরোগুলো দ্রুত সরিয়ে নেয়ার কাজে ব্যস্ত। বাবার ভিতরটা হাহাকার করে উঠল, তার মনে হল অতি আপণ কি যেন হারালেন। আগে কখনো এমন উপলব্ধি হয়নি। একবার ইচ্ছা হল পরম মমতায় গাছেরখন্ডগুলিএকটুখানি স্পর্শ করেন। পারলেন না যমদূতের মত রাইফেল হাতে দণ্ডায়মান দুজন আর্মির কারণে।একজনকর্কশ স্বরে চিৎকার করে উঠল– কেয়া দেখতা, তামাশা! যাও, আপনা কাম্‌মে যাও। বাবারা অফিসের দিকে রওয়ানা দিলেন। একঅব্যক্ত অপরাধবোধ তাকে পুড়িয়ে চলল।

দুঃশ্চিন্তাকাউকে পিছু ছাড়ছেনা– গাছটা ওরা কেন কাটল! এটা যে গত পরশু কোর্টে আর্মিভিজিটের বিষময় ফল তা বুঝতে কারো অসুবিধা হল না। কেউ টিপ্পনি কাটল-শনির দৃষ্টিই বটে!তবে এক শ্রেণীর লোক বেশ খুশি হল। তারা বলল– ভালই হল, জায়গাটার মুসলমানি হল। এত দিন এখানে একটা হিন্দুয়ানি ভাব ছিল।এসব বট অশ্বথ আসলে পৌত্তলিকতার প্রতীক। দেখেন না হিন্দুরা দেবতা জ্ঞানে এসব গাছের গোড়ায় সিঁদুর দিয়ে মাঙ্গলিক চিহ্ন আঁকে, মানতের ঘট কলা আলোচাল রেখে যায়। আমরা তো ফকিরহাট থেকে আসি, রাস্তার মোড়ে মোড়ে বট অশ্বথের সেকি ঘটাই না ছিল, এখন একটাও নেই। পৌত্তলিকতার চিহ্ন কেটে সাফ করে দিয়েছে আর্মিরা।

বাবা বললেন– হ্যা, গ্রামের মিটিং প্লেসগুলো ধ্বংস করা হল। তা নাহয় হলো, কিন্তু এই গাছটা কি দোষ করল, একে তো কেউ দেবতা জ্ঞানে পূজো করেনা, গোড়ায় মঙ্গলিক চিহ্নও আঁকে না। তাহলে পৌত্তলিকতার দায় মাথায় চাপিয়ে এত প্রাচীন একটা গাছ কাটা হল কেন? কিঅদ্ভুত ব্যবস্থাপত্র! বোধে আসেনা গাছ কিভাবে পৌত্তলিকতার প্রতীক হয়!

মঞ্জু ভাইকে বাড়ি ছাড়তে হল

অ্যাডভোকেট মঞ্জুরুল ইমামআওয়ামী লীগ করতেন। তার রাজনৈতিক উত্তরাধিকার কলেজ জীবন থেকে। তিনি তখন ছাত্রলীগের সদস্য।নামাজী ছিলেন। বাড়ির কাছেই তালতলা মসজিদ। সচরাচর সেখানেই নামাজ আদায় করতেন। নামাজ শেষে এ যাবৎ সাধারণ মোনাজাত হয়ে এসেছে। সেদিন হঠাৎ ইমাম সাহেব দীর্ঘ মোনাজাত ধরলেন– হে আল্লাহ, আমাদের কলিজার টুকরা পাকিস্তানকে তুমি হেফাজত কর। হিন্দুস্থানি শকুনেরা আজ আমাদের পবিত্র মাটিকে টুকরা টুকরা করতে চায়।আমাদের বেবুঝ নাদান কিছু লোক তাদের খপ্পরে পড়ে গাদ্দারির পথ বেছেনিয়েছে, হে আল্লাহতুমি তাদের হেদায়েত কর। ইসলামের নিশান বরদার পাকিস্তানি ফৌজসুদূর মগরেবি পাকিস্তানে বিবি বাল-বাচ্চা ফেলেএখানে এসে হিন্দুস্তানি ষড়যন্ত্র খতম করতে কতই না তকলিফ করছে,জীবন দিচ্ছে।হে আল্লা তুমি তাদের কামিয়াবি দাও, আমাদের নওজোয়ানদের তাদের পাশে দাঁড়ানোর তওফিক দাও।...

মঞ্জুভাই বাংলাদেশের স্বাধীনতারএকনিষ্ঠ সমর্থক। ইমাম সাহেবকে এতদিন সৎ এবং সাচ্চা মানুষ ভেবে এসেছেন। এখন তার প্রকৃতরূপ উন্মোচিত হতে দেখে বিস্মিত হলে হতাশও হলেন। মোনাজাত যত এগোয় তার হাত দুটো ততই অবশ হতে থাকে এবংএক সময় কোলের উপর ধপাস করে আছড়ে পড়ে। পাশের ভদ্রলোক মঞ্জুভাইকে বিলক্ষণ চিনতেন, টিপ্পনি কাটলেন– ঘুমিয়ে গেছিলেন বুঝি উকিল সাহেব!মঞ্জুভাই জবাব দেয়ার প্রয়োজন বোধ করলেন না, হাতও উঠালেন না, তবে কিছুটা চিন্তিত হলেন।

এপ্রিলের প্রথম দিক আর্মিরা তখনো বাড়ি বাড়ি তরুণ ও যুবকদের শিকারে বের হয়নি। তাদের নজর হিন্দু ও আওয়ামী লীগের নেতা কর্মীদের উপর নিবদ্ধ। মেশিনগান ফিট করা একটা ভারি ট্রাক এ সময় আহসান আহমেদ রোড দিয়ে এসে সামসুর রহমান রোডে ঢুকল, ধীর গতিতে এগিয়ে বাইতি পাড়ার মোড়ে ডান হাতের লাল দ্বিতল বাড়িটার ফটকে যেয়ে থামল। বাড়িটা মঞ্জু ভাইদের। ঝপ ঝপ কয়েকজন আর্মি ট্রাক থেকে লাফিয়ে নেমে দ্রুত সামনের দরজায় যেয়ে করাঘাত করল। তারা ঘরের মধ্যে ছ-সাত জন যুবক ও কিশোরকে পেল। তারা তখন মাদুর পেতে বসে ক্যারাম খেলছিল। অফিসার গোছের একজন হাতের শক্ত লাঠি দিয়ে সামনের ছেলেটাকে সপাৎ করে সজোরে আঘাত করে বলল– মিটিং চল রাহি হ্যায় শালে?উঠ্‌, চল্‌ হামারা সাথ।

মঞ্জুভাইয়ের বাবা ইউনুস সাহেব পাড়ায় ধার্মিক ও সম্মানীয় ব্যক্তি হিসাবে সুপরিচিত ছিলেন। ট্রাক থামার শব্দ এবং আর্মিদের তারই বাড়িতে ঢুকতে দেখে তিনি দ্রুত নেমে এলেন। হাতে তসবি। তাকে দেখে আর্মিরা একটু থমকালো। তিনি বললেন মেরা খোশ নসিব, আপলোগ মেহেরবানী করকে হামারা ঘর মে তশরিফ লায়া। আইয়ে জনাব বৈঠিয়ে, তিনি টেবিলের পাশে চেয়ারগুলো দেখিয়ে দেন।

আর্মি অফিসারটি ভদ্রভাবে জিজ্ঞাসা করল ইয়ে মাকান আপকা হ্যায়?

জি, জনাব।

হামারা পাস রিপোর্ট হ্যায় ইস মাকান কোই আওয়ামী লীগ লীডার কা হ্যায়। আওয়ামী লীগকা সাথ আপকা কেয়া রিশতা?

মঞ্জু ভাই চমকে ওঠেন। তিনি সুপরিতি কোন নেতা নন ঠিকই, কিন্তু আওয়ামী লীগ কমিটির সদস্য এবং গত নির্বাচনে সালাহউদ্দিন ভাইয়ের সাথে থেকে তার জন্য যথেষ্ট খাটা-খাটনি করেছেন। অসহযোগ আন্দোলনেও ছিলেন। এখন খবর পেয়ে এরা এসেছে তাকে ধরতে।

ইউনুস সাহেব তার জ্যেষ্ঠ পুত্রের আওয়ামী লীগ কানেকশনের কথা ভালই জানেন, খুব শান্ত কণ্ঠে বললেন, এ বাড়ি আমার। আমি আল্লার রাহে মশগুল থাকি, দুনিয়ার ফেতনা ফেসাদে জড়াই না। এরা সবাই আমার ছেলে, ভাইপো, কেউ হয়ত আপনাদের ভুল খবর দিয়েছে।

আর্মিরা চলে গেল। ইউনুস সাহেব বললেন, তোমাদের আপাতত অন্য কোথাও সরে যাওয়া ভাল। রিপোর্ট যখন হয়েছে, ওরা আবার আসবে। এবার ফেরত দেয়া গেছে, পরের বার যাবে বলে মনে হয় না।

মঞ্জুভাই বাড়ি ছাড়লেন।

তিনি গ্রামের এক বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিলেন। ঘরের সামনে পুকুর। খুব ভোরে এবং সন্ধ্যার পর বাইরে কিছুটা ঘোরাঘুরি করার সুযোগ পেতেন। এক ভোরে ফজরের আজানের পর তিনি পুকুর ঘাটে গেছেন ওজু করতে। পুকুরটা তেমন বড় ছিলনা, বিপরীত দিকে চোখ পড়তেই চমকে উঠলেন। ওপারের ঘাটে ওজু করতে এসেছেন তার পরিচিত এক মুসলিম লীগ নেতা। ভদ্রলোক যোতদার, নক্সালদের মৃত্যু পরোয়ানা মাথায় নিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন। তখন স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে বাংলাদেশ সরকার স্বাধীনতাকামী এবং মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি নকশালদের সাথে একত্রে কাজ করার জন্য উপর্যুপরি আহ্বান জানিয়ে যাচ্ছে। তারা দুজন পরস্পরকে ভুল বুঝলেন এবং এই দুঃসময়ে দুজনেই আবার অতি দুর্লভ হাইড-আউট ছেড়েপালাতে বাধ্য হলেন। মঞ্জুভাই ভিড়লেন তবলিগ জামাতে।তখন দেশের অভ্যন্তরে পলিয়ে বেড়ানো মানুষের জন্য তবলিগ জামাত ছিল ভাল আশ্রয়।

অফিসে ডেমোক্লিসের তরবারির নিচে

২৫ মার্চ রাতে ভয়াবহ আর্মি ক্রাকডাউনের পর স্বাভাবিক জীবনযাত্রা লন্ডভন্ড হয়ে যায়। কে থাকল কে থাকল না, কে কোথায় ছিটকে গেল তার হদিস ছিল না। এর মধ্যে আর্মি কর্তৃপক্ষ কাজে যোগদানের জন্য ক্রমাগত জরুরী এলান জারি করে যাচ্ছে। কিন্তু জীবনের আশংকায় সেদিকে কেউ ভ্রুক্ষেপ করছে না। তারা ২১ এপ্রিলের ডেট-লাইন দিয়ে কর্মচারিদের প্রতি কাজে যোগ দেয়ার চূড়ান্ত নির্দেশ জারি করল। ঐ সাথে হুমকিও দেয়া হল, অন্যথা হলে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হবে এবং সামরিক বিধি অনুযায়ী কঠোর শাস্তি বিধান করা হবে।

আমাদের রেডিও ছিল, আশেপাশে 'হিতৈষীর' সংখ্যাও কম ছিলনা। যতই দিন যাচ্ছিল এসব এলান আমাদের সংকট এবং অস্বস্তি বাড়িয়ে তুলছিল। তখনো কোথাও স্বস্তি এবং নিরাপত্তার সাথে কাজ করার মত পরিবেশ সৃষ্টি হয়নি। পথঘাট খুবই বিপদজনক। আমারঅফিস ছিল ভৈরবের ওপারে চন্দনীমহলে স্টার জুট মিলে। মিলে যেতে হলে ফেরিঘাট ও খালিশপুরের বৈরী বিহারী এলাকার উপর দিয়ে যেতে হয়। মিলে বাঙালি প্রাধান্য থাকলেও বিহারী কম ছিলনা। আর তখন তো একজন বিহারী একাই একশ। আমার ছোটভাই আনোয়ারের অবস্থা ছিল আরো ভয়াবহ। তাকে যেতে হবে করাচির মসরুর বিমান ঘাটিতে। আনোয়ার বলল–'ভাই ভালই হল, করণীয় নিয়ে আর মাথা ঘামাতে হবে না, আমি কালই নানি বাড়ির উদ্দেশ্যে সাতক্ষীরার দিকে চলে যাচ্ছি।'এই এলাকা ছিল ভারতীয় বর্ডার সংলগ্ন।

কিন্তু এ দিন সন্ধ্যাটা আমাদের জন্য গভীর দুঃশ্চিন্তা এবং হতাশা বয়ে নিয়ে এল। বাবা মসজিদে মগরিবের নামাজ পড়তে যেয়ে অনেক দেরিতে ফিরলেন। মা অস্থিরভাবে ঘর বার করছিলেন। তার অস্থিরতা আমাদের মধ্যেও সংক্রামিত হল, বললাম–মা আমি বরং কিছুটা এগিয়ে দেখে আসি।

মা বাঁধা দিলেন– না বাবা তোমারই বরং বিপদ বেশি। আর কিছুক্ষণ না হয় দেখি।

বাবা ফিরে এলেন বেশ পরে। অন্ধকার রাত, বেড়ার গেট খোলার শব্দ হতেই আমরা দরজায় ভিড় করে দাঁড়ালাম। মা হারিকেন হাতে এগিয়ে গেলেন। বাবা আসছেন, তার চলার গতিতে গভীর হতাশা, ভিতরে ঢুকে তক্তপোষের উপর বসে পড়লেন। সবাই তাকে ঘিরে দাঁড়ালো। বাবা ধীরে ধীরে বললেন, মসজিদ থেকে বেরিয়ে দেখেন সামনে কয়েকজন মুসল্লী। আজকাল মাঝে মাঝে মাগরেবের ওয়াক্তে বাইরের কিছু মুসল্লী মসজিদে নামাজ আদায় করতে আসেন। তাদের সবাইকে তিনি চেনেন না, দু'একজন মুখ চেনা। তাদের সাথে পাড়ারও দু'চার জন থাকে।

বাবা ধীরে ধীরে হাঁটছিলেন যাতে ওদের সামনে পড়তে না হয়। তার মত আরো দু'চার জন, সম্ভবত একই কারণে, হাঁটার গতি স্লথকরে দিয়েছিলেন। কিন্তু ওদের এড়ানো সম্ভব হল না। আলখাল্লাধারীরা আমাদের বাড়ির সামনে মোড়ের উপর দাঁড়িয়ে পড়লেন। মোড় থেকে দক্ষিণে একশ ফুটের মতপারিবারিক পায়েচলা পথ আমাদের বাড়িতে যেয়েমিশেছে। বাবা বাড়ির দিকে যাবেন, এমন সময় দল থেকে প্রতিবেশী এক ভদ্রলোক ডাক দিলেন–'কায়ছার সাহেব এদিকে আসেন, এনারা একটু কথা বলবেন।' শুধু বাবা নন, সবারই ডাক পড়ল।

বাবা কাছে যেয়ে সালাম দিলেন। আলখাল্লাধারী একজন, বাবার অপরিচিত, বললেন–'শুনেছি আপনি ভাল মানুষ, ধার্মিক বলে পাড়ায় সুনাম আছে। কিন্তু আপসোস আপনার ছেলেরা মসজিদে নামাজ পড়তে যায়নি। তাদের শিক্ষাটা বোধহয় সেভাবে হয়নি। আসলে এতদিন আমরা এসব খেয়াল করিনি। কিন্তু এখন বেখেয়াল হওয়ার সময় নেই।'

– বাবা বললেন, ওরা বাড়িতেই নামাজ পড়ে। এসময় বিশেষ বেরোতে চায় না কেউ। আমরাও বলিনা।

– ইমানের জোর থাকলে বেরোতে অসুবিধা কোথায়? আপনার বড় ছেলে তো ছাত্রলীগ করে, তার ইমানের জোর আসবে কোত্থেকে।

– না না, সে তো অনেক আগেই ছাত্র রাজনীতি ছেড়ে দিয়েছে। সে জুট মিলে চাকরি করে।

– তা আমরা জানি। আর এক ছেলে এয়ার-ফোর্সে আছে, সেটাও জানি। সরকার বাহাদুর তাদের ডিউটিতে রিপোর্ট করার জন্য এলানের পর এলান জারি করে যাচ্ছেন, অথচ তারা বাড়িতে বসে আছে। কেন তারা কি রেডিও শোনে না? নাকি শুধু গাদ্দারী করা সেন্টারগুলো নিয়ে বুদ হয়ে পড়ে থাকে। ঠিক আছে কায়ছার সাহেব, তাদের যদি অতদুর চাকরি না-পছন্দ, আমাদের এখানে যুবক ছেলেদের নিয়ে একটা সশস্ত্র বাহিনী তৈরি হচ্ছে, ওরা তাতে যোগ দিক।তারা আমাদের জোয়ানদের সাথে কাঁধ মিলিয়ে হিন্দুস্থান আর তার দালালদের বিরুদ্ধে লড়াই করবে, কওম-মুল্‌কের হেফাজত করবে, মশরেকি পাকিস্তানে ইসলামী ঝান্ডা কায়েম রাখবে।

– বাবা ফ্যাল ফ্যাল করে ওদের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন। তার বাক্যস্ফূর্তি ঘটে না।

– শোনেন কায়ছার সাহেব, এই তো পাশেই ভূতের বাড়িতে যে আনসার ক্যাম্প আছে ওখানেই ট্রেনিং দেয়া হচ্ছে।প্রতিদিনই রিক্রুটমেন্ট হয়। কালই ওদের পাঠিয়ে দিন। দেখবেন কেউ যেন আবার বোকার মত গাদ্দারী না করে বসে। এখানে সবাই সবাইকে চেনে। সবাই জানে আপনার বাড়িতে দু'একটি পরিবার আশ্রয় নিয়েছে, আপনার ছেলে মেয়েরা তো আছেই।

আমরা সবাই উদ্বিগ্নভাবে বাবাকে ঘিরে দঁড়িয়েছিলাম। তার শেষ কথাগুলো আমাদের কাঁপিয়ে দিয়ে গেল। সে সময় একটা পরিবারকে ভয়ে আধমরা করে ফেলার জন্য এতটুকু বলাও অনেক বেশি হয়ে যেত। এ এক ভয়াবহ হুমকি যার অর্থ- অন্যথা হলে বাড়ির মেয়েদের উঠিয়ে নেয়া হবে।মুহূর্তে গোটা বাড়িতে অমানিশার অন্ধকার নেমে এলো। বাকরুদ্ধ হয়ে আমি আকাশ পাতাল অনেক কিছুই ভাবছিলাম। আমাকে মিলে যেতে হবে ফেরিঘাট ও খালিশপুরের চরম বৈরী বিহারী মহল্লার মধ্য দিয়ে। আনোয়ারের অবস্থা আরো শোচনীয়, তাকে যেতে হবে সুদূর করাচির মসরুর এয়ার বেজে। আমারা কোন বিকল্প খুঁজে পেলাম না।

পরদিন সকালে আনোয়ার বাবার সাথে সার্কিট হাউজের সামনে যশোর রোড ও হাজি মহসিন রোডের সংযোগস্থলে সাদা দ্বিতল বাড়ির মিলিটারি অফিসে রিপোর্ট করতে গেল। এখানে অস্থায়ীভাবে এয়ার-ফোর্সের কাজ দেখাশোনা করা হত। বাড়িটি ছিল খুলনার এককালের স্বনামখ্যাত পৌর চেয়ারম্যান মহেন্দ্র ঘোষের। আমি আমার ভগ্নিপতি নুরুল ইসলামের সাথে প্লাটিনাম জুট মিলের গাড়িতে রওয়ানা দিলাম স্টারে আমার কর্মক্ষেত্রে যোগ দিতে। দিনটি ছিল ২২ এপ্রিল, বৃহস্পতিবার– আমাদের পুরো পরিবারের জন্য একটা গ্লুমি ডে। মা দাদী কতবার যে 'আয়তল কুরসি' পড়ে আমাদের মাথায় মুখে ফু দিলেন তার ইয়ত্তা নেই। বোনেরাও বাদ গেলনা। যারা আয়তল কুরছি জানতো না তারা সুরা এখলাছ পড়ল। যারা আরো ছোট তারা সবাই তখন কলেমা এবং দোয়া ইউনুছ শিখে নিয়েছিল। তাই পড়ে তারা আল্লাহর কাছে আমাদের মঙ্গল কামনা করল।

আমরা শান্তিধাম মোড় থেকে প্লাটিনামের বাসে উঠলাম, শিববাড়ির মোড়ে এসে বাসটা প্রায় ভরে গেল। বাসে এতগুলো লোক, কিন্তু কারো মুখে কথা নেই। নিউমার্কেট পার হতেই আমাদের নাকে পোড়া কাঠ এবং ধোঁয়ার তীব্র গন্ধ এসে ধাক্কা দিল। সামনে জোড়াগেটের মোড়ে আগুনের লেলিহান শিখা। অদূরে ডান দিকে ভৈরবের তীরে রুজভেল্ট জেটি। এখানে পথের দু ধারে ও আশেপাশে বেশ কিছু ঘুপচি ঘর–

ঘাট শ্রমিকদের বস্তি, তখনও দাউ দাউ করে জ্বলছে। আমরা সবাই মাথা নিচু করে স্তব্ধ হয়ে বসে আছি। কয়েকজন বিহারী স্টাফ অফিসার আছে গাড়িতে, তারাও নিশ্চুপ। আসলে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কেউ নিশ্চিত নয়। দু'পাশে আগুনের লেলিহান শিখার মধ্যে আমাদের গাড়িটা ওল্ড যশোর রোড ধরে মন্থর গতিতে এগিয়ে চলছিল। সহসাই যেন বহুদিন আগে দেখা এক ক্লাসিক ছবি 'ব্যাটেল অব এল আলআমিন'-এর এক অনবদ্য দৃশ্য জীবন্ত হয়ে চোখের সামনে ভেসে উঠল– বিক্ষিপ্তভাবে জ্বলতে থাকা অনেকগুলো ট্যাংকের মধ্য দিয়ে পথ করে একটা কভার্ডভ্যান উদ্ধারকৃত সৈন্যদের নিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার ব্যর্থ চেষ্টা করছে। পেছনে ধাওয়া করছে দানবের মত এক ফাইটার। শেষপর্যন্ত বিমানেরস্ট্রেফিংয়েরকাছে হার মানল ট্রাকটা।আমি ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম।বাসটা চলছে সংকীর্ণ রাস্তা দিয়ে, দুপাশে খান্ডবদাহ, গায়ে আগুনের আঁচ লাগছে। তথাপি কারো মুখে কথা নেই, কেউ দেখেও দেখছে না, যেন কিছুই ঘটেনি, ঘটছেনা।

ভেতরে দু একটা বাড়িঘর ও কাস্টমস অফিস ছাড়া জোড়া গেট থেকে জংসন স্টেশনের মোড় পর্যন্ত ওল্ড যশোর রোডটাকে তখন মনে হত জঙ্গলের মধ্য দিয়ে চলা একটা পথ। গাড়িটা মোড় ছাড়িয়ে সামান্য এগিয়ে খালিশপুর উপশহরে যেয়ে পড়ল। এখান থেকে গোটা উপশহর ঘিরে ডি-শেপের দীর্ঘ ইপিইডিসি রোড। রোডের পাশ দিয়ে ট্রেন লাইন চলে গেছে ফুয়েল ডিপো পর্যন্ত। লাইনের দুপাশে ঘন সন্নিবেশিত কাঁচা ঘরের সারি। কোনটা দোকান ঘর, কোনোটাতে শ্রমিক বসতি। এখন তারচিহ্নমাত্র নেই। মাটির পোতার উপর দু একটা পোড়া খুটি, ছাই এবং ভাঙ্গা হাড়ি কলসির টুকরো প্রমাণ দিচ্ছে একদা এখানে মানুষ ছিল। নুরুল ইসলাম আবু মৃদু স্বরে সতর্ক করল–বাইরে তাকানোর দরকার নেই, বিহারীদের সাথে চোখাচোখি না হওয়াই ভাল।

প্লাটিনামের অফিসে পৌঁছে বাসটা আমাদের নামিয়ে দিল। মিলের এক্সপোর্ট জেটির পাশে স্টারের লঞ্চঘাট, এখান থেকে তি-চার মিনিটের পথ। আবু আমাকে ঘাটে পৌঁছে দিয়ে ফিরে গেল। দীর্ঘদিন পর এম.এল স্টারের ডেকে পা রেখে আমি স্বভাবমত রেলিংয়ের ধারে যেয়ে দাঁড়ালাম। সহসা সামনে নদীতে দৃষ্টি পড়তেই মাথা ঘুরে গেল, গা গুলিয়ে উঠলো এবং বিবমিষা পেল। চোখের সামনে কি দেখছি আমি!

নদীতে লাশ ভাসছে, যেদিকে তাকাই শুধু লাশ আর লাশ। খালিশপুর সেনহাটি ছেড়ে যারা পালিয়ে এসেছিল তাদের কাছে শুনেছি ২৬ মার্চ থেকে এটাই ছিল ভৈরবের স্বাভাবিক দৃশ্য। তখন বিহারী বাঙালি হানাহানি চরমে ছিল, দু'পক্ষেরই লাশ পড়েছে নদীতে। কিন্তু এখনো যে সেই একই দৃশ্য দেখতে হবে স্বপ্নেও ভাবিনি। বুঝতে বাকি রইল না কিলার্স গেমটা এখন একেবারেই একতরফা। লাশ পড়ছে শুধু বাঙালির, অনেক আগেই তারা হার মেনেছে।

হতভাগ্য লাশগুলো তা বাঙালি-বিহারী যারই হোক না কেন, উন্মত্ত কিছু মানুষের নিষ্ঠুরতা কতদূর যেতে পারে তার স্বাক্ষী হয়ে নিজেকে ব্যাদান করে কখনো ভাঁটির দিকে কখনো উজানে ভেসে চলছে।এদৃশ্যের ভয়াবহতা যে কি তা বুঝে ওঠার ক্ষমতা আমার ছিল না। গা গুলিয়ে উঠলো, দ্রুত দু পা পিছিয়ে লঞ্চের পিছনের বেঞ্চে বসে পড়লাম। পরমূহুর্তেএক বিদ্রুপমাখা কণ্ঠস্বর হিস হিস করে উঠল–'কেয়া মানোয়ার সাব, এতনা গম! পহেলে যব আপকা আদমী মুঝে খুন কিয়া থা তব কাঁহা থা আপলোগ? ইয়ে সব তো আপলোগকা ওয়াজেসে হুয়া হ্যায়। আপভি গাদ্দার লোগোকো এক লিডার থা না! কেয়া সোচা আপনে মেরা দেমাক মে নেহী আতি, আপ ভি নোকরি মে আগিয়া!ক্যায়সে? অ্যায়সা হিম্মৎ আপকা!'

বিহারী আসগর! আমি কোন কথা বলতে পারছিলাম না,খুবই খারাপ লাগছিল। অতি কষ্টে বিবমিষা দমন করতে সমর্থ হলেও অস্বস্তি এবং প্রচন্ড ভয় আমাকে পেয়ে বসল। মনে হল জীবনের চরম ভুলটাই বোধ হয় করে ফেলেছি।

ঘাট থেকে উঠে সামান্য এগোতেই ডান হাতে অ্যাকাউন্টেন্ট ইনচার্জ সিরাজুল ইসলাম সাহেবের কোয়ার্টার। স্যার আমাকে যথেষ্ট স্নেহ করেন। আমি তার কোয়ার্টারে ঢুকে পড়লাম। এ ছাড়া আমার সামনে আর কোন উপায়ও ছিলনা। তিনি হতবাক হয়ে কতকক্ষণ শূন্য দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন– জয়েন করতে চাও, আমি তো ভেবেছিলাম পালিয়ে গেছ।

– যাওয়া উচিৎ ছিল স্যার, কিন্তু বোনগুলো কষ্ট পেয়ে মারা পড়বে, জায়গাটা এখন খুব বাজে হয়ে গেছে। আমরা একরকম ঘেরাওয়ের মধ্যে থাকি।

– স্যার বললেন বস, আমি সিকিউরিটি অফিসারের সাথে কথা বলে আসি। প্রায় বিশ মিনিট পর স্যার ফিরে এলেন। বললেন, তুমি জয়েন করতে পারো, খয়রাতি সাহেব তোমাকে তো ভালই জানেন, তবে তিনি যা বলেন তা তোমাকে শুনতে হবে। লঞ্চে কি হয়েছিল?

আসগরের কথাগুলো তাকে বললাম।

– খয়রাতি সাহেব জানেন তুমি এসেছ, আসগরই তার কাছে রিপোর্ট করেছে। তোমার ভাগ্য ভালো যে তিনি তোমাকে চেনেন এবং ভাল জানেন। আর্মিদের হুকুমে তিনিই এখন মিলের নিরাপত্তা সংক্রান্ত সবকিছু দেখাশুনা করছেন, তার হুকুম ছাড়া এখানে কেউ কিছু করতে পারবেনা। নইলে কি যে হত বলা মুশকিল! আসগর তার কাছে গিয়েছিল তোমার ব্যাপারে ফয়সালা করতে। ঠিক আছে তুমি অফিসে যাও,

আরো কয়েকজন জয়েন করতে এসেছে। প্রথমে সবার ড্রয়ারগুলো চেক কর, সাবভারসিভ কিছু পেলে পুড়িয়ে ফেল। চিন্তার কিছু নেই বলেই মনে হয়।

– নসরুল্লা কোথায় স্যার?

– শুনেছি সৈয়দপুর বেড়াতে গিয়েছিল, পরে সেখানে তো বড় ধরনের বিহারী কিলিং হয়। সেই থেকে দেখিনা। কেউ কেউ বলে সে নাকি মারা পড়েছে। কিছুটা চিন্তিতভাবে বললেন– নসরুল্লার সাথে কি হয়েছিল তোমার, তুমিতো ঝগড়া ফ্যাসাদে থাকো না।ওর সাাথে লাগতে গিয়েছিলে কেন?

– তেমন কোন ব্যাপার নয় স্যার। ঐদিন ইসমাইল ভাইআমার কাছে নসরুল্লার বিরুদ্ধে নালিশ করে, সে নাকি যেখানে সেখানে জয় বাংলার কর্মী এবং ছাত্রীদের সম্পর্কে অশালীন কথা বলে বেড়াচ্ছে। তিনি বিষয়টাআপনাকে বলতে বলেছিলেন যাতে আপনি তাকে মানা করেন। নসরুল্লাহ তো খুবই দুর্বিনীত, কিন্ত সে নাকি আপনাকে সে পীরের মত ভক্তি করে।

ইসমাইল ভাই ড্রাইভার হলেও খুবই ধার্মিক ব্যক্তি, গাড়ি চালানোর অবকাশে ধর্মীয় বই পড়েন কিন্তু গোঁড়া নন এবং একজন স্বভাব কবি। সবাই তাকে পছন্দ করেন এবং সাহেব অথবা ভাই ছাড়া সম্বোধন করেন না।

স্যার বললেন বেশ, তাহলে আমাকে না বলেতুমি নিজে বলতে গেলে কেন?

স্যার আমি তো আপনাকেই বলতে চেয়েছিলাম, কিন্তু আপনি চেম্বার ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন। ঠিক এ সময় সে এলো, আপনাকে না পেয়ে সে ইউনুস সাহেবের টেবিলের সামনে চেয়ার টেনে বসে পড়ল এবং খোচা মেরে কথা বলতে শুরু করল– কেয়া ইউনুস সাহেব, ইয়ে শালে জায়বাংলাওয়ালা হররোজ কেয়া করতা হ্যায় আপকা কুছ মালুম হ্যায়? খালিশপুর রেল লাইন বরাবর যো ঝোপড়ি হ্যায় না, কোই কোই ঝোপড়ি শ্রেফশুড়িখানা আউর রেণ্ডীখানা হ্যায়।জায়বাংলাওয়ালানেদফে দফে প্রসেশন করতা হ্যায়। একদফা প্রসেশন খতম হো চুকাতো বাস পয়সা লেলো আউর শুড়িখানা-রেণ্ডীখানামেঘুস যাও।দিনভর অ্যায়সি চল রাহা।একদফে প্রসেশন, পয়সা আউর শুড়িখানা-রেণ্ডীখানা; ফির প্রসেশন, পয়সা আউর শুড়িখানা-রেণ্ডীখানা। মনোয়ার সাবছে পুঁছিয়ে, সব কুছ আপকা একিন হো জায়গা স্যার।

বললাম– নসরুল্লা সাব, ফাউলটকছে কেয়া ফায়দা! আপলোগ কুছ কর সাকেগা নেহি। আচ্ছা হোগা আগার আপ খামুশ হো যায়ে।

সে ক্ষেপে গেল– নেহি হোগা তো? আপলোগ শ্লোগান দেতা হ্যায়– দেকে দেকে আগুন জ্বালো। আপনারা দেখে দেখে বিহারীকা ঘর আগছেজ্বালা দেগা, আউর হাম খামুশ রহেগা!

ইউনুস সাহেব বললেন– আরে নাহ্ ওরা বলে দিকে দিকে আগুন জ্বালো।

নেহি ইউনুস সাহেব নেহি, হামলোগ আচ্ছাসে সামঝা লিয়া উসকো মতলব কিয়া হ্যায়। উনলোক জরুর হামারা ঘর জ্বালা দেগা। তব আপলোগকা এক শ্লোগান বিলকুল সহি হ্যায়– যায় বাংলা। বাংলা যায় যায়।

বললাম– আমরা শ্লোগান দিই 'জয় বাংলা'– বাংলা উইল উইন। আগার পাকিস্তান না মানে তো পাকিস্তানকো কেয়া হোগা আল্লা মলুম!

নসরুল্লা খুব বাজেভাবে রেগে গেল, বলল– দো বাস্টার্ড 'শেখ' ইন্ডিয়ান মুসলমানকো বরবাদ কিয়া– কাশ্মীর কা শেখ আবদুল্লা আউর ইয়ে গাদ্দার শেখ মুজিব। আপসোস মানোয়ার সাব, আপ মোহাজির হুয়ে ফিরউস গাদ্দারকি সাথ হ্যায়!

স্যার সব কথা কি বলা যায়! মেয়েরা প্রসেশান করে শোগান দেয়–'রক্ত দিয়েছি আরো দেবো রক্ত।' এটাকে খুব অশ্লীলভাবে কটাক্ষ করে বলে– আরে শালি তোম তো হ্যার মাহিনা মে.... আউর কেতনা?স্যার, এই হল সেদিনের ঘটনা, ইউনুস সাহেব জয়েন করলে আপনি শুনে দেখতে পারেন।

ঠিক আছে, তুমি অফিসে যাও, যা বললাম তাই কর। আমি খয়রাতি সাহেবকে নসরুল্লার ব্যাপারে বলে রাখবো।

মুক্তিযোদ্ধার মুখ

সেদিনই প্রথম অফিস খুলল। আমাদের ডিপার্টমেন্টে প্রায় এগারো বারো জন স্টাফ জয়েন করতে এসেছিল। তারা আমাকে দেখে ভূত দেখার মত চমকে উঠল, সবাই উৎকণ্ঠিত–কোন অসুবিধা হবে নাতো স্যার!

– আল্লা ভরসা। বললাম, নির্বাচনে সালাহউদ্দিন ভাইয়ের জন্য কাজ করেছি, অন্যায় তো কিছু করিনি। তাও সালাহউদ্দিন ভাইয়ের সরাসরি অনুরোধে অফিস আমাকে ছুটি দিয়েছিল বলে। থাক এসব, আপনারা সবাই যার যার ড্রয়ারগুলো দ্রুত চেক করে ফেলেন, যারা আসেনি তাদের গুলোও দেখতে হবে। দরকার হলে তালা ভাঙতে হবে। পোস্টার, লিফলেট, পতাকা, ব্যাজ, ছবি যা আছে সব পুড়িয়ে ফেলতে হবে।

এর মধ্যে লুৎফর পিওন এসে ফিস ফিস করে বলল–আপনার মনে আছে স্যার, একবার গুজব উঠল বিহারীরা আমাদের মারতে আসছে, আমরা তখন কিছু লোহার পাত এবং রড এনে অফিসেবিভিন্ন আলমারির পিছনে রেখেছিলাম, ওগুলোর কি হবে?

এটা ছিল আমাদের জন্য খুবই দুঃশ্চিন্তার বিষয়। জানাজানি হলে সমস্যা হবে, বিহারীরা এককথায় এগুলোকে মারণাস্ত্র হিসাবে চিহ্নিত করবে। বললাম–এখন চুপ থাকো, টিফিনে যখন সাব্বির থাকবে না তখন ওগুলো সব রেকর্ডরূমের পুরনো আলমারির পিছনে রেখে এসো। বাইরে থেকে যেন দেখা না যায়।

সবাই দ্রুত হাতে কাজ করে গেল, দেখতে দেখতে কাগজের স্তুপ জমে উঠল মেঝের উপর। এবার আগুন ধরানোর পালা। আমাদের মধ্যে হরদম সিগারেট খেতো আকরাম। পকেট থেকে দেশলাই বের করে আগুন জ্বালাতে যেয়ে সে হঠাৎ থমকে দাঁড়ালো। আমরা কাগজের স্তুপটা ঘিরে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম। নিচের দিকে চোখ পড়তেই থমকে গেলাম। স্তুপের উপর বঙ্গবন্ধুর প্রমাণ সাইজ ছবি। চোখ দুটো জ্বল জ্বল করে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে। আশ্চর্যরকম জীবন্ত, ভাবখানা এমন– কিরে পোড়াবি নাকি!

আকরাম কয়েক সেকেন্ড সেদিকে তাকিয়ে থেকে নিঃশব্দে দেশলাইটা পাশে মকসুদ সাহেবের হাতে ধরিয়ে দিল। মকসুদ সাহেব কয়েক জনকে ডিঙ্গিয়ে দেশলাইটা তুলে দিলেন সাব্বিরের হাতে। আমাদের মধ্যে সাব্বিরই ছিল একমাত্র অবাঙ্গালী। আমি যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম, মকসুদ সাহেব ঠিক সিদ্ধান্তই নিয়েছেন। আমরা কেউই বঙ্গবন্ধুর ছবি এবং বাংলাদেশের স্বর্ণালী মানচিত্র খোচিত পতাকা পোড়ানোরকথা ভাবতে পারছিলাম না, আবার কেবলমাত্র সাব্বিরের উপস্থিতির কারণেইকোনবিকল্প খুঁজেও পাচ্ছিলাম না। ভাবলাম একান্তই যদিপোড়াতে হয় সাব্বিরই পোড়াক।

সাব্বির মৃদু হেসে আমার হাতটা টেনে নিয়ে দেশলাইটা ধরিয়ে দিয়ে বলল–'মনোয়ার সাব, হাম ক্যান্টিন সে থোড়া চা পিকে আয়ে।' ছোটখাটো মানুষটা প্যান্টের দু'পকেটে হাত ঢুকিয়ে ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেল। সাথে সাথে কে যেন উচ্চারণ করল–'গড হেল্প দোজ হু হেলপ দেমসেলভ্স।' মুহূর্তে স্তুপ হাতড়ে হাতে হাতে বঙ্গন্ধুর সব ছবি, বাংলাদেশের মানচিত্র খচিত পতাকা উঠে গেল স্তুপ থেকে, বিশাল রেকর্ড রূমের পনেরো বছরের পুরানো ফাইল ও রেকর্ডপত্রের আড়ালে অন্তর্হিত হল। তার বদলে বেশ কিছু অপ্রয়োজনীয় বাতিল কাগজপত্র এনে ফেলা হল স্তুপে।

দাউ দাউ করে জ্বলে পুরো স্তুপটা যখন নিঃশেষিতপ্রায়, সাব্বির ফিরে এল। সে আগাখানি কমুনিটির সদস্য ছিল, আমার পাশ দিয়ে যাবার সময় ক্ষণিক দাঁড়িয়ে অস্ফুট স্বরে বলল–'মনোয়ার সাব, নো বডি অব আওয়ার কুমুনিটি কুড অলসো সেট ফায়ার অন দি পোট্রেট অব আওয়ার বিলাভ্ড আগা খান।' সে তার টেবিলে যেয়ে বসল।

সবাই তখন যে যার টেবিলে বসে মাথা ঝুঁকিয়ে কাজ করছিল। বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে আমি একে একে মুখগুলোর দিকেতাকালাম, প্রত্যেকটা মুখই এক একজন মুক্তিযোদ্ধার মুখ, সাব্বিরের মুখও!

একপেশে এক ফ্যাকচুয়াল রিপোর্ট!

কাজে যোগদানের বেশ কিছু দিন পর পাট বিভাগের একজন স্টাফ ফিসফিস করে বলল–মিলে একটাফ্যাকচুয়াল রিপোর্ট তৈরি হয়েছে জানেন নাকি স্যার। গোপনীয় রিপোর্ট,কয়েকদিন আগে খুলনা আর্মি হেডকোয়ার্টারে নাকি পাঠিয়েও দিয়েছে। ওতে কিছু শ্রমিক ও স্টাফ-অফিসারের নাম আছে। তারা মিলে এলে নাকি আর্মিদের হাতে ধরিয়ে দেয়া হবে। রিপোর্টে স্যার আপনাদের বিভাগের শাহজাহান সাহেবের নামও আছে।

বলেন কি! শাহজাহান সাহেব তো খুবই ভদ্র এবং নিরীহ মানুষ, রাজনীতিও করেন না।

সেদিন যা ঘটেছিল শাহজাহান সাহেব কেন স্বয়ং দরবেশের পক্ষেও মাথা ঠিক রাখা কঠিন হত। ওপারে প্রচণ্ড হৈচৈ গুলির শব্দ আর্তনাদ শোনা যাচ্ছে। নদীর এপারে মিলের বহু লোক অসহায় ভাবে দাঁড়িয়ে দেখছে। এর মধ্যে ক্রিসেন্ট প্লাটিনামের ভিতর থেকে অনেক লোক প্রাণভয়ে ছুটে এসে কেউ নৌকায় উঠে কেউ সাঁতরিয়ে এপারে পালিয়ে আসার চেষ্টা করল। কিন্তু তাতেও রেহাই নেই। ওপারে অস্ত্রধারীরা নৌকা নিয়ে ধাওয়া করে নদীর মধ্যে তাদের কুপিয়ে মারছে। এই যে শুরুহলো এর আর শেষ নেই। এরমধ্যে বেশ কিছু মহিলা এবং

বাচ্চকাচ্চা নিয়ে কিছু লোক এক নৌকায় উঠে এপারে পালিয়ে আসার চেষ্টা করে। কিন্তু পরমুহূর্তে অস্ত্রধারীগুন্ডারা নৌকা নিয়ে তদের ধাওয়া করে প্রায় মাঝ নদীতে এসে সবাইকে কচুকাটা করতে থাকে।হাহাকার করা ছাড়া এপারে দাঁড়িয়ে আমাদের পক্ষেকিছুই করা সম্ভব ছিল না। তখন শাহজাহান সাহেব এবং আরো কয়েকজন ছুটে যেয়ে অফিসার কোয়ার্টারে যাদের বন্দুক ছিল তাদের বন্দুক কেড়ে নিয়ে আসে। তারা নদীর মধ্যে অস্ত্রধারীদের লক্ষ্য করে গুলি ছুড়তে থাকলে খুনি বদমাসগুলো পালিয়ে যায়। কিন্তু ততক্ষণে ক্ষতি যা হওয়ার হয়ে গেছে। এক নৌকা বোঝাই শিশু, মহিলা এবং পুরুষ কেউ বিহারীদের অস্ত্রের আঘাতে কেউ পানিতে ডুবে মারা পড়েছে। এপারের বাঙালিরাতখন ক্রোধে অন্ধ হয়েপ্রতিশোধ নিতে মিলের বিহারীদের উপর হামলা করে। তারা কয়েকজনকে টেনেহিঁচড়ে নদীর পাড়ে এনে হত্যা করে। শাহজাহান সাহেবরা কিন্তু তখন এই নিরীহ অসহায় বিহারীদের বাঁচানোর প্রাণপণ চেষ্টা করেন। তা সত্ত্বেও তার নাম রিপোর্টে আছে। আরো কয়েকজনের নাম আছে যারা আওয়ামী লীগ করে সম্ভবত সে কারণেই। আপনি তো ঐ সময় মিলে ছিলেন না, আপনার নাম নেই। তবু স্যার সাবধানের মার নেই।

আপনি কি পুরো রিপোর্টটা দেখেছেন?

কিভাবে দেখব স্যার! সিরাজি সাহেবের কাছ থেকে টুকরো টুকরো কিছু ঘটনা শুনেছি। স্যার ঐ সময় মিলে যা যা ঘটেছে তার বর্ণণা আছে রিপোর্টে।কিছু ভাল মানুষ, রিপোর্টে নাম আছে, তবুও বেশ কিছু দিন মিলে কাজ করেছে, ম্যানেজমেন্ট আপত্তি করেনি। পরে বিহারীদের চাপে তাদের সরিয়ে দেয়।তাছাড়া খালিশপুরে বাঙালিদের উপর যে নৃশংসতা ঘটেছে তার হাজার ভাগের একভাগও এখানে ঘটেনি। কিন্তু নেভিরা গানবোট থেকে মিলে এবং সেনহাটিতে কামানের গোলা ছোড়ে।ফলে বাঙালিরা অনেক দিন পর্যন্ত কাজে যোগ দিতে সাহস পায়নি।

সিরাজি সাহেব ইউপির উদ্বাস্তু। অ্যাসিসটেন্ট জুট অফিসার। ফর্সা, পাতলা ছিপছিপে, হাসিখুশি মানুষ, কিছুটা চপল স্বভাবের। সবার প্রিয়। একবার খালিশপুরে চিত্রালী সিনেমা হলে তুর্কি সাংস্কৃতিক দল প্রদর্শনী করতে এসেছিল। শহর ভেঙ্গে পড়েছিল হলে। মকসুদ সাহেব একদিন বললেন– গেছিলেন নাকি মনোয়ার সাহেব?

না, দু একদিনের মধ্যে যাব ভাবছি।

হ্যা যান, জীবন সার্থক করে আসুন।

আসলে বেলি ড্যান্স দেখার খুব ইচ্ছা আমার। মিশরের বেলি ড্যান্সারের কথা অনেক শুনেছি, একটা সিনেমাতেও কোন এক প্রিন্সেসের ড্যান্স দেখেছি। জানিনা তুর্কি বেলি ড্যান্সাররা কেমন।

মকসুদ সাহেব হা হা করে হাসতে হাসতে বললেন– যান ভাই, বেলি ড্যান্স-ব্রেস্ট ড্যান্স কত কি দেখতে পাবেন, প্রাণ জুড়িয়ে যাবে!

মানে?

মানে আর কি! হলে আমার পাশে এক সফেদ মাওলানা টাইপের ভদ্রলোক পাজামা-পাঞ্জাবী পরে মাথায় টুপি দিয়ে বসেছিলেন। বললেন– ইসলামী দেশের সাংস্কৃতিক দল তো, তাই দেখতে এলাম। বেলি ড্যান্সের সময় ভদ্রলোক নাউজুবিল্লাহ বলে দায় সারলেন। শেষ দিকে যখন সম্পূর্ণ নগ্নবক্ষা এক সুন্দরী ভরাট স্তন দুলিয়ে ব্রেস্ট ড্যান্স দেয়া শুরু করল তিনি নাউজুবিল্লাহ নাউজুবিল্লাহ বলে মুখের উপররুমাল চেপে ধরলেন, কিন্তু চোখ ঢাকলেন না।

তখন ছাত্ররাজনীতি করি, অনেকেই আমাদেরকে আদর্শ মানে। আমার যাওয়া হলনা। তবে বিষয়টা ওখানে শেষও হল না। অফিসে আমার ইমিডিয়েট বস ছিলেন ইউনুস সাহেব। একদিন সকালে গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করলেন চিত্রালীতে গিয়েছিলেন মনোয়ার সাহেব?

না স্যার, শুনেছি বাজে ধরনের নাচ দেখায়।

ঠিকই শুনেছেন, খবরদার যাবেন না। খুব অশ্লীল ব্যাপার।

আপনি গিয়েছিলেন নাকি স্যার?

আরে না। কে যাবে! যারা গিয়েছিল তাদের কাছে শুনেছি, তাই বললাম।

ঠিক এ সময় হৈহৈ করতে করতে সিরাজী সাহেব এসে অফিসে ঢুকলেন– আরে ইউনুস সাহেব, আমরা চ্যাংড়া-ছোকরা মানুষ, আমাদের না হয় মান-সম্মান নেই, যেখানে সেখানে যাই।কিন্তু আপনি গেলেন কোন আক্কেলে? বলেন ইউনুস সাহেব, বলেন আপনি কিভাবে গেলেন, আপনার লজ্জা করল না, ছি ছি ছি!–

ইউনুস সাহেব কি আর করবেন, নিশ্চুপ বসে বসে সিরাজি সাহেবের কথাগুলো হজম করলেন।

সম্ভবত আগস্ট মাসের দিকে সিরাজি সাহেব অফিসে এসে ইউনুস সাহেবের দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন। স্বভাব বিরুদ্ধভাবে তিনি নিরব ছিলেন। তার হাতটা ধরে ইউনুস সাহেব বিস্ময়ের সাথে বললেন কি ব্যাপার সিরাজি সাহেব, আপনার চোখে পানি! আপনি কি আমাদের ছেড়ে চলে যাচ্ছেন?

সিরাজি সাহেব নিরবে মাথা নাড়লেন। কিছুক্ষণ পর ধাতস্ত হয়ে বললেন প্রসিডেন্ট ইয়াহিয়ার উচিৎ ছিল শেখ মুজিবের হাতে ক্ষমতা দিয়ে সরে পড়া, তা না করেএকের পর এক ভুল করে যাচ্ছে। এখন আবার তার বিচার করতে বসেছে।এদিকে আর্মি ও বিহারীরা যা করছে তার ফল একদিন না একদিন পেতেই হবে। কিন্তু তখন কি কেউ বিহারী-পাঞ্জাবী-ইউপি দেখবে ইউনুস সাহেব? দেখবে না। ২৬ মার্চের পর ওরা আমাকেও তো বিহারী বানিয়ে দিল। এখন মনে হচ্ছে সময় থাকতে চলে যাওয়া ভাল। আই উইল অলওয়েজ রিমেমবার ইউ, আলবেদা টু অল অব ইউ মাই ব্রাদার!

সিরাজি সাহেবের সাথে আমার সম্পর্ক অফিসিয়াল সম্পর্কের অতিরিক্ত কিছু ছিলনা। যেদিন অফিসে প্রথম দেখা বললেন ওয়েল ডান মি. মনোয়ার, জয়েন কিয়া। হাউএভার সাম ওয়ান ওয়ানটেড টু কিপ ইউ অ্যাওয়ে ফ্রম দ্য মিল। বাট এসআই এন্ডউই নো ইউ ওয়েল। কেয়া কসুর আপকা? ডোন্ট ওরি, বি ফেথফুল টু আল্লাহ্।

মিলটি ছিল বাঙালি প্রভাবিত। পরিচালনার দায়িত্ব ছিল ব্রিটিশ কোম্পানির হাতে। তারা মিল চালানোরজন্যবিশেষভাবে উদগ্রীব ছিল। কিন্তু এ ব্যাপারে বড় বাধা ছিলেনমিলের নেটিভ খ্রিশ্চিয়ান ম্যানেজার এইচ জে রবার্টসন। তাকে বাঙালিরা অপছন্দ করত। শোনা যায় মিলে যখন নেভিরা কামানের গোলা বর্ষণ করে, যে কজন বাঙালি অফিসার তখনো মিলে ছিলেন তারাও গ্রামের ভিতর চলে যেতে চেয়েছিলেন, কিন্তু রবার্টসন নাকি পিস্তল বের করে এই বলে হুমকি দেন যে সেক্ষেত্রে তিনি স্ত্রী ও সন্তানদের গুলি করে নিজে আত্মহত্যা করবেন। কেউ আর মিল ছেড়ে যেতে পারেন নি। তিনি উর্দুভাষী ছিলেন, বাঙালিদের কমই বিশ্বাস করতেন। পরিস্থিতি আর্মির অনুকূলে চলে গেলে তিনি সার্কিট হাউজ আর্মি ক্যাম্পে যেয়ে কর্নেল শামসের সাথে দেখা করেন এবং কাঁধে কর্নেল শামস-এর দেয়া উপহার চাইনীজ রাইফেল ঝুলিয়ে মিলে ফিরে আসেন।

বাঙালিরাও তাকে বিশ্বাস করত না এবং কাজে যোগ দেয়নি। মিল ম্যানেজমেন্ট বাধ্য হয়ে তাকে সরিয়ে একজন ব্রিটিশ নাগরিক ডি জি র‍্যামজেকেমিলের জেনারেল ম্যানেজার করে পাঠান। তবে সামারক কর্তৃপক্ষতার আনুগত্যেরমূল্যায়ন করেনতাকে প্লাটিনাম জুবিলি জুট মিলের প্রকল্প প্রধানের পদে বসিয়ে। আমরা এই মিলের মধ্য দিয়ে স্টার জুট মিলে যাতায়াত করতাম। তাকে যখনই দেখেছি তার কাঁধে চাইনীজ রাইফেলটিও ঝোলানো দেখেছি।শুনেছি স্বাধীনতার প্রাক্কালে তিনি বাংলাদেশ ছেড়ে যান।

আমরা খুলনা থেকে আসতাম। পথে মাঝে মাঝে আর্মি ও নেভির চেকিংয়ের মুখে পড়তাম। তারা আমাদের কাছে 'ডান্ডিকার্ড' দাবী করতো। প্রায় অশিক্ষিত সেন্ট্রিরা আইডেনটিটি কার্ড উচ্চারণ করতে সমর্থ ছিলনা। পরে আর্মি কর্তৃপক্ষ সকল প্রতিষ্ঠানকে তাদের কর্মীদের জন্য আইডেনটিটি কার্ড ইসুর আবশ্যকীয় নির্দেশ জারি করে। আমরাও প্রশাসন বিভাগকে পরিচিতি পত্রের জন্য ক্রমাগত চাপ দিয়ে যাচ্ছিলাম। কিন্তু প্রশাসন বিভাগ নিরুপায় ছিল। তখন স্টাফ অফিসাররা প্রায় সকলে মিলের মেসে, কোয়ার্টারে এবং আশেপাশের গ্রামগুলোতে বাসা ভাড়া করে থাকা শুরু করেছিল।

জায়েদীস ফটোগ্রাফারের মালিককে আমি চিনতাম। কর্মাস কলেজের সামনে মোড়ের মাথায় তাদের স্টুডিও। অফিস থেকে ফেরার পথে আমরা দু তিন জন স্টুডিওতে নামলাম। তাকে মিলে যাওয়ার কথা বলতেই লাফিয়ে উঠলেন– ওরেপ্ বাপ, লাখ টাকা দিলেও ঐ বিহারীএলাকায় যাবেন না। বললাম– আমরা তো রোজই যাই। গাড়িতে যাবেন আসবেন। আইডেনটিটি কার্ডের জন্য শত শত ছবি তুলতে হবে, ভেবে দেখুন। ভদ্রলোক আমাদের বয়সী ছিলেন, বললাম আপনার কাছে আমি এটুকু দাবী করতেই পারি। তিনি রাজি হলেন, মৃদু হেসে বললেন আপনি চাকরি করতে পারছেন, বিস্ময়কর!

যে দিন সবাই কার্ড হাতে পেল মনে হল যেন জীবন ফিরে পেয়েছে। একজন অফিসার বললেন ফ্যামিলি আনতে গিয়েছিলাম দেশের বাড়িতে। লঞ্চঘাট থেকে বেরতেই চেকিংয়ের মুখে পড়লাম। যাদের আইডেনটিটি কার্ড আছে সহজেই পার পেয়ে গেল। যাদের নেই তারা মোটা বেতের বাড়ি খাচ্ছে, ঐ সাথে কঠোর হুমকি– দো দিন কা আন্দার ডান্ডিকার্ড বানালো, নেহি তো...। সবচেয়ে ভয়াবহ হল, সন্দেহবশে তারা কাউকে কাউকে একপাশে বসিয়ে রাখছে। আমাদের সিরিয়াল আসার আগেই বুঝে গেলাম বোধহয় কিছু একটা দেখালেই চলে। রেশন কার্ড ছিল তাই বাড়িয়ে ধরলাম। ব্যাটা বেহেড আর্মি, উল্টেপাল্টে দেখে বলল, তসবির কাঁহা? আমি ঝামেলা এড়াতে চাই, তাজিমের সাথে বললাম স্যার, ইয়ে তোপ্রভিশনাল কার্ড হ্যায়, তসবিরওয়ালা অফিশিয়াল কার্ডমুঝে দো-তিন রোজকা আন্দারইনশাআল্লাহ মিল যায়েগা। আমি স্ত্রী কন্যার সামনে বেতের বাড়ি খাওয়া থেকে রেহাই পেলাম।

আনোয়ার করাচি গেল জীবন হাতের মুঠোয় নিয়ে

খুলনা সার্কিট হাউজে মূল আর্মি ক্যাম্প। ২৭ ফ্রন্টিয়ার ফোর্স এখানে আস্তানা গেড়ে বসে আছে অহেশ দিন থেকে। সামনে লোয়ার যশোর রোড। সার্কিট হাউজ মাঠের কর্নার থেকে দক্ষিনমুখে বেরিয়ে গেছে হাজী মহসীন রোড। রাস্তা দুটোর কোণায় একটা সাদা দ্বিতল অট্টালিকা- খুলনার দীর্ঘদিনের স্বনামখ্যাত পৌর চেয়ারম্যানমহেন্দ্র ঘোষের পরিত্যাক্ত বাড়ি। বাড়িটা এখন পাকিস্তানি বিমান বাহিনীর অফিস।আনোয়ার বাবার সাথে সেখানে যেয়ে রিপোর্ট করল। সেঘরে কয়েকটা হুলো বেড়াল দেখতে পেল যারাতাদের নাগালেনির্বোধের মত এককবুতর ছানার ঢুকে পড়া দেখেউল্লাসে জিপ চাটছিল।

আনোয়ারকে ডিউটি অফিসারের ঘরে ঢুকানো হল। এক তরুণ ক্যাপ্টেন চেয়ারে বসা। জবরদস্ত স্যালুট ঠুকে আনোয়ার বলল– স্যার হাম এয়ার ফোর্সমে নকরি করতা হ্যায়, হামারা ডিপার্টমেন্টকা এলান হুয়া জয়েন করনে কি লিয়ে, ম্যায় জয়েন করনে কি লিয়ে আয়া হু।

ক্যাপ্টেন ভ্রু কুঁচকে আনোয়ারের দিকে তাকিয়ে বলল– হা, উও তো ঠিক হ্যায়, হাম দেখা তুম আ গিয়া, মাগার এতনা দিন কাঁহা থা? আভি হার গ্যায়ে, আউর জয়েন করনেকি লিয়ে আ গয়া।

– স্যার, হাম ছুটি মে থা আউর ঘর পে থা।

– ইউ সি মিস্টার আনোয়ার! ঝুট বোলনেছে কোই ফায়দা নেহি হোগা, হামারা পাস সব রিপোর্ট হ্যায়। তোম এয়ারফোর্স পারসোনেল হ্যায়, তোম তো জরুর হিরো বনকে মিসক্রিয়েন্টসকো ট্রেনিং দিয়া, কমান্ড ভি কিয়া। তো আভি বাতাও কেতনা মিসক্রিয়েন্টকো ট্রেনিং দিয়া? কাঁহা কাঁহা জং কিয়া? কেতনা বিহারী আউর কাবলীকো মারডালা? সবকুছ এক এক করকে বাতাও। হাম সব শুনেগা, ইয়ে সব কাহানীছে মেরা বহুত ইন্টারেস্ট হ্যায়।

আনোয়ার হতাশ হয়ে পড়ল।উদ্‌ভ্রান্ত বাবা কিছু বলতে গেলেন– স্যার.....

– আপ কৌন?

– স্যার আনোয়ার হামারা বেটা হ্যায়।

– মৌলবী সাব, আপ আপকা কামমে চালা যাইয়ে। যাইয়ে প্লিজ। হাম আপকা বেটাকো থোড়া পুছপাছ করুঙ্গা।

তবে বাবার নূরানি চেহারা সম্ভবত তাকে কিছুটা প্রভাবিত করেছিল। দাদী ছিলেন মেদিনীপুরের উর্দূভাষী বাঙালি। বাবাও চমৎকার উর্দু জানতেন, বললেন– হামলোগ হিন্দুস্থানকি মোহাজির, হামারা খানদান এক মশহুর খানদান হ্যায়। পাকিস্তান কি লিয়ে হামলোগ ঘর জমিন সব কুছ কুরবান কিয়া, আভি পাকিস্তান কি লিয়ে হাম জান ভি দে সাকতা হু। ইসি লিয়ে হামারা বেটা পাকিস্তান এয়ার ফোর্স মে জয়েন কিয়া। আভি উও ছুটি মে হ্যায়, মাগার গাদ্দারকো সাথ উসকা কোই রিশতা নেহি। হামলোগ এক বেটার টাইমকা এন্তেজার মে থা যব উও মসরুর এয়ার বেস মে রিপোর্ট কর সাকে। মেরা বেটা সাচ্চা পাকিস্তানি হ্যায় স্যার।বাবা সালাম দিয়ে উত্তরের অপেক্ষা না করে ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেলেন।

তোমবাহারমে ওয়েট কর আনোয়ার। এর মধ্যে কয়েকজন আর্মি চার-পাঁচ জন বন্দীকে পিছমোড়া করে বেঁধে নিয়ে এলো। ক্যাপ্টেন বলল– ভেরি গুড ক্যাচ! ওয়েল ডান।

স্যার অল আর্মড পারসোনেল, দে ফ্লেড অ্যাওয়ে উইথ আর্মস। পাকাড় গিয়া।

লোকগুলোর সারা দেহ ক্ষতবিক্ষত, এখানে ওখানে কুদোর কালসিটে দাগ, জমাট রক্ত। কিছুক্ষণ পর ধৃত লোকগুলোর পিছু পিছু ক্যাপ্টেন বেরিয়েএলো, হঠাৎ আনোয়ারের দিকে ফিরে বলল– তোমারা হালাত য়্যায়সা ভি হো সাকতা, হাউএভার ইউ হ্যাভ নট গন উইথ দেম, ইউ হ্যাভ কাম টু আস। আনোয়ার চুপচাপ বসে আকাশ পাতাল ভাবছিল, হঠাৎতার ডাক পড়ল। ক্যাপ্টেন তার হাতে একটা টাইপকরা কাগজ ধরিয়ে দিল, বলল– দেখো আনোয়ার, আই অ্যাম নট অথরাইজড টু অ্যাকসেপ্ট ইউর জয়েনিং, ইউ আর টু গো টু যশোর ক্যান্টনমেন্ট।

– ইয়েস স্যার।আনোয়ার স্যলুট দিয়ে বেরিয়ে এলো।

খুলনা থেকে যশোরে যাতায়াতের মাধ্যম রেল অথবা বাস। দুটো রুটই তখন সৈয়দপুরের একপাল ক্রোধোন্মত্ত বিহারীর দখলে। বাঙালিরা তাদের জিঘাংসার শিকার। পথে পথে গোদের উপর বিষফোড়ার মত আছে আর্মি ও রাজাকার ক্যাম্প। গত কয়েক দিনে তাদের হাতে মারা পড়েছে অসংখ্য বাঙালি।বাবা ঘোর দুঃশ্চিন্তায় পড়লেন। তবে মামা ছিলেন যশোর হাবিব ব্যাংকের ম্যানেজার। অবৈধ রেমিটেন্সের সুযোগ

নিতে আর্মিদের কাছে তখন ব্যাংক ম্যানেজারদের কদর অনেক বেশি। মামা ব্যাংকের গাড়িতে করে আনোয়ারকে নিয়ে গেলেন যশোর ক্যান্টনমেন্টে। সেখানেও তারা আর একটা কাগজ ধরিয়ে দিয়ে আনোয়ারকে বলল- মেবি দে আর দি প্রপার অথরিটি টু একসেপ্ট ইওর জয়নিং, গো টু ঢাকা পিএএফ বেজ।যশোর ক্যান্টনমেন্টের অবস্থা ছিল আরো ভয়াবহ।

এবার আনোয়ার একা নয়, এয়ার ফোর্সের চারজন বাঙালি একত্রে রওনা দিল বিপদসঙ্কুল ঢাকার পথে। তখন সিরাজগঞ্জ-জগন্নাথগঞ্জ ঘাট হয়ে ট্রেন যেত ঢাকায়। সিরাজগঞ্জ ঘাটে মহা বিপদে পড়ল তারা। ঘাটের দায়িত্বে ছিল একদল নিরেট আর্মি। মিসক্রিয়েন্ট হাতে পাওয়ার কৃতিত্বে উল্লাসিত, আনোয়ারদের এয়ার ফোর্সের পরিচয়পত্রের কোন গুরুত্ব নেই তাদের কাছে। সবাইকে ফল ইন করালো।

হামলোগ সাচ্চা পাকিস্তানি হ্যায় স্যার, পাকিস্তানকি খেদমত করনেকি লিয়ে... কথা শেষ হয়না হলুদ দাঁত বের করে অশ্লীলভাবে ঠা-ঠা করে হেসে ওঠে এক বদমাস, কণ্ঠে বিদ্রুপের সুর– শালে পাকিস্তানকো খেদমত করেগা! আরে তু, তেরা বিবি, তেরা গুড়িয়া হামলোগকা খেদমত করেগা শালে, সামঝা? তু হামারা জুতা পালিশ করেগা।গাদ্দারকি বাচ্চা, কাঁহা হ্যায় তেরা মুজিব, জয় বাংলা বানায়গা, ছাধিন হোগা- ছাধিন!

কাড়াপাড়া মুসলিম লীগ

ঈষ্ঠা-৩০৫

ওষুধ সংগ্রহ

মে মাসের শুরুতে এক অপরাহ্নে আইনুল আমাদের বাড়িতে এলো, বলল– ভাই বাইরে আসেন কথা আছে। সে আমার ভগ্নিপতির ছোট ভাই, আমাদের সাথে সন্দীপনে ছিল, গুরুর সাথে সেতু পত্রিকায় কাজ করত। ভাল কর্মি। বলল– যুদ্ধ তো চলছে, কিছু কাজ করতে হবে, অবশ্য তেমন রিস্কি না, তবে আপনি কোথাও আমার কথা বলতে পারবেন না, আমিও আপনার কথা বলব না।

বল কি কাজ।

যুদ্ধে সব সময় ছেলেরা আহত হচ্ছে, তাদের চিকিৎসার জন্য ওষুধপত্র গজ ব্যান্ডেজ দরকার। জুট মিলের ডিসপেন্সারিতে প্রচুর ওষুধ পাওয়া যায়, আপনি কি কিছু ওষুধ যোগাড় করে দিতে পারেন।

ডক্টর আমানুল্লার কথা মনে পড়ল, মিলের মেডিকেল অফিসার, মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের লোক। বললাম– অফিসে যাই তারপর জানাব, তবে পারা যাবে বলে মনে হয়।

পর দিন বেলা বারোটার কিছু আগে ডিসপেন্সারিতে গেলাম, এ সময় শ্রমিক কর্মচারিদের ভিড় কম থাকে। তবে আমার দুঃশ্চিন্তা সিকিউরিটি অফিসার খায়রাতি সাহেবকে নিয়ে। আমি চাকরিতে যোগদানের আগে আমার পক্ষে এস আই খান সাহেব তাকে কথা দিয়েছিলেন যে আমি কোন ধরনের গাদ্দারী বা জাসুসিতে নেই, আমি খানদানী বংশের ছেলে, মোহাজির এবং নিপাট ভাল পাকিস্তানি। ডিসপেনসারির মুখোমুখি তার অফিস। ভাগ্য ভাল তিনি অফিসে ছিলেন না। ডাক্তার সাহেব বললেন– আরে আসেন আসেন, বলেন দেখি কি অসুবিধা।

– তেমন কিছু নয় ডাক্তার সাহেব, আসলে যে কথা বলতে এসেছি, এমন একটা সময়ের মধ্যে আছি যে কারো সাথে কথা বলাই দুষ্কর।

– ঠিকই। কেউ কেউ আপনার জয়েন করা নিয়ে বিস্ময় প্রকাশ করে, আপনি নাকি বড় ধরনের রিস্ক নিয়েছেন। আমি অবশ্য আপনাকে ঠিক ওভাবে চিনি না, তবে আপনার আওয়ামী লীগ কনেকশন সম্পর্কে শুনেছি।

হাতে সময় কম ছিল, সরাসরি কাজের কথায় চলে গেলাম– আমি একটা অনুরোধ নিয়ে এসেছি ডাক্তার সাহেব, পারলে রাখবেন, না পারলে আমার কথাগুলো শ্রেফ ভুলে যাবেন। আমার কিছু গজ, ব্যান্ডেজ, তুলা আর কাটাছেড়ার জরুরি ওষুধপত্র দরকার।

– ডাক্তার সাহেব কিছুক্ষণ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন– আপনি অফিসে যান, ও বেলায় আপনার বসকে দেখতে যাবো, তখন আপনার প্রেশারটা দেখে দিতে বলবেন। প্রেশারের সিম্পটম কি জানেন তো?

বিকালে ডাক্তার সাহেব যথারীতি তার কালো চামড়ার ডাক্তারি ব্যাগ নিয়ে অফিসে এলেন। কিছুক্ষণ পর স্যারের চেম্বারে ঢুকে বললাম– ডাক্তার সাহেব, গত রাত থেকে মাথাটা ঘুরছে, ঘাড়েও ব্যাথা এবং অস্বস্তি।

– ঠিক আছে আপনার টেবিলে যান, আমি আসছি।

ডাক্তার সাহের আমার টেবিলের সাইডে চেয়ার টেনে বসে নিচু হয়ে ব্যাগ থেকে প্রেশার মাপার মেশিন বের করার ফাঁকে বেশ কিছু ওষুধপত্র, গজ, ব্যান্ডেজ নিচের খোলা ড্রয়ারে ঢুকিয়ে দিলেন। খস খস করে প্রেসক্রিপশান লিখতে লিখতে বললেন– ওষুধগুলো ডিসপেনসারি থেকে আনিয়ে নেবেন, পরে যে দিন আসব তখন আবার দেখব।

এবার আমার দায়িত্ব সন্দেহ বাঁচিয়ে ওষুধ গজ ব্যান্ডেজগুলো বাড়িতে পাচার করা। এটা কঠিন কিছু ছিল না, তখন চেকিংয়েরও তেমন কড়াকড়ি ছিলনা। তবু মনে হল কিছুক্ষণ আগে ডাক্তার সাহেবকে বলা সিম্পটমগুলো এখন ঘাড়ে এবং মাথায় ভালই অনুভূত হচ্ছে। যাহোক দু'দিন ধরে আমি টিফিন বাটিতে ভরে ওষুধগুলো বাড়িতে নিয়ে এলাম।

দু'তিন দিন পর আইনুল আবার এলো, বলল– সামনের সপ্তাহে ডুমুরিয়া থেকে লোক আসবে, এর মধ্যে আপনি যদি কিছু যোগাড় করতে পারেন আমি এসে নিয়ে যাব।

ডুমুরিয়া নকশালদের ঘাঁটি, তবে আমরা তখন তাদের মুক্তিযোদ্ধাদের মিত্র বলে মনে করতাম। জয় বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে সেভাবেই প্রচার করা হত। দেশের কিছু কিছু জায়গায় তাদের শক্ত ঘাঁটি ছিল। মুক্তিযোদ্ধাদের তেমন কোন শেলটার ছিলনা। তারা ফরমেশন গঠনের একেবারে প্রাথমিক পর্যায়ে ছিল এবং অস্ত্র সমেত দেশের ভিতর দৌড় ঝাপের মধ্যে পড়ে গিয়েছিল। হানাদারদের ছত্রছায়ায় জামাত ও মুসলিম লীগের লোকেরা এবং তাদের পেটোয়া বাহিনী হত্যা, ধর্ষণ, লুট ও বাড়ি ঘরে আগুন দিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রচণ্ড আতংক সৃষ্টি করেছিল এবং ক্রমাগত তাদের উৎখাত করে চলেছিল। ফলে আশ্রয়, খাবার এবং সঙ্গবদ্ধ হওয়ার ক্ষেত্রে মুক্তিযোদ্ধারা তীব্র সংকটের মধ্যে পড়ে যায়। এমতাবস্থায়, স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে মুক্তিযোদ্ধাদেরকে স্থানীয় নকশালদের সাথে যোগাযোগ রাখা এবং নকশাল ঘাটিতে আশ্রয় নিয়েএকত্রে যুদ্ধ করার নির্দেশ দিত। এই ঘোষণা আমাদের অনুপ্রাণিত করেছিল। আমি আইনুলকে বললাম– তুমি সময়মত এসো, আমি যোগাড় করতে পারব আশা করি।

তবে ওষুধগুলো হ্যান্ডওভার করা হয় নি। আইনুল খুবই সরল প্রকৃতির ছিল, খোলাখুলি প্রশ্ন করে বসল, নকশালদের অপছন্দ করা সত্ত্বেও আমি কেন তাদের সহযোগিতা করতে চাচ্ছি।

বিস্মিত হয়ে বললাম– কেন, নকশাল ও মুক্তিযোদ্ধারা তো একসাথে স্বাধীনতার জন্য আর্মিদের বিরুদ্ধে লড়াই করছে। স্বাধীন বাংলা বেতারে তো তাই বলে।

এটা আপনার ভুল ধারণা। আগে অবশ্য তেমনি মনে করা হত। কিন্তু এখন সে অবস্থা নেই। খুলনায় নকশালদের দুটো মূল ধারা সক্রিয় আছে। কমরেড তোয়াহার দল দুই ফ্রন্টে যুদ্ধ করছে– মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের দালাল পাকিস্তানের বিরুদ্ধে এবং একই সাথে সেভিয়েট সংশোধনবাদ ও ভারতীয় সম্প্রসারণবাদের দালাল মুক্তিযোদ্ধাদের বিরুদ্ধে। আর একটা ধারা কমরেড আব্দুল হকের ইপিসিপি (এমএল) আপাতত পাকিস্তানের বিরুদ্ধে নয়, কেবল তথাকথিত মুক্তিযোদ্ধাদের বিরুদ্ধে লড়ছে। আমরা কমরেড আব্দুল হকের সাথে আছি।

আমি অবাক হয়ে বললাম, কিন্তু কয়েক দিন আগেও তো শুনেছিলাম তোমাদের লড়াইটা আগে স্বাধীনতার জন্য।

তেমনি ধারনা ছিল বটে, তবে পার্টি চুলচেরা বিশ্লেষণ করে দেখেছে আওয়ামী লীগের হাতে দেশ স্বাধীন হলে দেশটা ভারতের শক্ত গ্রিপে চলে যাবে এবং পূর্ব পাকিস্তান আরো অসহায়ভাবে ভারতের কলোনিতে পরিণত হবে। তখন না আসবে স্বাধীনতা- না আসবে মানুষের মুক্তি। মহান গণচিনের কমুনিস্ট পার্টির বিশ্লেষণও তাই বলে। বিষয়টা কিন্তু ভেবে দেখার মত ভাই। একটু ডিপলি চিন্তা করে দেখুন, আপনি কিভাবে একে অস্বীকার করবেন।

আমি জানি এখন তর্কে যাওয়ার সময় না, নিরাপদও না। চিন্তাক্লিষ্টভাবে বললাম– খুব একটা ভুল বলনি। ঠিক আছে, আমি ওষুধ যোগাড় করতে চেষ্টা করব, তুমি তোমার সুবিধা মত সময়ে দেখা কোরো। যদিও জানি, আমার প্রচেষ্টা কখনো সফল হবে না।

কয়েকদিন যেতে না যেতেই ডা, আমানুল্লাহ আমাদের সাথে হ্যান্ডশেক করে গেলেন। ফিস ফিস করে বললেন চলে যেতে হচ্ছে ইউনুস সাহেব, বলার তো কিছু নেই, আমার জন্য দোয়া করবেন, সাবধানে থাকবেন এই আর কি! স্বাধীনতার পর রবার্টসনের ০ সিচুয়েশন রিপোর্টটা যখন হাতে পাই তাতে ডা. আমানুল্লার নাম দেখে বিস্মিত হয়েছিলাম।

বাসিত চাচা, আমি এবং বাবলু

বাসেত চাচা বসিরহাটে রাজনীতি করতেন না, তার ভাইরা কংগ্রেস করতেন। তারা বসিরহাট ছাড়েননি। কংগ্রেস করতেন বলে '৫০-এর সাম্প্রদায়িক সংকট কালে বহু মুসলমানকে বাড়িতে আশ্রয় দিতে পেরেছিলেন। বাসেত চাচা ছিলেন পুরোদস্তুর অসাম্প্রদায়িক। কিন্তু '৫০-এর দিকে তার দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটে। যাদের সাথে এককাল বন্ধুর মত মিশেছেন, তাদের দৃষ্টি এখন ভিন্নতর কেন? আপরাইট ছিলেন, উচিৎ অনুচিৎ নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন। সেকুলার ভারতের ধারণা তখন কাজীর গরুর মত কেতাবে বন্দি। শেষ পর্যন্ত পাকিস্তানে পালিয়ে বাঁচলেন। তিনি তখন পুরোদস্তুর সাম্প্রদায়িক, হিন্দুদের বলতেন মালো। জিন্না বলা পছন্দ করতেন না, বলতেন তাজিমের সাথে বল কায়দে আজম মোহম্মদ আলী জিন্না, শুধু কায়দে আজমও বলতে পারো। তার সামনে আমাদের তাই বলতে হত। এছাড়া তার সব কিছুই ছিল চমৎকার। বাবার একনিষ্ঠ বন্ধু, প্রায়ই আমাদের বাড়িতে আসতেন এবং বাবাকে তার আওয়ামী লীগঘেষা রাজনীতির জন্য তুলোধূনা করতেন। বাবা চুপচাপ থাকতেন, কখনো তর্কে যেতেন না।

সাতক্ষীরায় চাচার বেশ কিছু ধানী জমি ছিল, ভেড়িবাঁধের ঠিকাদারীও ছিল। প্রায়ই যাওয়া-আসা করতেন। তবে স্টিমারে এবং ট্রেন-বাসে যশোর ঘুরে যাতায়াতের মত সময় এবং ধৈর্য তার ছিলনা। হাম্বার সাইকেল ছিল দারুন হার্ডি, এবড়ো খেবড়ো মাটির পথ ভেঙ্গে ডুমুরিয়া-তালা হয়ে যাওয়া-আসা করতেন। বাড়িতে ফিরে গোসল এবং নাস্তা সেরে সোজা চলে আসতেন আমাদের বাড়িতে। আমি প্রমাদ গুনতাম। মাকে ঢালাও অর্ডার দিতেন ভাবি বড় এক মগ চা বানান, গরম চা, কড়া করে। তারপর শার্ট খুলে বারান্দায় উপুড় হয়ে শুয়ে আমাকে বলতেন–দাবাও বাবা, আচ্ছা মত দাবাও, শরীরটা জামড়ে দলা পাকিয়ে আছে। তার ছেলেরা বাবার শরীর দাবাতে স্বভাবতই স্বস্তি বোধ করত না। তারা জানতো বাবা কখন ফিরবে, যথাসময়ে পালিয়ে যেত। আমার দুর্ভাগ্য চাচার প্রত্যাবর্তনকাল আমার জানা থাকত না, ধরা খেতাম। চাচাকে পছন্দ করতাম আর একটা বিশেষ কারণে, তিনি আমাদের বাড়িতে আসা মানে হরিণের মাংস আসা, হাঁস পাখি আসা। তখন এসব শিকার নিষিদ্ধ ছিলনা। কিন্তু বাবা নিষেধ করতেন। কপট রাগ দেখিয়ে চাচা বলতেন– তোমার জন্য তো আনিনি কায়ছার, যাদের জন্য এনেছি দেখগে এতক্ষণে তারা তাদের মায়ের বটির চারপাশ ঘিরে বসে কে কোনটা খাবে তার বায়না দিয়েরাখছে।

চাচা আমার ছাত্রলীগ কানেকশনের কথা ভালই জানতেন। '৭০-এর মার্চের শেষদিকে তিনি সাতক্ষীরায় আটকে পড়েছিলেন, ফিরে এলেন এপ্রিলের শেষ দিকে। আমাদের বাড়িতে এসে আমাকে দেখেই দারুণ উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন– মাশআল্লা, তুমি বাড়িতেই আছ! কি কায়সার বলেছিলাম না, মনোয়ার মালোদের সাথে যেতেই পারে না, শ্যাখেগা চাল যখন ট্যার পাবে নিজেরে ঠিকই সরায়ে নেবে। কথা কেমন ফলে গেল দেখলে তো? চাচা সম্ভবত নির্বোধ ঘৃণা থেকে কখনো শেখ মুজিব বলতেন না, বলতেন শ্যাখ্ এবং 'হিন্দুদের হিন্দু বলতেন না, মালাউনও বলতেন না, অতি তুচ্ছ ভাবে বলতেন মালো।

আমি যে প্রায় এক বছর রাজনৈতিক বিচ্ছিন্নতার কারণে বাড়িতে থেকে গেছি এবং এ নিয়ে নিজেই যন্ত্রণাবিদ্ধ, চাচা তা জাবেন কিভাবে। বাঙালিদের বিরুদ্ধে এ ধরনের মন্তব্য আমি আগেও শুনেছি, কিন্তু আগে যা কখনো হয়নি, এখন তা হল। আসলে ২৬ মার্চ সকাল থেকেই একটা প্রবল বিতৃষ্ণাবোধ থেকে এর উদ্ভব । আমি চাচাকে দাবাতে উৎসাহ হারালাম। বাবা চুপচাপ ছিলেন। মা চা দিয়ে গেলেন। গরম চায়ে তৃপ্তির সাথে চুমুক দিয়ে চাচা হঠাৎ বললেন– কায়ছার, আজ একটা দৃশ্য দেখে বড়ই আনন্দ পেলাম। তোমার কি সেদিনের কথা মনে পড়ে, সেই যে মালোরা দূর দূর করে আমাদের তাড়ালো। কি কষ্টেই না গেছে সেদিন। আর আজ প্রাণ ভরে সেই একই দৃশ্য দেখলাম। মালোরা যাচ্ছেন মাথায় বোঝা, কাঁধে ঝোলা, কাঁখে আন্ডাবাচ্চা- ট্যাফো করে কানছে, ডুলিতে বুড়োবুড়ি। দেখিএকদশাসই বেটা কাঁধের উপর থেকে বুড়িটাকে ধপাস করে পথের ওপর ফেলে দিয়ে ঝাঁঝিয়ে উঠল– আর পারবুনি। বুড়িটার গেলামগো মলামগো বলে সে কি কোঁকানি!। এক খুন খুনে বুড়ো, মাজা বেঁকে গেছে, লাঠিতে ভর দিয়ে সেও হাঁটছে। আহা কি দৃশ্য কায়ছার! সাতক্ষীরা-ডুমুরিয়া, গোটা রাস্তায় কতবার যে দৃশ্যটা দেখলাম! এক একটা লাইন কি লম্বা, মাথা মুড়ো নেই। অবাক হতে হয়, এদ্দিন এত মালো ছিল আমাগো দ্যাশে! টিক্কা খান বাপের ব্যাটা বটে!

বাবা হতভম্ভ। ব্যাথায় নীল হয়ে অধোমুখে বসে রইলেন। চাচার সব কথা তার কানে গেছে কিনা সন্দেহ। মা সরে গেলেন। দাদী অবাক হয়ে বললেন– তুমিতো কখনো এমন ছিলেনা বাসিত। আমার গা জ্বলছিল, হঠাৎ সেজচাচার একটা কথা মনে পড়ল। আমি কথাটা বাসেত চাচাকে ফিরিয়ে দিলাম– চাচা সেই যে '৫০ সালে সব ফেলে আপনারা এতগুলো মানুষ দেশ ছেড়ে ছিলেন, মার কাছে সব শোনা, ওসময় আপনার কষ্ট হয়নি?

হয়নি আবার! তাহলে বলছি কি!

সেই একই তো দৃশ্য,তাইনা? আপনার জায়গায় অন্য এক দল মানুষ প্রাণের ভয়ে সব ফেলে আন্ডা বাচ্চা বুড়ো মা বাবাকে নিয়ে অনির্দিষ্টের পথে পা বাড়িয়েছে। পথে পথে অন্তহীন কষ্ট। ওদের কষ্টে আপনার কষ্ট না হয়ে আনন্দ হচ্ছে, কেন চাচা? পঞ্চাশ সালে আপনার কষ্টের জন্য তো এই লোকগুলো এতটুকু দায়ী ছিলনা।

চাচা এমনভাবে লাফিয়ে উঠলেন যেন তার পশ্চাদদেশে বৃশ্চিক কামড় বসিয়েছে।মুরুব্বীদের কথার মধ্যে কথা!–আধ-খাওয়া কাপ মাদুরের উপর পড়ে থাকল,চাচা রাগে কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়ালেন, ক্রুদ্ধভাবে বেরিয়ে যেতে যেতে বললেন– বেয়াদব! এত বড়স্পর্ধা! মার কোলে চড়ে এসেছ, তাদের সেদিনের কষ্টের কথা তুমি কি জানো? তোমার চ্যাংড়ামি আমি ভাঙ্গব।–

বাবার সাথে তখন আমার এক ধরনের একটা দূরত্ব সৃষ্টি হয়েছিল কদাচিৎ কথা হত, শুধু বললেন, এভাবে না বলাই ভাল ছিল। মা আমাকে নিয়ে খুবই উদ্বিগ্ন ছিলেন, চাচার রাগের বিষয়টা ভালই জানতেন, বেড়ার গেট পর্যন্ত পিছু পিছু যেয়েও তাকে ফেরাতে পারলেন না।

এরপর অনেকগুলো দিন চাচা আর আমাদের বাড়িতে আসেন নি। এলেন ১ আগস্ট, রোববার। তাকে আসতে হল। বাবারপ্রাণহীন দেহ তক্তপোষের উপর নিথর পড়ে আছে। করুণ বিলাপ এবং পবিত্র আয়াতের সুর বাড়িতে এক অপার্থিব জগত তৈরি করেছে। আমি মেঝের উপর বাবার পায়ের দিকে অন্তহীন শূন্যতার মধ্যে বসে ছিলাম। চাচা বললেন– আমার উপর এত রাগ বাবা, যে আগে তার অসুস্থতার একটা খবরও পর্যন্ত দিলেনা। আমার ঠোটদুটো কেঁপে গেল। বু বলল– কেউ তো বুঝতে পারেনি চাচা আব্বা এভাবে চলে যাবেন। ক্ষেতে মাটি কোপাতে কোপাতে পড়ে গেলেন। সাথে সাথে সব শেষ হয়ে গেল!

বাসিত চাচাদের বাড়ি মূল রাস্তায়, একই নামে একটা ক্রস রোডমূল রাস্তা থেকে বেরিয়ে পূবে চলে গেছে। মোড় ছাড়িয়ে ক্রস রোডেবাবলুদের বাড়ি। উভয় বাড়ির হোল্ডিং নম্বর একই। বাবলুহালকাপাতলা মানুষ। খুবই আমুদে। কোন দুঃশ্চিন্তা বেশিক্ষণ ধরে রাখতে পারত না। তার বাবা পুলিশ বিভাগে চাকরি করতেন, ধুসর তালিকাভুক্ত হয়ে পূর্ব পাকিস্তানেই থেকে গিয়েছিলেন। তার পোষ্টিং অন্য জেলায় ছিল। বাবলুদের পরিবার বাড়ি ছেড়ে গ্রামের বাড়িতে চলে গিয়েছিল, বাড়িটা সেই পাহারা দিত। তার বন্ধুভাগ্য ছিল অদ্ভুত। কয়েকজন হরিহর বন্ধুতার সাথে সন্দীপনসাংস্কৃতিক সম্প্রদায়ের সাথে যুক্ত ছিল। রাজনীতিকরতো না, তবে মিছিল-মিটিংয়ের সামনে পড়লে বন্ধুদের নিয়ে তাতে ঢুকে পড়ত। পরে জানতে পেরে হতভম্ভ হয়ে গিয়েছিলাম যে তাদের কেউ কেউ নকশাল আন্দোলনের সশস্ত্র ক্যাডার। মাওবাদ, নকশাল আন্দোলন ও কমুনিজমের সীমাবদ্ধতা নিয়ে তাদের সামনে বিরোধিতা কম করিনি! আমার উদ্বেগ দেখে বাবলু হো হো করে হেসে উঠেছিল–দূর, চিন্তা বাদ দেন তো, ওরা আমাদের বন্ধু না! বাঙালি না!বুঝলাম বাবলুর চিন্তাধারা চলে সরল রেখায়।

এপ্রিলের শেষ দিকে বাবলু হঠাৎ হতদন্ত হয়ে আমাদের বাড়িতে এলো, ঘরে ঢুকে তক্তপোশের উপর ধাপাস করে বসে পড়ে বলল আমি মহা বিপদে পড়ে গেছি ভাই, এখন কেবল আপনিই পারেন আমাকে উদ্ধার করতে। আপনার বাসিত চাচা আমার পিছনে পুলিশ লেলিয়ে দিয়েছে।

তার মানে?

সমস্যা আপনার বাসিতচাচাকে নিয়ে, আপনার চাচা নকশাল বলে আমার নামে পুলিশে রিপোর্ট করেছে, আমি নাকি তাকে দশ টাকা দিয়ে শেষ খাওয়া খেয়ে নিতে বলেছি।–

বললাম বাবলু, সপ্তাহখানেক আগে হলেও হয়ত চেষ্টা করা যেত, এখন আদৌ সম্ভবনা। তার সাথে আমিই এখন এক মহাঝামেলা বাঁধিয়ে বসেছি। নেহাৎ বাবা মার কারণে চাচা কিছু বলছেন না, নইলে এতদিনে কিযে হতবলা মুশকিল।

ঘটনা শুনে বাবলু ঐ অবস্থার মধ্যেও হো হো করে হেসে উঠল। কথায় কথায় হাসা তার স্বভাব। সে এমনই যে আর্মির গুলির সামনে দাঁড়িয়েও বোধহয় নিজের ধরা পড়ার বোকামোর কথা ভেবে খানিক হো হো করে হেসে নিতে পারে।

মা বাবলুকে মোটেও পছন্দ করতেন না, বললেন– চারদিকে মানুষের জান নিয়ে টানাটানি, তুমি এভাবে হাসছ যে।

হাসছি, মনোয়ার ভাইয়ের জান নিয়েও টানাটানি পড়েছে তাই, তাও আবার বাসিত সাহেবের হাতে!

মা বললেন, তোমাদের কারো মুখে লাগাম নেই এটাই হল সমস্যা।

বললাম, বাবলু তোমার আব্বার কলিগদের কেউ থানায় নেই ?

– আছে, তবে তাদের কাছে যেতে ভয় হয়।

বাবুল অনেক ভেবে চিন্তে তার বাবার ঘনিষ্ঠ এক পুলিশ অফিসারের কোয়াটারে যেয়ে দেখা করল। সালাম দিতেই তিনি বললেন, ওহ্ তুমি তাহলে ঠিকই খুলনায় আছো। দুঃসাহস বটে!

বাবলু অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে থাকল। তিনি বললেন, বাসিত সাহেব ফোন করেছিলেন, নকশালটা খুলনাতেই আছে। তুমি নাকি তার কাছে দশ টাকা আর কাফনের কাপড়ের টুকরো পাঠিয়ে শেষ খাওয়া খেয়ে নিতে বলেছ! কি ব্যাপার বলত?

বাবলু স্বভাবসুলভ ভাবে হো হো করে হেসে উঠল, তারপর অফিসারের চোখে চোখ পড়তেই থমকে গেল, বলল– স্যার, এখন বাড়িতে থাকি না। কয়েকদিন পরপর এসে দেখেশুনে আবার চলে যাই। গতকাল বাড়ি ফিরে দেখি দরজার নিচে মেঝেতে দুতিনটে চিঠি। ক্রস রোডের বাসিত সাহেবের চিঠি পিওনভুল করে আমাদের বাড়িতে ফেলে গেছে। দু বাড়ির নাম্বার এক, মূল রাস্তাও এক, ওনাদের রাস্তাটা শুধু ক্রস রোড। পাশের বাড়ির এক বাচ্চাকে দিয়ে চিঠিটা পাঠিয়ে দিয়েছি। কি করে বুঝব ওটা নকশালদের চিঠি। এখন তো মহা বিপদে পড়েছি।

এখন সোজা বাড়ি যাও, জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে যত দ্রুত পারো দ্রুত সরে পড়। এর বেশী বলার কিছু নেই।

– বাড়িতে গেলে পুলিশ বা বাসিত সাহেবের লোকজন যদি ধরে?

– ধরবে না, নকশালদের সবাই ভয় পায়। ওরা শুধু টেলিফোন করে আমাদের জ্বালিয়ে মারে। পুলিশ একবার তোমাদের বাড়ি যাবে বটে, তখন না পেলেই হল। কেউ তোমাকে দাবড়াবে না। পুলিশের এখন অত সময়ও নেই, উৎসাহও নেই।

চাচা, আমি কিন্তু নকশাল না, সত্যি বলছি।

সে যখন সিভিল প্রশাসন আসবে, তখন দেখা যাবে। এখন তুমি কি কিছুই যায় আসে না।

এক পথের কুকুর, মহিউদ্দিন ও তার সহযাত্রীরা

মহিউদ্দিন সাহেব আমাদের কলিগ, স্টার জুট মিলের হিসাব বিভাগে একসাথে চাকরি করি। তার বাড়ি কুষ্টিয়ায়। ২৬ মার্চ কারফিউ এবং আর্মি অ্যাকশানের কারণে বাড়ি যেতে পারেন নি। তারপর তো ভালমতই আঁটকে গেছেন। সাদাসিধা মানুষ। রাজনীতির সাতে পাঁচে থাকেন না। তবে '৭০-এর নির্বাচন ছিল এমন একটা উৎসব যাতে নৌকা নিয়ে মাতামাতি করেনি এমন বাঙালি কমই ছিল। নির্বাচনে ভূমিধ্বস বিজয় সে আমেজকে ক্লাইম্যাক্সে পৌঁছে দিল। তারপর সে উৎসবের আমেজ ধীরে ধীরে এক গুমোট অনিশ্চয়তা ও হতাশার দিকে ঠেলে নিয়ে গেল বাঙালিদের। পশ্চিম পাকিস্তানি সামরিক জান্তা বাঙালিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করবে কিনা তা নিয়ে সন্দেহ প্রকট হয়ে উঠল।

মার্চের মাঝামাঝি, মহিউদ্দিন সাহেব তার টেবিলে বসে উৎকর্ণ হয়ে কলিগদের আলোচনা শুনছিলেন, বললেন– ক্ষমতা তো দিতেই হবে, না দিয়ে যাবে কোথায়! নির্বাচনে জিতেছি না। তবে পশ্চিমাদের রাজনীতি যে এত সরল রেখায় চলে না, এটা তার চিন্তায় ছিল না। মহিউদ্দিন সাহেব ভালমত ধাক্কা খেলেন যখন ইয়াহিয়া খান ভবিষ্যৎ সংবিধান নিয়ে আলোচনায় অহেতুক কালক্ষেপ করতে থাকলেন এবং ভুট্টো এক পার্লামেন্টে দুই সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের তত্ত্ব হাজির করলেন, তার বিশ্বাসে চির ধরল। তবুও তিনি ২৫ মার্চের কথা ঘুণাক্ষরেও ভাবেননি।

তিনি মিলের স্টাফ মেসে থাকতেন।ব্যাচেলর মেস। এ সময় প্রায় সবাই মেস ছেড়ে চলে গেলেও তিনি এবং আরো দু'চার জন যারা দূরে উত্তরের জেলাগুলো থেকে এসেছিলেন তাদের বাড়ি যাওয়া হয়নি। ভাঙ্গা ভাঙ্গা বাসরুটগুলের পাশে বিহারী পকেটের অবস্থান এবং বাসের অনিশ্চয়তা তাদের পথে নামতে নিরুৎসাহিত করেছিল। সবচেয়ে সহজ যোগাযোগ ছিল রেলপথ। কিন্তু বাঙালিদের জন্য তখন রেলপথ ছিল শ্রেফ মৃত্যুফাঁদ। সে সময় বিহারীরাই রেলে একচেটিয়াভাবে কাজ করত।

মহিউদ্দিন মে মাসের মাঝামাঝি ছুটিতে গেল দশদিনের জন্য। মার্চ-এপ্রিলের হাঙ্গামার দিনগুলিতে সে মিলে আটকা পড়েছিল। তার পরিবার ছিল চুয়াডাঙ্গার বাড়িতে এবং তারা পরস্পরের জন্য প্রচণ্ড টেনশনের মধ্যে ছিল। তাকে যেতে হবে বাস অথবা ট্রেনে। পথে পদে পদে ভয়, সর্বত্র শ্বাপদের মত ওৎ পেতে আছেআর্মি এবং বিহারীরা। যারা ওদিক থেকে এসেছে তাদের সাথে কথা বলে সে বাসে যাওয়াই সাব্যস্ত করল। দুঃশ্চিন্তার বিষয় এই যে পথে বাস পাল্টানোর প্রয়োজন হয় এবং সেখানে পরবর্তী গন্তব্যের বাস পাওয়া যাবে কিনা সে ব্যাপারে কেউ ভরসা দিতে পারেনা। তবে আশার কথা যে, আরো কিছু লোক যাচ্ছে দর্শনা-চুয়াডাঙ্গা দিকে। তাদের কেউ কেউ তার পরিচিত। দৌলতপুর

থেকে বাস ছাড়ল জনাকয়েক যাত্রী নিয়ে। ডাইভার হেলপার সবাই বিহারী, যাত্রীরা অধিকাংশই বাঙালি, স্বভাবতই নিশ্চুপ, নিরাপদে গন্তব্যে পৌঁছানোর চিন্তায় ভারাক্রান্ত।

ইস্টার্ন জুট মিলের গেট থেকেবাসে উঠল ইয়াকুব। সে মহিউদ্দিনের আত্মীয়, তারা আলোচনা করেই এক সাথে যাচ্ছে, একই গন্তব্যে। ইয়াকুব বাসে বসে চার দিকে দৃষ্টি বুলিয়ে ফিসফিস করে বলল– যাত্রীরা সবাই পঁচিশ থেকে চিল্লিশের মধ্যে। খুবই বিপদজনক বয়স। এ বয়সের লোকেরা যুদ্ধ করছে ওরা তাই ভাবে। মহিউদ্দিন চমকে ওঠে এবং কথাটা ভুলে থাকতে চায়। পথে পথে চেকপোস্ট। ক্রুদ্ধ রুক্ষ চেহারার আর্মিরা বাসের পাদানীতে উঠে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সবাইকে মাপে, সন্দেহ হলে নিস্তার নেই। অর্ধেক পথ ঝামেলা ছাড়াই কাটে। নওয়াপাড়ায় বড় ধরনের ক্যাম্প, ওরা সবাইকে নামায়। একজন অফিসার নির্দেশ দেয়– ফল ইন, আইডেনটিটি কার্ড ইন ইওর হ্যান্ড। সে প্রথম থেকে শেষ ব্যক্তিটির আইডেনটিটি কার্ড চেক করে– আপলোগ সব নকরি করতা হ্যায়, নকরিমে জয়েন কিয়া। ঠিক হ্যায় গো এ্যহেড।

ঝাড়া তিন ঘন্টা পর গাড়ি থামে যশোর বাসস্টান্ডে, এটাই এ বাসের শেষ গন্তব্য। মহিউদ্দিনরা একরূপ ছুটতে থাকে বকুলতলা বাসস্টান্ডের উদ্দেশ্যে। ওখান থেকে বাস যায় চুয়াডাঙ্গা হয়ে মেহেরপুর। কতগুলো বাস এদিক ওদিক দাঁড়ানো। পাশের এক নড়বড়ে চায়ের দোকানীকে বাঙালি বলে মনে হয়, মহিউদ্দিন জিজ্ঞাসা করে, চুয়াডাঙ্গার বাস কোন দিকে, কখন ছাড়বে বলতে পারেন ভাই?

ওই যে বাসটা, ওর ড্রাইভারকে জিজ্ঞসা করেন।

মহিউদ্দিন মাঝবয়সী ড্রাইভারকে জিজ্ঞাসা করে, ভেইয়া হামলোগ চুয়াডাঙ্গা যায়েঙ্গে, আপকা বাস কব ছোড়েগা?

হা ছোড়েগা, পহেলে তো পাসিঞ্জার হোনে দিজিয়ে। যাইয়ে আন্দার যা কর বয়ঠিয়ে।

এখন অপেক্ষার পালা আর ঐ সাথে উৎকণ্ঠা। তবে প্রতিকূলতা ইয়াকুবকে খুব একটা স্পর্শ করে বলে মনে হয় না। সে এর মধ্যে হোটেল খুজে বার করেছে যেখানে চাপাতি রুটি এবং গোস্ত পাওয়া যায়। সে মহিউদ্দিনকে বলে চাপাতির চেয়ে গোস্ত সস্তা, কেন বলতো? ইয়াকুব নিজেই জবাব দেয়, আটা কিনতে হয়, কিন্তু গরুটা মাঠ থেকে টেনে আনলেই চলে। চল দোস্ত খেয়েদেয়ে বাসে উঠি।

বাসটা ঝিনাইদহ ছাড়িয়ে চুয়াডাঙ্গার পথে বাসস্টান্ডে এসে দাঁড়ায়। এখানে আর্মি চেকপোস্ট। আর্মিদের মধ্যে উত্তেজনা দেখে সবার মুখ পাংশু হয়ে যায়। তারা ধাক্কাধাক্কি করে সবাইকে বাস থেকে নামায়, কর্কশভাবে উচ্চারণ করে- ফলইন। সবাই তটস্থ হয়ে আইডেনটিটি কার্ড হাতে নিয়ে লাইনে দাঁড়ায়। আর্মিরা দেখেও দেখেনা। লাইনের প্রথম লোকটির কাছে জানতে চায়- কেয়া নাম, কাঁহা সে আয়া, কাহা যানা হ্যায়?

মেহেরপুর যাবে শুনে সে পৈশাচিক উল্লাসে ফেটে পড়ে–হা হাম তো তোমহারা এনতেজার মে হ্যায়। তোমকো জরুর ওহা ভেজ দুঙ্গা শালে গাদ্দার, টেরনিং কি লিয়ে যাতা হ্যায় না, আভি সামঝেগা!

নেহি স্যার, হামলোগ নকরি করতা হ্যায়, দেখিয়ে হামারা আইডেনটিটি কার্ড, দেখিয়ে স্যার। হামলোগ ঘর যাতা হ্যায় মেরা বিবি বাচ্চাকো দেখনে কি লিয়ে, জলদি জলদি ওয়াপাস আউঙ্গা স্যার। তার কথা শেষ হয় না চাইনিজ রাইফেলের কুদোর বাড়ী পেটের উপর পড়তেই তার দেহটা কুঁকড়ে যায়। পেট চেপে ধরে সে বসে পড়ে। লাইনের মাঝ থেকে একজন উচ্চকণ্ঠে কলেমা শাহদাত পড়তে শুরু করে। দেখাদেখি অন্যরাও সুরা কলেমা যে যা পারে পড়তে থাকে। রাস্তার ঢালু পাড়ে মাথার পিছনে দুহাত বেঁধে তাদের দাঁড়াতে বলা হয়েছে। কয়েকজন সৈন্য রাইফেল নিয়ে তাদের সামনে প্রস্তুত হয়। কর্কশ নির্দেশ, মৌমাছির একটানা গুঞ্জনের মত সুরা পাঠের আওয়াজ এবং ফুঁপিয়ে কান্নার শব্দের মধ্যে রাইফেল কক করার আওয়াজ ভয়াবহ হয়ে কানে বাজে। সুরা, কলেমা এমনকি দোয়া ইউনুসের মত ছোট দোয়া পাঠেও বারবার ভুল হতে থাকে।

পথের একপাশে একটা কুকুর মাটিতে মুখ রেখে এতক্ষণ চুপ চাপ শুয়েছিল, হঠাৎ গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়ালো। সে একপাও এগিয়ে আসেনি কিন্তু জাগায় দাঁড়িয়ে কমান্ডিং অফিসার এবং রাইফেল তাগকারী সৈন্যদের দিকে তাকিয়ে ত্বারস্বরে ঘেউ ঘেউ করে চিৎকার করতে শুরু করেল। ফায়ারিং অর্ডার দিতে যেয়ে ক্যাপ্টেন মনঃসংযোগ হারালেন এবং অতিশয় বিরক্তির সাথে কুকুরটার দিকে তাকালেন। কিন্তু কুকুরটা তার দিকে তাকিয়ে সমানে ঘেউ ঘেউ করতে থাকল। থামাথামি নেই। তিনি ধৈর্য হারালেন এবং হোলস্টার থেকে পিস্তল বের করে কুকুরটাকে লক্ষ্য করে পুরো ম্যাগাজিন খালি করে ফেললেন। কুকুরটা প্রথম গুলিতেই পিছন দিকে ছিটকে গিয়েছিল এবং প্রতিটি গুলির সাথে কেঁপে কেঁপে উঠছিল। শেষ পর্যন্ত ধীরে ধীরে লেজ নাড়তে নাড়তে নিথর হয়ে গেল। ক্যাপ্টেন একরাশ বিরক্তি নিয়ে অফিসে ফিরে গেলেন। কিছুক্ষণ পর একজন আর্মি এসে স্বগতোক্তি করল শালেলোগ বাঁচ গিয়া। তারপর সবার উদ্দেশ্যে হাত নেড়ে বলল– যাও চলা যাও, জলদি সে হটো।

বাসে সবাই নিরব ছিল, এ ঘটনার রহস্য তাদের অজানা। বহুক্ষণ পর একজন অস্ফুট স্বরে বাতাসে একটা প্রশ্ন ছুড়ে দিল– কুকুরটা কি ছিল?

ইয়াকুব বলল– কুকুরই ছিল, মানুষকে বোঝে, ভালবাসে- সেই কুকুর।

লোকটা জাসুস ছিল!

লোকটা পাগল ছিল না কামেল ছিল কেউ তা নিশ্চিত করে বলতে পারেনা। কিন্তু সবাই একবাক্যে বলবে যে সে জাসুস ছিলনা।

সে কে, কবে, কিভাবে এখানে এসেছিল কেউ তা মনে রাখেনি। তবে থার্ড মুন্সেফ কোর্টের পিওন আবদুলকে জিজ্ঞাসা করলে সে বলবে সেই যখন জোরেশোরে প্রেসিডেন্ট আয়ুবের ডিকেড উৎসবের তোড়জোড় শুরু হলতখন থেকেই তো লোকটা আছে। পরনে রংজ্বলা প্যান্ট। গায়ে বোতাম ছেড়া কোট, রং বোঝা দায়। একমাথা রুক্ষ কাঁচাপাকা চুল। শরীরের খোলা অংশে পুরু হয়ে ময়লা জমে আছে, কতদিন গোসল করেনি কে জানে। লোকটা চারপাশে একধরনের বাসি গন্ধ ছড়িয়ে মোড়ের প্যারাপিটের উপর পা ঝুলিয়ে বসেছিল। তখন শীত যাই যাই করছে। অফিস শেষে বাড়ি ফিরছি, কে একজন শ্লেষের সাথে মন্তব্য করল–পুরোনো পাগলে ভাত পায় না–তখনই স্যার, লোকটাকে দেখি।

লোকটা অবশ্য অনেক দিন থেকে আছে। কোর্ট পাড়ার নানান কিছিমের লোকজনের ভিড়ে বেমালুম মিশে আছে। তাকে আলাদা করে চেনা যায়না। কেডি ঘোষ রোড থেকে উত্তরে কোর্ট রোডে ঢোকার মুখে দু'পাশে অনুচ্চ প্যারাপিট। লোকটা সকাল বিকাল পালাক্রমে পূব আর পশ্চিম দিকের প্যারাপিটের উপর বসে। পাগল হোক আর যাই হোক চোখের উপর সরাসরি রোদ কেউই পছন্দ করেনা। জাগতিক সকল ব্যাপারে সেনির্লিপ্ত। কথা বলেনা, কদাচিৎ অন্তরের গভীর থেকে একটামাত্র শব্দ উচ্চারণ করে–আল্লাহ্। তার এই নির্লিপ্ততা নিয়ে কোর্ট পাড়ায় নানা ধরনের কানাঘুষাআছে। কেউ বলে কামেল লোক, ধরা দেন না। কেউ বলে খোঁজ নিয়ে দেখুনগে খুনে ডাকাত, ভেক ধরেআছে। আবার হার্ডলাইনাররা তাকে পুলিশের চর বলেও সন্দেহ করে।এভাবে কিছুটা ভয়, কিছুটা শ্রদ্ধা, কিছুটা ঘৃণাভরে তাকে এড়িয়ে চলে সবাই। তবে এসব নিয়ে লোকটার কোন মাথাব্যাথা নেই।

কোর্টরোডের দুপাশে গায়ে গা লাগা ছোটবড় অনেকগুলো কাঁচা দোকান ঘর, গোলপাতা বা করোগেটেড টিনে ছাওয়া। প্রায় সবগুলোই হোটেল। স্টেশনারি দোকান, বাইন্ডিং শপ, পানবিড়ির দোকানও আছে দু চারটে।হোটেলের মাথায় রংজ্বলা সাইনবোর্ডে হোটেলগুলোর জাতপাতের পরিচয় লেখা। একাত্তরের ২৫ মার্চ পর্যন্ত এসবের কদর ছিল। লোকটার অবশ্য জাতপাত নিয়ে মাথাব্যাথা নেই। ক্ষিধে পেলে যে কোন হোটেলের সামনে যেয়ে দাঁড়ায়, তা সে শ্রীদুর্গা হিন্দু হোটেলই হোক আর হোটেল মোহাম্মাদিয়াই হোক। হোটেলের বয় বেয়ারাররা শিক্ষিত ভদ্রলোকের মত অত জটিল চিন্তা ভাবনায় যায়না, তারা তার কামেলিয়াতেই বিশ্বাসী। তাছাড়া এ ধরনের লোকজনের প্রতি মালিকের কিছুটা নিরব প্রশ্রয়ও থাকে। তার উপস্থিতি শুভলক্ষণ বলে ধরে নেয়া হয়। ফলে তিন বেলা উদরপূর্তি নিয়ে তাকে কখনো ভাবতে হয়নি। বলা বাহুল্য টাটকা-বাসি ভাত-রুটি কোন খাবারেই তার অরুচি নেই।

লোকটাকে নিয়ে দু-তিনজন টাউট একবার ব্যবসা ফাঁদার চেষ্টা করেছিল। তারা হঠাৎ একদিন প্যারাপিটের সামনে হুমড়ি খেয়ে পড়ে লোকটার ময়লা পা দুটো কোলের মধ্যে টেনে নিয়ে টেপাটেপি শুরু করল–কি না তারা বাবাকে ঠিকই চিনেছে, মহা কামেল লোক! বাবার অবশ্য পা টেপাটেপিতে কোন আপত্তি দেখা গেল না। কোর্ট এলাকায় কৌতুহলী লোকেরও অভাব হয়না।দ্রুত সেখানে ছোটখাটো ভীড় জমে উঠল।ওরা এবার তাদের মক্কেলকে সামনে ঠেলে দিয়ে বলল– চা না, বাবার কাছে চা, যা চাবি তাই পাবি। লোকটা বাবার পায়ের কাছে পাঁচটা সিকি এবং দলিল দস্তাবেজ ফেলে পা'দুটো জড়িয়ে ধরে তার মুখের দিকে সতৃষ্ণ নয়নে তাকিয়ে বলল, দোয়া করেন বাবা, যেন মামলাটায় জিত হয়, অনেকগুলো সম্পত্তির ব্যাপার।

এত সব ঘটনার মধ্যেও বাবা নির্বিকার। ওদের আনা কলাপাতায় মোড়া গোটা কয়েক সিঙ্গাড়া ও মিষ্টি ছাড়া চারপাশের আর সব কিছু–ওদের পা টেপা, মক্কেলের উৎকণ্ঠিত মুখ,পায়ের কাছে পড়ে থাকা দলিল, পাঁচটা সিকি– কোনকিছুই তার দৃষ্টি আকর্ষণ করে না।শুধু একবার একপলক নিরাসক্ত দৃষ্টিতে মক্কেলের উদ্বিগ্ন মুখের দিকে তাকিয়ে সে গরম সিঙ্গাড়া মুড়মুড় করে ভেঙে খাওয়ায় মনোনিবেশকরে। টাউটরা এতেই মহাখুশি যেন এতক্ষণ এরই প্রতীক্ষায় ছিল। তারা সমস্বরে হৈচৈকরে উঠলো–ওরে বাবার করুণা হয়েছে, বাবা মুখ তুলে চেয়েছেন রে, আর চিন্তাকি!তারা লোকটাকে ঠেলেঠুলে কোর্টে পাঠিয়ে দেয় এবং পয়সাগুলো পকেটে ভরে আর একদফা বাবার পা টেপায় ব্যস্ত হয়ে পড়ে। দুর্ভাগ্য, মামলায় লোকটার শোচনীয় হার হয়। ফলে বাবাগিরি, টাউটগিরি কোনটাই আর জমে না। বাবা থেকে যায় আগের মতই। একটা ভয়মিশ্রিত শ্রদ্ধাবোধ তাকে একইভাবে ঘিরে থাকে।

লোকটা আবার খবর হল একাত্তরের মাঝামাঝিতে। ইয়াহিয়ার মার্শাল ল যখন শুরু সেই উনসত্তরে কোর্টের সামনে সার্কিট হাউজে আর্মি ক্যাম্প বসেছিল। এতদিন ক্যাম্পটা ছিল নির্বিষ সাপের মত, যতটা না ভয়, তারচেয়ে বেশি অস্বস্তিকর। তবে একাত্তরে ২৫ মার্চের পর তারও বিষদাঁত গজালো। ৪ এপ্রিল ভোরহতে তখনো বেশ বাকি আলতাপ গলি যেখানে সাউথ সেন্ট্রাল রেডের সাথে মিশেছে সেখানে একসাথে ৫-৬ জনকে গুলি করে ফেলে রেখে তারা তার স্বাক্ষর রাখল। আতঙ্কে দুপুরের মধ্যেই খালি হয়ে গেল গেটা খুলনা শহর।অফিস আদালত

দোকান পাট সব বন্ধ। কে কোথায় ছিটকে পড়ল তার হদিস নেই। যারা শহর ছাড়েনি তারাও বাড়ির চার দেয়ালের ভিতর হারিয়ে গেল। ফলে আর্মিরা যখন রেডিওতে একঘেয়েভাবে হুমকি ধামকি সহকারে কাজে যোগদানের জন্য জরুরি এলান জারি শুরু করল, তা সহসা খুব একটা কাজে এলনা। বিশেষকরে কোর্টের একেবারে নাকের ডগায় নাৎসী ঘেট্টোর মত আর্মি ক্যাম্পের অবস্থান কাজটাকে কঠিন করে তুলল।

তারপরও পেটের দায়ে হোক আর চাকরি হারানোর ভয়েই হোক এপ্রিলের মাঝামাঝি থেকে একজন দুজন করে নানা পেশার লোকজনের অফিসে যাওয়া আসা শুরু হল। তবে কোর্টে তখনো কাজের চাপ কম। ফলে সময়টা দুঃসহ ভার হয়ে সবার উপর চেপে বসে। হেলিপোর্ট থেকে ভেসে আসা হতভাগ্য কোন বাঙালির হৃদয় বিদীর্ণ করা আর্তনাদ সে ভারকে দুঃসহ করে তোলে।সকলেরই তখন ইয়া নফসি অবস্থা। লোকটার কথা কারো মনে ছিল না, ভাবার সময়ও ছিলনা।

কিন্তু সবাইকে অবাক করে মে'র শেষাশেষি একদিন সে হঠাৎ আবার কোর্ট পাড়ায় আবির্ভূত হল। সকালে কোর্টে আসার পথে প্যারাপিটের উপর তাকে পরিচিত ভঙ্গীতে বসে থাকতে দেখে অনেকে যেমন বিস্মিত হল তেমন আনন্দিতও হল। কোর্ট পাড়ায় প্রায় অলক্ষে তার উপস্থিতি শুভলক্ষণ বলেধরে নেয়ার একটা কালচার আগে থেকেইগড়ে উঠেছিল। এ দুঃসময়ে সেটা আরো দৃঢ় হল। কামেল পীর জ্ঞানে অনেকেই তাকে ভক্তিভরে সালাম জানাল। কেউ কেউ আরো একধাপ এগিয়ে তারহতকুচ্ছিত হাত দুটোজড়িয়ে ধরে আর কখনো তাদের অসহায় ফেলে চলে না যাওয়ার অনুরোধ জানালো। লোকটা আগের মতই সীমাহীন নির্লিপ্ততার সাথে এর সবকিছুই উপেক্ষা করল।

এরমধ্যে আর্মিরা শহরে তাদের নিয়ন্ত্রণ শক্ত করে নিয়েছে। সাথে সাথে পাল্লা দিয়ে দিয়ে বেড়েছে তাদের অত্যাচারের মাত্রা। কোথা থেকে তারা প্রতিদিন একের পর এক লোকজন ধরে নিয়ে আসে, খোলামেলা হেলিপোর্টে কাঠের ফ্রেমে ঝুলিয়ে নির্দয়ভাবে মারে। অধিকাংশই যুবক। রাইফেলের কুদো, বেত, মোটা লাঠি, ভারি বুট, চাবুক, মুষ্টাঘাত–কোন উপকরণই বাদ যায় না। লোকগুলো রক্তাক্ত হয়। তাদের বুকচেরা আর্তনাদে বাতাস ভারি হয়ে ওঠে। ঐসাথে থেকে থেকে ভেসে আসে আর্মিদের ক্রুদ্ধ চিৎকার, গালিগালাজ এবং পিশাচের মত খনখনে হাসি। সব কিছুই ঘটে লোকটার চোখের সামনে, ফ্যাল ফ্যাল করে সেদিকে তাকিয়ে থাকে, কি ভাবে কে জানে। তবে তার নির্লিপ্ততায় চীর ধরে বলে মনে হয়। যাওয়ার পথে কেউ কেউ লোকটার পাশে দঁড়িয়ে ফিস ফিস করে বলে, কিছুএকটা করেন বাবা, কিছু একটা করেন, কার কলজেছেড়া ধন কিভাবেই না শেষ হয়ে যাচ্ছে! প্যারাপিটের উপর লোকটা কেমন জানি অস্থির হয়, দু'হাতে মাথার চুল খামচে ধরে কেঁপে কেঁপে ওঠে।

দিনে দিনে লোকজনের হতাশা বাড়তে থাকে। আবার কখনো কখনো আশাও জাগে, বাঙালিরা লড়ছে। তবে উল্টোভাষ্যই বেশি জোরালো। ওরা কতজন, করগুনে বলে দেয়া যায়। কিন্তু ঘাড়ের উপর আর্মি ক্যাম্পের সুবাদে ওদের স্বরগ্রাম চড়া, চলাফেরার ধরনও আলাদা, চেনা যায় সহজে।জয়বাংলা আকাশবাণীর সংবাদ তাচ্ছিল্যের সাথে উড়িয়ে দেয়। বলে, ছোঃ! কোথায় বিশ্বসেরা ট্রেন্ড পাকিস্তানি জোয়ান আর কোথায় ঢাল নেই তলোয়ার নেই নিধিরাম সর্দার! পুঁচকে বাঙালিরা লড়বে ওদের সাথে! দেখেছেন ওদের ফিগারগুলো, একজনের সামনে যেখনে তিনজন হিন্দুস্তানি সৈন্যও দাঁড়াতে পারেনা সেখানে বাঙালি! কি যে ভাবেন আপনারা! মুক্তি ফুক্তি সব ব্লাফ, শ্রেফ হিন্দুস্তানি প্রপাগান্ডা।

ভয় হয়। অস্থিরতা বাড়ে। আবার বিদ্যুৎ ঝলকের মত চকিতে কারো কারোমনের গভীরে আশার আলো চকিতে ঝিলিক দিয়ে ওঠে, যদি মুক্তি নাই হবে তবে কাদের ধরে এনে এভাবে টর্চার করে মারছে আর্মিরা, কেনই বা মারছে? তারা নিশ্চিত হয়, যুদ্ধ চলছে–মুক্তিযুদ্ধ। এ এক অদ্ভুত অনুভূতি, গায়ের রোম খাড়া হয়ে যায়। অদূরে কাঠের ফ্রেমে ঝোলানো নিথর লোকগুলো একান্ত আপন হয়ে যায়, বিষন্ন মমতায় মন ছেয়ে যায়।

থার্ড মুনসেফ কোর্টের পিওন রউফ, বয়স বেশি নয়,হাসিখুশি থাকতে পছন্দ করে। এখন চোখের সামনে আর্মিদের নির্বিচার টরচার দেখতে দেখতে বিষন্নতা তাকেও পেয়ে বসেছে। ঐ সাথে যোগ হয়েছে আতঙ্ক। এই দুঃসময়ে তার বিলাসিতা ছিল খবর আদান প্রদান করা।ফিস ফিস করে মুক্তিযুদ্ধের খবর একেওকে শুনিয়ে বেড়াত সে। তবে তার শ্রোতা বাছাইসবসময় যথাযথ হতনা। ফলে অফিসেরই এক কেরানি বাবু তাকে ফাঁসিয়ে দেবার হুমকি দিয়েছে। তারপরও খবর আদান প্রদান বন্ধ করেনি সে।তাকে দেখে বোঝা যায় কি কষ্টটাই না পাচ্ছে, তারপরও হেলিপোর্টের তাজা খবর না শুনিয়ে স্বস্তি পায় না।

কাজের ফাঁকে ফাঁকে কের্টের বারান্দায় যেয়ে দাঁড়ায়, সেখান থেকে সরাসরি হেলিপের্টের আর্মি অফিস, ক্যাম্প, টরচার কেন্দ্র সব কিছুই পরিস্কার দেখা যায়।কখনো এসে বলে তিনটে ছেলেকে ফ্রেমের সাথে বাঁধছে স্যার, একেবারে কচি বাচ্চা। কখনো বলে ওদের অফিসের বারান্দায় দুটো লোককে অনেক্ষণ ধরে উল্টো করে ঝুলিয়ে রেখেছে স্যার, ওরা নড়ছে না! কখনো বলে দেখেন স্যার কিভাবে লাথি ঘুষি মারছে ছেলেটাকে, ওদের কি বাচ্চাকাচ্চা নেই, জানে দয়ামায়া নেই একটুও! সে হতাশ হয়ে অফিসের কোণে টুলের উপর ঝিম মেরে বসে পড়ে। একদিন হঠাৎ ছুটতে ছুটতে এসে বলল, সর্বনাশ হয়েছে স্যার। আর্মিরা এইমাত্র মস্তান বাবারে ধরে নিয়ে গেল। মুহূর্তে কথাটা রাষ্ট্র হয়ে গেল। তারপর যা ঘটল সেই বিষম সময়ে তা ছিল একেবারেই অচিন্তনীয়। কাজ ফেলে সবাই একে একে কোর্টের বারান্দায় ভীড় করে দাঁড়াল। এ যেন এক নিরব প্রতিবাদ।

লোকটাকে ওরা অফিসের ভেতর নিয়ে গেল। অনেক্ষণ পর যখন বের করল তার মাথাটা বুকের উপর ঝুকে আছে, নাক মুখ দিয়ে ফোটা ফোটা রক্তঝরে পরনের কোটটা ভিজিয়ে দিচ্ছে। ওরা ওকে হেলিপোর্টে নিয়ে কাঠের ফ্রেমের সাথে বাঁধল। কোর্টের লোকেরা এবার সত্যি ভয়ে চমকে উঠল। তারা পরস্পরের মুখ চাওয়া চাওয়ি করল, কিন্তু কোনভাবেই বুঝে উঠতে পারল না, কি এমন ঘটল যে মাস্তান বাবাকেএভাবে শাস্তি দেয়া হচ্ছে। বাঁধা শেষ হলে হেলিপোর্ট অফিস থেকে একজন অফিসার বেরিয়ে এলো এবং সম্ভবত তাকে পর পর কয়েকটা প্রশ্ন করল। মাস্তান বাবার কাছে কোনো জবাব ছিল বলে মনে হয়না। তারা নির্দয়ভাবে তাকেমারতেই থাকল, যতক্ষণ না তাদের আশ মেটে।

যখন তার বাঁধন খুলে দেয়া হল, কেউ তাকে ধরেনি, তার দেহটা হেলি পোর্টের পাকা মেঝের উপর হুড়মুড় করে ভেঙ্গে পড়ল।

ক্ষোভে দুঃখে রউফ পিওন অস্থিরভাবে ঘর বার করছিল।

একজন কর্মচারি সিগারেট ফুকতে ফুকতে শুধান এত তড়পাচ্ছ কেন রউফ, তোমার কেউ হয় নাকি?

এ কি বললেন আপিনি! কারো কষ্টে কষ্ট পেলে তাকে নিজের কেউ হতে হয় নাকি!

না, এই যে এখানে চাকরি করি। এটা আদালত। প্রতিদিন কত বিচার হয়। কত লোকের শাস্তি হয়। ফাঁসির অর্ডারও হয়। কই কেন দিন তো তোমাকে তড়পাতে দেখিনি। বরং বল ভাল হয়েছে, উচিৎ সাজা হয়েছে। কি বলনি?

হ্যা বলেছি, কিন্তু সেটা আর এটা! কোথায় খুন ডাকাতির আসামী আর এরা বড়জোর আন্দোলন সংগ্রাম করেছে শ্লোগান দিয়েছে!

আরে না, এরাও সব বড় বড় কালপ্রিট। কত বিহারী কাবলী আর মুসলীম লীগরদের কেটেছে খোঁজ নিয়ে দেখগে, যাও।

ফকির বাবাকে নিয়ে এসব কি বলছেন আপনি!রউফ দুম দুম করে পা ফেলে সেরেস্তাদার সাহেবের পাশে এসে দাঁড়ায়। তিনি বলেন, ওদের কথা শুনতে যাও কেন? যাও চোখ মুখে পানি দিয়ে এসো,চুপচাপ আল্লাকে ডাকো।

না স্যার আগে ওনার টাকে দুটো চটির বাড়ি মেরে আসি। সে ঝাঁঝের সাথে রওনা দেয়ার উপক্রম করে।

বাবা বললেন যা বলছি তাই কর। হঠকারী কিছু করতে যেও না। তোমার বৌ ছেলে মেয়েকে বিধবা আর এতিম বানাতে ওদের দু মিনিটও লাগবে না।

কালিপদ

কালিপদ ছিল সুশান্তর বন্ধু, ফুলতলায় থাকতো। একবার এক উপন্যাসে পড়েছিলাম কলকাতার এক আধা শিক্ষিত টাফ যুবক পাচারকারী চক্রের খপ্পরে পড়ে এক শতাব্দীপ্রাচীন মন্দিরের কারুকাজ করা বিশেষ একটা ইট খসিয়ে আনার দায়িত্ব নিয়ে বীরভূম না কোথায় যেন এক আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকায় গিয়েছিল। সে কালিপূজার রাত বেছে নিয়েছিল। ঘোর অমাবশ্যায় গভীর রাতে সেখানে মোষবলি হত। রাত গভীর হলে মাংস ও সাধধীর মহোৎসব এবং আদিম নৃত্যের এমন কিছু বর্ণনা সেখানে ছিল যা আমাকে দীর্ঘদিন অমন একটা পরিবেশে কালিপূজা দেখার উৎসাহ দিতো। তবে কখনো দেখা হয়নি। কালিপদদের গ্রামে ভৈরবের তীরে গভীর রাতে শ্মশানকালির পূজা হয়। সে ডাবলুর কাছে আমার ইচ্ছার কথা জেনে সে ডাবলু এবং আমাকে তাদের এলাকার কালিপূজা দেখার আমন্ত্রণ জানালো। সেটা ছিল সম্ভবত অক্টোবর মাস, নির্বাচন কাছিয়ে এসেছিল। সন্ধ্যার কিছু আগে আমরা যখন বাস থেকে নামছি তখনও ঝুম বৃষ্টি। কালিপদ ছাতা নিয়ে এগিয়ে এলো। আমরা একটা রেস্তরায় বসলাম। কালিপদ বলল দাদা বাড়িতে তো চায়ের ব্যবস্থা নেই, চাটা এখান থেকে খেয়েই যাই। তবে সে আরো কিছু বলতে চেয়েছিল যে জন্য রেস্টুরেন্টে বসা, বলল– আমরা গ্রামে থাকি দাদা, এখানে সবাই এখনো সবকিছু উদার ভাবে মেনে নিতে পারেনা। আমি বাড়িতে আপনার নাম মনোহর বিশ্বাস বলেছি, অসুবিধা নেই তো দাদা?

আরে না। শোনো '৫৩ সালে সেনহাটিতে যখন স্কুলে ভর্তি হই, সহপাঠীরা প্রায় সবাই ছিল হিন্দু, অনেকেই আমাকে মনোহর নামেই জানত। নামটা তো চমৎকার তাই না। আমি যখন কলেজে পড়ি তখনও একজন স্যার আমাকে মনোহর নামে ডাকতেন, তারপর যখন বুঝলেন আমি মুসলমান, জিজ্ঞাসা করলেন নামের অর্থ কি? বললাম– যখন আমার জন্ম তখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ চলছে, বাবা নাম রাখলেন মানোয়ার- যুদ্ধ জাহাজ। আকিকার সময় নাম আর বদলানো হয়নি, আকারটা বাদ দেয়া হয় মাত্র। অর্থ দাঁড়ালো আলো।

আমরা যখন তাদের টিনে ছাওয়ার চৌচালা বারঘরে পৌঁছাই তখনও বৃষ্টি। রাত বাড়ার সাথে সাথে সেকি বৃষ্টি। আমরা কাঁসার থালায় আলাদা আলাদা বাটিতে নানা পদের তরকারি দিয়ে সকাল সকাল ভাত খেয়ে নিলাম। পাতের একপাশে ঘি এবং বেগুন ভাজি। কালিপদ বলল, যা বৃষ্টি দাদা এখন একটু রেষ্ট নেন। আসল পূজো হবে গভীর রাতে। তখন আপনাদের নিয়ে যাবো। টিনের চালে ঝুম ঝুম শব্দে আদিম নৃত্যের মত নেচে নেচে বৃষ্টি নামছে। বিরাম নেই। শীত শীত আবহাওয়া। আমরা গভীর ঘুমে তলিয়ে গেলাম। ঘুম ভাঙলো দিনের ঘোলাটে আলোয় কালিপদর ডাকাডাকিতে। তখনো ঝুম বৃষ্টি। পূজা দেখার ইতি ঘটল।

মে মাসের প্রথম দিকে কালিপদ আমাদের বাড়িতে এলো। ধুলি ধুসারিত শরীর। পরনে মলিন পাজামা, মাথায় টুপি। ধপ করে পোটের রানার উপর বসে পড়ে বলল, দাদা ডাবলুদের খবর জানেন? খবর দিয়েছিল, নওয়াপাড়ায় আছে, ওদের বাড়িতে ডাকাত পড়েছিল। সব নিয়ে গেছে। নদীর ওপার দিয়ে গেলাম অনেক কষ্টে। কিন্তু ওরা নেই। আপনাকে বাড়িতে পাবো তাও ভাবিনি। আপনি কি ডাবলুদের খবর কিছু জানেন?

আমি যা জানি তা কালিপদকে আশ্বস্ত করতে পারল না। সে বিমর্ষচিত্তে উঠে দাঁড়াল। বললাম বসো, চা হচ্ছে। তোমাদের ওদিককার খবর বল।

এতদিন ভালই তো ছিলাম দাদা। নকশাল এরিয়া। তারা অভয় দিলেন, থাকেন আপনারা– আমরা তো আছি। তারপর কত ভাগ। কেউ বলে মুক্তিযুদ্ধ শ্রেফ ভাওতা, দুই কুকুরের লড়াই। লড়তে হবে আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে, পাকিস্তানের বিরুদ্ধে না। কেউ বলে লড়াই হবে দুই ফ্রন্টে– পাকিস্তানের বিরুদ্ধে আবার মুক্তিযোদ্ধাদের বিরুদ্ধেও। মুক্তিযুদ্ধের পক্ষেও একদল আছে, তবে তারাও এখন ভারতের বিরুদ্ধে। কিন্তু আমরা তো প্রাণের দায়ে বুঝে গেছি ভারত ছাড়া এখন আমাদের গতি নেই। জানিনা কি হবে! বাবা কাকারা আছেন, তারাই সিদ্ধান্ত নেবেন।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ডাবলুর কাছ থেকেই দুঃসংবাদটা পাই, ভারতে যাওয়ার পথে ২০ মে কালিপদরা চুকনগরে ছিল, আর্মিদের গুলিতে অসংখ্য মানুষের সাথে সেদিন সেও প্রাণ হারায়।

হাটবি তো হাট নইলে ফেলে যাবো

চুকনগর গণহত্যা

অফিসে আমাদের কিছু বামপন্থী সহকর্মীর চিন্তাধারার পরিবর্তন আমাদের বিস্মিত ও ব্যথিত করেছিল। ২৫ মার্চের পরও তারা বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রশ্নে কমিটেড ছিলেন, অথচ এখন তাদের একাংশ হঠাৎকরে মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে অবস্থান নিলেন। তারা মূলত মওলানা ভাসানীর অনুসারীর, বললেন এটা কোন মুক্তিযুদ্ধই না, আওয়ামী লীগ কোন বিপ্লবী পার্টি না যে তার নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধ হতে পারে। তারা পেটি বুর্জোয়া পার্টি, আত্মসমর্পণ ছাড়া তাদের সামনে কোন বিকল্প নেই। তারা হয় পাকিস্তানের কাছে নয়ত ভারতের কাছে বিকিয়ে যাবে। দেখেন না তারা ভারতে পালিয়েছে। দেশ ছেড়ে পালিয়ে বিদেশে বসে আর যাই হোক মুক্তিযুদ্ধ হয় না, মুক্তিযুদ্ধ করতে হয় দেশের মধ্যে থেকে, দেশের মধ্যে মুক্তাঞ্চল গড়ে তুলে। সেটা না করে আওয়ামী লীগ সুড় সুড় করে ভারতে পালাল।

এ ধরনের সমালোচনা দিনে দিনে তীব্র হচ্ছিল। এটা পরিস্কার যে তাদের মাথায় মহাচীনের ঘাঁটি এলাকা, মুক্তাঞ্চল ইত্যাদি কিলবিল করছিল। তারা ভেবে দেখেনি যে, মাও সে তুং মার্শাল চেন-ইর নেতৃত্বে একটি সুসজ্জিত চীনা পদাতিক ডিভিশন তার পক্ষে পেয়েছিলেন। ক্ষেত্রবিশেষেপিছিয়ে যাওয়া অথবা মুক্তাঞ্চল গড়ার জন্য ঐতিহাসিক 'লংমার্চ' চালানোর মত বিশাল ও বৈচিত্রময় ভূখণ্ডও তাদের ছিল। তাছাড়া ছিল দুর্গম পাহাড় পর্বতে ঘেরা সুরক্ষিত ঘাঁটি। বললাম তোমরা ভালই জানো– ছেলেরা প্রতিরোধ যুদ্ধ করতে করতেই পিছিয়েছে এবং শেষপর্যন্ত সীমান্ত পার হতে বাধ্য হয়েছে। কেননা পাকিস্তানে কোনো পূর্ণাঙ্গ বাঙালি রেজিমেন্ট ছিলনা যারা বিদ্রোহ করে তাদের পাশে দাঁড়াতে পারতো এবং দেশেরমধ্যেই প্রতিরোধ গড়তে পারতো। দলছুট কিছু জুনিয়র অফিসার এবং সৈন্য বিচ্ছিন্নভাবে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। কিন্তুতাদেরকেও শেষপর্যন্ত ভারতে আশ্রয় নিতে হয়। তারা ছাড়া অন্য কারো সামরিক ট্রেনিং ছিলনা এবং মান্ধাতা আমলের থ্রিনটথ্রি রাইফেলের উর্ধ্বে কোন অস্ত্রও ছিলনা। দেশের মধ্যে বসে অসহায় মৃত্যুবরণ না করে তারা ট্রেনিং এবং আধুনিক সমরাস্ত্রের জন্য ভারতে গেছে। সমকক্ষ হয়ে প্রতিশোধ স্পৃহা নিয়ে দেশে ফিরবে। মাওলানা ভাসানীও কিন্তু পালিয়ে ভারতে আছেন এবং সেখান থেকে রেডিওতে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভাষণও দিয়েছেন।

তাদের মুখে উত্তর যেন যোগানোই ছিল– ভাসানী সেখানে গৃহবন্দী এবং তাকে দিয়ে কথাগুলো বলানো হয়েছে। তবে এসব বাম বন্ধুদের মধ্যে দু-চারজন ডাইহার্ড ছাড়া প্রায় সকলেই খুব দ্রুত বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে ফিরে এসেছিলেন। এর পিছনেছিল আর্মিদের হাতে

জুনের শেষদিকে খুলনা ভাসানী ন্যাপের ত্যাগী সভাপতি অ্যাডভোকেট আব্দুল জব্বারের নির্মম নির্যাতন এবং চির দিনের জন্য তার হারিয়ে যাওয়া। কুখ্যাত টিক্কা খানকে সহায়তার জন্য জামাত ও মুসলিম লীগ সারা দেশে তথাকথিত পিস কমিটি গঠন করেছিল। জব্বার সাহেব খুলনা পিস কমিটিতে যোগ দিয়েও জামাত এবং আর্মিদের রোষানল থেকে বাঁচতে পারেন নি সম্ভবত তার বামপন্থী রাজনীতি সংশ্লিষ্টতার কারণে। একই দিনে খুলনা ভাসানী ন্যাপের আর এক প্রখ্যাত নেতা অ্যাডভোকেট আব্দুর রাজ্জাক রাতে বাড়িতে না থাকায় অল্পের জন্য প্রাণে বেঁচে যান। তিনি আরবিলম্ব করেন নি, প্রথম সুযোগেই পশ্চিমবঙ্গের বসিরহাটে পালিয়ে যান। এই ঘটনার পর দেশ ছাড়া নিয়ে ওরা আর কখনোউচ্চবাচ্য করেনি।

জব্বার সাহেব হারিয়ে গেলেন

সম্ভবত এপ্রিলের শেষ দিকে জব্বার সাহেবকে দেখলাম পিটিআই মোড়ে। ছ-সাত জন বিভিন্ন বয়েসী লোক তাকে ঘিরে আছে। এটা বুঝতে পারা কঠিন নয় যে অনেকগুলো দিন পর তারা একজন গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ব্যক্তির দেখা পেয়েছে এবং তার কথা আগ্রহের সাথে শুনছে। জব্বার সাহেবের বাম হাতের ভাজে সাদা কটি বা ঐ জাতীয় কোন পোষাক, সম্ভবত মৌলবীপাড়ায়তার বাড়িতে ফিরছিলেন। আমি তখন একটা বন্ধ্যা সময় পার পার করছিলাম এবং ধীরে ধীরে ভিড়ের পিছনে যেয়ে দাঁড়ালাম।

জব্বার সাহেব খুলনা ভাসানী ন্যাপের সভাপতি ছিলেন। আইনজীবী, সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী এবং ডাইহার্ড। জীবনযাত্রা ছিল খুবই সাধারণ। তখন অধিকাংশ ছাত্র ছিল দরিদ্র। তিনি তাদের প্রয়োজনীয় সাহায্য-সহযোগিতা দিতেন। থানার মোড়ে তৃপ্তি নিলয়ে বসতেন। টিনে ছাওয়া রেস্টুরেন্টটি ছিল তাদের রাজনৈতিক আড্ডাখানা। তেমন ভাল বক্তা ছিলেন না, তবে অভাবিত সাংগঠনিক ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। ফলে আমৃত্যু খুলনা ভাসানী ন্যাপের সভাপতির পদ অলংকৃত করেছিলেন। আমি তার সুপরিচিত ছিলাম না, কিন্তু পথেঘাটে দেখা হলে সালাম দিতাম। কমই হাসতেন, মনে হত সর্বদা কিছু ভাবছেন, তবে মাথা ঝুঁকিয়ে সালামের জবাব দিতে ভুলতেন না। আমি ইতোপূর্বে শুনেছিলাম তিনি খুলনা শান্তি কমিটিতে যোগ দিয়েছেন। প্রথমে বিশ্বাস হয়নি, তবে সেটা সত্য ছিল। বাধ্য হয়েছিলেন কিনা কে জানে।

সবার মত আমিও পরিস্থিতি জানার জন্য উদগ্রীব ছিলাম, মনে হল এখনতিনিই সবচেয়ে উপযুক্ত ব্যক্তি। কিন্তু আমাকে হতাশ হতে হল। তিনি শান্তি কমিটিতে তাদের ভূমিকা ব্যাখ্যা করছিলেন–গণচীন ভেবে চিন্তেই পাকিস্তানকে সমর্থন দিয়েছে। তারা পিছনে আছে। ফলে কাজ করতে যেয়ে প্রথম পর্যায়ে দু'চারটে ভুল করলেও আর্মিরা শীঘ্রই লাইন এসে যাবে। আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে সাধারণ মানুষের জান-মাল রক্ষা করা। আমাদের ভয় পাওয়ার কিছু নেই। আর্মিরা সুনির্দিষ্ট ভাবে আমেরিকা, ভারত ও সোভিয়েট সামাজিক সাম্রাজ্যবাদের দালালদের ধরছে। এটা ওদের জনপ্রিয়তার জন্য নয়, আসলে ওরা সস্তা কিছু কথা বলে মানুষকে বিভ্রান্ত করেছিল। সাধারণ মানুষের জন্য তারা কিছুই করত না, তাদের তেমন কোনো কর্মসূচিও ছিলনা। আসলে যেটা হত, আদমজী বাওয়ানী ইস্পাহানীদের বদলে টাটা বিড়লা ডালমিয়ারা আবার আমাদের উপর জাঁকিয়ে বসত।

জব্বার সাহেব আমাকে সামনা সামনি চিনতেন না। আমিও তার সামনে যেয়ে দঁড়াইনি। তবে আমি নিশ্চিত, নামে ভালভাবেই চিনতেন। কিন্তু যাদেরকে তিনি অমিয় বাণীগুলো শোনাচ্ছিলেন তাদের একজন প্যারিস আমাকে চিনত। সে ছিল আমার কলেজ জীবনের বন্ধু ফারুকের ছোট ভাই। আমার সাথে সে বেচারাও মহা লজ্জায় পড়ল। আমি তার দিকে তাকিয়ে মলিন হেসে ধীরে ধীরে চলে এলাম।

জব্বার সাহেবের সমীকরণ সঠিক ছিল না। পূর্ব বাংলা সম্পর্কে চীনের অনুসৃত নীতি আদর্শিক ছিলনা, ছিল শ্রেফ রাজনৈতিক ও ব্যবসায়িক স্বার্থসংশ্লিষ্ট। আর্মি মহলে জামাতের প্রভাব এবং ন্যাপ ও কমুনিস্ট পার্টির সেক্যুলার রাজনীতি সম্পর্কে জামাতের গোঁড়ামিকেও তিনি খুবই খাটো করে দেখেছিলেন। পশ্চিম বাংলায় তার শুভানুধ্যায়ী রাজনীতিবিদ কম ছিল না। তখন কানাঘুষায় শুনেছি, তারা তার জীবন সম্পর্কে শংকিত হয়ে তাকে বারবার পশ্চিম বাংলায় যাওয়ার জন্য অনুরোধ করেছিলেন, কিন্তু তিনি রাজি হননি। আমাদের অফিসে বামপন্থী কেউ কেউ এই ঘটনা নিয়ে বেশ গর্ব করতেন– প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধা দেশ ছাড়ে না, দেশে থেকেই লড়াই করে।ভারতের আশ্রয় প্রশ্রয়ে বাংলাদেশ স্বাধীন হলে সেটা সিকিম ভুটান জাতীয় স্বাধীনতা হবে মাত্র। তারা ক্যাস্ত্রো, হো চি মিন, সুকর্ণ প্রমুখের উদাহরণ দিত। তবে শেষ পর্যন্ত এসব কোন কাজে আসেনি।

জব্বার সাহেবের অন্তর্ধানের কথা আমি অনেক পরে শুনি। শান্তি কমিটির সদস্য হওয়া সত্ত্বেও জুনের শেষদিকে আর্মিরাতাকে ধরে নিয়ে অমানুষিক নির্যাতন করেছিল, মুমুর্ষু অবস্থায় তাকে নিয়ে তারা ন্যাপ নেতাদের সন্ধানে অ্যাডভোকেট আব্দুর রাজ্জাকের ফারাজীপাড়ার বাড়িতেও গিয়েছিল। সৌভাগ্যক্রমে তিনি বাড়িতে ছিলেন না এবং প্রথম সুযোগেই ভারতে পালিয়ে যান। জব্বার সাহেবকে কেউ আর কখনো দেখেনি।

তার নিরুদ্দেশ হওয়া নিয়ে কথাশিল্পী হাসান আজিজুল হকের কিছু স্মৃতিচারণ আছে। তিনি অধ্যাপনা করতেন এবং বাম চিন্তাধারার মানুষ ছিলেন। তারা তখন মুসলমান পাড়ার এক বাসায় থাকতেন। একাত্তরের সেই দিনগুলি ছিল ভয়াবহ, প্রতি রাতেই শহরতলীতে কোথাও না কোথাও দাউ দাউ করে আগুন জ্বলতে দেখা যেত, আকাশ চিরে গোলাগুলি ছুটত, ভ্যান বোঝাই করে যুবকদের গল্লামারী বধ্যভূমি অভিমুখে নিয়ে যাওয়া হত, ল্যাম্পপোস্টে ঝুলত তরুণ ও যুবকদের লাশ। এমন এক সময়েখালেদ রশীদ এলেন তাদের বাসায়, খুবই ক্ষুধার্ত। বাসার দক্ষিণে একটা বড় পুকুর। পুকুরের ওপারে একআওয়ামী লীগ নেতার বাড়ি। ভদ্রলোক কেরোসিনের ডিলার। তারা বাড়িতে ছিলেন না। তবে লুট হয়ে যাওয়ার ভয়ে কেরোসিন তেলের টিনগুলো তিনি ঘরে এনে রেখেছিলেন। আর্মিরাহঠাৎ এসে বাড়িটাঘিরে পজিশন নিল এবং বাড়িতেআগুন লাগিয়ে দিল। জতুগৃহের মতো মুহুর্তে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলোবাড়িটা। টিনের চালার নাট বল্টু বিকট শব্দে চারিদিকে বুলেটের মতো ছুটতে থাকলো, কেরোসিনের টিনগুলো ফাটতে থাকল বোমার মত। খাবার ফেলে হাসান আজিজুল হক এবং খালেদ রশীদ সাহেব বাড়ি ছেড়ে পালালেন। কেননা এসব অপারেশনে আর্মিরা কথিত মিসক্রিয়েন্টের সন্ধানে বাড়ি বাড়ি ঢুকে পুরুষ মানুষ যাকে পেত ধরে নিয়ে যেত এবং সে হতভাগ্যেরকপালে লেখা হয়ে যেত অবধারিত মৃত্যু। একটা রিকসা নিয়ে তারা ফারাজিপাড়ায় কিছুটা ভেতরে অ্যাডভোকেট রাজ্জাক সাহেবেরবাড়িতে এসে উঠলেন।

রাজ্জাকসাহেব এরমধ্যে মুসলমান পাড়ার ঘটনা শুনেছেন, বললেন– এরা তো আমাদের কাউকে বাঁচতে দেবে বলে মনে হয় না।

হাসান আজিজুল হক প্রাণভয়ে বাড়ি ছেড়ে এসেছেন,পরিবারের ভাগ্য সম্পর্কে তখনো কিছু জানেন না, ক্ষোভের সাথে বললেন– এই কুকুরগুলোকে ধ্বংস করা ছাড়া এখন কি আমাদের আর কোন কাজ আছে? বস্তুত জাতির এই সংকট কালে লড়াইয়ের লাইন নিয়েবামশক্তির দোদুল্যমানতা তাকেতখন খুবই বিচলিত করেছিল।

রাজ্জাক সাহেব এসময় ভয়াবহ দুঃসংবাদটি দিলেন– গতরাতে তিনি বাড়িতে ছিলেন না। রাত দুটোর দিকে আর্মির জীপ এসে তাদের বাড়ির সামনেথামে। তারপর দরজায় ধাক্কা। তার স্ত্রী আলো জ্বালিয়ে আর্মিদের মাঝে লুঙ্গি-গেঞ্জি পরা বিদ্ধস্তপ্রায় জব্বার সাহেবকে দেখেচমকে ওঠেন। অকল্পনীয় নির্যাতনে তাকে চেনার উপায় ছিলনা। তারা আবার জব্বার সাহেবকে টেনেহিঁচড়ে নিয়ে বেরিয়েযায়। সেই থেকে জব্বার সাহেবকে আর কেউ কখনো দেখেনি। (স্মৃতি: ১৯৭১, পঞ্চম খণ্ড- সম্পাদনা: রশীদ হায়দার, পৃষ্ঠা-৭১)

জহুর আমার বন্ধু ছিল

জহুর আমার বন্ধু ছিল। '৫৯ সালে দৌলতপুর কলেজে ভর্তি হয়েছিলাম, সেখানেই প্রথম পরিচয়। টিনশেড হোস্টেলে একটা সীট নিয়ে থাকত। সঠিক মনে নেই পাবনা না কুষ্টিয়া কোথায় তাদের বাড়ি ছিল। সে শ্যামলা, কিছুটা লম্বা এবং ছিপছিপে আমার মনে হয় অন্য অনেক ছেলেদের থেকেও সে আকর্ষণীয় এবং ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন ছিল। কিন্তু সে তার নাক নিয়ে সব সময় বিব্রত থাকত। তার নাক ছিল তুলনামূলক ভাবে বেশ ছোট। কিন্তু সে জানতো না এটা তার চেহারাকে আলাদা বৈশিষ্ট্য দিয়েছিল। আমরা কয়েক বন্ধু একদিন সিনেমা দেখে নিজাম হোটেলে বসে আড্ডা দিচ্ছিলাম। সে সময়কার বাংলাদেশের বই, নায়ক নায়িকা পাশ্বচরিত্র ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল। যে বইটি আমরা দেখে এসেছিলাম তাতে পার্শ্বচরিত্রে রওশন আরা অভিনয় করেছিলেন। আজম হঠাৎ বলল, খুঁজে দেখ রওশন আরা তোর হারানো বোন বা তুই তার হারানো ভাই কিনা। আমি নিজ চেহারা নিয়ে সব সময় বিব্রত থাকতাম, বললাম আমি তোকে রহমানের (তৎকালীন সুদর্শন নায়ক) সাথে তুলনা করি আর তুই এভাবে প্রতিদান দিলি। ফারুক পিঠে থাবা দিতে দিতে বলল, দোস্তো তোমার দুঃখ পাওয়ার কিছু নেই, দুঃখ পেলে বরং রওশান আরাই পেতে পারে। সে সময় নাজানি আরো কি বলে বসে,আমি কথা ঘুরিয়ে দিলাম। হঠাৎ জহুরের নাক নিয়ে কথা উঠল। সে সব দিক থেকে আকর্ষণীয় ছিল, কিন্তু নাক নিয়ে তার আক্ষেপের অন্ত ছিলনা। অথচ সবাই একমত হল যে, সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের ক্ষুদ্রাকায় নাক তার চেহারার আকর্ষণ বরং বাড়িয়ে দিয়েছে। আমি সেটা তাকে বললাম এবং বললাম সে নাক নিয়ে সে যেন কখনো আক্ষেপ না করে।

ছাত্র রাজনীতির ঢেউয়ে ভাসতে ভাসতে আমি তখন ল'কলেজে। চাকরি করছি, আবার ছাত্রত্বও বজায় রাখিছ। মাঝে মাঝে নদীর ধারে বেড়াতে যেতাম। নদী প্রকৃতি এসব আমাকে টানতো। আমি ঘাটের সংকীর্ণ কাঠের জেটিতে দাঁড়িয়ে ছিলাম। জেটির মাথায় বন বিভাগের এম.এল.বনরূপা বাধা আছে। দেখতে সুন্দর। এরকম আরো দু'তিনটে জাহাজ আশেপাশে বাধা থাকে, কখনও থাকেনা। অফিসের কাজে সুন্দরবন যায়। জাহাজ থেকে একজন সুবেশা ভদ্রলোক বেরিয়ে এসে আমাকে অতিক্রম করার সময় থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল, মনোয়ার না? সাত-আট বছর ব্যবধান সত্ত্বেও আকর্ষণীয় নাকের জন্য জহুরের চেহারা ভোলা সম্ভব ছিলনা, বললাম– জহুর!

সে বনবিভাগে চাকরি করে। সুন্দরবন যাচ্ছে অফিসের কাজে। দশটা সাড়ে দশটার দিকে লঞ্চ ছেড়ে যাবে। বলল, চল ঘুরে আসি, বেশী না দু'তিন দিনের মধ্যেই ফেরা যাবে। যখন শুনল আমি আজও সুন্দরবন এবং সমুদ্র দেখিনি, জোর চাপাচাপি করল। বকলাম, যাবো তো, কিন্তু ছুটিতো নেই নি। তবে আমার আসল সমস্যা ছিল ভিন্ন, আমি যে যাবো, তেমন জামা-কাপড় কোথায়। সে সময় আমি মাত্র দু'সেট প্যান্ট-শার্ট নিয়ে কালযাপন করতাম, তাও পুরোনো হয়ে গিয়েছিলাম। বললাম, আজ থাক জহুর, পরে তো আবার যাবে তখন অবশ্যই সঙ্গী হব।

যাওয়া হয়নি। মাত্র কয়েক মাস পর একাত্তরের কোন একদিন বিকালে অফিস থেকে ফেরার পথে এক কলেজ বন্ধুর সাথে দেখা হল, বলল জহুরের কথা মনে আছে ?

জহুর! মনে না থেকে পারে ? হঠাৎ বুকটা ধড়াস করে উঠল। সে সময় আচমকা কারোর প্রসঙ্গ তোলা হলে একটা অমঙ্গল আশংকা সবাইকে পেয়ে বসত এবং বাস্তবিকই এটা ভাল কোন সংবাদ বয়ে আনত না। উদ্বেগের সাথে বললাম, কেন কি হয়েছে ?

তাকে তো বিহারীরা মেরে ফেলেছে, সেই প্রথমেই।

মানে !

বেচারা যদি প্রথম দিকেই চলে যেত, ভাল হত। কিন্তু ভাবল এমন গোলযোগ তো প্রায়ই হয়, থেমেও যায়। কিন্তু দিনে দিনে যখন সংকট বাড়ল সে বাড়ি চলে যেতে চেয়েছিল। তখন দূর পথে বাস ঠিক মত চলত না। কোথায় নামিয়ে দেয়, সেখানে কনেক্টিং বাস পাওয়া যায় কিনা সেভরসা কেউ দিতে পারেনা। জহুর ট্রেনেই গেল। কিন্তু ট্রেন তো চালায় বিহারীরা, রেলপথ যে তখন এত বিপদজনক হয়ে গেছে তার জানা ছিলনা। তখন ট্রেনযাত্রী ছিল শুধু বিহারীরাই, বাঙালিরা কেউ যদি ভুলে চড়ে বসে তার আর গন্তব্যে পৌঁছানো হয় না।

জহুরকে ওরা ট্রেনেই জবাই করে যশোরের একটু আগে রেল লাইনের পাশেএক ডিচে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল। গর্ত গুলো তখন পরিচিত ছিল মৃতের ভাগাড় হিসাবে।

স্বর্ণালী

স্বর্ণালীর বিয়ে হয়ে গিয়েছিল। তার স্বামী রাজনীতি করত। সে যেহেতু সীমান্ড় পার হয়নি, তাকে পালিয়ে বেড়াতে হত। স্বর্ণালী থাকতো মায়ের কাছে। বাড়িটি মেন রাস্ড়া থেকে তিন চার মিনিটের দূরত্বে মিয়া পাড়া রোডের মাঝামাঝিতে। রাস্ড়াটা তখনও কাচা, আর্মি হামলার আশংকা কম, তবে রাজাকারদের কথা আলাদা। তাসত্ত্বেও সুশ্রী স্ত্রীকে নিয়ে তার আশংকা কম ছিল। কেননা সেছিল গর্ভবতী এবং সেটা স্থুল ভাবে প্রকাশ্য ছিল।

সম্ভবত মে মাসের শুরু থেকে এমন রাত কমই গেছে যে রাতে আমরা ঘন্টার পর ঘন্টা মর্টার অথবা কামানের গোলার গুমগুম আওয়াজ শুনিনি। আমরা ভেবে পেতাম না কোথায় এগুলো ফাটছে। দিনের বেলা এ ধরণের শব্দ কমই শোনা যেত। কিন্তু রাতের নিস্ড়ব্ধতা যতই গাড় হত, দূরাগত গোলার শব্দ ততই তীব্র হত এবং আমাদের প্রানে ভয় ধরিয়ে দিত। তখন এমন একটা সময়যখন অনুকুল গুজব, প্রচার প্রপাগান্ডাগুলো বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হত। নইলে বিচার বিশেষণে না মিললে আমি তা সহসা বিশ্বাস করতাম না। সীমান্তে গেরিলা যুদ্ধ চলছে এবং ভারতীয় আর্টারির সহযোগিতা পাওয়া যাচ্ছে এটা বিশ্বাস যোগ্য ছিল। কিন্তু ৩৫ মাইল দূরের সীমান্ত থেকে গোলার শব্দ শুনতে পাওয়া অসম্ভব।

শীঘ্রই সবাই নিশ্চিত হল এগুলো দেশের অভ্যন্তরে ফাটছে এবং হানাদার সৈন্যরাই ফাটাচ্ছে কোন না কোন গ্রামের উপর।আমরা ব্যথ্যায় কুকড়ে যেতাম এবং ভারত কেন এখনো আমাদের স্বীকৃতি দিয়ে এগিয়ে আসছে না এই বলে অক্ষেপ করতাম। স্বার্ণালী প্রায় পাগলের মত হয়ে গিয়েছিল। তার স্বামী কাছে ছিল না এবং সব সময় সে তার নিজের এবং বাচ্চার অসহায় অবস্থার কথা ভেবে অস্থির থাকতো। রাতে গোলার শব্দ শুরু হতেই সে আতংকে নিজের মাথা ও পেটের ওপর বালিশ চাপা দিয়ে কুকড়ে-মুকড়ে পড়ে থাকতো। তার অবস্থা হল ভয়াবহ। খালামা ওকে নিয়ে এলেন আমাদের বাড়িতে বললেন, বু ওকে তোমাদের এখানে রাখো নইলে হয়তো বাঁচানো যাবে না। স্বাভাবিক সময় হলে মা হয়ত আপত্তি করতেন। আমাদের নিয়ে তার সন্দেহ ছিল এবং একসময় সেটা অমূলক কিছু ছিলনা। স্বর্ণালী আমাদের বাড়িতে থেকে গেল। আমি ঠিক জানিনা কে বিট্রে করেছিল সে না আমি।

'৬৬ তে ৬- দফা কর্মসূচি ঘোষিত হল। এটা ছিল পূর্ববাংলার স্বায়ত্ত্বশাসনের একরেখা দাবী। স্বভাবতই তা পশ্চিম পাকিস্তানি আমলা ও সামরিক জান্তাকে ক্রুদ্ধ করে তুলেছিল। আয়ুব খা অস্ত্রের ভাষায় ৬-দফা মোকাবেলা করার হুমকি দিলেন। মওদূদী ভুট্টো তার সুরে সুর মেলাবেন এটা অপ্রত্যাশিত ছিলনা। কিন্তু পাক-চীনআঁতাতের কারণে পূর্ব বাংলার ডান বাম নির্বিশেষে আয়ুবের কাতারে দাড়িয়ে যাবে এটা

অবিশ্বাস্য ছিল। বিশেষত বামপন্থিরা পূর্ব বাংলার জন্য অর্থবহ স্বায়ত্তশাসনের দাবীতে আমাদের চেয়েও বেশী সোচ্চার ছিল। মওলানা ভাসানী সেই '৫৬ সালে কাগমারি সম্মেলনে পশ্চিম পাকিস্তানিদের উদ্দেশ্যে স্বভাবসুলভভাবে বলেছিলেন– ভাত কাপড় দিয়ে পুষতে পারলে পোষো নইলে তালাক দাও। পরিস্থিতি আমাদের দায়িত্ব বাড়িয়ে দিল। অনেকেই এ সময় ৬-দফা অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত সাংসারিক জীবনে প্রবেশ করবে না এমন একটা বিশ্বাস নিয়ে চলতো। এটা খুব যে সিরিয়াস কিছু ছিল আমার কাছে তেমন কখনো মনে হয়নি। কিন্তু কমার্স কলেজ ছাত্রসংসদের ভিপি শপথ কারীদের একজন ছিল। তাকে কেন্দ্র করে পরিস্থিতি হঠাৎ সিরিয়াস হয়ে উঠলো। সে একটা মেয়েকে ভালবাসতো এবং এটা বেশ গভীর ছিল।এটা প্রকাশ পেলে আমরা তাকে শপথের কথা মনে করিয়ে দিলাম। সে পত্রপাঠ লজিং এবং লজিং বাড়ির প্রেয়সীকে ছেড়ে বেডিং পত্র নিয়ে হোস্টেলে চলে এল। আমাদের মধ্যে প্রেমের ব্যাপারে উৎসাহ যোগানোর লোকের অভাব ছিলনা। কিন্তু তাকে সিদ্ধান্ত থেকে সরানো গেল না, বলল– আপনারা স্মরণ করিয়ে দিয়ে ভালই করেছেন, আমাদের সামনে এখন অনেক বড় কাজ, এর মধ্যে একটা মেয়েকে জড়ালে তার ভবিষ্যৎ ঝুকির মধ্যে ফেলা হবে। তার চোখে মুখে অভিব্যাক্তি এমন ছিল যার সাথে আমাদের আগে কখনো পরিচয় ঘটেনি। এই ঘটনা আমাদের কারো কারো জন্য চিন্তার কারণ হয়েছিল। তা সত্ত্বেও আমার মনে হয়না যে জীবন উপেক্ষিত হয়েছিল। কিছুটা শ্লথ হয়েছিল হয়ত।

এই সময়টা ছিল আমাদের। অন্যদলের ছেলেরা ব্যাপকভাবে আমাদের সংগঠনে যোগ দিচ্ছিল। আমাদের অবাক করে মাজহার স্রোতের বিরুদ্ধে ছাত্র ইউনিয়নে যোগ দিয়ে বসল! সেপ্রেমিজিং এবং সব ব্যাপারে চৌকষ ছিল, তাকে দলে প্রয়োজন ছিল। আমি তার সাথে কথা বললাম। হ্যাভস এন্ড হ্যাভনটস নিয়ে সেই সনাতন বিতর্ক, বলল– আঞ্চলিক বৈষম্য দূর হল ভাল কথা, কিন্তু ৬-দফায় মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তির কথা কোথায়?

বললাম– বাম আন্দোলন যখন করতে যাচ্ছ জানো নিশ্চয় জাতীয় মুক্তির আন্দোলনটাই প্রথমে হতে হয়, নাকি ?

ছাড়েন এসব। মৃদু হেসে বলল, আমি দলে ফিরলে, স্বর্ণালী কি আপনার কাছে ফিরবে। আমার তো তা মনে হয় না।

আমি অবাক হয়ে আর মুখের দিকে তাকালাম- স্বর্ণালীর কথা আসছে কেন ? তাছাড়া তোমার দল ছাড়া না ছাড়ার সাথে তার কি সম্পর্ক ! তাকেই জিজ্ঞেসা করাই ভাল, আপনারই তো প্রিয় বোন।

স্বর্ণালী তাকে কতদূর কি বলেছে, কেনই বা বলেছে কে জানে। প্রশ্নটা তখনকার মত মনের ভিতরেই থাকলো।

ওরা এখন বেশ সুখে আছে। পরে আরো একদফা দল পাল্টিয়েছে- সুমেরু থেকে সরাসরি কুমেরুতে। আশ্চর্যের বিষয় সাউথ পোলের নাম কুমেরু কেন রাখা হয়েছিল! ওদের বাড়িতে এখন বিধিসম্মত গুটি কয়েক পুরুষ ছাড়া আর সবাই গায়ের মহররম।

স্বর্ণালী আমাদের বাড়িতে থেকে গেল। কিন্তু আমরা কেউই কথা বলতে উৎসাহ বোধ করতাম না। আমাদের উঠানে তিনদিকে ঘর,ফাঁকা জায়গাটুকু বেড়া দিয়ে ঘেরা ছিল। দক্ষিনে জনমানবহীন দিগন্ত বিস্তৃত বিল। ফলে মেয়েরা উঠানে পেতে রাখা চৌকিতে মাদুর বিছিয়ে বসতে পছন্দ করত। বৈকালিক চা সবাই এখানে বসেই খেত। একদিন চা পর্ব শেষ না হতে না হতেই টিপটাপ বৃষ্টি পড়া শুরু হল। স্বর্ণালী চায়ের কাপ হাতে ফোটা ফোটা বৃষ্টিতে কিছুক্ষণ ভিজল। আমি পাশের কাঁচা ঘরে থাকতাম।তাকে উঠতে না দেখে বিচলিত হলাম। তার শরীরটা বেশ ভারি। বোঝা যায় উঠতে বসতে কষ্ট হয়। আমি আমার বোনকে ডাকলাম যাতে ওকে ধরে ঘরে নিয়ে যায়। কিন্তু সে নিজেই ধীরে ধীরে নেমে দাঁড়াল এবং সবচেয়ে কাছে আমার ঘরের দিকে এগিয়ে এল। মাটির দাওয়ায় উঠতে উঠতে বলল– বাব্‌বাহ্ ! আমি বাঘ না ভালুক যে খেয়ে ফেলার ভয়ে বোনকে ডাকতে হবে। ভেবেছিলাম বৃষ্টিতে ভিজছি, আপনি ডাকবেন। আমার পোড়া কপাল! বাধ্য হয়ে নিজেকেই আসতে হল। থাকগে সবাই জানে আমার হায়া লেহাজ একটু কম।

ডাকব যে কথা তো বলনা। পরস্ত্রী! তারপর হাতে তাসবিহ্। ডেকে ঝামেলায় পড়ব নাকি।

আমি আজ কয়েকদিন হল আপনাদের বাড়িতে এসেছি। কথা আমি আগে বলবো না আপনি?

বাহ্ আগের মতই প্রগলভ আছো দেখছি! থাকগে বোধ হয় কিছু বলতে চাও, বল কি বলবে।

আপনি বিয়ে করছেন না কেন ?

ভাল সময় প্রশ্নটি করেছ, এটা কি বিয়ের উপযুক্ত সময় ?

কিন্তু আমি তো জানি আপনি কেন বিয়ে করছেন না।....

বোধহয় ভুল জানো।তবে এক সময় ৬-দফার আন্দোলন শেষ না হওয়া পর্যন্ত সময়সীমা ঠিক করে ছিলাম। এখন তো স্বাধীনতা। বিজয় আসুক তারপর না হয় ভাবা যাবে।

কিন্তু আপনি তো যুদ্ধে যাননি। আর আপনি কি বিশ্বাস করেন বাংলাদেশ স্বাধীন হবে? পাকিস্তানের এত সৈন্য, এতো কামান বন্দুক। এরা ওদের সাথে পারবে কেন ? খালি খালি স্বাধীনতা স্বাধীনতা করে সবাইকে কি যে বিপদে ফেলেছেন আপনারা!

যুদ্ধ তো কতভাবেই করতে হয়। যাকগে এসব কথা কে বলেছে তোমাকে, তোমার সাহেব ?

না সে বলবে কেন ? সে তো স্বাধীনতার পক্ষে। কারো বলাই বা লাগবে কেন। আমি তো নিজেই দেখছি। এত গোলাগুলি কবে শেষ হবে আল্লাই জানেন। আমার তো আর গুলির শব্দ সহ্য হয় না।

মেঘে মেঘে অপরাহ্নে সাঁঝের আঁধার নেমেছে। বাইরে ধুম বৃষ্টি, গা ভার হওয়া ভেজা বাতাস। দায় বোধহয় প্রকৃতির। আমি হঠাৎ স্বর্ণালীর হাতটা ধরলাম। ছাড়ানোর চেষ্টা করলো না, ওর ডান হাতটা আলতভাবে আমার হাতের ওপর রাখল। অদ্ভুত এক নৈঃশব্দ ঝুলে আছে দু জনের মাঝে, গর্ভিনী ঢলঢলে একটা মুখ আমার খুব কাছে। পুরোনো লোভটা থেকে থেকে মাথা চড়া দিয়ে উঠছিল। কিন্তু সময়টা যে বৈরি!

এই দারুণ সময়ে 'লুন্দর শেখের' মত হায়নাদের হাত থেকে 'নবিতুনদের' বাঁচানো জরুরী-এমন তাগিদ আছে বলেই কদমসারেংদের কাছে প্রলেভন তুচ্ছ হয়ে যায়।

আমাদের বাড়িটাও স্বর্ণালীকে খুব একটা স্বস্তি দিতে পারেনি। রাত হলেই তার চোখে মুখে অস্থিরতা ফুটে উঠতো। এবং যখনই দুরাগত গোলার শব্দ স্পষ্টতর হত সে ভয়ার্ত ভাবে শুধু উচ্চারণ করত– ঐযে ঐযে আবার শুরু হয়েছে! একদিন দুটো গোলার শব্দ এত ভয়ংকর ছিল যে মনে হলো বাড়ির পাশেই কোথাও বুঝি গোলা ফেটেছে। আসলেও তাই। আমরা শহরের দিকে যেতাম না বললেই চলে। প্রতিবেশীরাও কিছুটা বৈরী। ফলে ওরা যে ডিনামাইট দিয়ে '৬৯ এ নির্মিত খুলনার প্রথম পাকা শহীদ মিনারটি উড়িয়ে দিয়েছে তা জানতে আমাদের সময় লেগে যায়।

সেই থেকে স্বর্ণালী বিছানা থেকে প্রায় উঠতো না। আমাদের বাড়িতে একটিমাত্র পাকা কামরা ছিল। কামরার অর্ধেক জুড়ে তক্ত

পোষ পাতা। ওরই এক অন্ধকার কোণে সে চুপচাপ পড়ে থাকতো। তার অবস্থা দেখে মা একদিন খালামাকে ডেকে পাঠালেন– সালমা, তুই তোর মেয়েকে নিয়ে যা, আমার কিন্তু মোটেও ভাল ঠেকছে না।

স্বর্ণালী চলে গেল। কয়েক দিনের মধ্যে আমরা খবর পেলাম সে একটা মৃত সন্তান প্রসব করেছে। যে খবরটা দিয়েছিল সে বলল বাচ্চাটা মরে গিয়ে বেঁচে গেছে চাচি।

জুট অফিসার

মিল থেকে পরপর দু'জন বাঙালি অফিসারকে সরানো হল। একজন জুট অফিসার, অন্যজন মিলের অ্যাকাউন্টেন্ট ইনচার্জ। হিসাব বিভাগের দ্বিতীয় ব্যক্তি কাজী গোলাম আকবর এসআই খান সাহেবের দায়িত্ব নিলেন। তিনিও বাঙালি, তবে নিজেকে পাঠান বংশোদ্ভুত ভাবতে ভালবাসতেন। বাঙালিদের মধ্যে থাকলে চমৎকার বাঙালি, আবার অবাঙ্গালী কেউ থাকলে ঘোর পাঠান। বেলায়েত সাহেব একদিন হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করেছিলেন– স্যার আপনি আসলে কি– বাঙালি না পাকিস্তানি, নাকি পশতুন?

জানিনা, বুঝতেই পারিনা।

এটা কেমন কথা!

আসলে কি জানেন, যখন হিন্দুস্তানের তড়পানি দেখি, মনে হয় পাকিস্তান ছাড়া গতি নেই। আবার যখন দেখি কাজ করছি আমি, প্রমোশন পাচ্ছে সদরুল্লা বশিরুল্লা তখন মনে হয় বাঙালিদের একজোটে রুখে দাড়ানোটা খুবই জরুরী।

জুট অফিসার ছিলেন নিপাট ভদ্রলোক। রাজনীতির সাতেপাঁচে থাকতেন না। তবে '৭০-এর নির্বাচনের আগে পূর্ব বাংলার পাট সম্পদের আয় কিভাবে পশ্চিম পাকিস্তানে পাচার হয়ে যাচ্ছে তার একটা তথ্যবহুল চিত্র অনেকের সামনে তুলে ধরেছিলেন। তবে সেটাও বড় কারণ নয়। সম্প্রতি পাট ক্রয়ের ব্যাপারে মিলে নতুন নিয়ম চালু হয়েছে। মিলের ঢাকাস্থ হেড অফিস মিলঘাটে পাট কেনা বন্ধ রেখে মাত্র দু মাইল দূরে

দৌলতপুরে এজেন্সী খুলে পাট ব্যবসায়ীদের নিকট থেকে পাট কেনার নির্দেশ দেন এবং একই সাথে তাদের এক স্বজাতি হাদি রিজভীকেজুট পারচেজারকরে ঢাকা থেকে পাঠিয়ে দেন।যুক্তিটা ছিল পরিস্থিতির কারণে আসন্ন পাট মৌসুমে মোকাম থেকে পাট আমদানি কঠিন হবে। দ্রুত পাট ক্রয় শুরু হল। কিন্তু মিলে পাট পাঠানো শুরু হলে জুট অফিসার পাটের ওজন এবং মান নিয়ে আপত্তি দিলেন।চালানের ওজন অপেক্ষা বেলের প্রকৃত ওজন অনেক কম, পাটের মানও নিম্ন।

তবে হাদি রিজভীর খুঁটিঅনেক শক্ত, বাঙালি জুট অফিসারকেইসরতে হল। পাট কর্মকর্তার বিদায় পর্বটি ছিল নাটকীয়। এক সকালে তাকে মিলের জিএম সাহেবের অফিস কক্ষে ডেকে নেয়া হয়। অল্পক্ষণ পর তিনি প্রায় কাঁপতে কাঁপতে বেরিয়ে আসেন। নিজ অফিসে ঢুকে কাঁপা কাঁপা হাতে প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র গোছগাছ করে চার্জ বুঝিয়ে দিয়ে ঐ যে বেরিয়ে গেলেন আর ফিরলেন না। কেবলমাত্র বিশ্বস্ত অফিস সহকারীকে নাকি গোপনে বলে গেছেন, আর্মিরা তাকে খোঁজাখুঁজি করছে, অফিসেও আসতে পারে।

অফিস সহকারি জিজ্ঞাসা করল– কি কারণে খুঁজছে, কিছু জেনেছেন স্যার?

না, শুধু শুনেছি তারা নাকি ক্রোধের সাথে আমার খোঁজ করছে।

হাদী রিজভী চেয়ারে জাঁকিয়ে বসলেন। তবে হিসাব ইনচার্জের গোপন রিপোর্টের ভিত্তিতে শীঘ্রই তাকেও বিদায় নিতে হল। সেই আমলে ভদ্রলোক মাত্র তিন মাসে বিস্ময়করভাবে সাত লক্ষ টাকার পাট ঘাটতি করে নজির সৃষ্টি করেন। মিলের হিসাব ইনচার্জকেও অবশ্য পরপরই যেতে হল। আমদের বিশেষ করে আমার জন্য সংবাদটা ছিল বজ্রাঘাতের মত। যাওয়ার আগে ইউনুস সাহেব এবং আমাকে চেম্বারে ডেকে বললেন, শুনেছ বোধহয় আমি রিজাইন দিয়েছি, দিতে হয়েছে আর কি। তোমাদের কোন অসুবিধা হলে খয়রাতি সাহেবের সাথে যোগাযোগ কোরো। তাকে আমি বিশেষভাবে তোমাদের কথা বলে রেখেছি।

বেশ কিছুদিন পর নতুন জুট অফিসার হয়ে এলেন ইকবাল ফাহ্‌মি, ইউপির এক তরুণ ভদ্রলোক।কিছুটা লিবারেল প্রকৃতির মানুষ।অল্পদিনেই ভারপ্রাপ্ত অ্যাকাউন্টেন্ট ইন চার্জ আকবর সাহেবের সাথে তার ভাল সম্পর্ক গড়ে উঠল। প্রায় আকবর সাহেবের চেম্বারে এসে গল্পগুজব করতেন।

বড় মাপের একজন মানুষ

অক্টোবরের এক শনিবার, দুপুর একটায় অফিস ছুটি হয়েছে, সেই মুহূর্তে খবর এলো আমাদের গাড়িটা সার্ভিসিং-এ গেছে, ফিরতে দেরি হবে, আমরা যেন প্লাটিনামের বাসে যাই, তাদের বলা আছে আমাদের নিয়ে যাবে। আমরা কজন পড়ি কি মরি করে ছুটলাম। অফিস থেকে নদীর ঘাটে পৌঁছানো, নদী পার হওয়া, প্লাটিনাম জেটি থেকে তাদের অফিসে পৌঁছে গাড়ি ধরা কমপক্ষে পনের মিনিটের ব্যাপার, অথচ প্লাটিনামের গড়ি অফিস ছুটির পর পাঁচ-সাত মিনিটের মধ্যেই ছেড়ে যায়। যা ভেবেছিলাম ঠিক তাই। প্লাটিনামের অফিসে পৌঁছে দেখি গাড়ি নেই।

ইউনুস সাহেব আমাদের ইমিডিয়েট বস, প্লাটিনাম অফিস থেকে মিলে টেলিফোন করে মিলের লঞ্চটা চাইলেন। আগেও গাড়ি না থাকায় আমরা বেশ কয়েকবার লঞ্চে খুলনায় যাতায়াত করেছি। সহজেই অনুমতি মিলেছে, কিন্তু এবার মিলল না। প্রশাসনিক কর্মকর্তা পরিস্কার জানিয়ে দিলেন, মিলের জিএম ডি জি র‍্যামজের নিষেধ আছে। তিনি নাকি ইপিআইডিসি রোডে প্রচুর বেবিট্যাক্সি চলতে দেখেছেন, তাছাড়া সরকারও বলছে দেশের অবস্থা স্বাভাবিক, সেখানে আমরা অস্বাভাবিক ভাবছি কেন। আসলে বলার কিছু নেই, সবাই জানে বৃটিশ জিএম এবং বাঙালি প্রশাসনিক কর্মকর্তা দুটোই পাঁড় রাজাকার। ইউনুস সাহেব বললেন– চলেন, আল্লা ভরসা করে বেবিতেই যাই।

তারা একটা অপেক্ষমান বেবি নিয়ে দ্রুত চলে গেলেন। আমাদের বেবি পেতে কিছুটা বিলম্ব হল। একসাথে যাওয়া হল না বলে মনটা খচ খচ করতে থাকল। এখন ড্রাইভাররা সবাই বিহারী, কোন বিকল্প নেই, অতএব কিছুটা নিরাপত্তার আশায় আমি একজন মাঝ বয়সী ড্রাইভারের সন্ধানে ছিলাম। কিন্তু ভাগ্যে জুটল অতিশয় বৃদ্ধ স্থুলকায় এক বেবি-ড্রাইভার। তার নড়তে চড়তেই যথেষ্ট সময় লাগে। এরমধ্যে আমাদের হতবাক করে দিয়ে ড্রাইভার হঠাৎ ইপিআইডিসি রোড ছেড়ে ডান দিকে বিহারী মহল্লার ভিতরের রাস্তায় টার্ন নিল। এই এলাকা তখন বাঙালিদের জন্য ওয়ানওয়ে ট্রাক বলে কুখ্যাত ছিল। কোন বাঙালি এখানে ঢুকে পড়লে তার জীবিত বা মৃত কোনভাবেই এখান থেকে বেরনো সম্ভব ছিলনা। একাত্তরে কত বাঙালি যে না জেনে এখানে ঢুকে শেষ হয়ে গেছে তার ইয়ত্তা নেই।

সম্বিত ফিরে পাওয়া মাত্র আমরা ড্রাইভারকে অনুরোধ করলাম– চাচা, মেহেরবানি করকে ওয়াপাস চলিয়ে, ইপিআইডিসি রোড বরাবর যাইয়ে, আপ কিউ ইধার ঘুঁসা,আল্লাহ কি ওয়াস্তে ওয়াপাস যাইয়ে প্লিজ।কিন্তু আমাদের শত অনুরোধেও তাকে ফিরানো গেল না, বলল–

নেহী বাবা, উও রাস্তা বহুত খারাপ হ্যায়, জার্কিং হোগা, বহোত ধুলা ভি হ্যায়, ইয়ে স্কুটারভি বহোত পুরানা হ্যায়, ক্যায়সে যাউ। একটু থেমে আমাদের দিকে তাকিয়ে বলল– খুদাপর ভরসা রাখো বেটা।

প্রবাদ আছে যেখানে বাঘের ভয় সেখানে সন্ধ্যা হয়। আমাদের বেলা ঠিক তাই ঘটল। অয়ারলেস টাওয়ার ছাড়িয়ে কিছুটা আগে বাম হাতে পুকুর। ঘাটে বেশ কয়েকজন বিহারী কেউ বসে কেউ বা দাঁড়িয়ে আছে, গোছল করতে নেমেছে কেউ কেউ। পুকুরের প্রায় কাছাকাছি যেয়ে বেবিট্যাক্সিটা কয়েকবার ঝাঁকি খেয়ে ভটভট শব্দ করতে করতে থমকে দাঁড়াল। বৃদ্ধ ড্রাইভার বিরক্তির সাথে ক্ষণিক অপেক্ষা করে আমাদের দুজনকে নেমে দাঁড়ানোর নির্দেশ দিল– উতরিয়ে সাব, কাবোরের্টার সাফা করনে পড়েগা। অবশপ্রায় শরীর নিয়ে আমরা বৃদ্ধের নির্দেশ পালন করলাম। তিনি টুলবক্স ঘেঁটে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি বের করলেন, তারপর ধীরে সুস্থে ইঞ্জিনের ঢাকনা খুলে কারবোরেটর সাফা করার কাজে মনোনিবেশ করলেন।

সময় যত গড়ায় ঘাট থেকে একজন দুজন করে বিহারীরা উঠে এসে আমাদের বেবিট্যাক্সিটা ঘিরে দাঁড়াতে থাকে। অলস পাখায় ভর করে শকুনের নেমে আসার মত তারা আসে ধীরেসুস্থে, নিঃশব্দে। বৃদ্ধ ড্রাইভার লোল চর্মাবৃত হাতে কাজ করে যান। মনে হয় তার কাজ অনন্ত কাল ধরে চলছে এবং শেষ হবার নয়। কাজের ফাঁকে একবার মুখ তুলে শকুনগুলোর উদ্দেশ্য বলেন– তামাসা দেখতা হ্যায় কেয়া? যাও বাবা, আপনা কামমে যাও।

তারা যায় না। আমার কেন জানি মনে হয় চোখের সামনে পাঁচটা লোভনীয় শিকার ফেলে ওরা চলে যেতে নারাজ। শকুনের মত আধখোলা পাখায় ভর করে কয়েক পা পিছু হটে মাত্র, তারপর দাঁড়িয়ে পড়ে, ধীরে ধীরে আবার এক পা দু পা করে এগিয়ে আসে। কে জানে ওরা একজন গিন্নি শকুনের জন্য অপেক্ষা করছে কিনা! আমার তলপেট শিরশির করতে থাকে, প্রস্রাবের বেগ বাড়তে থাকে।

হঠাৎ চোখের সামনে একটা আশার আলো ঝলকানি দিয়ে ওঠে। রাস্তার ডান দিকে পুকুরের ঠিক বিপরীতে ইলিয়াস ভাইয়ের বাড়ি। তিনি ডাক্তার, বাঙালি। তার বাড়িও পশ্চিম বাংলায়। আমার এক চাচাতো ভাইয়ের ঘনিষ্ট বন্ধু। প্রায়ই পাশের বাড়িতে আসতেন, সেই সুবাদে আমাকে ভালভাবেই চেনেন। উত্তর খালিশপুরের আত্মীয়স্বজন ফেলে এই বিহারী মহল্লায় বসতি গড়ে তোলা নিয়ে এক সময় পরিচিত মহলে তার যথেষ্ট সমালোচনা ছিল। তবে শুনেছি এখানে বিহারীদের মাঝে তিনি দেবতার মত জনপ্রিয় এবং তার পসারও বেশ ভাল। তবে আশাটা হঠাৎ যেমন জেগে উঠেছিল তেমনই দপ করে নিবে গেল যখন খেয়াল হল তিনিও বাঙালি, আর এই ভয়াবহ পরিস্থিতির মধ্যে কোন বাঙালির পক্ষে এখানে টিকে থাকা সম্ভব নয়। অথচ তিনি টিকে আছেন!

রাস্তা থেকে তার বাড়ি প্রায় পঞ্চাশ ফুট ভিতরে। গেটের সামনে এক লাইনের একটা উর্দু সাইনবোর্ড ঝুলছে- মোহাজির মুসলমান কো মাকান। সম্ভবত বিহারীরা তার ঋণ ভোলেনি এবং প্রয়োজনও ভোলেনা। তিনি ধীরে ধীরে বারান্দায় এসে দাঁড়ান। পরনে লুঙ্গী গেঞ্জী। আমার মনে হল ভর্ৎসনার দৃষ্টিতে একপলক আমাকে দেখলেন। তারপর এমন ভাব করলেন যেন অচেনা একজন। মুষড়ে পড়ি। অথচ ভাবছিলাম বিপদ দেখলে এক দৌড়ে তার বাড়িতে যেয়ে উঠব। তিনি রুস্তম নামে কাউকে ডাকেন। ঘেরাও ভেঙ্গে সুঠামদেহী এক যুবক এগিয়ে যায় এবং একটু পরে ফিরে আসে। সে ড্রাইভারের উদ্দেশ্যে বলে– বুঢ্ঢা মিয়া এতনা দের কিউ হোতা, জলদি কর।

হা বাবা, বয়ঠা তো নেহি।

ঠিক হ্যায় চাচা, মাগার এতনা উমার মে কিউ গাড়ি চালাতা আপ লোগ। লাড়কা উড়কা নেহি হ্যায় কেয়া?

বৃদ্ধ ড্রাইভার জবাব দেন না, আমাদের দিকে ফিরে বলেন– যাইয়ে সাব, উঠ্ যাইয়ে, গাড়ি ঠিক হো গিয়া।

আমি ড্রাইভারের পাশে বসেছিলাম, গাড়ি চলতে থাকে, তিনি বিড়বিড় করে বলতে থাকেন– লাড়কা! উও তো পহেলেই মরচুকা, আল্লা উসকো বেহেস্ত নসিব করে। মাগার হাম উহ কাহানী বোলে, আউর তোম শালে ইয়ে সব মাসুম বেচারাকো উপর হামলা করো– হা, মুঝে বেওকুফ সামঝা!

আমাদের মাথাপিছু ভাড়া ছিল আট আনা, হাতে দশ টাকা উঠে এলো। আমি পুত্রহারা একজন বৃদ্ধ অথর্ব পিতার হাতে টাকাটা গুজে দিয়ে ক্ষণকাল তার হাতের মুঠো নিজের হাতের মুঠোয় চেপে ধরে থাকি। আমার দেখা বড় মাপের একজন মানুষ।

মওলানার বক্তৃতা

মসজিদের ইমাম সাহেবরা তখন অধিকাংশই শীর্ণকায়, পরিবার পরিকল্পনা ইসলামের বর্হিভূত কাজ বলে আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করেন। ফলে ঘরভরা সন্তান। স্বভাবতই তারা সকলে পুষ্টিহীনতার চুড়ান্ত প্রতিচ্ছবি। সেকালের ইমাম সাহেবরা সৎ,আময়িক ও জনপ্রিয়। তাদের জীবন যাত্রা ইমামতি, ধর্মপ্রাণ মানুষের দয়া-দাক্ষিণ্য, মিলাদ, ওয়াজ মহফিল এবং ধর্মশিক্ষা দানের উপর নির্ভরশীল। তাদের সাচ্ছন্দ-অসাচ্ছন্দ স্থানীয় লোকদের স্বাচ্ছন্দ-অস্বাচ্ছন্দের উপর নির্ভরশীল। তবে এ ছবি একাত্তরপূর্ব সময়কালের। একাত্তরে টুপি লেবাসধারী পাকিস্তানি দুবৃত্তরা ভাবলো ইসলামের নামে এসব সরল ধর্মভীরু ইমাম সাহেবদের সহজে কাজে লাগানো যায়। তারা মাঠে নামলেন, ওজস্বিনী ভাষায় ইমাম সাহেবদের ইসলামের অতীত গৌরবের কথা, শৌর্যবীর্জের কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন। বুঝিয়ে দিলেন পাকিস্তানি সৈন্যরা ইসলামের নিশান-বরদার, তারা ইসলাম ও পাকিস্তান রক্ষার জন্য হাজার মাইল দূর থেকে আমাদের মুলুকে এসে লড়ছেন, জান দিচ্ছেন। তারা জেহাদে সামিল। আর আমরা, আপনারা কি করছি! ইসলাম কি শুধু তাদের আর আমাদের মত গুটিকয়েক মানুষের যে শুধু আমারই পেরেশান হব? আর আমাদের ঘরে ঘরে জাসুস, গদ্দার আর হিন্দু-মালউনরা আশ্রয় প্রশ্রয় পাবে, এদেশ থেকে ইসলামের নাম নিশানা মুছে ফেলার জন্য। আমাদের ভিতর ইসলামের সেই জ্বেহাদী জোশ কোথায়? মনে রাখবেন ইসলামের চেয়ে সন্তান বড় নয়। আপনারা মুসল্লিদের সামনে এসব বয়ান করবেন, মুসল্লিদের ইসলামের পথে ধরে রাখবেন। আর যখনই সুযোগ পাবেন কোন না কোন মসজিদে যাবেন, বয়ান করবেন। মনে রাখবেন এটা কর্তৃপক্ষের আদেশ।

খুলনার এক অতি বিখ্যাত মওলানা এলেন পূর্ব বানিয়া খামার মসজিদে। মসজিদে ইদানিং মুসল্লি খুব কম হয়। আজ কিছুটা বেশি। যারা এসেছেন ইমাম সাহেবের সনিবদ্ধ অনুরোধে এবং বিশেষকরে পাড়ার দু-চার জন লেবাসধারীর ভয়ে। মাগরিবের নামাজের পর বয়ান হল– দুঃখের বিষয় আমরা ইসলামের অতীত গৌরবের কথা ভুলে গেছি। যা শোনবার নয় তাই শুনি, তার নয় ভাগই মিথ্যা। বিবিসি, আকাশবাণী, ভোয়া- যাদের নামই ভূয়া, তাদের কথা আপনারা শোনেন কেন, বিশ্বাস করেন কেন? ওগুলো চালায় কারা- ইহুদি, নাসারা আর মালউনরাই তো, নাকি? আপনারা আপনাদের পাক ওয়াতনের রেডিও শোনেন। হ্যা আমরা শুনেছি, আপনাদের এলাকায় কিছু ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু তারা কারা তাকি জানেন? তারা ছদ্মবেশী হিন্দুস্তানি চর। গভীর জলের মাছ, আপনার আমার পক্ষে তাদের চেনা সহজ না। কিন্তু আর্মিদের কাছে ঠিকই খবর পৌছে যায়। ওদের মাল-সামান বাচ্চা-কাচ্চা এবং স্ত্রী কন্যা সবই গনিমতের মাল। জ্বেহাদী সৈন্যরা ওদের ভোগ দখল করতে পারে। আপনারা কি খন্দকের যুদ্ধের কথা পড়েন নি?–

অন্যদের কি অনুভূতি হয় হাসান আলী জানেন না। আধো আলো আধো অন্ধকারে সবার মুখগুলো থমথমে পাথরের মত দেখায়। তিনি অনুভব করেন তার গালের ভিতরটা তেতো হয়ে গেছে। খন্দকের যুদ্ধের বিষদ বর্ণনা তার জানা নেই। ফেরার পথে পাড়ার বয়ঃবৃদ্ধ মুসল্লি কেরামত চাচাকে ফিস ফিস করে জিজ্ঞাসা করে এসব কি সত্যি চাচা? তিনি খুকখুক করে কাশতে থাকেন, বলেন– হতে পারে বাবা, তারাই ঠিকমত কবার পারে। তয় এতবড় মওলানা মিথ্যে কবে? হোসেন আলীর সন্দেহ যায় না।

কে যায়?

ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তার উপর দাড়িয়ে মুহম্মদ বক্তার উদ্দীন তাকিয়ে তাকিয়ে একটা দৃশ্য দেখেন। সুবেহ্ সাদেক। মাথায় কাঁধে কাঁকে বোচকা বুচকি আন্ডা-বাচ্চা নিয়ে দু তিনটে পরিবার নদী কিনারের ভেড়ির ভাঙ্গাচোরা পথে হাঁটছে। নিঃসন্দেহে হিন্দু তাবে কারা দূর থেকে ঠাওর করতে পারলেন না। ভেড়ির উল্টো দিক দিয়ে হতদন্ত হয়ে আসছিলেন আবেদ মুনসী। বোর্ডের রাস্তায় উঠে বললেন– খবর দিছেন বক্তার সাব।

খবর না, এত্তেলা দিছি, তোমারে কয় নাই।

কইছিল, কন্‌কের উর্দু না আরবি শব্দ মনে রাখবার পারি নাই।

মনে রাখবা এইটা আমাদের নবীর প্রবিত্র জবান– আরবি শব্দ, কারা গেল?

সনাতন কাকা আর প্রফুল্ল মন্ডলের পরিবার।

আর তুমি অগো আদাব দিলা? সাধে কি আর ক্যাপ্টেন সাহেব কয় তোমরা মালাউনগো বংশজাত! তারা কনে গেল, লগে কি কি লইছে, জিগাইছ?

হয়, নদীর ওপারে হেরশ্বশুর বাড়ি যায়। জামা-কাপড় এই সব লইছে।

আর সোনা-দানা, গোলা-গুলি– ওগুলান তোমার জন্য ঘরে থুইয়া গেছে!– বক্তার উদ্দীন খেঁকিয়ে ওঠেন। যাও আর্শ্চরে এত্তেলা দাও, দশটায় জরুরী মিটিং আছে।

গেরামের ব্যাবাক মান্‌ষেরে কমু নাকি ?

না, হ্যারা কেউ আর মানুষ আছে নি, সব তো আমলীগ হয়া গেছে, আমলীগ আমি হ্যাগোর হোগার মইধ্যে ঢুকামু। যাও আমাগো লোকদের এত্তেলা দাও, জামাতের লোকদের কইয়ো, ইমাম সাবরেও কইয়ো।

বেলা দশটার দিকে জনা বিশেক লোকের এক বিশাল সভায় জ্বালাময়ী ভাষণ দেন মুনশী বক্তার উদ্দীন। প্রথমে নরম এবং বিদ্রুপের সুরেসকালেদেখাঘটনার কথা উল্লেখ করলেন– ভেড়ি দিয়া সনাতন ঘোষেরা পোটলা পুটলি লইয়া নদীর দিক যায়, তোমরা কেউ দেখছনি?

হ, বুঝছি, দেখবা ক্যামনে! সুবে সাদেকের সুময় মোষের মত ঘুমাইতে থাকো, নামাজ কালাম নাই। এদিকে সনাতন ঘোষেরা দ্যাশ ছিবড়া কইরা সব বর্ডার পার হইতেছে, তোমাগো আরোয়ায় মালুম নাই। গেরাম কমিটি তৈরি কর, পাহারা বসাও। কেউ যেন্ এক রত্তি সোনা-রূপা, টাকা-পয়সা না লইতে পারে। হ্যারা যায় যাউক, আপদ বিদায় হইলেই ভাল। হ্যারা গ্যালে ভোট আমলীগের হোগায় যাইবে। আর একটা কথা, কেউ অগোরথন ওগোর কাছ থিকা কিছু কিনবা না, এমনিতেই সব পাইবা।

সভার এক সিদ্ধান্ত হায়দারের পথ বদলে দিল

পঞ্চবিথীর কাছে পুরোনো একটা দালান, অন্ধকার দেয়ালের জায়গায় জায়গায় পলস্তারা খসা। মেঝের উপর ফরাস বিছানো। মলিন ফরাসের উপর নিঃশব্দে একজন দু'জন করে ছেলেরা এসে বসল। তারা সবাই সন্ত্রস্ত। ভয়ে যতটা নয়, তার চেয়ে বেশি কি সিদ্ধান্ত জানানো হবে তাই নিয়ে। পুলিশ এখন অনেকটাই নিষ্ক্রয়। শান্তি কমিটি একটা গঠিত হয়েছে বটে কিন্তু তাদের লোকবল নেই। আবার আর্মিদেরও লোকবল যথেষ্ট নেই, চেনা জানাও নেই। তারা চিন্তিত কি সিদ্ধান্ত জানানো হবে তাই নিয়ে।

এখানে একটা সভা হবে, হয়তো আলোচনাও হবে এবং সিদ্ধান্ত জানানো হবে। সেন্টারের সিদ্ধান্ত। স্থানীয় সেন্টার সে সিদ্ধান্ত জানাবেন, মতামত আহ্বান করবেন। নীতিগতভাবে সবাই গণতান্ত্রিক কেন্দ্রীকতার প্রতি বিশ্বস্ত, কেন্দ্রের সিদ্ধান্তই তাদের সিদ্ধান্ত। সব আলোচকরা যুক্তি রেফারেন্স তুলে ধরবেন সিদ্ধান্তের পক্ষে এবং এক বাক্যে।

কমরেড, আমরা যুদ্ধ করব। সেন্টারের সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত, আমাদের দেশ আক্রান্ত হয়েছে রুশ সংশোধনবাদ এবং ভারতীয় সম্প্রসারণবাদ আমাদের উপর আগ্রাসী থাবা বিস্তারের দিবাস্বপ্ন দেখছে। আমেরিকার দালাল পাচটা কুত্তা আওয়ামী লীগ-ছাত্রলীগ দেশভাগের দিবা স্বপ্ন দেখছে।

আমরা যুদ্ধ করব তাদের বিরুদ্ধে পাকিস্তানি আর্মিদের সাথে কাঁধ মিলিয়ে। আপনাদের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে, পাকিস্তানও তো শ্রেণী শত্রুদের ক্যাটাগরিতেই পড়ে। হ্যা, ঠিক কথা। কিন্তু মনে রাখবেন শত্রুর শত্রু আমাদের মিত্র। সময় হলে আমরা ওদের উপরও আঘাত হানব। গোটা পাকিস্তান লাল হয়ে যাবে। কোন সন্দেহ নেই লাল হবেই। এতে মেহনতি মানুষদের গণচীনের এবং মহান নেতা মাওসেতুং-এর সম্মতির কথা আপনারা কাগজেই দেখছেন। এখন আপনারা যার যার ঘাটিতে চলে যাবেন। চীনের চেয়ারম্যান আমাদের চেয়ারম্যান, মাও চতুশি- জিন্দাবাদ।

সব আলোচনা রেলের বগির মত ইঞ্জিনের পিছু পিছু ধাবিত হয়। আলোচনা সংক্ষিপ্ত হয়। এখন কথা নয়, কাজের সময়।

রশীদ ভেবেছিল, আর্মি একশান গণমানুষের বিরুদ্ধে গেছে, ঘোষণা আসবে বাংলাদেশ হানাদার মুক্ত করার পক্ষে এবং সম্ভবত আওয়ামী লীগ বলয়ের বাইরে থেকে। কিন্তু ঘোষণা শুনে তার ভেঙ্গে পড়ার দশা হয়। কোন প্রতিক্রিয়া দেখানোর ব্যাপারে সে সতর্ক ছিল, তবু তার চেহারা মলিন হয়, মাথা ঝুকে পড়ে, অনেকেরই হয়েছে। তারাও তার মত সন্ত্রস্ত।

সে ভেবেছিল কিছু আলোচনা শেষ পর্যন্ত উঠবেই, ওঠেনি, সিনিয়াররা সব ক্ষুরধার যুক্তি দেখিয়েছেন। কদিন আগেও সুর ছিল ভিন্ন, নিশ্চিত থাকো স্বাধীনতার যুদ্ধে যাচ্ছি আগে। প্ল্যানটা হবে হোচিমিনের মত, বুর্জোয়া দল আওয়ামী লীগের দম থাকবে না। তাদের সুবিধাবাদী আচরণ মুক্তিযোদ্ধাদের বিরূপ করবে, তাদের নেতারা প্রবাসে চলে গেছে। আমরা দেশে আছি, আমাদের ঘাটি এলাকা আছে। মুক্তিযোদ্ধারা দেশে ঢুকে আমাদের কাছে শেলটার নিতে বাধ্য হবে, মটিভেশন সহজ হবে। লাল ঝন্ডা উড়তে সময় লাগবে না। অথচ হলটা কি!

দুজন নিঃশব্দে হাঁটছিল। হরিহর আত্মা, অথচ এখন কেউ কাউকে আস্থায় নিতে পারছে না। রশিদ বিড় বিড় করে জিজ্ঞাসা করল, আমরা এখন কি করব?

যেভাবে বলা হয়েছে, কম এবং জরুরী জিনিসপত্র এবং যত বেশী সম্ভব টাকা-পয়সা নিয়ে আজই ঘাটির উদ্দেশ্যে রওনা দিতে হবে, আমাদের হাতে সময় কম।

রশিদ বুঝল ওসমান ঘাটিতেই যাবে। তার কাছে আদেশের অর্থ একটাই– অবশ্য পালনীয়। রশিদ বলল লঞ্চ০০০ দেখা হবে। দেড় ঘণ্টা নয় রশিদের হাতে সময় ছিল বড়জোর আধ ঘণ্টা। সে মোড়ের রিকশা০০০০ থেকে রং চটা পুরানো একটা সাইকেল বেছে নিল। এগুলো ভাঙা পাওয়া যায় কি করেন রশিদ ভাই, কি নিচ্ছেন ওটা? ভাল সাইকেল।

এতেই হবে, ধুলো বালির পথ, আল ভাঙ্গাও লাগতে পারে। মোড় ঘোরার আগে ফিরে এলো, চল্লিশটা টাকা বাড়িয়ে দিয়ে বলল, টাকা কয়টা রাখেন রুস্তম উ০০ ফিরে এসে নেবো। পথঘাটে শুনি হরদম ছিনতাই, রাহাজানি হচ্ছে। ক্যান, বাড়ি যাবেন না? যাবো, কিন্তু বাড়িতে এখন আছে কে! তারপর কোথায় দৌড়াতে হয় কিজানে। তার মনের ভার অনেকখানি হালকা হল, শুরুটা অন্তত একা ০০০ মানুষকেফাঁকি দিতে হলনা। অল্পক্ষণ পর সাইকেলের হ্যান্ডেলে পুরোনো চটের থলি ঝুলিয়ে, লুঙ্গি-গেঞ্জি পরে সাতক্ষীরার পথে বেরিয়ে পড়ল রশিদ– বর্ডার একটা ঠিকই পেয়ে যাবে, ছাত্রলীগের ছেলোা তারে ভঅল চেনে, কিন্তু তার নকশাল কানেকশনের কথা জানে না, অস্ত্র একটা জুটে যাবেই।

আবুল লঞ্চঘাটে গিয়েছিল বন্ধুদের সি-অফ করতে। উদ্বিগ্ন ভাবে ওসমানকে দাঁড়ানো দেখল রেলিং ধরে রশিদ তখনো আসেনি। টুংটাং করে লঞ্চের শেষ ঘণ্টা বেজে উঠল দু'জনেই সমান উদ্বিগ্ন, কি হল রশীদের। ওসমানের অনুরোধ আরো কয়েক মিনিট লঞ্চ ঘাটেই অপেক্ষা করল– যাত্রী কম যদি আরো দু'চার জন এসে যায়। যাত্রীরা উসখুস শুরু করে শ্বাপদপদবাচ্য আর্মি সংকুল শহর ছাড়ার জন্য সবাই উদগ্রীব। ঠিক আছে অবশ্যই খোঁজ নেব, ওসমানকে আশ্বস্ত করে আবুল নেমে এল, সে অবশ্য ততটা উদ্বিগ্ন নয়। ওসমান খানিকটা ব্লাস্ট, সে বই পড়ে একটা নির্দিষ্ট লাইনে, একটা নির্দিষ্ট লাইন বিশ্বাস করার জন্য এবং বিশ্বাস করে এবাদতের মত অন্ধ ভাবে, নইলে মিটিং থেখে বেরিয়ে রশিদের করা প্রশ্নটা সে মিলিয়ে দেখতে পারত।

তাজউদ্দিন মোসলমান না

সেদিন মিটিং বসে। উদ্যোক্তা জামাত। তিনি বলেন– ঐ তাজুদ্দিন মোসলমান না, হিন্দুর ঘরে জন্ম। পরে উদ্দেশ্য নিয়া মোসলমান হইলেও হইতে পারে। মুজিব কার কথায় উঠবোস করে। শেষপর্যন্ত মুখে আত্মসমর্পন করেছে, কিন্তু তাজউদ্দিন কোথায়? সেতো ইন্ডিয়ায় চলে গেছে। সেখানে বসে কলকাঠি নাড়ছে, আর আমরা গল্প দিয়ে যাচ্ছি। এত যে বিপদ, তখন উদারতা আসে কোথেকে। আমরা জানি চেয়ারম্যান মুসলিম লীগ করে, ভাল মানুষ। অথচ দ্যাখছেনকত মালাউনরে আশ্রয় দিয়া রাখছেন। আমি জিগাইছি। কি কইছেন শুনবেন– ইসলামে তো আশ্রয় দেয়ার কথা আছে। কেমন ভুল ব্যাখ্যা দেখেন! কাদের আশ্রয় দিতে কইছে ইসলাম? নিরীহ অসহায় মানুষরে তো। হিন্দুরা নিরীহ অসহায় হইলে গাদ্দার পার্টির নৌকায় ভোট দেয় ক্যামনে? ওগোর পিছনে হিন্দুস্তান সরকার আছে। আরে চেয়্যারম্যনে কইছে। ঠিক আছে, ওদের যাইতে কন। আমারে সাফকইয়া দিলেন– আমি এই বিপদগ্রস্ত লোকগুলারে তেমন কথা কইতে পারবো না, তারা নিজের ইচ্ছা হইলে যাইতে পারে।

এসকেন্দার কবির বাচ্চু

হঠাৎ একদিন বাচ্চু আমাদের বাসায় এলো। আমাকে বাসায় দেখে কিছুটা অবাক হল, বলল– ভাই শুনে এসেছি আপনি বাড়িতে আছেন, বিশ্বাস হয় নি। এখন দেখছি খবরটা ভুল ছিল না। আপনি পার্টিতে গ্রুপিং পছন্দ করতেন না, বলতেন– গ্রুপিং হবে আগামীতে, সেদিন আসছে। কে কোন পক্ষে থাকবে আসল গ্রুপিং হবে তখন। সে দিন তো এসে গেছে ভাই, এখন জানতে ইচ্ছা করে আপনি কোন গ্রুপে। আমাদের তো বিশ্বাস করতে কষ্ট হয় আপনি স্বাধীনতার পক্ষে নেই।

তোমাদের বিশ্বাস থাকলে ঠিকই আছে। প্রায়এক বছর তো সবার থেকে বিচ্ছিন্ন ছিলাম, কারণটা তোমরা ভালই জানো।তারপরও খুলনার প্রতিরোধ ভেঙ্গে গেলে রূপসায় সবাই আবার একসাথে হয়েছিলাম। হয়তো অনেকেই তখন আমাকেপছন্দ করেনি বা সঙ্গে নিতে চায়নি। সে রাতে রেডিও স্টেশন আক্রমণ করা হবে,জানতেই পারিনি। শুধু বলা হয়েছিলরূপসায় আমাদের অবস্থানআর্মিদের গোলার রেঞ্জের মধ্যে, আমাদের পিছিয়ে যেতে হবে। নদীপার হয়ে বাড়ি এসেছিলাম জামা কাপড় এবং কিছু টাকাপয়সা নিতে। শেষ রাতে প্রচন্ড গোলাগুলি। পর দিন সকাল না হওয়া পর্যন্ত বুঝতেই পারিনি গোলাগুলি হচ্ছে খুলনা বেতার কেন্দ্রে। একদিন পর নদী পার হয়ে দেখি রূপসায় তোমরা কেউ

নেই। কেবলকমার্স কলেজের ফজলু সাহেবের সাথে দেখা হল,কাছেই তার বাড়ি, বললেন– সবাই বাগেরহাটের দিকে চলে গেছে মনোয়ার সাহেব, এখন কোথায় আছে জানি না। ভাল হয় আপনি এখন বাড়ি চলে যান, পরে খোঁজ নিয়ে যোগাযোগ করবেন। এখানে বেশীক্ষণ থাকা ঠিক না, কারো সাথে কথা বলার দরকারও নেই। এলাকাটা রাতারাতি পাল্টে গেছে বলে মনে হয়।

আমি আর কখনই ওদের সাথে যোগাযোগ করতে পারিনি। তবে এখানে থাকলে বাঁচা কঠিন। দিনে দিনে পরিস্থিতি জটিল হয়ে উঠছে।

ভাই, আমরা জানি আপনি বাড়িতে বাড়িতে আছেন, কতটুকু সহযোগিতা করতে পারেন সেটাই জানতে এসেছি।

অবশ্য ওরা কেউ কখনো আমার সাথে আর যোগাযোগ করেনি। যদিও কানাঘুষায় শুনেছিলাম আশেপাশেই মুক্তিযোদ্ধাদের একটা শেলটার আছে।

কাফেলা

সীমান্তে এক বুড়ি এসে পৌঁছালো। কোমর থেকে মাথা পর্যন্ত ভূমির সাথে সমান্তরাল, হাতে তেল চিটচিটে লাঠি। মাথায় কদম-ছাট দেয়া ধূসর চুল। আগে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে, পরনের ধুতিটা তখনো শুকিয়ে পারেনি। ধপকরে সামনের ভিজে মাটিতে বসে পড়ল। বুড়ি তখনো কুকুরের মত হাফাচ্ছে। কায়েকজন ছেলে তাকে ঘিরে দাঁড়ালো। কিছুটা ধাতস্ত হয়ে বুড়ি জিজ্ঞসা করলো– বাবারা এটা কি হিন্দুস্থান? লোকে কল। তারপর কপালে করজোড় ঠেকিয়ে বলল, ভগ্‌মান তালি বাঁচায়ে আনিল!

একজন জিজ্ঞেস করল, সঙ্গে লোকজন নেই?

আছে বাবা আছে। দুই না তিন দিন, ঠিক কতি পারিনে, হ্যারা আমারে ছাড়ে আইছে। হাটতে তো পারিনা, তাগো লগে তাল দিয়া ক্যামনে চলি কও। হ্যারা আগেই আইয়া পড়ছে।

সেকি তারা আপনারে একা ছেড়ে এলো!

একা হবি ক্যান বাবা! পথে কত মানুষ। আমার পিছে পিছেও তো কত মানুষ আইতেছে।

বুড়িরে যেন কথায় পেয়ে বসে। বলতে থাকে তাগো দোষ দিই না বাবা। এত পথ, পথও খারাপ। কাদা পানি বিল পাটখ্যাত সব ভাঙ্গে আইতে হইছে। কাদা তো না, য্যান কুমোর বাড়ির ছ্যানা মাটি, পা পড়লি কামড়ি ধরে। তয় লোকজন পার করি দিছে। কইতেছিলাম, হ্যাগো লগে মাল-মাত্তা, পোলাপান আছে। হকলে জেরবার হইয়া আছে, ওগো দোষ দিই না বাবা। হেই যে যৈবনকালে বাপের বাড়ি গিছিলাম মাদারিপুর–কতেক লঞ্চ, কতেক গরুর গাড়িতে। বাকি দেড় কোশ ডিঙ্গি বাইতে হয়। তখন শুকনার কাল, ডিঙ্গি চলে না। আল ভাঙ্গতে হইছিল। সে কি কষ্ট! আধা কোশও যাইতে পারি নাই, পোলারা থপ করি বসি পড়িল, কয় বাড়ি চলো। কি আর করি কোলে নিয়া হাটলাম। ওর বাপেরে কিছু কইতে পারিনা। তার হাতে গুড়ের ঠিলা। রাগে টং হইয়া আছে। কিছু কইলেই, খোটা দিব দ্যাশে খেজুর গাছ নাই, বাপের গুড় পছন্দ, লও এক খান! কইবে তোমার সাত গুষ্টির জন্যি এটা লমু, ওটা লমু, না তোমার পোলারে কোলে নিমু! কি আর করি কও, কাঁকে পোলা হাতে টিনের বাকস লইয়া এক কোশ হাটছি। কি কষ্ট গ্যাছে সেদিন! বুইলে বাবারা, কষ্টটা জানিতো, তাই পোতারা যহন এর ওর মুখ চায়া-চায়ি কইরা কইল- ঠাকুমা আর তো পারি না! কইছি, তোরা তো বাঁচ।

হ্যারা কনে এটটু খুঁইজা দাও বাবারা–ঐ যে সুবল আর ধনা। ধনা কইও না বাবা, ধণঞ্জয় বইলা ডাক পাড়ো, কলেজে পড়তিছে তো।

ইন্ট্রোগেশন

জুলাই-এর শেষ দিকে কাশেম চাচা এসেছিলেন আব্বার সাথে গল্প করতে। বললেন সামসুদ্দিন উকিলকে তো চেনেন। তার ছেলেটা স্কুলে-টুলে পড়ে বোধহয়, ছাত্র ভাল। তবে দলেপড়ে বখে গেছে, ছাত্রলীগ করে। এতদিন খোঁজ ছিলনা। সেও নাকি মুক্তিযোদ্ধা, বোঝেন অবস্থা! বলিহারি যাই, আর লোক জোটেনি, ছোট ছোট বাচ্চাদের ধরে নামিয়ে দিয়েছে! রাইফেল উচু করতে পারে কিনা সন্দেহ। জানেন তো কায়ছার সাহেব একটা রাইফেলের ওজন সাড়ে সাত সের। ফলেযা হবার তাই হয়েছে, দেশে ঢুকে নদীর ওপারে কোথায় যেন অস্ত্রপাতি সমেত রাজাকারদের হাতে ধরা খেয়েছে। কাজ দেখাচ্ছে বটে রাজাকাররা! তারা তুলে দিয়েছে আর্মির হাতে। এখন ঠেলা বোঝো।

আব্বার সবচেয়ে কষ্টের জাগায় আঘাত লেগেছে, বললেন– একেবারে বাচ্চা ছেলে বলছেন, তারপরও আর্মিদের হাতে তুলে দিল!আপনার কি মনে হয়সত্যি এরা মুক্তিযোদ্ধা?

শোনেন কায়ছার সাহেব, পাকিস্তান আর্মি ঘাস খায় না যে দেশের এতটা ভিতরে হিন্দুস্তানী মুক্তিরা ঢুকে পড়বে। এরা মুক্তি না, তবে হ্যা লুটেরা ডাকাত টাকাত হতে পারে। ওর বাবা গিয়েছিল শান্তি কমিটির অফিসে তদবির করতে। ছেলে নাকি ধোয়া তুলশি পাতা। হুজুকে পড়ে দলের সাথে ওপারে গিয়েছিল বটে, ওখানে কষ্টে পড়ে কান্নাকাটি করছিল, একটা দলের সাথে ফেরত এসেছে। নদীর ওপারে রাজাকারদের তাড়া খেয়ে সবাই পালিয়েছে, ও ছেলে মানুষ, কোন অন্যায় নাকি করেনি, পালাতেও চেষ্টা করে নি। ওর মা কান্নকাটি করে পাগলপ্রায়। অতএব হুজুরের কাছে আর্জি আর্মিদের বলেকয়ে ছেলেটাকে উদ্ধারের ব্যবস্থা করে দিন।

কিন্তু বুঝলেন, শান্তি কমিটি তো অত নাদান নয় যে বাপ-চাচারা যা বলল তাই হজম করে বসে থাকবে। সব খবরই তাদের রাখতে হয়। চেয়ারম্যান বললেন, তা তো বুঝলাম, কিন্তু পাশের জঙ্গল থেকে যে পাঁচটা রাইফেল উদ্ধার হল তার জবাবটা কি? ঠিক আছে এখন যান, এ ব্যাপারে ইনভেস্টিগেশন চলছে, তাকে এক ক্যাপ্টেন জিজ্ঞাসাবাদ করছে, গুলাম আলী না কি যেন নাম। লোকটা ভাল, ছেলেটা সহযোগিতা করলে আশা করি ভাল রিপোর্টই দেবে, তখন যাতে জেলটেল না হয় সেটা দেখা যাবে।

পরে শুনেছিলাম রাফি ছাড়া পেয়েছে। মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশ্নে তখনো আমি বিশ্বাস অবিশ্বাসের মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছিলাম, সত্যি কি তারা আছে, ভিতরে এসেছে, বিশেষকরে সীমান্তের এতটা ভিতরে! আমার আগ্রহ ক্রমেই বাড়ছিল। রিক্স সত্ত্বেও এক দুপুরে বৃষ্টির মধ্যে রিকশার পর্দা ফেলে ওদের বাড়ি গেলাম। ওর মা দরজা খুললেন, বললেন– ওতো বাড়ি নেই, চাচার সাথে থানায় রিপোর্ট করতে গেছে, মাঝে মাঝে যেতে হয়। শোনেন বাবা, আমাদের পরে পুলিশের নজর আছে, ভাল হয় আপনারা যদি আর কখনো না আসেন।

আমি ধীরে ধীরে ফিরে এলাম।

স্বাধীনতার পর আমি এক বন্ধুর কাছে শুনেছিলাম গুলাম আলী নিষ্ঠুরতা পছন্দ করতো না, সে কিশোরদের পছন্দ করতো। রাফিকে দেখে এবং তার সম্পর্কে শুনে সে নাকি বলেছিল, ইউ মিন দ্য কিড ইজ এ মিসক্রিয়ান্ট!

আরে ইয়ার ইনট্রোগেট কর, ডোন্ট টেক ইট লাইটলি, ইয়ে লাড়কা মুক্তি হ্যায়, মুক্তি।

মুক্তি! গুলাম আলী নাকি ঠা ঠা করে হেসে বলেছিল– তো ইয়ে হ্যায় তোমহারা মুক্তি! ম্যায় সামাঝ্‌তা নেহী হোয়াট হ্যাপেন্ড টু আওয়ারওয়ার্লড ফেমাস হিরোজ,দে আর সিয়িং মুক্তিস এভরী হ্যয়ার, ইভন ইন দ্যা লিটল বয়েস! আরে ইয়ার ইয়ে সব খুবসুরাত লন্ডা ক্যান ওনলি বি সেক্স পাটনার, মুক্তি ফুক্তি নেহি। সামঝা।

দিস ইজ ইয়োর পাঠ্‌ঠে নাও, ইউ ফাইন্ড আউট অ্যাকচুয়ালি হোয়াট হি ইজ। আওয়ার মেন হ্যাভ অ্যারেস্টেড হিম ফ্রম নিয়ারবাই ভিলেজ, বাট হিজ কম্পেনিয়নস হ্যাভ ফ্লেড অ্যাওয়ে। দে অলসো রিকভার্ড ফাইভ রাইফেলস ফ্রম দিবুশেস। হাউএভার ইট ইজ ট্রু দ্যাট হি ইজ টু শর্ট টু ক্যারি এ থ্রিনটথ্রি রাইফেল।

ঠিক হ্যায় দেখেগা, তোম চিন্তা মৎ করো।

সে রাফিকে বলেছিল, দেখো রাফি কিসিকো ফিজিকাল টরচার করনা মুঝে বিলকুল পছন্দ নেহি, হাম পেয়ার সে পুছতা হু, তোম ঠিক ঠিক জবাব দো।রাফি মুক্তি পেয়ে যায়, তবে তার আগে বিকৃত রুচি মাঝবয়সী ক্যাপ্টেনের রূমে তাকে গা ঘিন ঘিন করা দুটোরাত কাটাতে হয়।

পিকচার প্যালেস মোড়

কিছু কিছু মানুষ আছে কোন কারণ ছাড়াই তাদের সঙ্গ অসহ্য মনে হয়। আমি রাসেলকে পছন্দ করতাম না। অথচ তাকে এড়িয়ে চলা কঠিন। সুইটহাউজে ঢুকেছি, হয়তো সে এক কোণে বসে চায়ে চুমুক দিচ্ছে। আমি চা চাইতে যাব, অনন্ত বাবু চায়ের কাপনিয়ে হাজির, রাসেল হাসিমুখে খেতে ইশারা করছে। জানিনা কেন আমার ভেতরে অস্বস্তি শুরু হত। সে বেশী কথাও বলত না। প্রায় যে এটা ঘটতো তাও নয়। তবু মনে হত, সে যেন সবসময় আমাকে টার্গেট করে সুযোগ খুঁজছে। কিছু বলাও কঠিন। রাজনীতিতে যেমন বাধে, বিবেকেও বাধে। কোন পদে না থেকেও দলের অনেক কিছুই দেখতে হয়। কাউকে দূরে ঠেলে দিয়ে দলের ক্ষতি করার কথা কিভাবেভাবতে পারি!

১ আগস্ট দিনটি ছিল আমার জন্য গ্লুমি ডে। প্রকৃতিতে উজ্জল রোদ আর আলো বাতাসের অভাব ছিল না। তবু মনটা ভার হয়ে ছিল। আসলে আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। অফিস এবং বাড়ি– কোথাও স্বস্তি নেই, প্রতিক্ষণ মুত্যু ভয়। ভয়টা জগদ্দল পাথরের মত বুকের উপর

চেপে বসে আছে। দিনে দিনে হতাশা প্রকট হয়ে উঠছে কি জানি আমার বোধহয় স্বাধীনতা দেখা হবে না, অথচ স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করাও হল না। রোববার ছুটির দিন, অস্বস্তি চরমে উঠল। যা হয় হবে ভেবে পথে বেরিয়ে পড়লাম। বেরোবার মুখে বাবার সাথে দেখা হল প্রচণ্ড রাগের সাথে পাশের বাড়ি থেকে ছিটকে বেরিয়ে আসছেন, চিৎকার করে বলছেন– আপনারা মানুষ না জানোয়ার। বাবা সচরাচর তার বড়ভাইদের কথার প্রতিবাদ করেন না, এ ভাষায় তো নয়ই। তবু কখনো কখনো ধৈর্য বজায় রাখা কঠিন হয়। এখন সম্ভবত তেমনি কিছু ঘটেছে। চাচা মাঝে মাঝে বাবাকে আর বড়ভাই আমাকে ডেকে পাঠান। যেতে হয় এবং তাদের অমিয় বচন শোনার পর স্বাভাবিকভাবে ঘরে ফেরা কঠিন হয়। আমি সে রকম কিছু ভেবে বিষয়টাকে তেমন গুরুত্ব দিলাম না। বেরিয়ে গেলাম।

পিটিআই মোড়ে দাঁড়িয়ে ভাবছিলাম কোন দিকে যাব। একটা কৌতুহল ছিল, ভূতের বাড়ি রাজাকার ক্যাম্পের দিকে রওনা দিলাম। এক সময় এটা ছিল ভূ. মজুমদারের বাগানবাড়ি। গোরস্তানের পাশে জঙ্গলাকীর্ণ বাড়িতে পরপর কয়েকটা খুনের ঘটনা ঘটলে লোকজন বাড়িটাকে ভয় পেতে শুরু করে। বাড়িটা পরিত্যাক্ত হয়। তবে সাতচল্লিশের দেশভাগের কিছুদিন পর এখানে আনসার ক্যাম্প প্রতিষ্ঠিত হলে বেচারা ভূতেরা আশ্রয়চ্যুত হয়। এটা এখন ভয়ংকর রাজাকার ক্যাম্প। খুলনা জামাতের আমির মওলানা ইউসুফ এখানেই বাংলাদেশে প্রথম কুখ্যাত রাজাকার বাহিনীর গোড়া পত্তন করেন। তখন পথের ধারে, এখন যেখানে দ্বিতল ব্যারাক, সেখানে খোলা মাঠে ট্রেনিং হত। কিছু লোক পথের পাশে দাঁড়িয়ে রাজাকারদের কুচকাওয়াজ দেখছিল। আমি ওদের পিছনে যেয়ে দাঁড়ালাম। ট্রেনিং পর্যবেক্ষণ করছিলেন স্বয়ং মওলানা ইউসুফ ও কমার্স কলেজের বাংলার প্রফেসর হারুন অর রশীদ। তারা দুজনেই আমার পরিচিত। কমার্স কলেজে আমি হারুন স্যারের ক্লাশও করেছি। তিনি জামাতের রাজনীতিতে খুবই সক্রিয় ছিলেন। এটা সম্ভবত কোন ব্যাচের শেষ পর্যায়ের ট্রেনিং ছিল, মনে হল এরা আমাদের মুক্তিযুদ্ধকে যথেষ্ট ভোগাবে।

এখানে বেশিক্ষণ দাঁড়ানোর সাহস হল না। সে সময় আমার ঠিক কি হয়েছিল বলতে পারব না, হাঁটতে ভালই লাগছিল। আমি গগন বাবু রোড ধরে সাউথ সেন্ট্রাল রোডে যাওয়ার কথা ভেবেছিলাম, পথটা নিরাপদ ছিল। কিন্তু হাঁটতে হাঁটতে উপস্থিত হলাম ভৈরব স্ট্রান্ড রোডে ইপিআর ক্যাম্পের সামনে। ২৬ মার্চের পর এখান থেকে প্রায় অর্ধেক বাঙালি ইপিআর অস্ত্র সমেত পালিয়ে গিয়েছিল। যারা যায়নি মুক্তিযুদ্ধের নয় মাস তারা জেলখানায় অবর্ণনীয় নির্যাতন সহ্য করেছে। কেউ কেউ মারাও পড়েছে আর্মিদের হাতে। আমি দ্রুত একটা রিকশা নিয়ে সাউথ সেন্ট্রাল রোড দিয়ে পিকচার প্যালেসের মোড়ে চলে এলাম।

সেখানে তখন যথেষ্ট ভিড়। আমি এতটা ভাবিনি। আগে রোববারে হলে মর্নিং শোতে ইংরেজী বই দেখানো হতো। তখন দি ট্রেন, দি ট্রাপ, পেল হর্স, গানস আব নাভারন, ব্রিজ অন দি রিভার কিউয়াই-এর মত ভাল ভাল বই আসতো। আমি এবং আবু ছিলাম নিয়মিত দর্শক। হল মালিক বিহারী। এখন দর্শক না হলেও হল খোলা রাখেন, বইও চলতে থাকে। মোড়ের স্টেশনারি দোকানগুলো খোলা, সবই উর্দুভাষীদের, তবে ক্রেতারা বাঙালি। ভীড়ের মধ্যে মানুষ যে অনেক নিরাপত্তা বোধ করে সেটা নিজের অনুভূতি থেকেই বুঝলাম। আমি দীর্ঘপথ এসেছি টানটান উত্তেজনা নিয়ে, এখানে ভিড়ের মধ্যে সেটা কখন জানি বেমালুম উবে গেছে। বেলা বাড়ছে, বাড়িতে সবাই উৎকণ্ঠায় থাকবে, জনপ্রিয় ইত্তেফাক কাগজ বন্ধ করে দিয়েছিল আর্মিরা, একটা আজাদ কাগজ কিনে বাড়ির উদ্দেশ্যে ধর্মসভার রাস্তায় টার্ন নিলাম।

সহসাই কর্ণারের স্টেশনারি দোকানের পাশে সুটেড বুটেড অবস্থায় রাসেলকে দেখে বিস্মিত হলাম। সে ছাত্র সংগঠনে তেমন সক্রিয় ছিল না বটে, কিন্তু ছাত্রলীগ থেকে কলেজ ছাত্র সংসদের নির্বাচিত সদস্য ছিল। সুদর্শন এবং জামা কাপড় দেখে অনুমান করা কঠিন ছিল না যে সে স্বচ্ছল পরিবারের ছেলে। কিন্তু এই সংকট কালে তাকে হঠাৎ এখানে দেখা যাবে ভাবিনি। রাজনীতি-ছাত্ররাজনীতির লোকজন তো বটেই, তার বয়সী সাধারণ ছেলেরাও পর্যন্ত কেউ এখন স্বস্তিতে নেই। অথচ দেখা যাচ্ছে সে বেশ ভালই আছে। আমি সরে যেতে চেষ্টা করলাম, কিন্তু সে দ্রুত পাশে চলে এলো–কেমন আছেন ভাই?

– ভাল, তুমি?

– আমি তো ভালই আছি। কিন্তু আপনি কোথায় আছেন- এখানে না অন্য কোথাও?

– না, এখানেই আছি।

– সে অবাক হয়ে বলল- চাকরিও করছেন?

– হ্যা।

– খালিশপুরে! অসুবিধা হয় না?

– হয় তো অবশ্যই। তবে মিলের গাড়িতে যাতায়াত করি, কিছুটা প্রটেকশন পাওয়া যায়।

– আপনার কাছে কিন্তু আমরা এক সময় অন্য কথা শুনতাম ভাই, সামনে কঠিন দিন, যুদ্ধ, স্বাধীনতা– কত কিছু। আর এখন আপনাকে এ অবস্থায় দেখে সত্যি অবাক লাগছে! আমাদের ধারণা ছিল আপনি কোথাও না কোথাও মুক্তিযুদ্ধে আছেন।

আমি বলতে যাচ্ছিলাম– যুদ্ধে তো কত ধরনের আয়োজন লাগে, কত ভাবেই তো যুদ্ধ হয়, আমি হয়তো–। হঠাৎ ভিতরে সতর্ক ঘন্টা বেজে উঠল। ছেলেটা আসলে আলোচনা কোন দিকে নিয়ে যেতে চাইছে, কেনই বা নিচ্ছে!

বললাম– কোথায় কি? মুক্তিযুদ্ধের কথা শুনি বটে, তবে ধাপ্পা বলেই মনে হয়। সবাই জানে এটা শ্রেফ আকাশবাণী, জয় বাংলা আর বিবিসির প্রপাগান্ডা। শোনা যায় এখানে ওখানে যুদ্ধ হচ্ছে। কেউ দেখেছে?

রাসেল কঠিন ভাবে বলল– আপনি হয়তো সেভাবে জানেন, কিন্তু সবাইকে সেদিকে টানবেন না। সে সজোরে আমার কনুই চেপে ধরে ধর্মসভার রাস্তায় ঠেলে নিয়ে চলল। মোড়ের মাথায় এসে এদিক ওদিক তাকিয়ে বোতাম খুলে কোটটা ফাঁক করে দেখালো। আমি শিউরে উঠলাম কোটের ভিতর ভাজ করা অস্ত্র, ভয়ংকর কালো, ভয় ধরানো। আমি ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকলাম।

রাসেল বলল– এটা রীতিবিরুদ্ধ। তবু আপনাকে দেখালে হল এজন্যই যে আপনার কাছ থেকে এ ধরনের কথা শুনব কখনো চিন্তায়ও আসেনি। জানিনা আপনি কি? তবে যেই হোন জেনে রাখুন বাংলাদেশ স্বাধীন হবেই, আমরা সবখানেই আছি। শুনুন, এবার মাথা নিচু করে সোজা চলে যান। মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে আপনি এখন কি ধারনা পোষণ করেন সেটা আপনি এবং আপনার আল্লা জানেন। তবে কোন রকম হৈচে করে আমাকে বিপদে ফেলার চেষ্টা করবেন না, ঝাঁঝরা হয়ে যাবেন। সে ধর্মসভা ক্রস রোডের দিকে টার্ন নিয়ে দ্রুত অদৃশ্য হয়ে গেল।

আমি এই প্রথম একজন মুক্তিযোদ্ধা দেখার আনন্দে পরম মমতায় তাকে স্পর্শ করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু নিজেকে সামলে নিলাম, বাড়ানো হাতটাকে মনে হল নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর– একজন মুক্তিযোদ্ধাকে স্পর্শ করার মত নয়।

বাবা চলে গেলেন

আমি প্রফুল্ল মনে বাড়ির দিকে রওনা দিলাম। যে গ্লুমি ভাব নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে ছিলাম সেটা এখন নেই। মির্যাপুর ও মৌলবীপাড়ার ভিতর দিয়ে ফিরছিলাম। পথটা সংক্ষিপ্ত, নিরাপদও বটে। টিবি বাউন্ডারি রোডের শেষ মাথা থেকে পূবে টার্ন নিলেই মিয়াপাড়া, ডান হাতে দ্বিতীয় বাড়িটাই আমাদের। বাবার হাতে লাগানো গাছপালার ফাঁক ফোঁকর দিয়ে বাড়িটার দিকে চোখ পড়তেই চমকে উঠলাম। বাইরের বারান্দায় দরজা এবং জানালার ধারে মহিলা শিশু কিশোরদের ভীড়। এ সময় এধরনের ভীড় অশুভ কোন বর্তাই কেবল বহন করত। দ্রত পা চালিয়ে বাড়ির আঙ্গিনায় পা রাখতেই একজন প্রতিবেশি ভারাক্রান্ত স্বরে বললেন কোথায় ছিলে এতক্ষণ। তোমার আব্বার অবস্থাতো খুবই খারাপ, ডাক্তার দেখছেন।

দ্রুত ঘরে গেলাম, ভেতরে কান্নার রোল, বাবা তক্তপোশের উপর নিশ্চল শুয়ে আছেন। ডাক্তার তার বুকে কোরামিন ইনজেকশন দিয়ে টর্চের আলোয় চোখের তারা পরীক্ষা করছেন। আমি বাবার মুখ থেকে যেন একটা বুকচেরা শ্বাসের শব্দ শুনতে পেলাম। ডাক্তার সাহেব বাবার চোখের পাতা বন্ধ করে দিয়ে ব্যাগ গুছিয়ে দ্রুত উঠে দাঁড়ালেন। দোলাভাইকে অতি মৃদু স্বরে বলা তার 'নেই' শব্দটা আমাকে কাঁপিয়ে দিয়ে গেল।

যমদূতের মত নসরুল্লা অফিসের দোরগোড়ায় এসে দাঁড়াল

আগস্টের একদিন আমার মাথায় যেন বাজ ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হল। সর্বত্র গুঞ্জন আমাদের বিভাগীয় প্রধান সিরাজুল ইসলাম খান পদত্যাগ করেছেন। জুট অফিসারের পর তিনি হচ্ছেন দ্বিতীয় বাঙালি যিনি পাকিস্তানি খড়গের মুখে পড়লেন। তার অপরাধ গুরুতর। বাঙালি জুট অফিসারকে সরিয়ে ম্যানেজমেন্ট নিজেদের লোক হাদী রিজীভকে মিলের জুট অফিসার পদে বসিয়েছিল। এই করিৎকর্মা ভদ্রলোক মাত্র তিন-চার মাসেরই সাত লক্ষ টাকা মূল্যের বিশ হাজার মন পাট ঘাটতি করে বসেন। সে আমলে সাত লক্ষ টাকা অনেক টাকা। ম্যানিপুলেশনের ঘটনাটি উদ্ঘাটন করে ম্যানেজমেন্টের রোষানলে পড়েন এস আই খান। হাদী রিজভীকে অবশ্য আগেই যেতে হয়েছিল। তবে তার ঝোলায় তখন বিপুল বিত্ত বৈভব।

হিসাব বিভাগের দ্বিতীয় ব্যক্তি কিউ জি আকবরকে দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়ে স্যার যখন এককাপ চা নিয়ে চেয়ারে হেলান দিয়েছেন, বিমর্ষ চিত্তে স্যারের রুমে ঢুকলাম। স্যার বললেন– আমি তোমার মনের অবস্থা জানি, তবে চিন্তা কোরোনা খয়রাতি সাহেবের সাথে কথা বলে এসেছি। তিনি কথা দিয়েছেন। তবুও সাবধানে থাকবে। আর নসরুল্লার খবর খয়রাতি সাহেব নিজেও জানেন না। মারা গেছে বোধহয়।

তবে সব গুজব মিথ্যা প্রতিপন্ন করে আগস্টের শেষ দিকে নসরুল্লা ফিরে এল। মাথায় কদম ছাট ছোট ছোট চুল। তার উপর লিয়াকত আলী মার্কা কালো ভেলভেটের শক্ত টুপি। চোখ রক্ত বর্ণ। তিনজন সঙ্গীসহ আমাদের রুমে ঢোকার মুখে প্রশ্বস্থ দরজার দুপাশে দুহাত রেখে থমকে দাড়াল।

একটা অস্বস্তিকর নিরাবতা নেমে এল হিসাব বিভাগের পাশাপাশি দুটো রুম জুড়ে। একমাত্র যিনি নসরুল্লাকে নিয়ন্ত্রন করতে পারতেন তিনি হিসাব বিভাগের প্রাক্তন ইনচার্জ এস আই খান।তিনি নেই, ভারপ্রাপ্ত হিসাবরক্ষক আকবর সাহেব তার চেয়ারে। নসরুল্লা তার সঙ্গীদের দরজায় রেখে ইউনুস সাহেবের টেবিলের সামনে সশব্দে চেয়ার টেনে বসে পড়ল,আমার দিকে ফিরেও তাকালো না। বলল– ইউনুস সাহেব,আপকা তো জরুর ইয়াদ হ্যায় উস দিন কিয়া হুয়া থা। আগার হাম ফির কুচ বাতাতা তো ইয়ে গাদ্দার নে জরুর হামকো ভোজালী মারকে খতম কর দেতা। দেতাকি নেহি, আপ বলিয়ে ইউনুস সাব? তো ইয়ে শালে ভি নোকরিমে জয়েন কিয়া! মালুম হোতাস্টার জুট মিলমে অভিতক গাদ্দার মুজিবকে হুকুমত চল রাহা হ্যায়।

ইউনুস সাহেব নিরবে মাথা ঝুকিয়ে বসে থাকেন।আমি আগেই জীবন সম্পর্কে আশা হারিয়ে ফেলেছিলাম, মাথা ঝুকিয়ে চুপচাপ বসে ছিলাম। শুধু ম্লানকণ্ঠে বললাম– হাম কাভি ভেজালী ছুয়া ভি নেহি, হ্যাম ক্যায়সে কোই আদমীকো....।

–চোপ সালে! তুঝে কোন পুছা? তু আভি উপরওয়ালে কো ডাক।

তার সঙ্গীরা আমার দিকে ধেয়ে এলো। তবে সে তাদের নিবৃত করল– আভি নেহি, জলদি জলদি ওয়াপাস আউঙ্গা, তব দেখা যায়েগা। সে দলবলসহ বেরিয়ে গেল।

ইউনুস সাহেব বললেন– মনোয়ার সাহেব, দেরি না করে এখুনি পালিয়ে যান। ওরা ফিরে আসার আগেই যেভাবে হোক পালান।

আমাদের ঠিক পাশেই আকবর সাহেবের চেম্বার। তিনি দুহাতে মাথা চেপে বসেছিলেন। স্খলিত পায়ে তার রুমে ঢুকতেইবললেন– আমরা কিছুই করতে পারবো না মনোয়ার সাহেব,আমাদের কি ক্ষমতা বলেন। আপনি বরং ইউনুস সাহেব যা বলল তাই করেন, জলদি পালিয়ে যান। পশ্চিমের গেট দিয়ে সেনহাটি যান, এদিকে গেলে বাঁচবেন না।

বললাম– কোনো দিকে যাবার উপায় আছে স্যার? বিহারীরা সব জায়গায় আছে। এমনও হতে পারে যাওয়ার সময় নসরুল্লা গেটে পাহারা বসিয়ে গেছে। অথে পাথারে আমি তখন খড়কুটো হাতড়ে বেড়াচ্ছি। বেলায়েত সাহেবের খোঁজেপাশের রুমে গেলাম। তিনি মিল শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান।

মহিউদ্দিন বললেন– নসরুল্লা দলবল নিয়ে ঢোকার সাথে সাথেই তিনি বেরিয়ে গেছেন। দায় এড়ালেন বোধ হয়। শান্তিকমিটির চেয়ারম্যান, কিন্তু বাঙালি তো, তার ক্ষমতার দৌড় আর কত হবে!

এবার আমার নিজের পালা। সুস্থির হয়ে চেয়ারে ফিরে এলাম। আমি এখন জানি আমাকে কি করতে হবে। হাশেম বামপন্থী লোক, কেউ কেউ বলত নকশাল। চৌষট্টির রায়টে পশ্চিমবঙ্গ থেকে পালিয়ে এসেছে। বলল– স্যার পালাবার কথা ভাবছেন? কিন্তু পালাবেনকিভাবে? নসরুল্লাকে তো চেনেন, সব গেটেই নিশ্চয়ই লোক বসিয়ে গেছে। ধরে নেন মারা যাচ্ছেন। এখন ভেবে দেখেন কিভাবে মরবেন- বীরের মত, না বাঙালির মত? ওদের চাপাতির তলায় ঘাড় পেতে দেবেন, না লড়াই করে মরবেন?

মরলে বীর বাঙালির মতই মরব, নসরুল্লাকে নিয়ে মরব! অস্ত্রতো নেই, ওর গলার নলি কামড়ে ছিড়ে নেব, নিশ্চিত থাকুন।

কেন স্যার, অস্ত্রতো আছে। আগে একবার বিহারীরা ঝামেলা করতে চেয়েছিল না। তারপর আমরা কয়েকটা লোহার পাত আর তাতের স্পিন্ডেল রেকর্ড রুমে সেরে রেখেছি।ওগুলো আছে। আপনি যদি লড়েন, আপনার পাশে দাড়িয়ে আমিও লড়ব। খানিকটা অবিশ্বাস নিয়ে আমি হাসেম সাহেবের মুখের দিকে তাকালাম। সাথে সাথে মহিউদ্দিনওবলে উঠল মনোয়ার সাহেব আমিও লড়ছি, এখন মৃত্যুই আমাদের নিয়তি, তবে লড়ে মরতে চাই। কেন জানি ভীষণ কান্না পেল। কে তারা! আত্মীয় নয়, সবার রাজনৈতিক দর্শনও এক নয়, কয়েক বছর একসাথে চাকরি করেছি মাত্র। তবে এক জায়গায় দারুণ মিল আমাদের– আমরা বাঙালি এবং চাপিয়ে দেয়া এক নির্দয়যুদ্ধের মধ্যে আছি। আমাদের চেয়ারের পেছনে ছোট ছোট স্টিল র‍্যাক। মনসুর এবং লুৎফর র‍্যাকের পিছনে লোহার পাত এবং স্পিন্ডলগুলো রেখে গেল, দেখা গেল মাত্র তিন জন নয়, আরো কয়েকজন স্টাফ তাদের হাতের কাছে র‍্যাকের আড়ালে লোহার পাত অথবা রড রেখে দিল।

নসরুল্লারা এলো আধা ঘন্টা পর। দরজার মুখে সঙ্গীদের রেখে সে একই এগিয়ে এলো। আমি প্লেনের বাম্পিংয়ের অস্বস্তিকর অনুভূতির সাথে পরিচিত ছিলাম। এখন তীব্রভাবে সেটা অনুভব করতে থাকলাম। শুধু তল পেটে নয়, মুখ থেকে গলা বুক পর্যন্ত শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল, ভিষণ তেষ্টা পেল, কিন্তু মুখ থেকে কথা সরল না। আমি করুণভাবে বীরের মত লড়ে মারার উদ্দ্যোগ নিতে ব্যর্থ হলাম। জানি আর কয়েক সেকেন্ড দেরী করলে র‍্যাকের পেছন থেকে লোহার পাতটা হাতে নিতে পারবো না। অথচ ওর একটা মোক্ষম বাড়ি নসরুল্লাকে শেষ করে দেয়ার জন্য যথেষ্ট ছিল। আমি সময়ের হিসাব ভুলে গেলাম। নসরুল্লাহ পাশে এসে দাঁড়িয়ে গেল। অথচ আমিভেতো বাঙালির মত অসহায় মৃত্যু বরণের অপেক্ষায় চেয়ার নিশ্চল বসে রইলাম। এক আপার্থিব শূন্যতা আমাকে গ্রাস করল, জগত সংসার সব দৃষ্টির স্থান থেকে মুছে ধূসর হয়ে গেল। কেউ যখন নিজের তাৎক্ষণিক মৃত্যু সম্পর্কেনিশ্চিত হয়ে যায় এবং তার কিছু করার থাকেনা তখন বোধহয় এমন অবস্থাই হয়।

নসরুল্লা এখুনি হয়তোআমার পৃষ্ঠদেশে ভোজালির তীক্ষ্ণ ফলা বসিয়ে দেবে অথবা আমার কলার ধরে হিড় হিড় করে টানতে টানতে নদীর ধারে নিতে যাবে। জানিনা কি তার ইচ্ছা। গোটা অফিস স্তব্ধ।ইউনুস সাহেব এবং পাশের টেবিলের কলিগরামাথা ঝুঁকয়ে বসে আছে। সবাই হঠাৎ ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠার শব্দে চমকে আমার দিকে ফিরে তাকালো।

না আমি না, নসরুল্লা কাঁনছে!কান্নাজড়িত কণ্ঠে সে বলল– ইউনুস সাব, কেয়া দেখা ম্যায়নে! সৈয়দপুর মে যো হুয়া উও হাম ক্যায়ছে ভুল সাকতা, ক্যায়সে আপকো বাতাউ? হোনেওয়ালী মা রাস্তা কি উপার মরে পড়ে হুয়া হ্যায়। কেতনি খুবসুরাত বেচারি! জয় বাংলাওয়ালা কোই গুন্ডা ভোজালিছে উসকা পেট ফাড় দিয়া। বাচ্চে ভি মাকো দো হাতকি বিচমে মরে পড়ে হুয়া হ্যায়। কেতনা লাশ দেখা ম্যায়নে। মাসুম লেড়কিকো ক্যায়ছে ব্রুটালি রেপ কিয়া, খুন কিয়া আউর রাস্তাকি উপার ফেঁক দিয়া। কিউ এতনা জুলুম-সিতম দেখা ম্যায়নে!পহেলে কিউ আন্ধা নেহি হো গয়া?ইসি লিয়ে দিমাক ঠিক নেহি থা ইউনুস সাব, যো কুছ বোলা মাফ কর দিজিয়ে। মনোয়ার সাব আপভি ভুল যাইয়ে আউর সহি সালামত রাহিয়েসবলোগ।

সে সঙ্গের লোকজন নিয়ে বেরিয়ে গেল। অফিস কতক্ষণ নিস্পন্দ ছিল জানিনা, সবার মাথা গুলো তখনো বুকের উপর ঝুকে আছে। মহিউদ্দিন উঠে এসে আমার হাতে টেনে নিয়ে তার বুকের উপর চেপে ধরল, সেখানে যেন হাতুড়ি পিটছে, বলল– আমরা ভেতো বাঙালি বস! সাহস পাইনি। সে ধপ করে পাশের চেয়ারে বসে পড়ল।

বললাম সাহস যে হয়নি সেজন্যই বোধহয় বেঁচে গেলাম। ঘটনার আকস্মিকতায় সবাই অবাক, বিস্মিত। আমার মন ছেয়ে গেল গভীর কৃতজ্ঞতায়– খয়রাতি সাহেব কথা রেখেছেন।

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার দু দিন পর মিলে যাওয়ার সুযোগ পেলাম। খয়রাতি সাহেবের কাথা জিজ্ঞাসা করলাম এক সহকর্মীকে। তার জবাব অপ্রত্যাশিত ছিলনা– পালানোর কোন সুযোগই পাননি খয়রাতি সাহেব, আগে থেকেই নজরদারীতে ছিলেন। তার আশা ছিল আর্মি অথবা নেভি তাকে উদ্ধার করে নিয়ে যাবে। করেনি। বুক ও পিঠ ব্লেড দিয়ে ফালা ফালা করে চিরে লবন দিয়ে তাকে মেরে ফেলা হয়।

শিউরে উঠলাম!

মনোয়ার সাহেব, সে আপনাকে বাঁচিয়েছে। হয়তো আরো দুচার জনকে বাঁচিয়েছে। কিন্তু অনেক মৃত্যুর জন্য সে দায়ী। তার লোকেরা এভাবে পিঠ চিরে লবন দিয়েবাঙালিদের মেরেছে। তারা আকুল হয়ে বলেছিল গুলি করে মেরে ফেলতে। শোনেনি। আপনি না হয় তাকে ছাড়তে চাইলেন, কিন্তু তারা কি চাইবে, না সেটা উচিত?

বেশ কিছুদিন আগে দেখা একটা দৃশ্য আমি ভুলতে চেয়েছিলাম, দু নম্বর মিল থেকে একজন শ্রমিককে ধাক্কাতে ধাক্কাতে নিয়ে যাচ্ছিল বিহারী জল্লাদরা। লোকটার ঠেটের কোনে রক্ত-কস, চোখেমুখে বাঁচার আকুতি! কখনো হাত জোড় করছিল, কখনো পা জড়িয়ে ধরতে চেষ্টা করছিল। পাশে দারোয়ানকে দেখেকরুণ দৃষ্টিতে কিছু বলতে চেয়েছিল হয়ত। কিন্তু দারোয়ান মাথা নিচু করে ফেলল,পরমুহূর্তে হঠাৎ অ্যাটেনশান হয়ে স্যালুট ঠুকল। আমি দ্রুত চোখ সরিয়ে নিলাম, পেছনে সিকিউরিটি অফিসার,সাথে বডিগার্ড।

ফারুক ড্রাইভার

খালিশপুর স্যাটেলাইট টাউনের উত্তরাংশ বাঙালি অধ্যুষিত ছিল। উর্দুভাষী বাঙালিও (ক্যালকেশিয়ান) যথেষ্ট ছিল। স্যাটেলাইট টাউনের বিহারী অধ্যুষিত দক্ষিণাঞ্চল নোংরা বস্তিতে পরিণত হয়েছিল। বাঙালিরা পারতপক্ষে এই এলাকায় প্রবেশ করত না। একটি তারকাঁটা ঘেরা অয়ারলেস টাওয়ার, লেক এবং স্যাটালাইট টাউন কর্তৃপক্ষের অফিস ও স্টকইয়ার্ড এলাকা দুটিকে বিভক্ত করে রেখেছিল। এর পাশ দিয়ে ছিল পাকা সড়ক যা বিহারী এলাকার মধ্যে অবস্থিত ছিল। আগে অফিসে যাওয়া আসার জন্য আমরা প্রায়ই এই পথটি ব্যবহার করতাম।

আমরা বলতাম কোহিনূর সড়ক। কোহিনূর ছিল এই রাস্তার পাশে বড় একটা রেস্টুরেন্ট, যার বেশ নামডাক ছিল। ভারি যানবাহন চলাচলের কারণে ইপিআইডিসি রোড ভেঙ্গেচুরে যাওয়ায় ছোট ছোট গাড়ি, বেবিট্যাক্সি, রিকশা এই পথটা পছন্দ করত। তবে '৭১-এর ২৬ মার্চ থেকে পথটা তো বটেই, গোটা খালিশপুর শহর বাঙালিদের জন্য প্রবেশ-নিষিদ্ধ এলাকায় পরিণত হয়। এটা হয়ে ওঠে মৃত্যুকূপ বিশেষ। অবস্থা এমন দাঁড়িয়ে ছিল যে এখানে কেউ একবার ঢুকে পড়লে তার আর বেরোনো হত না। স্বাধীনতার পর ওভারহেড পানির ট্যাংকের পিছনের জলা জায়গায় উন্মুক্তভাবে পড়ে থাকা অজস্র কংকাল, গলিত-অর্ধগলিত এমনকি প্রায় তাজা লাশ মানুষকে কান্নায় ভাসিয়েছিল।

অফিসে যাওয়ার জন্য আমরা আবার ভাঙাচোরা সনাতন ইপিআইডিসি রোড বেছে নিয়েছিলাম। জুলাইয়ের এক শনিবার দুপুরে বাড়ি ফেরার সময় ফারুক ড্রাইভার হঠাৎ ইপিআইডিসি রোড ছেড়ে ডানদিকে খালিশপুরের ভেতর পুরানো পথ অভিমুখে গাড়ি ঘুরিয়ে দিল। ফারুক বিহারী, কিন্তু বাঙালিদের প্রতি খুবই সহানুভূতিশীল ছিল। আমরা তার উপর অগাধ আস্থা রাখতাম। সবাই বোবা হয়ে গেল এবং ইউনুস সাহেব কেবল একটিমাত্র শব্দ উচ্চারণ করতে সমর্থ হলেন– 'ফারুক!'

ফারুক বলল–'মাফ কিজিয়ে স্যার, হায়াত-মউতকা মালিক আল্লা। ম্যায় একরার করতা হু, আগার ম্যায় জিন্দা রহে তো আপ ভি জিন্দা রহেগা। হাম শ্রেফ আপকো এক আজিব কারবার দেখানে কি লিয়ে ইধার লায়া হু। আভি দেখিয়ে।'

আমরা অয়ারলেস টাওয়ারের কাছাকাছি এসে গিয়েছিলাম। সে গাড়ির গতি কিছুটা শ্লথ করল। টাওয়ারের পাশে বড় বড় কয়েকটা গাছের নিচে অনেকটা জায়গা পরিস্কার করা হয়েছে। সেখানে বিভিন্ন গ্রুপে কুচকাওয়াজ ও রাইফেল ট্রেনিং চলছে। শিশু-কিশোর থেকে বৃদ্ধরা পর্যন্ত ট্রেনিংয়ে সামিল। ছোটদের হাতে তক্তাকাটা ডামি রাইফেল, বড়রা আসল থ্রিনটথ্রি রাইফেল নিয়ে ট্রেনিং নিচ্ছে। রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে বাচ্চা কোলে কিছু বয়স্ক মহিলা ও ছোট ছোট ছেলে মেয়ে তাদের নিকটজনদের উৎসাহ দিচ্ছে। বাচ্চারা উৎফুল্ল, খেলা হিসাবে নিয়েছে এটাকে। কিন্তু যুবকদের চোখেমুখে হিংস্র উন্মাদনা। বৃদ্ধদেরকে বোঝা কঠিন, তারা নিশ্চুপ, অনেকেই সম্ভবত বিষন্ন, চিন্তাক্লিষ্ট। ট্রেনার রিটায়ার্ড আর্মি বা ইপিআর-এর কেউ হবে। তাদের অতিক্রম করে যেতেই ফারুক ফুলস্পিডে গাড়ি ছুটিয়ে খালিশপুর থেকে বেরিয়ে এল। আমরা সবাই রুদ্ধশ্বাস ছেড়ে স্বাভাবিক হলাম।

ফারুক এতক্ষণে মুখ খুলল–'ট্রেনিং শেষে লেকচার হবে স্যার। ঐ হারামজাদা কি বলে জানেন, বলে, আগার বাঁচনে চাহো তো হাতিয়ার উঠা লো। দেখিয়ে স্যার, ক্যায়সে নাদান হ্যায় ইন লোগ। ইয়ে মাসুম বাচ্চা আউর বুঢ়ঢানে হাতিয়ার লে কর হামলোগকো বাঁচায়ে গা! কিয়া কহু স্যার, হামারা লিডার হ্যায় মতিউল্লা- গুন্ডা, শ্রিফগুন্ডা হ্যায় স্যার। তো ইস্‌ছে আলগ আউর কেয়া হোগা!'

ফারুক লেখা পড়া কমই জানে। কিন্তু নির্বোধ নয়, যথেষ্ট বুদ্ধিমান ও বিবেকবান মানুষ। বিহারীদের নেতৃত্ব তার মত মানুষের হাতে পড়লে তারা হয়ত যুক্তিসংগতভাবে পক্ষ বেছে নিতে পারত। নিরপেক্ষ থাকলেও বহু বিপত্তি এড়াতে পারত তারা। কিন্তু তা হয়নি, তাদের নেতৃত্ব ছিল ব্লান্ট ও গুণ্ডাধরনের লোকদের হাতে। এরা সহজেই সামান্য পয়সার জন্য এবং ইসলাম ও পাকিস্তানের সংহতির নামে কর্নেল শামস, সবুর খান ও মওলানা ইউসুফের মত নেতা এবং খুলনা ও খালিশপুরের অবাঙ্গালী শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের দ্বারা ব্যবহৃত হয়েছে। ফারুক বলল, 'স্যার সকুর খান (বিহারীদের কাছে সবুর খান এ নামেই পরিচিত ছিল), মওলানা ইউসুফ, মতিউল্লা, ওয়ার্শী, আগাখানি, আর্মিলোগ সব তো জরুর পাকিস্তানমে চলা জায়েগা। মাগার হামারা কেয়া হোগা? হাম কাঁহা জায়েগা, ক্যায়সে জাউঙ্গা? মেরা মাসুম বাচ্চা, মেরা বিবি, মেরা বহিন, হাম সব তো এহি রহেগা। আউর কেয়া করু, কাফ্‌ফারা দেগা! আপলোগ বদলা লেগা, হামকো মার ডালেগা, মেরে বিবি আউর লেড়কিকো উঠা লে যায়েগা, মেরে মাকান মাল সামান সব লুট হো যায়েগা। এহি তো হামারা নসিব হ্যায় স্যার!'–তার কণ্ঠ থেকে গভীর হতাশা ঝরতে থাকে!

আমাদের স্বপ্নের বাংলাদেশ এ ধরনের ঘটনা ঘটবে, তাতে আমার মন মোটেও সায় দিচ্ছিল না। কিন্তু ঐ মুহূর্তে ফারুককে আশার বাণী শোনানোর মত কিছুই খুঁজে পেলাম না। আমি নিরব ছিলাম। ভাবনা আমাকে পেয়ে বসল, যারা ইতোমধ্যে বিহারীদের হাতে নিষ্ঠুরভাবে নিহত, নিগৃহীত হয়েছে, সর্বস্ব হারিয়েছে তাদের লোকেরা কি এমনিতে ছেড়ে দেবে? সুযোগ পেলে তারা কি বিহারী এলাকায় নরক বানিয়ে ছাড়বে না? ইতিহাস স্বাক্ষী, ফারুকের মত বোধবুদ্ধি সম্পন্ন বিহারী বাংলাদেশে কম ছিল এবং তার দূরদৃষ্টি মোটেও ভুল ছিল না।

ফয়জুল হক

ফজজুল হক সরকারি চাকরি থেকে রিটায়ার করেছেন কয়েক বছর হল। পশ্চিম বাংলার উদ্বাস্তু। সেই সুবাদেবাঙালিদের জন্য নির্ধারিত উত্তর খালিশপুরে দু কামরার ঘুপচি ঘর স্বল্পমূল্যে বরাদ্দ পেয়েছেন। বাঙালি হলেও উর্দু জানেন মাতৃভাষার মতই। এই এলাকায় কিছু ভদ্র এবং শিক্ষিত অবাঙালি পরিবারও বসবাস করে। তাদের সাথে ফয়জুল হকের ভাল সম্পর্ক। সেই ভরসায় ২৬ মার্চের পরও বাড়িতে থেকে গিয়েছিলেন। ভেবেছিলেন থাকেই যাবেন এবং বেশ নিশ্চন্তে ছিলেন যে বিহারীরা তাদের ক্ষতি করবে না।

কিন্তুবৌ ছেলে-মেয়েদের চাপে চেঁচামেচিতে এপ্রিলের প্রথম দিকে খালিশপুর ছেড়েছেন। তিনি একরোখা মানুষ, স্ত্রীর কথায় কান দেননি।কিন্তু তার চাকরিজীবী পুত্র তাকে স্মরণ করিয়ে দেন যে, তিনি রাজনীতি করেন না ঠিকই কিন্তু অসহযোগ আন্দোলনের সময় গোলচত্তরে দাঁড়িয়েতিনি সবিস্তারে লোকজনকে বুঝিয়েছেন যে, হাজার মাইল ব্যবধানের দুটো এলাকা নিয়ে এক দেশ হয় না, লাহোর প্রস্তাবেও ছিল দুটো দেশ। এরপরও ওরা আপনাকে ছাড়বে ভাবছেন ?

চিন্তার বিষয় বটে। ফজজুল হক অশ্রুজলে বাড়ি ছাড়লেন। সাতচল্লিশের পর একবার তো সবই ছেড়ে এসেছেন। এ আবার কি গেরোর মধ্যে পড়লেন। তার সবসময় চিন্তা তাদের কিবা আছে, কিন্তু যেটুকু আছেতাও যদি আবার যায়, বাঁচবেন কিভাবে!

তারা ভৈরবের ওপারে সেনহাটিতে এক আত্মীয়ের বাসায় আশ্রয় নিলেন। এপারে থাকলেও সব সময় তার মন পড়ে থাকে বাড়ির দিকে।এক বিকালে সেনহাটির এক চায়ের দোকানে দেখা হয় তার প্রতিবেশী বন্ধু আসাদুল্লা সাহেবের সাথে। দুজনেরই বাড়ি খালিশপুরে প্রায় কাছাকাছি। পর পর কয়েকদিন এভাবে দেখা হয়, নানা কথা হয় তাদের মধ্যে। একদিন দেখা গেল তারা দুজনেই বেশ উদ্বিগ্ন। কানাঘুষায় তারা শুনেছেন, সৈয়দপুর রংপুর থেকে ট্রেন বোঝাই হয়ে দলে দলে বিহারীরা আসছে খালিশপুরে, বাঙালিদের বাড়িগুলো একের পর এক দখল করে নিচ্ছে।

পরের শুক্রবারে দুপুরে জুম্মার নামাজের জন্য বেরিয়ে গেলেন ফজজুল হক সাহেব। এরপর পর তাকে আর কেউ দেখেনি। কিছু দূরে এক বাড়িতে আসাদুল্লা সাহেবরা থাকতেন। সেখানে খোঁজ নিয়ে দেখা গেল সে বাড়িতেও একই অবস্থা, জুম্মার নামাজে যেয়ে আসাদুল্লা সাহেবও ফেরেন নি। চায়ের দোকানীই শুধু সামান্য ক্লু দিতে পেরেছিল– ওরকম দুজন প্রৌঢ় লোক আগের দিন বিকালে তার দেকানে বসে চা খেয়েছেন, খালিশপুরে বাড়ির কথা কি যেন আলোচনা করছিলেন, তিনি খেয়াল করে শোনেন নি। টাবুরে ঘাটে খোঁজ নিয়ে কোনো তথ্য মিলল না। তারা বলল এখন তো মাঝ বয়সী লোকেরাই বেশি পারাপার করে, কি করে বোঝব আপনারা কোন দুজনরে খোঁজেন।

দু বাড়িতে নির্ঘুম রাত পার হয়, আশায় আশায় থাকে সবাই, রাতের সামান্যতম শব্দে চমকেওঠে। কিন্তু বয়স্ক মানুষ দুটো ফেরে না। বেলা কিছুটা বাড়লেআজিজুল হক এবং শহিদুল আল্লা ভরসা করে টাবুরে নৌকায় চেপে বসে। খালিশপুরে বাড়ির কাছাকাছি পৌঁছে তারা চমকে ওঠে। পাশের বাড়ির দেয়ালের ওপর অতঙ্কিত একটা মুখ, ফ্যাল ফ্যাল করে তাদের দিকে তাকিয়ে আছে– সাম্মি চাচা। তিনি হিস হিস করে উঠলেন– তোম? নালাইক কাঁহিকা!

আজিজুল হককাঁদো কাঁদো স্বরে বলল– চাচা আমরা এসেছি আব্বার খোঁজে।তারাগতকাল জুম্মার নামাজ পড়তে বেরিয়ে আর বাড়িতে ফেরেননি। কোথাওতাদের পাওয়া যাচ্ছেনা।

হা, মুঝে মালুম হ্যায়। চুপচাপ উও ঝোপড়িকা পিছে খাড়ে রহ,হাম আতা হ্যায়। তিনি দ্রুত ঘরের ভিতর অদৃশ্য হন, গেঞ্জির উপর আধা মালিন পাঞ্জাবি গলিয়ে মাথায় টুপি চাপিয়ে দ্রুত বেরিয়ে আসেন, চাপা রাগের সাথে বলেন–তোমহারা দেমাক খারাপ হো গিয়া কেয়া? কিউ আয়া ইধার? তোম কুচ সামাঝ্‌তা নেহী! তিনি দুজনকে দুপাশে একরূপ বগলদাবা করে দ্রুত ফিরতি পথ ধরেন।

অদূরে পুকুর ঘাট। ভাঙ্গা ঘাটে বসে আছে কয়েকজন টাফ লোক। নিচেশানের উপরঅস্ত্র ধার দেয়ার শব্দ- কেউ একজন তার অস্ত্র শানিত করছে।অকস্মাৎ তীক্ষ্ণ ছুরির ফলার মত ভয়ধরানো প্রশ্নটা ছুটে এলো– কোন হ্যায় চাচা আপকা সাথ, কভি তো ইধার দেখা নেহি। কোই মতলব তো নেহি?স্থানীয় ও নবাগতদের সেই সনাতন দ্বন্দ্ব, একই সম্প্রদায় কিন্তু পরস্পরের প্রতি সন্দেহ।

আরে নাহিরে বেটা, মেরা আপনা ভাতিজা। ফেরিঘাটমে রাহেতে হ্যায়।

পায়ে পা জড়িয়ে যাওয়ার উপক্রম হল দুজনের। সাম্মী চাচা ফিস ফিস করে বললেন– ডরো মৎ বেটা। চুপচাপ চলতে রাহো, ইধার উধার দেখনা মৎ। ইনলোগ সব সৈয়দপুর সে আয়া হ্যায়, বড়ি খতরনাক আদমি। কিয়া কহু, কেতনা গলতি কিয়া তোম! তার গলা ধরে এলো– তোমহারা ওয়ালেদ সাহেব মেরা জানি দোস্ত থা, উন দোনো বহুত আচ্ছা আদমী থা, আল্লাহ নে উন লোগকো বেহস্ত নসীব করে।

রজব আলী ফকির

হাশিম চাচা বাবার কলিগ ছিলেন, ভাল বন্ধুও ছিলেন। ঘোর মুসলিম লীগ পন্থী। পাকিস্তানি সৈন্যদের যথার্থই ইসলাম ও পাকিস্তানের নিশান বরদার ভাবতেন এবং মনে প্রাণে তাদের বিজয় এবং দুষ্কৃতিকারীদের ধ্বংস কামনা করতেন। তার একটাই দুঃখ, বাবার মত একজন ভাল মানুষ কিভাবে সত্য বিচ্যুত হল, যে কিনা হিন্দুদের হাতে নিগৃহীত হয়ে নিজ জন্মভূমি ছেড়ে পাকিস্তানের পবিত্র মাটিতে আশ্রয় নিয়েছে। তিনি সম্ভবত বিশ্বাস করতেন বাবা তার পুরানো বিশ্বাসে ফিরে আসবেন। বাবা নিজের বিশ্বাস নিয়ে প্রায়ই নিশ্চুপ থাকতেন এবং কারো সাথে বিশেষ তর্কে যেতেন না। সম্ভবত এটাই হাশিম চাচার বিশ্বাসের পিছনে কাজ করত।

বোরবারে মাঝে মাঝে আমাদের বাড়িতে আসতেন আশফাক চাচাকে সাথে নিয়ে। তিনিও বাবার কলিগ এবং হাশিম চাচার মত একই দর্শনের অনুসারি ছিলেন। গল্প বা কথা যা বলার হাশিম চাচাই বলতেন। তার কথার বড় অংশ জুড়ে থাকত হজরত খানজাহান আলীর মাজারের খাদেম বংশের আওলাদ রজব আলী ফকিরের কথা। সাপ্তাহিক বন্ধে চাচা মাঝে মাঝে বাগেরহাটে বাড়িতে যেতেন। ফিরে এসে পরের রোববার কখনো কখনো আমাদের বাড়ি আসতেন রজব আলী ফকিরের বীরত্বগাথা শোনানোর জন্য। তার বীরত্বগাথা মানে নকশাল ও মুক্তিদের নাস্তানাবুদ করা, হিন্দুদের বাড়ি-ঘরে আগুন দিয়ে, মারধর করে, সহায় সম্পদ কেড়ে নিয়ে দেশছাড়া করা এবং কিছু সংখ্যক প্রয়োজনীয় হিন্দুকে বলপূর্বক ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় দিয়ে তাদের ইহকাল পরকালের তরক্কির ব্যবস্থাকরা। চাচা হত্যা ধর্ষণ জাতীয় শব্দগুলি সচেতনভাবে 'মারধর' বলে চালিয়ে দিতেন।

বাবাদের কোর্টে বাগেরহাট থেকে আরো কয়েকজন চাকরি করতেন। তাদের কাছে রজব আলীর দুষ্কৃতি সম্পর্কে অনেক কথা শোনা যেত। হয়তো সে কথা ভেবে হাশিম চাচা বলতেন– হ্যা, তার কিছু দুর্নাম আছে বটে তবে নবীজির ধর্মের প্রচার, প্রসার এবং পাকিস্তানের সুরক্ষায় তার যা অবদান তার তুলনায়, বুঝলেন কায়ছার সাহেব, ওসব কিছুই না। আসলে হজরত খানজাহান আলী দরগার খাদেমগোষ্টির লোক তো, ফকিরি জানে অবশ্যই, কিছু আছে তার মধ্যে, নইলে মুক্তিরা তো তাকে মেরে ফেলার কম চেষ্টা করেনি! আচ্ছা আপনি খোকন, মানস ঘোষ এদের নাম শুনেছেন?

বাবা বললেন– না। কারা তারা?

বাবার দিকে মুখ ঝুঁকিয়ে কণ্ঠস্বর যথাসম্ভব নিচু করে বললেন– নকশাল, বুঝলেন নকশাল! এত নিচু কণ্ঠে বললেন যেন মানস ঘোষের চর বেড়ার ওপাশে ঘাপটি মেরে তার উপর নজর রাখছে। মালাউনটার বাড়ি মানসা গ্রামে। ওদের একটা বড়সড় গলাকাটার দল আছে। শিবাজীর মত ধূর্ত বুঝলেন, রজব আলী ফকিরের মত লোকও তাকে কাবু করতে পারছে না। দুজন এখন দুজনের ঘোর শত্রু। বাগে পেলেই একজন আর একজনকে একেবারে শেষ করে দেবে, এমন অবস্থা!

আমরা হঠাৎ একাদিন শুনলাম রজব আলী মারা পড়েছে। মানস ঘোষের লোকেরা তাকে মেরে পথের পাশে ফেলে রেখে গেছে। আমরা রজব আলীর নৃশংসতা সম্পর্কে এত শুনেছি যে, ভুক্তভোগী না হয়েও যেন হাফ ছেড়ে বাঁচি। পরের রোববার হাশিম চাচা এলেন। এক কাপ চা হতে চেয়ারে চুপচাপ বসে থাকলেন। মুড়ি বাদাম পাশেই পড়ে থাকল। শেষে ধৈর্য হারিয়ে বাবাই কথা বললেন– রজব আলী সম্পর্কে কি যেন শুনছি, গুজব নিশ্চয়।

না, ঠিকই শুনেছেন। গুলি খেয়েছে কয়েকটা। এতদিনে মারা গেছে বোধ হয়।

এত দিনে মারা গেছে, মানে?

মানসের লোকেরা মেরেছিল ঠিকই, তবে তারাও খুব ভয়ে ভয়ে ছিল, বোধহয় লোকজনও ছুটে এসেছিল। মৃত্যু নিশ্চিত করে যেতে পারেনি। এর আবার ফকিরি প্রাণ তো, পুরোপুরি মরেনি, তবে গুলি খেয়েছে বেশ কয়েকটা। আর্মিরা হেলিকপ্টারে ঢাকা নিয়ে গেছে। আর খবর জানিনে, এতদিন কি আর বেঁচে আছে শরীরে অতগুলো গুলি ঢোকার পর!

বাবা বললেন তার সাথে সব সময় বডিগার্ড থাকে বলেছিলেন না!

থাকে তো, তবে ঐ যে সব মহাবীরের দল, একজন রাইফেল নিয়ে আর একজন রাইফেল ফেলে লেজ তুলে দৌড়, কে কাকে হারায়! কেজানে কিভাবে কি হল, সবাই এখন নিজেদের পিঠ বাঁচাচ্ছে নানা অজুহাত দিয়ে। আসলে কি জানেন কায়ছার সাহেব, ষোল কলা পূর্ণ হলে যা হয়। যা শুরু করেছিল। হিন্দু হলেই মারতে হবে? কত নিরীহ মানুষ যে মেরেছে, বাচ্চা বুড়োরাও বাদ যায়নি। ফর্সা, লম্বা চওড়া মানুষ, রাইফেল নিজে বইত না, এক বশংবদের হাতে থাকতো নাকি। অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছিল যে তাকে দেখলেই হিন্দুরা দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটত আর নিরীহ মুসলমানরা আড়াল খুঁজত। সে নাকি তখন দাড়ি মোচড়াতে মোচড়াতে বন্দুকের জন্য হাত বাড়িয়ে দিত। তারপর নিজে গুলি ছুড়ে পাখি মারার মত মানুষ মারত। তার হাতের টিপও নাকি বেশ ভাল। এক বুড়ো মাস্টার নাকি তার জল্লাদের কাজ করত।

তার দায়িত্ব ছিল মৃত্যুদন্ডপ্রাপ্ত মিসক্রিয়েন্টদের জবাই করে মারা। সে নাকি বলত– বাবারা বুড়ো হয়ে গেছি, বেশি উচু হতে পারিনে, তোমরা যদি গর্দানটা একটু নিচু কর আমার সুবিধা হয়, তোমাদেরও কষ্ট কম হয়। এসব কথা বাগেরহাট-ফকিরহাটে মুখে মুখে ফেরে। ভাবতে পারেন!

ও হারামজাদার মুসলমান বানানোর একটা ঘটনা বলি। এক বড়সড় হিন্দু পরিবার, কর্তা বুড়ো মানুষ, অসুস্থ, ছেলের বৌ পোয়াতি, সম্পত্তিও যথেষ্ট, মায়া ছাড়তে চায় না। দালালরা বলে উপায় তো আছে কর্তা। শেষে ইমাম সাহেবের কাছে খবর পাঠালো পরিবারসুদ্ধ মুসলমান হবে, ইমাম সাহেব যেন ব্যবস্থা নেন।

সিদ্ধান্ত দেয়ার মালিক রজব আলী। সে রাজি হল। শর্ত হিসাবে পাকিস্তান রক্ষা, ইসলাম রক্ষা, মসজিদ ইত্যাদি ফান্ডে ভাল অঙ্কের চাঁদা দিতে হল, রজব আলীর ভেট তো আছেই। তারপর শুক্রবারে মসজিদে ঘটা করে ধর্মান্তর অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন হল। পৌত্তলিকতা ছেড়ে তাওহীদ বিশ্বাসে আস্থাশীল হওয়া চাট্টিখানি ব্যাপার নয়! সকাল থেকে মসজিদের পাশে ডেগ চড়েছে। গরু খাশি বেছে নেয়া হয়েছে বাবুর গোয়াল থেকে। চাল ডাল তেল মসলা সবই তার টাকায়। দেখে যাওয়া ছাড়া বাবুর করা বা বলার কিছু ছিলনা।

বাবুর একান্ত ধারণা ছিল তাদের পাতে অন্তত খাশির মাংস দেয়া হবে, দেয়া হল গরুর মাংস। দীর্ঘ দিনের সংস্কার, অস্বস্তি হওয়ারই কথা। এর মধ্যে ইমাম সাহেব বয়ান করলেন– তোমরা যে কুনো ডরে বা চাপে মোসলমান হইলা না, খাস দেলে ইসলাম কবুল করছ তার পরমান হইল এদ্দিন যারে গো-দেব্‌তা ভাইবা পূজা করছ, তার গোশত খাওয়া। অহন কও দেহি গরু কি দেব্‌তা হইবার পারে? এইডা যে ভূয়া দেব্‌তা আজ উয়ার গোশত খাইয়া হেইটা পরমান করবা। নেও, বিসমিল্লা কর।

এরমধ্যে দু একজন গলা টানা শুরু করেছে। বিশেষত বাবুর কিশোর পুত্র। যে কোন মাংসেই তার এলার্জি। মাত্র কয়েকদিন আগে ধর্মান্তরিত এক নও মুসলমান ফিস ফিস করে বলল– খাও বাবা, খাইয়া লও, না খাইলে মহা বেপদ।

রজব আলী ফকির প্রথমে চোখ গরম করল, তারপর নাকি হঠাৎ শান্ত হয়ে বলল– খাও দেরী কইরো না। আমার মেলা কাম, তোমাদের খাওয়া দেখতে বসে থাকা সম্ভব না। সবাই গরুর ঝোল মাখা ভাত গালে তুলল। ছেলেটা এক গাল ভাত মুখে তুলে গলাধঃকরণের চেষ্টা করল, তারপর হঠাৎ মুখ চেপে ধরে আসর ছেড়ে ছুটে ঝোপের ধারে যেয়ে হড় হড় করে বমি করে ফেলল। রজব আলী ক্রোধের সাথে উঠে দাড়াল। বাবু তাড়াতাড়ি ছুটে যেয়ে তার পায়ের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল– রাগ কইরেন না কর্তা, কিছু মনে কইরেন না, আমরা হক্কলে তো খাইতেছি, হেও খাইবে। ছেলেমানুষ, কি যে হইছে, বাড়িতেও তো কোন মাংস খায় না।

মাংস না গোস্ত বল– ইমাম সাহেব ফুসে ওঠেন।

হ ভুল হইছে, গোস্ত– হে ঠিকই গোস্ত খাইবে, মোসলমান হইছে না! আজ উয়ারে মাপ কইরা দেন সাহেব।

না আজই খাইতে হইবে। মুখ টুক ধুইয়া আইতে কও, মোসলমানের ঘরে মালাউনের বাচ্চা থাকা ঠিক না– কি কন কমান্ডার সাব– ইমাম সাহেব রজব আলীর দিকে তাকিয়ে কথাগুলো বলেন।

ছেলেটা গোস্ত খায়। বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে কি বোঝে কে জানে, মাথা নিচু করে গোস্ত খায়, তার চোখ দিয়ে অশ্রু গড়তে থাকে। শুনেছি বাড়িতে যেয়ে জ্বরে বেঘোরে পড়ে ছিল। বলেন তো কায়ছার সাহেব, এই ইসলাম আর মুসলমান দিয়ে কি তরক্কি হবে পাকিস্তানের? সে আরো আগে গেলেই বরং ইসলামের অনেক উপকার হত। যাকগে যা বললাম সব শোনা কথা, ঠিক নাও হতে পারে। আমি তো আর নিজে দেখিনি, এসব আবার কোথাও বলতে যাবেন না যেন।

তিন চার দিন পর বাবা অফিস থেকে ফিরলেন ঘোর দুঃসংবাদ নিয়ে, রজব আলী বেঁচে আছে। সে নাকি এখন রাজাকার মেজর। কয়েক দিনের মধ্যেই বাগেরহাটে ফিরবে, রিসেপশানের জোর তোড়জোড় চলছে। হাশিম সাহেবই খবরটা দিয়েছেন ফিসফিস করে– শুনেছেন কায়ছার সাহেব শয়তানটা বেঁচে আছে, সুস্থ্য হয়ে উঠছে, শিঘ্রী ফিরবে। ফিরে এসে কি যে করবে তা তো বোঝাই যায়। বুঝলেন, রাসপুটিন একটা! সহজে মরেনা, মরবে যখন পাকিস্তানকে নিয়েই মরবে বোধহয়।

হাশিম চাচা ভুল বলেন নি, স্বাধীনতার পরদিন খান জাহান আলীর দীঘির পাড়ে তার মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখা যায়। লোকে বলে বিশ খেয়ে আত্মহত্যা করেছিল নাকি।

দেবী

'৭১-এ আমার চোখে দেখা সবচেয়ে দুর্ভাগ্যজনক ঘটনার কথা যখনই মনে পড়ে এক অসম্ভব কষ্ট আমার ভিতরটা কঠিন মুষ্টিতে খামচে ধরে। সেদিন ছিল শনিবার, আধা বেলা অফিস। দুপুরে বাড়ি ফিরে সবে বেড়ার গেট লাগাচ্ছি, রোজকার মত পাড়ার এক নিস্তব্ধ দুপুর, হঠাৎ ঘুঙুরের শব্দ আমাকে সচকিত করে তুলল। রাস্তার পশ্চিম দিকে তাকিয়ে হতবাক হয়ে এক যুবতী মেয়েকে দেখলাম, গায়ে পোষাক এবং অলংকার বলতে শুধুমাত্র একপায়ে একটা ঘুঙুর। নাচতে নাচতে এগিয়ে আসছে এবং নাচতে নাচতে আমাকে অতিক্রম করে চলে গেল। বিষন্ন মুখ, শূন্য দৃষ্টি। সে নাচে কোন ছন্দ-তাল-মান ছিলনা, যেন নাচতে হয় তাই নাচছে। আমি ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে ছিলাম। একেবারে ভেনাসের মত ভরাট স্বাস্থ্য, ফর্সা, কিন্তু গায়ের সর্বত্র ছোপ ছোপ ময়লার আস্তর। স্তনের বোটায় দুধের ফোটা আমাকে কাঁপিয়ে দিল, বাচ্চাটা সাথে নেই!

সে চলে গেল, আমার জন্য রেখে গেল একরাশ কষ্ট এবং চিন্তা-দুঃশ্চিন্তার ভার। কি হতে পারে, কেন এমন হল– চোখের সামনে একের পর এক পীড়াদায়ক দৃশ্যআমাকে তাড়িত করতে থাকল। তখন অনেক লোমহর্ষক ঘটনার কথা শোনা যেত– মায়ের বুক থেকে বাচ্চা কেড়ে নিয়ে লোফালুফি করতে করতে বাচ্চাটাকে আছড়ে ফেলে দিয়ে অথবা দুধের বাচ্চাটাকে উপরে ছুড়ে দিয়ে বেওনেটের ডগায় গেঁথে মেরে ফেলে মাকে টেনে হিচড়ে ক্যাম্পে ধরে নিয়ে গেছে আর্মিরা। মার বুকফাটা কান্নায় নিষ্ঠুর রসিকতার ছড়ান্ত করেছে। তারপর মাকে ধরে নিয়ে যেত ক্যাম্পে। কুমারী মেয়েদের সাথে এমন অজস্র মাকে ক্যাম্পে ধরে নিয়ে দিনের পর দিন নিজেদের খেয়াল খুশি মত ভোগ লালসায় ব্যবহার করতো। অফিসারর্স ক্যাম্পে এসব মেয়েদের উপর তাদের পারর্ভাসনের চূড়ান্ত দেখিয়ে ছাড়তো বিকৃতকাম অফিসাররা। কোন সন্দেহ নেই এই সুন্দরী মা তেমনই কোন ঘটনার শিকার যা তাকে এই করুণ পরিণতির মধ্যে ঠেলে দিয়েছে।

শাহীন হোটেল

ফায়ার ব্রিগেড রোডে কমার্স কলেজের উত্তর পাশ ঘেষে পাঁচতালা শাহীন হোটেল। হেটেলের মালিক আবুল হাসান সাহেব মুসলিম লীগের গুরুত্বপূর্ণ নেতা। গল্পবাজ মানুষ, যেখানে বসতেন আসর জমিয়ে রাখতেন। সবাই শ্রোতা, বক্তা তিনি একাই। সবই আষাঢ়ে গল্প, অবলীলায় সত্যের মত বলে যেতেন। একদিন আচমকা বর্ষায় আমরা একছুটে ডাকবাংলোর প্রশ্বস্ত বারান্দায় উঠে পড়লাম। হাসান সাহেব আগেই সেখানে এক কুরসিতে জাঁকিয়ে বসে ছিলেন। সঙ্গে দু চারজন পাত্রমিত্র। বর্ষার ছাট বারান্দা পর্যন্ত ভিজিয়ে দিচ্ছে। একজন বলল কি বৃষ্টিরে বাবা! তিনি তাকে থামিয়ে দিলেন– আরে এ আর এমন কি বৃষ্টি, হ্যা- বৃষ্টি হয়েছিল বটে একদিন!

গল্পের গন্ধ পেয়ে আমরা আশেপাশের চেয়ার বেঞ্চ টানাটানি করে বসে পড়লাম। তিনি বললেন– এই তোরা শব্দ কম কর। সেদিন আবার আমার মুসলিম ক্লাবের সাথে টাউন ক্লাবের ফাইন্যাল ম্যাচ। মর্যাদার লড়াই– কলকাতার মহামেডান আর মোহনবাগানের মত ব্যাপার। দুদিন আগে ঢাকায় গেলাম প্লেয়ার হায়ার করতে। টাউন ক্লাব গেল একদিন পর। তা ওরাও একসেট প্লেয়ার হায়ার করল। পরদিন সকালে ফ্লাইট, বিকেলে খেলা। কিন্তু ভোররাত থেকে সেকি বৃষ্টি! থামার লক্ষণ নেই। কোন রকমে প্লেয়ারদের নিয়ে গেলাম তেজগা এয়ার পোর্টে। তারপর তো মাথায় বাজ। ব্যাটারা বলে কিনা আবহাওয়া খারাপ, প্লেন যাবেনা। বললেই হল প্লেন যাবেনা! আমার খেলা আছে না। ধরলাম এক পাইলটরে। টাকা গচ্চা গেল বটে, কিন্তু ব্যাটা রাজি হল, প্লেনও ভাড়া করে নিয়ে এলো। যখন রওনা দেবো দেখি টাউন ক্লাবের লোকজন গোমড়া মুখে দাঁড়িয়ে আছে। বললাম– ওয়াকওভার আমার পছন্দ না, তোরা না গেলি খেলবো কার সাথে, উঠে পড়। প্লেনে পাইলটের পাশে বসেছি। তবে বৃষ্টি বটে! সামনে কিছু দেখাও যায়না। কাঁটা-কম্পাসের উপর ভর করে প্লেন চলছে। হঠাৎ একসময় মনে হল প্লেনের মুখটা যেন একটু ঘুরে গেল। বললাম কি পাইলট সাহেব, প্লেনের মুখটা ঘুরে গেল নাকি, নাকি ভুল দেখলাম! ব্যাটা বলে কিনা ঠিকই দেখেছেন স্যার, আমরা ঢাকা ফিরে যাচ্ছি। যশোরে রানওয়ের উপর একহাটু পানি। প্লেন ল্যান্ড করানো যাবেনা।

বললাম– তাই, সরোদিনি দেখি, কিভাবে প্লেন ল্যান্ড করাতে হয় দেখিয়ে দিচ্ছি। তাকে পাশে ঠেলে দিয়ে চালকের আসনে বসে শক্ত হাতে স্টিয়ারিংটা ধরলাম।....

তিনি হঠাৎ উঠে পড়ার উপক্রম করলেন। কৌতুহল ঠেকাতে না পেরে একজন জিজ্ঞাসা করল– কি হল ভাই? থামলেন যে!

বাইরে দেখ্, বৃষ্টি থেমে গেছে বোধহয়।

বলে রাখা ভালো হাসান সাহেবকে ভুল বোঝার অবকাশ নেই। তিনি যথেষ্ট বুদ্ধি ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ছিলেন। হোটেলের পঞ্চম তালা জুড়ে এক চমৎকার রেস্টুরেন্ট ও মিটিং-প্লেস তৈরি করেছিলেন। খুবই খোলা-মেলা রেস্টুরেন্ট। চেয়ার টেবিলগুলো ফাঁকা ফাঁকা করে সাজানো। সম্ভবত খুলনার আড্ডাবাজ এবং সাহিত্য-সাংস্কৃতি জগতের লোকদের কথা মাথায় রেখেই রেস্তরাটা বানানো হয়েছিল। আড্ডা দেয়ার মত চমৎকার

জায়গা, যেখানে দু'টাকা খরচ করে ছোট এক পট চা, দুটো বৈধ কাপ এবং আরো দুটো পাইলট (খালি কাপ) সামনে নিয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা কাটিয়ে দেয়া যেত। বিদ্যুৎ দা-ফারুক ভাইয়ের মত আড্ডাবাজরা রাত বারোটার আগে ওঠার কথা ভাবতেই পারতেন না। নাজিম মাহমুদ স্যার, মুস্তাফিজ স্যার, আফতাব স্যারেরাও কম যেতেন না। বেচারা মোসলেম ঘুমে ঢুলু ঢুলু চোখে দু'তিন দফা টেবিলের আশপাশ দিয়ে ঘোরাঘুরি করে নিজের টুলে ফিরে যেয়ে ঘুমে ঢুলতে থাকত। শেষে নাচার হয়ে আড্ডা ছেড়ে উঠতেন তারা। বলা বাহুল্য আমিও প্রায় তাদের খপ্পরে পড়ে যেতাম।

হোটেল ছাড়িয়ে দক্ষিণে সামান্য এগোলেই হাসান সাহেবের বাড়ি। তার জ্যেষ্ঠ কন্যা হেলেন খুলনা গার্লস কলেজে পড়ত এবং কলেজ শাখা ছাত্রলীগের সভাপতি ও কলেজ ছাত্রী-সংসদের সাধারণ সম্পাদিকা ছিল। সে আকর্ষনীয় চেহারা ও ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিল। ফলে তার পিতার রাজনীতি অনেকটাই আমাদের দিকে নমনীয় হয়ে পড়েছিল। এটা আমাদের বিরাট সুবিধা করে দিয়েছিল। আমরা আমাদের ঘরোয়া মিটিংগুলো রেস্টুরেন্টের মিটিং-কর্ণারে প্রায় নিখরচায় সেরে নিতাম। এক দেড়শ ছাত্রের সভা বড় ধরনের উৎপাত ছিল বইকি। তখন সভাস্থলের চেয়ার ছাড়াও রেস্টুরেন্টের চেয়ারগুলোও টানাটানির প্রয়োজন পড়ত। পাইলট কাপের সুবিধা থাকায় চা পাওয়া যেত সস্তায়। আমরা সিঙ্গাড়া কিনতাম বাইরে থেকে। শাহীন হোটেলের সবচেয়ে সস্তা আলুর চপের দাম ছিল ছ'আনা। সে সময় দেড়-দুশো ছাত্রের জন্য মাথাপিছু ছ'আনা খরচ করার সামর্থ আমাদের ছিল না।

হোটেলের পাশে ভিক্টোরিয়া ইনফ্যান্ট স্কুল, তারপর লেয়ার যশোর রোড। যশোর রোডের উত্তরে সার্কিট হাউস, হেলিপোর্ট ও ইউ.এফ.ডি (বর্তমানে খুলনা ক্লাব) ক্লাব। এই গোটা এলাকা জবরদখল করে ২২ ফ্রনটিয়ার ফোর্স তাদের শক্ত ঘাটি বানিয়েছিল। সন্ধ্যার পর প্রতিদিন রাস্তা বরাবর আর্মিরা টহল দিত- দু'জন পূব এবং দু'জন পশ্চিম মুখী হয়ে। হোটেলের ছাদে উঠলে তাদের পরিস্কার দেখা যেত।

রেস্টুরেন্টের ম্যানেজার ছিল আব্দুস ছাত্তার, প্রাণবন্ত, সুদর্শন এক তরুণ। চাকরির পাশাপাশি সে কর্মাস কলেজে পড়ত এবং ছাত্রলীগ সংগঠনের সাথে যুক্ত ছিল। ২৭ মার্চ রাতে সবেদা তলার সভায় সেও উপস্থিত ছিল। এবং অতগুলো ছেলের মধ্যে আমার ও জাহিদের নেতৃত্বে সার্কিট হাউস আক্রমণের প্রস্তাব দিয়ে আমাদের মহা লজ্জা ও সংকটে ফেলেছিল। অতটা সাহসী আমি কোন কালেই ছিলাম না। কিন্তু সে কিছু একটা করার জন্য ছটফট করছিল। শেষে তার হাতে বোমা তুলে দেওয়া হয়। সে ঠিকই শাহীন হোটেলের ছাদ থেকে সন্ধ্যার আলো-আঁধারীতে নির্ভুল লক্ষ্যে টহলদার আর্মিদের উপর বোমা নিক্ষেপ করেছিল।

ছাত্তার দ্রুত এসে তার রুমে শুয়ে পড়েছিল। দুর্ভাগ্যক্রমে সে আর্মি ইনটেলিজেন্সের কথা মাথায় রাখেনি। খুব শীঘ্রই বুটের প্রচণ্ড লাথিতে তার দরজার পাল্লা দুটো দু'দিকে হাট হয়ে খুলে যায়। আর্মিরা ক্রুদ্ধভাবে রাইফেল উচিয়ে তার রুমে ঢুকে পড়ে। বিশ্রী গালিগালাজ করতে করতে তাকে টেনে হিঁচড়ে খাট থেকে নিচে নামায় এবং চাদর তোষক সব উল্টে পাল্টে তছনছ করে। তারা বোমার সন্ধান করছিল এবং বাক্স পেটারা, খাটের তলা তন্নতন্ন করে দেখে কিছু না পেয়ে তাকে মারতে মারতে ধরে নিয়ে যায়। ছাত্তারের কাছে একটা রাইফেল ছিল যা তার পাশের খাটে তোষকের নিচে লুকানো ছিল। সে ঐ প্রচণ্ড মারের মধ্যেও গভীর স্বস্তি অনুভব করল যখন দেখল আর্মিরা ঐ খাটের তোষকে হাত দেয় নি। আসলে আর্মিরা গোলাকার বোমা জাতীয় বস্তুর সন্ধানে ব্যস্ত ছিল। ফলে পাশ্ববর্তী খাটের সমান্তরাল বিছানা তাদের বিভ্রান্ত করতে সমর্থ হয়েছিল। এভাবে সে ফায়ারিং স্কোয়াড থেকে বেঁচে যায়। তবে আর্মি ক্যাম্পে তাকে যেভাবে মারা হয় তা তার জীবনীশক্তি প্রায় নিঃশেষ করে দিয়েছিল। আর্মিরা আবার ফিরে আসতে পরে এমন আশঙ্কায় হোটেলের চীফ ম্যানেজার মোশারাফ হোসেন রাইফেলটা সাথে সাথে সরিয়ে ফেলেন।

মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে রেস্টুরেন্টটা উঠে যায়। বাবা একদিন অফিস থেকে ফিরে বললেন– সেখানে অনেকগুলো ঘর তৈরী হচ্ছে। রেস্টুরেন্টের ফ্লোর জুড়ে সারি সারি ছোট ছোট রুম তৈরি হয়েছিল বটে, তবে হোটেলের বোর্ডারদের জন্য নয়, রাজাকারদের জন্য। শেষপর্যন্ত হোটেলটা হয়ে উঠেছিল রাজাকারদের স্থায়ী ও ট্রানজিট ক্যাম্প। কে জানে হাসান সাহেব ছাত্রলীগকে প্রশ্রয় দেয়ার কাফফারা দিলেন, নাকি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়েই করেছিলেন কাজটা।

আগেই হেলেনের বিয়ে হয়ে গিয়েছিল। বিয়ের দিন আমরা একটা কবিতার বই প্রায় ত্রিশ জন ছাত্রলীগ কর্মী স্বাক্ষর করে অনেক রাতে তাকে দিতে গিয়েছিলাম। হাসান সাহেব তখন ভিতরে উঠানে ভাঙ্গাহাটে চেয়ারের উপর পা তুলে দিয়ে চুপচাপ বসেছিলেন। বললেন, এত দেরী করলি যে? আমি তো এখনো তোদের জন্য না খেয়ে বসে আছি।

আপনি তো আমাদের দাওয়াতই দেন নি!

দেই নি, তাতে কি? দাওয়াত দিতে হলে আগে তো এনএসএফ-এর ছেলেদের দিতে হয়, আমি তো ঐ দল করি- না কি! ছাত্র ইউনিয়নের কিছু ছেলেকেও বলতে হয়। তারপর বিয়ে বাড়িতে একটা ঝামেলা বেধে যাক আরকি! তবে আমি জানি তোরা ঠিকই আসবি, সেজন্য ভাঙ্গাহাটে বসে আছি। যা আগে উপরে যেয়ে হেলেনের সাথে দেখা করে আয়, আমার উপর রেগে টং হয়ে আছে।উঠতে উঠতে শুনলাম

তিনি কসাই ও বাবুর্চিদের উদ্দেশ্যে হাঁক পাড়ছেন– কি হল, এখনো হাত গুটিয়ে বসে আছো যে,দেখছ না মেহমানরা এসে গেছে। জলদি লেগে পড়।

তার ঝুলিতে সবসময় অদ্ভুত সব আষাড়ে গল্প ভরা থাকতো, শুনতে শুনতে সময় কাটল। অনেক রাতে ভরপেট গরম পোলাও এবং খাশির মাংস খেয়ে আমরা বেরিয়ে এলাম।

স্বাধীনতার পর ঐ কুখ্যাত রাজাকার ডেনের জন্য আমরা হাসান সাহেবের মত একজন অমুদে মানুষ এবং স্মৃতিময় শাহীন হোটেল থেকে দূরে সরে এসেছিলাম।

কিছু একটা ঘটেছে। মতিয়ার রহমান মিনহাস উদ্দিন। বাঙালী অবাঙালী সম্পূর্ন আলাদা হয়ে গেল।

ইউং কমান্ডার বেগ- পেশওয়ার হেড কোয়ার্টরে তাকে পাঠানো হল। তিনি বললেন অনুগত থাকা উচিত। যারা অনুশ্চিত তারা দরখাস্ড় করতে পারেন। পিতা মারা গেছেন। ফেরত দেয়া হল। পলিটিকাল ডিসটারবেন্স মানুষিক ভাবে বিপর্যস্ড়। এয়ার ম্যান ও এনসিওস এন কমিশন অফিসার ১০/১৫ জন। ভাবে ভাবে ছিলাম। মার্শাল ১২ ঘন্টা ডিউটি করা লাগতো। কঠিন ডিউটি থেকে উইয়ডো। প্রাক ব্যপারে থাকবো না। তারা বিভিন্ন ব্যাপাক হয়ে যায় জাগায় থাকায় অনুমতি দিল। এক খেয়েমি। দুই মাস হয়ে গেল। দুই মাস পর হিসাব নিকাস। সুলতান সাহেব ছিলেন অপপর্ধঃ ঙভভরঃবৎ বিমানের টিকিট পাওয়া যায় না। জাহাজ সাকিনা এ আরব যাত্রীপাখী হাত পা বেধে সকালে ফেলে দেয়। কতৃপক্ষ টিকিট দিচ্ছে না। নিজেদের টাকায় টিকিট কিনলাম। নিজেরা আলোচনার কাছে মুক্তিযুদ্ধে যাবার সিদ্ধান্ড় নিলাম। ঞ আইডি কার্ড হারিয়ে গেছে তবে রেজিস্ট্রেশন কার্ড আছে। পরীক্ষা দেওয়ার জন্য করা হয়ে ছিল। বিছানা পত্র পাতা আছে। ওরা অনেকেই বুঝল, কিন্তু কিছু বলল না। বিমানে উহমরহ ট্রাবল দেখা দিয়েছে। ব্যাক করল। এয়ার পোট এর কাছে হোটেল।

তারা ৬ জন ভারতীয় সৈন্য পাকিস্ড়ানে নিয়ে গেল একই বিমানে। ৪/৬ জন ভারতীয় সৈন্য জলপাই পোশাক মেজ মামু যশোর বিমান থেকে

মোলাহাটের ঘটনা

এস এম আশরাফুল ইসলাম আশা এস এসসি পরীক্ষার্থী ছিলেন ১৯৭১।

টিন এজ- ছোট বেলা থেকে লিডার। আগেই দল গঠন সোমবার ইয়াহিয়া খানের ভাষণ ** হলে ভাবতে হবে না হলে যাবো। আর হান্নানের এর সাথে সোমবার রাত্রে চলে যায়। ৫/৬দিন লাগে বন গা যাবার পথে বাগের হাট ঘুরে যাই। ঐ দিন রজব আলীকে গুলি মারে। হান্নান ক্যোথ ইনচার্জ ছিল। হোটেলের রিয়াদ এর ম্যানেজার ধাক্কা দিয়ে বের করে দেয় জলদি চলে যান। পাশের র“মে রাজাকার অফিস ছিল। মোলাহাট মুক্তিযোদ্ধা বেশী ছিল। মোলাহাটের ছেলেদের পড়ে আক্রোশ বেশী ছিল। বাগের হাট, ফকির হাট, রূপসা নড়াইল যশোর মোরক গল্প কালীগঞ্জ চিনিকলেরআগে মেন রাস্ড়া পায় হই কাদা ভেঙ্গে হাটা। বাচ্চা বুড়ো বুড়ি পথে ফেলে গেছে কেউ জ্যন্ড় কেউ মারা গেছে। ইটনায় বিনয় ** এর পরিবারের সাথে। ইটনা কলাবাড়িয়া কালিগঞ্জ বর্ডার । এক বাড়িতে এক রাত ভাড়া নিয়ে থাকি। খাবার শুকনে। গ্র“পে অনেক শরনার্থী ছিল। আমাদের দুজনের প্রতি স্যারের আস্থা। আমাদের খাবার লাগেনি। হান্নান সমবয়সী । মামাতো ভাই ৫০ টাকা। তিন ব্যাস্ড় রেডিও ৫৮ টাকার বিঙ্গনী। পায়ে হেটে নৌকায়। বিনয় বা সাথে নিতে চায়। আমরা ট্রেনিংয়ে যাব বলি। বনগায় রাস্ড়ায় ঢুকছি। ভারতীয় আর্মী প্রশ্ন করে। ট্রেনিংয়ে যাব বললে গাড়ি করে বসির হাট থেকে ৭ কিলোমিটার দক্ষিণে পিফা ক্যাম্পে পৌছে।আম বাগান জমিদার বাড়ি। কাদা ধুতে ধুতে পুকুরের মাছ মারা যায়। এখানে ট্রেনিং হয় নি। সে জলিল ক্যাম্পের সিপা। বরিশালের লোক আগে যাবে সিপা বলে না আগে যারা এসেছে তারা আগে যাবে।এমপি সাহেব ও আরো ৮/১০ জন ভারতের কর্মকর্তা। হাত মিলিয়ে দেন। আমরাই আগে যাই। ১ মাস ৩দিনের মাথায় সিংভূম চাকুরিয়া ক্যান্টের ম্যান্ট। পাশে বাংলাদেশের বাস, জয় বাংলার বাস (বাংলাদেশের বাস)। রাস্ড়ার র“টি এবং মোঠা ডাল অদ্ভুত ভাল লাগে। বাংলা পার হলে লোকনেই নকশাল। জমিদার বাড়ির **মেয়ে পরোটা এবং চিনি খেতে দিত। তারা হিন্দু। মুসলমানের বির“দ্ধে ছিল। গিয়েছি বাবা মা জানেন। ছোট বেলা থেকে ডান পিঠে ছিলাম, ফলে বাড়ির জন্য মন খারাপ হত না আগেই কামার দিয়ে নীল কাঠের বাবা কথায় রাম দা বানাই। দারোগা নির্মল উদ্দীন ধরেন বলি বাড়াবাড়ি করবেন না।তিনি খবর পেলে গোলাগুলি ছুড়ে আত্মসমর্পন করবেন বলেছেন। থানা আক্রমনের মত সদবদ্ধ ছিলাম না। মোলারহাট পুড়িয়ে দেয়। আমরা সাথে সাথে আগুন নেবাই। মা উর্দূ মাকতেন আব্বা এস এম নজির হোসেন। আর্মিতে ছিলেন। দীর্ঘ দিন মাস্টার ছিলেন। মা আর্মীদের নিবৃত করেন। এক মাস তিন দিন ** ট্রেনিং হয়। নোয়াখালীর** ভারতীয় কর্ণেল চার্জে ছিলেন। রাতে পৌছে**ল্যান্টিন তৈরী করতে হয়। এক এক **১০/১২ জন প্রথম দুই ভাগ**এক লাইন। আমি এখনো দাড়াই। বাকিরা অন্য লাইন। ৪৪% ডিসিশন এর ছেলে। কেড়ি পোকা সহ দুটি লুচি এক মগ চা। আস্ড় পাতায় চা মোষের দুধ। ** করে নাস্ড়া। পরের ক্লাশ গুলো জঙ্গলে। কোন টেবিলে চেয়ার নেই। খোলনা জোরনা ভরনা এবং বিভিন্ন পার্সসের নাম। বিভিন্ন দিন বিভিন্ন অস্ত্র।

এস এমসি/ এল এমজি- ৩২০০ ভিতরে প্রথম। আমি দুই নং উইং।** ৮০ মাইল লম্বা। ** সিনেমা, ডায়রী, টর্চলাইট উপহার- ফকিরহাটে হারিয়ে ফেলে। ৫০/৫৮ টাকা মাসিক বেতন ট্রেনিং কালে। গোসলের জন্য দুই মগ পানি নির্দিষ্ট। বৃষ্টি হলে ** গড়াগড়ি দিতাম, পানি বেধে থাকত।

একদিন ** করে খেতে আসি। দুজন অস্ত্র পাহাড়ায় ছিল। কয়েকজন ভারতীয় সৈন্য যায়। গল্প করে। দুটো অস্ত্র সবার। ফল ইনকরার। অস্ত্র কোথায়। জানিনা। তারা কঠিন শাস্ড়ি দেয়। ক্লিং এর পর ক্লিং ফ্রন্টরোল (ডিগবাশ) গড়ানো কুচি পাথরের মধ্যে ক্লিং। তারপর ভারতীয় কর্মকর্তা এল এমসি। কক করেন। আলা ভগমানের নাম করেন। অস্ত্র পাচার করেছেন। কারো কাছে যদি বেড থাকতো আত্ম হত্যা করতেন। ক্লাসে না নিয়ে রাস্ড়ায় নিয়ে যায়। দিব পায়েস দেব। আমরা জানতাম না গুলি নেই। দেশে যেতে হত, অন্য মাফক না হও।

একজন টার্গেট পুতছে। আমি এস এমসি তাক করেছি। ট্রেনার দূর থেকে দেখেন। ১/২ ঘন্টা মাথা নিচু পা উপরে দিয়ে রাখে। মনে হয় মুখ ফেটে রক্ত বেরিয়ে যাবে। ছোট ছোট বিষক্ত সাপ। টেল্ট এর পাশে পরিক্ষা খনন করতে হত যাতে ঢুকতে না পারে।

লাইট পেট্রোল। সারারাত আল জঙ্গল ভেঙ্গে ঘোরা। পাকা পথ থেকে ঘুমের ঘোরে পথ ভ্রষ্ট হলে লতা পাতা পায়ে জড়ালে ঘুম ভেঙ্গে যেত। অথচ ক্যান্টমেন্ট থেকে বেশী দূরে যায়নি। যাইতে যাইতে ঘুম এসে যেত। খাদের দিকে গেলে ঘুম ভেঙ্গে যেতো। ক্লাস্ড় হয়েও ঘুমিয়ে পড়তাম কিন্তু অস্ত্র গুলো দু পায়ের ফাকে রেখে দিতাম যাতে কর্মকর্তা চুরি করতে না পারে। পানি** ২/৩ টা লুচি, চিনিও পানি। তিন দিনের মাংস, দুই দিনের মাছ, দুই দিনের সবজী। রাত্রে দুপুরের ভাত। ২৪ ঘন্টা ট্রেনিং, কিভাবে ঘুমাচ্ছি। এটাও দেখা হত। হুইসিল সাথে সাথে কোথ খানা থেকে অস্ত্র নিয়ে**।

/ **এ করে ট্রেন থেকে নেমে রাত ৮ টার বেগুনদিয়া (বসিরহাট) ক্যাম্প। মোলাহাটে ৫৫ জন ছিলাম। হান্নান সাথে আছে। আমার চেয়েও ছোট ছিল মুজিবর (কাহালপুর), নগর কান্দির জুলফিকার আমার চেয়ে ছোট ছিল। ধরা পড়ে আর্মিরা ছেড়ে দেয়।

বেগুনদিয়া ক্যাম্পে খাওয়া দাওয়ার পর আমাদের ** ইসু হয়।** এ ২টা (একটি আমার কাছে ছিল)। ** রাইফেল। ৩/৪ জন ফাকা দিল গুলি করার জন্য।

রাইফেল **বিড়ল ভাব, পিস্ড়ল,** এক খন্ড হয় মাইন এক্সপোসিড (বিল্ডিং ও ব্রীজ এড়ানো আঠালো) মার্টার, রকের্ট লাঞ্চার- ২নং সবাই এই ট্রেনিং পায় সম্ভবত ২৫০ জন।

** করার অর্ডার দেন। আর্মির গাড়ি ৫৫ জন কে হিঙ্গলগঞ্জ পৌছে দিয়ে গেল। খেয়া ঘাট ইট সোলিং পানি পর্যন্ড়। কমান্ড স্টার্ট করেন আবু তালেব শরীফ। সামসুর রহমান ** বিমান বাহিনীর একজন কর্মকর্তা। চেম্বারে গুলি ভরার অর্ডার হয়। একজনের রাইফেলের গুলে বেরিয়ে যায়। নৌকায় নদী পার হলে কালিগঞ্জ থানার এলাকা দিয়ে খাল পার হয়ে চার দিয়ে ফেরার পথে পড়ে যায়। স্কুলে এস এম জি মিস ফায়ার। সেফটি ক্যাচ অন থাকলে সামান্য আঘাতে ফায়ার হয়। কওসার (শাসন গ্রাম) পায়ের মাংস পেশীতে নিজেদের গুলি। ওকে (মিলের আইডেনটিটি) থাকার সাথে ১জনকে দিয়ে রেখে আমরা মুভ করি। পয়সা দিই এবং দেশে চলে যেতে বলি।

এক স্কুলে আশ্রয় নিই দিনে। সেফ এলাকা। খরস্রোতা অগ্রগতি হই। আমরা তিনটি স্বরূপ কাঠি নৌকা (উচু বাকানো নৌকা) পাই জঙ্গলের সীমানায়। সবাই খুবই ক্লাস্ড়। নৌকায় সুন্দরবনের গা ঘেষে অগ্রসর হই। মাঝিরা র্ুটি বানিয়ে খাওয়ায়। তখন দুপুর একটা। নৌকার ভিতরে থাকলে বাইরে থেকে দেখা যায় না। আমারে আটা কিনতে পাঠায়। তখন ভাটি। রাস্ড়া থেকে দূর গ্রাফিন ফেলে নৌকা বেধে রাখা হয়। রাজাকার আলবদর পাড় থেকে জানতে চাই তোমরা কারা। আমরা বাওয়ালী। তারা বিশ্বাস করে না। আমরা তখন নৌকা নিয়ে জঙ্গলে চলে যাই। সন্ধ্যায় বের হয়। ঐ নৌকা ছেড়ে অন্য ২টাছই বিহীন নৌকায় সুতার খালি (রাজাকারা পাশে)। এখানে আসতে খরস্রোতা শিবসা পার হতে হয়। সব ঘরের ভেতর বন্যার পানি। আমরা সারা গ্রামে বিভিন্ন ঘরে ভাগাভাগ হয়ে থাকি। স্বামী স্ত্রীর ঘর ছেলে মেয়েরা ছিল না। তারা নিজেরা পানির মধ্যে দাড়িয়ে থাকে আমাদের তিন জনকে খাটে থাকতে দেয়। পান্ড়া ভাত মাংস খেতে দেয়। সকালে উঠে গ্রামের লোকজন একেবারে কম। ভয়ে আমরা ডিঙ্গী নৌকা নিয়ে জঙ্গলে পালাই। এর আগে দুদিন কিছু খায় নি। পানিও ছিল লবনাক্ত। সন্ধ্যায় ফিরে দেখি সারা গ্রাম পুড়িয়ে দিয়েছে। আর্মীরা এসে পুড়িয়ে দেয়। আমরা অস্ত্র নিয়ে পানির ভিতর দিয়ে ধানক্ষেতের ভিতর দিয়ে পূর্ব দিকে হেটে অগ্রসর নি। ৫ মিনিট বসে চেষ্টা নেওয়ার মত কোন স্থল ভাগ নেই। পশুর নদীর পাড়ে আসি। কোন নৌকা পায় নাই। এ সময় আফজাল ভারত থেকে সরাসরি লঞ্চ নিয়ে আসে। আমরা তাকে এগিয়ে না দিলেও নদী পাড় করে দিতে অনুরোধ জানাই। সে অস্বীকার করল এবং লঞ্চ নিয়ে চলে গেল। পশুর নদীর পশ্চিম পাড়ে অবস্থান করে ছিলাম। সকালে যখন জঙ্গলে যাব তখন জিজ্ঞসা করলাম কি মাংস ছিল। তারা তলপেটে বলল শুকরের মাংস ছিল। জায়গাটা চালনা ও মঙ্গলার নিকটবর্তী হওয়ার গানবোধ ঘোরাঘুরি করছিল। সুতর খালী ও ভাংমারী মঙ্গলনর মাঝামাঝি বাজুয়া। ইলিশ মাছের নৌকা পাই। লম্বা ছিল, দাড় ছিল, হাল ৩/৪ জন করে জেলে ছিল। নৌকাটা খ্রীষ্টান সাজে সাজানো। গোরম্ভ রাজাকারের পাশ দিয়ে ধুলু-হুকা খেতো, তামাক চিটে গুড় কিনে দিতে হত। চুলকাটি বাজারে নামি। দোকান পাট ছিল। চিড়ে মুড়ি খাই। রাতে নামি। নৌকা ফিরে যায়। আমরা পেমেন্ট করি। চুলকাটিতে একটা অল্প বয়সী গাইড পাই। র্পসা বাগেরহাট

রেল লাইন এর নিরাপদ স্থানে পৌছে দেবে। চুলকাটি থেকে পায়ে হেটে পুর উত্তর দিকে রওনা দেই। ঐ রাত্রে আনুমানিক ৮ কিলো কিছুটা মাটির কিছুটা খোয়ার আমরা দু পাশ ধরে লাইন করে যেতে থাকি। অন্ধকার কৃত। কৃত দশটার পর হবে। একবারেই সামনে থেকে আদেশ আসে হল্ড। নোয়াপাড়া ক্যাম্প ছিল। আর্মী রাজাকার মিলেমিশে সম্মিলিত বাঙালীনাইট পেট্রল ছিল। আমি ৫/৬ জনের পিছনে ছিলাম। কেউ কেউ দুই দিকে দৌড় দেয়। সাথে সাথে তারা ব্রাশ করে। আমার পাশেই ছিল অমিতোষ (মেহেরপুর) তার রক্ত মাংস আমার গায়ে লাগে। আমি ফায়ার করতে করতে দৌড় দিই। বেতের কাটার ভেতরে আটকে যায়। অনেক কষ্টে পিছিয়ে আসি। ডাইনে কেটে পূর্ব দিকে হেটে যাই। একটা মাত্র** ম্যাগাজিন আছে। আর সব পড়ে যাই।বাগানের মধ্যে যেতে একটা বাড়ি পাই। তখন ফজরের আজান হচ্ছে। তখন অন্ধকার। ওখানে তখন খুব ফায়ার হচ্ছে। আবু তালেব শরীফ সহ ৮/১০ জনকে পাই। সংকেতের মাধ্যমে। অনেকের হাত খালি। আমরা দৌড়ে পূর্ব দিকে যতদূর সম্ভাব পালিয়ে যেতে থাকি। আমাদের কাছে গুলির কোন পোট ছিল না। বাচ্চার জন্য দৌড়ানো। বুঝতে পাড়ছি সবাই ঝোপ ঝাড় বাড়ি বাড়ি তলাশী চলছে একটা বড় ঝোপ পাই। ভোর হলে দেখি এটা কোন বড় ঝোপ নয়। চার দিকে রাস্ড়া একটা নোংরা ডোবা থেকে পানি খাই। নিরাপদ ভাবে ঝোপের ভিতর বসে থাকি। চার দিকে পাকিস্ড়ানী জিন্দার ইয়ার সালী ধবনি হচ্ছে। বেলা আট টায় দুজনে বাঁশ কাটতে আসে। আমরা লুকিয়ে থাকতে পারতাম। কিন্তু কাটা বাঁশ আমাদের গায়ে এসে পরবে। ফলে আমরা বাধা দিই। দুজনকে গ্রেফতার করি। কাছে রাখি। দুপুর ১টার দিকে একটা লোক দেখে ফেলে। তার চালচলন বলে দিচ্ছিল সে আমাদেরই খুজছে। তাকেও ধরে রাখা হয় লোকটা নারকেল গাছে উঠে নারকেল আলা ডাব পাড়ার অনুমতি চায়। আমরা ক্ষুধার্ত ছিলাম। বলি রাইফেল নিয়ে নিচে দাড়িয়ে। বলি কোন রকম চালাকি করলে শেষ। আমাদের এক জনের কালাম (কামার গ্রাম) থেকে ১ কেজি মাংসউড়ে যাই। তার হুস নেই। রক্ত পচা গন্ধে আমরা টের পাই, শোকে পাথর। ডাব খাওয়ার পর সন্ধ্যার আগে মাতবর গোছের একজন আমাদের কাছে আসে। ১/৪ মাইল দূরে তার বড় সড় বাড়ি। তাকেও আমরা সল্ট কই, ওখানে তখন সবাই রাজাকার। রজব আলী আমার বিত হওয়া শেষ। আলাপের কোন আগ্রহ নেই। জানিনা আপনারা কয় দিন খান না। আমাকে ছেড়ে দিন আমি খাবারের ব্যবস্থা করি। আমরা তার সাথে তার বাড়ি যাব বলি। সন্ধ্যার পর যাই তার বাড়ি ঘিরে রাখি। উত্তর পশ্চিম দিকে কাচা রাস্ড়া টিনের ঘর। বৈঠক খানা আছে। সামনে বিকট পুকুর। পায় সাওয়ালা। ১ঘন্টার মধ্যে খাবার রেডি হয়। ভাতটা সবে আনছে কাচারি ঘরের মেঝেতে বসে পেটে ভাত নিই। আবু তালেব সাদা ভাত মাখিয়ে মুখের কাছে তুলতেই গন্ধ পায়। বিষ। তালেব লাথি দিয়ে পেট উল্টে দেন এবং লেকেরা কে খোজা হয় কোথাও পাওয়া যায় নি। সে সেন্ট্রি এড়িয়ে পুকুর সাতরে ক্যাম্পে খবর দিতে গেছে বলে। আমরা বেশী হৈ চৈ না করে দ্রুত পালিয়ে যাই। যাতে লোকজানা জানি না হয়। দীর্ঘ হাটার পর রেল লাইন পাই। চিনে জোগের আক্রমণে অতিষ্ট। রেল লাইনের কাছা কাছি পৌঁছায়। রেল লাইনে আমি সেন্ট্রী। যাতে কেউ উপরে না ফেলে। মারুফকে সহ দুই জনকে এসএমজি দিয়ে পাঠানে হয় পূর্ব দিক বাগের হাটের দিক । একটা বাক ফায়ার দিবা। সুই সইড। যাতে ফায়ার শুনে আর্মীরা সে দিকে ** হয় এবং আমরা লইন ক্রাস করতে পারি। তারা ফায়ার দেয় এবং ইস্পিত ঘটনা ঘটে। লাইন ক্লিয়ার পেয়ে ক্রাস করি। হুড়া হুড়ি পায় তারা পরে দু জন আসেন। এক বুড়িকে মা ডেকে বলে আমরা মুক্তি যোদ্ধা। আমাদের বাঁচান ধানের গোলার মধ্যে লুকিয়ে রাখে এবং নিরাপদে পাড় করিয়ে দেয়। আমরা রেল ক্রস করে বারই পাড়া বাজারে পৌঁছায় তখন ভোর। দোকান থেকে চিড়া গুড় বিস্কুট কিনি। খাবার সংগ্রহ করে আমরা দেরী না করে রওনা দিন এবং দুটো টাবুরে নৌকা নিয়ে রওনা দিই। দড়াটানা নদীর হয়ে বিলে ঢুকি। ১১টার দিকে বামনডাঙ্গা (মোলারহাট থানায়) পৌঁছায়। হিন্দু এলাকা মুক্ত এলাকা। স্থানীয় লোকজন আগেই খবর পেয়ে গিয়েছিল। দই মিষ্ট চিড়ে। খাওয়া দাওয়া যখন শেষ তখন খবর আসে রাজাকাররা চরকুলিয়া আক্রমণ করতে আসছে। ৫ কিলোমিটার কয়েকজন ** ছুটিতে আসল পুলিশ, আর্মী, বিডিআর এরা মুক্তিযুদ্ধ করেছে। স্থানীয় ভাবে অস্ত্র সংগ্রহ করে বন্দুকই বেশী। ক্যাপ্টেন ফহমউদ্দীন নেতৃত্বে ছিলেন। তিনি ফাতলা ও চরকুলিয়ার দুটো ক্যাম্প চালাতেন আমরা দ্রুত তাদের সাথে যোগ দিই তারা পালিয়ে যায়।

৫৫ জনের মধ্যে ২৩ জনের হদিস পাওয়া যায়। ৩২ জন সম্ভবত মারা যায়। গলামারিতে নিয়ে মারা হয়। ৪জন পরে যোগ দেই, ছোট বলে তারা বেঁচে যায়।

হিঙ্গলগঞ্জ পার হয়ে পাকা রাস্ড়া। গাইড মোলাহাটের লোক না। এটা নকশাল এরিয়া, আপনি পজিশন নেন। আমি পজিশন নিই। দল চলে এলে উঠে পড়ি। আগে আগে থাকি। কখন গাইড চলে যায় জানি না। মোলারহাটের আর্মীরা ক্যাম্প করে। আমাদের বাড়ি পুড়িয়ে দেবে। আব্বা ১০ বস্ড়া চাল সিও (ডেভ) অফিসে রাখেন। ঐ বাড়িতেই ক্যাম্প। ১০ বস্ড়া চালই তারা প্রথম খায়। আব্বাকে মারতে নিয়ে যায়। তিনি বলেন ছেলেকে অনেক আগেই ত্যাজ করেছি। এভাবে বাঁচেন।

উদয়পুর উপর সাহেব বাড়িতে আম্মা গেলে তাকে ঢুকতে দেওয়া হয়নি সে আওয়ামী লীগ করে। খারিজ হয়ে গেছে। তওবা করে ফিরলে মা পড়ে নিজের বাড়িতে নিয়ে তাদের স্থান দেন, স্বাধীনতার পর।

চরকুলিয়ার প্রধান ফহমউদ্দীন, সহকারী আবু তালেব সামসুদ্দীন। ক্যাপ্টন সেলিম (পাকিস্ড়ানী) শুক্রবার মারা যান। আমার কাছে ** ছিল। আমরা কাঠের ব্রীজ ভেঙ্গে দিই। তারা মেসিনগান নিয়ে আসে। ২ সাইডে বিল মাঝে ১ মাইল মত গ্রাম চরকুলিয়া পার হই। ব্রীজ এর কাছে মসজিদ হাড়িদাহ গ্রাম।আমরা পজিশনে ছিলাম সবই টেঞ্চে। মোক্তাবের সাহেবের দোতালা বিল্ডিং এর ছাদে আমি** নিয়ে পজিশনে। তার বাড়িতে আমাদের ক্যাম্প। হাসান হানিফ আপন দুই ভাই। দুজনি**। সবার ধারণা তাদের গুলিতে ক্যাপ্টন সেলিম মারা যান। পাক

পজিশন ছিল ব্রিজের উপর পাশে আমার দক্ষিনে। চাকায় চলা হেডী মেশিন গান চালাচ্ছিল একজন সৈন্য। তার লক্ষ ঠিক ছিল না। ক্রুদ্ধ ক্যাপ্টেন লাথি মেরে সৈন্য টাকে খালের মধ্যে ফেলে ছিল। নিজে দায়িত্ব নিল। হাসান হানিফ ছিল একেবারে সামনে। সেলিম একবার ফায়ার সুযোগ পাই। তারা আর্মী হেলমেটে ফুটো হয়ে খুলি সহ খালে যেয়ে পড়ে।

দুপুরে তিনজন রাজাকার বৈঠক করতে আসে। আমার মার কাছ থেকে দোয়া নিয়ে আসে, মুক্তি মারতে যাচ্ছি তারা দাড়িওয়ালা। আমি এল এমজি সহ দূরে ছিলাম। এম গার্ভের ফুটো দিয়ে ওদের দেখি। এটা ছিল আনন্দের এক লাইন। তিন জন এক গর্ম মারা যায়। ক্যাপ্টেন সেলিম মারা যায় কয়েক দিন আগে। রবিবার রাজাকারের দিন দুপুরে রাজাকার সাজা হল। সকালে সিগারেটের প্যাকেটে মার চিঠি পেলাম। ৫০০ যাচ্ছে তোরা সাবধান হয়ে যা। দুদিন আগের থেকে ট্রেঞ্চ ছিলাম। এক কলসি দুধ, চিড়ে এবং ভারের সব থাকত। ভারী অস্ত্র নিয়ে নড়া চড়া যেতো। মোলাহাটের দক্ষিনের তেরখাদায় দুধ ছাগল তখন খুলনায় না যেয়ে আমাদের ওখানে যেত। ক্যাম্পটা ১/২ মাইলের দক্ষিণে খুলনার দিকে পিছিয়ে নিলাম নিরাপত্তার জন্য। ট্রেঞ্চে আছি এরও দুই সাইডে বিল। মাঝখানে গ্রাম। গ্রামের ভেতর দিয়ে রাস্ড়া তখন কাচা ছিল। ওটায় এখন যাওয়া মংলা রাস্ড়া। চরকুলিয়া গ্রাম। ওলি মন্দির খাল এর দক্ষিণে খালের উপর থেকে দক্ষিণে ক্যাম্প সরিয়ে আনা হয়।যার চিঠি পেয়ে সরে আসি। দ্রুত ট্রেঞ্চ যোড়া হয়। জনগন সাহায্য করে।

পাকিস্ড়ানী আর্মী বিকালে দোতালা বিল্ডিং উঠে এবং ধরে এনে জবাই করে খায়। খাওয়ার পার মগররেব আযানের পর চাঁদ ওঠার সাথে সাথে (৪/৫ দিনের চাঁদ) মর্টার ও রকেট লা হওয়ার দিনে আমাদের ক্যাম্পের উপর আক্রমণ চালায়। তারা কিভাবে আমাদের ক্যাম্পের অবস্থান ঠিক করেতা বিস্ময় কর। দোতালা দিয়ে ক্যাম্পের উপর মরছে। টিনের ঘরে ক্যাম্প। কভারিং ফায়ার। কিন্তু ১/৪ মাইল সামনে আমাদের ট্রেঞ্চ। কিন্তু ক্যাম্পের কেউই হতাহত হয় নি। কমান্ডার তিনজনের নির্দেশ ছিল আমার মেশিন গানের ফায়ারের আগে কেউ আগে ফায়ার করবে না। আমাদের ১ মাসের ট্রেনিং। খালের দক্ষিণ পাশের ১/২ মাইল জুড়ে আমাদের ট্রেঞ্চ। পিছনে এত গোলা মুক্তিযোদ্ধাদের বিভান্ড়ি হয় যে ওরা যে কোন ভাবে পিছন থেকে আক্রমণ করেছে এবং ঘিরে ফিলেছে। এরা পালিয়ে নাসোখালি বাজারের ভিতরে যায় দক্ষিণে। আমাদের কিছু জানা নেই। তারা যে চলে গেছে তা আমাদের জানা ছিল। কভারিং ফায়ারের মধ্যে নিচ দিয়ে পাকিস্ড়ানী আর্মীরা এগিয়ে আসে। এবং খালের (উত্তর) পাশে পজিশন নেই। ওখানে ট্রেঞ্চ ছিল না। পজিশন নিয়ে তারা বিভিন্ন অস্ত্র দিয়ে একভাবে ব্রাশ করতে ঐ সাথে গালাগালি বিভিন্ন বাসা। আমি কোন ফায়ার দিচ্ছি না। জ্যোৎনার হালকা আলোয় আমি তাদের দু চার জনকে আমি দেখতে পাচ্ছি। আমি ট্রেঞ্চ। মেশিন গান উপরে বুক পর্যন্ড় উঠে এম করে মারতে হবে। অন্ধের মত মরতে হলে হাত তুলতে হবে। দু ঠাং এর উপর। আমার কাছে ছিল বৃটিশ এল এমসি। কলিকার মত। গুলি ছিল পুড়ো এক বস্ড়া। ম্যাগাজিনে ৩০টা করে গুলি। ১০টা ম্যাগাজিন। কাওসার ছিল আমার সাথে। একটা রাইফেল ছিল বিপদের বন্দু হিসাবে। আমাদের পক্ষ থেকে কোন সাড়া না পেয়ে ওদের ধারণা হয় আমরা সবাই ভেগে গেছি।ওরা তখন আনন্দে ছড়িয়ে একত্রিত হয়ে মাথার উপর অস্ত্র তুলি ইয়ার আলী নাকিত্তান জিন্দার এবং মুক্তির মাকে। কওছার বলছে দাদা আয় কত গালগাল শোনাবেন। ১০টা ম্যাগাজিন পুরো লোড। অপেক্ষ কর। আরো একটু একত্রিত হোক তখন। ওদের কাছে রেডিওতে ফৌজি অনুধাবণ হচ্ছে। উচ্চ স্বরে। আমরা শুনতে পাচ্ছি। ব্যবধান মাত্র ২০/২৫ ফুট। ওরা খালের ওপাশে আমরা এপাশে। ওদের অসেডন উলাস দেখা যাচ্ছে। খালের এপাশে আসার উপায় নেই। ব্রীজ ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছে। কাওসার ক্রমগত ভাবে আমাকে উত্তেজিত করছে। ভিতরে কি হলো জানিনা। এল এমজি উচু করে ট্রেঞ্চের ভিতরে দাড়িয়ে গেছি। ব্রাশ করি। দেখি লোক পড়ে যাচ্ছে। গুলিতে না শুয়ে পড়ছে বুঝতে পারছি না। কোন আওয়াজও শুনতে পারছি না। গরম খোসা গুলো আমার মুখের পাশ দিয়ে গড়িয়ে বুকের পরে পড়ে। পুড়ে যায়। একটি স্প্লিন্টার বা কিছু একটা ডান চম্বুকে আঘাত হানে। কষ্ঠায় হাড়ে এল এমজি

নকশাল মারতা হ্যায়সেপ্টেম্বর,৭১

মকসুদ সাহেব মহেশ্বরপাশায় থাকেন। এখন এর নতুন নামকরণ হয়েছে কামালপাশা। পাশার সাথে মিলিয়ে এলাকার নামের ইসলামীকরণ করা হয়েছে। যারা করেছে তারা বুক ফুলিয়েই কৃতিত্ব জাহির করে– ইসলামী হুকুমতে কুফরি দেবতার নাম থাকবে না, তাই এলাকার নাম থেকে 'মহেশ্বর' বাদদিলাম আমরা।যিনি বদলে দেয়ার মূল হোতা শোনা যায় তিনি নাকি কলেজের প্রাক্তন অধ্যাপক। একজন অধ্যাপক ইতিহাস সম্পর্কে সামান্যতম ধারণাও রাখবেন না কিভাবে ভাবা যায়!

ক্যানভাসার টাইপেরমাঝবয়সী এক লোক রাস্তার মোড়ে নানা বয়সী কিছু ছেলে ছোকরা এবং অফিস ফেরতা কিছু লোকজনের সামনেদাঁড়িয়ে নাম পরিবর্তনের যৌক্তিকতা তুলে ধরে অনর্গল বকতে থাকেন– আমরা তো মুসলমান, এলাকার হিন্দুয়ানি নাম থাকবে কেন,নাম হবে ইসলামী, তাই নাম বদলে কামালপাশা রাখা হয়েছে। ঠিক কাজই করা হয়েছে, কি বলেন ভাইসব?.... সঙ্গের গুটিকয়েক ছেলে-ছোকরা পথচারীদের থামিয়ে এহেন মূল্যবান বক্তব্য শুনতে উদ্বুদ্ধ করে। মকসুদ সাহেবকেও সাইকেল থেকে নামতে হয়। কিয়ৎকাল দাঁড়িয়ে তিনিনিঃশব্দে সরে পড়তে চেষ্টা করেন। পাশ থেকে একজন ফস করে জিজ্ঞাসা করে বসেন, এই কামাল পাশাটা কে ?

নাউজুবিল্লা! মুসলিম জাহানের এতবড় একজন সিপাহসালার, নামও শোনেন নি! তুর্কি দেশের নাম শুনেছেন? কতশত বছর এই দেশের সুলতানরা মুসলিম জাহানের খলিফা ছিলেন, কামাল পাশাও সে দেশের একজন সুলতান।

ভাল ভাল– মকসুদ সাহেব নিঃশব্দে সরে পড়েন। এখন তিনি যদি বলেন, এই কামাল পাশা ভদ্রলোক তুর্কি খেলাফতের জটশুদ্ধু উপড়ে ফেলেছিলেন, ইস্তাম্বুলের বিশাল সোফিয়া মসজিদকে যাদুঘর বানিয়েছিলেন, বসে নামাজ পড়ার সিস্টেম চালু করেছিলেন, তুরস্কে পাশ্চাত্ব জীবন ধারার প্রবর্তন ঘটিয়েছিলেন, তাহলে উল্টে নিজেই এসব বেহেড লোকগুলোর হাতে কচুকাটা হবেন।

মকসুদ সাহেব মুর্শিদাবাদের উদ্বাস্তু মুসলমান, দাঙ্গার সময়ে দেশ ছেড়ে পূর্ব বাংলায় এসেছিলেন এবং বাড়ি বদল করে খুলনার মহেশ্বরপাশায় স্থায়ী হয়েছেন। তিনি আমাদের কলিগ।একদিন ভোরে অফিসে এসে বিমর্ষচিত্তে টেবিলের উপর অনেক্ষণ মাথা ঝুঁকিয়ে বসে থাকলেন। হাসিখুশি মানুষ, তবে '৭১-এর দিনগুলিতে কেই বা হাসি আনন্দে থাকতে পারত। খানিকক্ষণ উসখুস করে উঠে এলেন আমার টেবিলে। বললেন গতকাল চোখের সামনে মানুষ খুন হতে দেখে তিনি সারা রাত ঘুমোতে পারেন নি, এখনো স্থির হতে পারছেন না। এই প্রথম স্বচক্ষে মানুষ খুন হতে দেখলেন তিনি।

আমরা এই সেপ্টেম্বরেও প্রতিদিন নদীতে দু'চারটা লাশ দেখি। মৃতদেহ দেখে দেখে গা সওয়া হয়ে গেছে। কিন্তু আমি চোখের সামনে জলজ্যান্ত মানুষ খুন হতে কখনো দেখিনি। মকসুদ সাহেব গতকাল বিকালে তাই দেখেছেন, যা তাকে অস্থির করে তুলেছে।

গতকাল বিকালে অফিস শেষেতারা কয়েকজন নিত্যকার মত সাইকেলে বাড়ি ফিরছিলেন। বিহারী অধ্যুষিত খালিশপুরর পথ পরিহার করার জন্য তারা সেনহাটি ঘাট দিয়ে খেয়া পার হয়ে মহেশ্বরপাশায় যেতেন। অনেকটা পথ। তারা মহেশ্বরপাশার মোড়ে পৌঁছাতেই সামনে আর্মি দেখে দ্রুত সাইকেল থেকে নেমে পড়েসালাম দিলেন। তখন এটাই ছিল রেওয়াজ। সেখানে তখন রাস্তার দুপাশে ছোটখাটো ভিড়। এক পাশে আর্মি ভ্যান দাঁড়ানো। আর্মিদের সাথে কয়েকজন নেতাগোছের মানুষ শেরওয়ানি জিন্না টুপি পরে দাঁড়িয়ে আছে। এক পাশে গাছের গুড়ির সাথে বাঁধা এক বৃদ্ধকে দেখে তিনি থমকে গেলেন, বৃদ্ধ হিন্দু। তাকে আগেও দেখেছেন। পথের পাশে এক ভাঙ্গাচোরা দালানের বারান্দায় দু হাঁটুর মধ্যে মাথা ঝুঁকিয়ে গুড়ুক গুড়ুক করে হুকোয় তামাক খেতেন আর খক খক করে কাঁশতেন। একেবারে জয়িফ মানুষ। তার বাড়ির সবাই ভারতে চলে গেছে। তিনি পৈতৃক ভিটে আগলে পড়ে আছেন। ছেলেরা বৃদ্ধ বাবাকে,বোঝা হবেন ভেবে অথবা বাড়ির পাহারায় কেউ না কেউ থাকুক এমন বিবেচনায়সঙ্গে নিয়ে যেতে তেমন জোর করেনি। জোর অবশ্য একজন করেছিলেন– তার স্ত্রী। কিন্তু বৃদ্ধ রাজী না হওয়ায় তিনিও স্বামীর সাথে থেকে গেছেন।

এটা বাড়াভাতে ছাই দিয়ে বসার মত হতাশ করেছে এলাকারসুযোগসন্ধানী লোকদেরকে। অনেকখানি বাগান সহ বাড়িটার উপর তাদের অনেক দিনের লোভ। এখন সুযোগ বুঝে তারা আর্মি নিয়ে এসেছে, তাদের হাতে সহজ প্রমাণও আছে। পাড়ার সবাই জানে তার এক ছেলে নকশাল করে, দীর্ঘদিন থেকেই ফেরার।

আর্মিরা বুড়ো বুড়িকে দেখে খানিকটা হতাশ হয়েছিল। কিন্তু অভিযোগ, স্বাক্ষ্য প্রমাণ সবই অকাট্য– 'স্যার এই বুড়োটাই পালের গোদা, খুবই খতরনাক আদমি। রাত বিরেতে উসকা ঘরমে গাদ্দার, মিসক্রিয়েন্ট আউর নকশাললোগ আতা যাতা হ্যায়। হামলোগ আপনা আঁখুছে দেখা, ঘরমেখানাপিনাকা এনতেজাম হোতে ভি দেখা।দেখিয়ে না স্যার শ্রেফ দো বুঢ্ঢা বুঢ্ঢি, ফির ঘরমে কেতনা চাউল, ডাউল, ঘি সব মজুদ করকে রাখ্যা হ্যায়।'

হ্যা, ছেলেরা যাওয়ার আগে বাবা-মা'র জন্য বেশ কিছু দিনের খোরাক মজুদ রেখে গেছে। সেটাই এখন কাল হল।ওরা বুড়ো লোকটাকে ধরে নিয়ে গেল। বুড়িটা স্বামীকে আঁকড়ে ধরতে যেয়ে দড়াম করে মেঝের উপর আছড়ে পড়ল।

মোড়ের উপর পথচারীদের হালকা ভিড়। সবাই যখন বিষয়টা আঁচ করতে পারল দ্রুত সড়ে পড়ার চেষ্টা করল। কিন্তু একটা কঠোর আদেশ তাদেরকে স্থনুবৎ দাঁড় করিয়ে দিল– 'কোই আদমী হিলেগা নেহি। ইয়ে আদমী নকশাল হ্যায়, কমুনিস্ট, ইসলাম কা দুশমন। ইনকো সাজা মিলেগা।'

বুড়ো লোকটা গাছের সাথে তারই গামছা দিয়ে বাঁধা। তাকে মোড় পর্যন্ত টেনে হিঁচড়ে আনা হয়েছে। নিজের পায়ের উপর এমনিতেই বল নেই। এখন তো দাঁড়াতে পারায় প্রশ্নই ওঠে না। তার পা দুটো কুঁকড়ে যায়, মাথাটা মাটির দিকে ঝুঁকে পড়ে, শীর্ণ বুকের উপর ততোধিক শীর্ণ হাত দুটো জোড় করে নির্বাক মিনতি জানাতে থাকে।

কমান্ডারের আদেশ পেয়ে একজন আর্মি তার চাইনিজ রাইফেলটা কাঁধ থেকে নামিয়ে দু'পা এগিয়ে যায়। সবাই নির্বোধ আশা নিয়ে বোবা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে,বিশ্বাস হতে চায়না এমন জয়িফ একজন মানুষকে কেউ মারতে পারে। অন্তহীন নিস্তব্ধতার মধ্যে রাইফেল কক করায় শব্দ প্রচন্ড হয়ে কানে বাজে। চমকে ওঠে সবাই। পালানোর জন্য আবার হুটোপুটি পড়ে যায়। কমান্ডার ক্রুদ্ধস্বরে চিৎকার করে ওঠেন– 'ভাগতা কিউ?সব চুপচাপ আপনা জাগে পর খাড়ে রহ, হাম তো নকশাল মারতা হ্যায়। সবকো দেখ্নাচাহিয়ে গাদ্দারীকা নতিজা কেয়া হোতা হ্যায়!

মকসুদ সাহেব সঠিক মনে করতে পারেননি কখন গুলি হয়েছিলবা কয়টা গুলি হয়েছিল। তার অনুভূতি সম্ভবত ভোতা হয়ে গিয়েছিল। যখন খেয়াল হল, দেখলেন লোকটার মাথা মাজা থেকে আরো ঝুঁকে পড়ছে, জোড় হাত দুটো আলগা হয়ে ঝুলে গেছে ঝাঁঝরা হয়ে যাওয়া দেহের দু'পাশে।

ঘোর অনিচ্ছা সত্ত্বেও দু দিন ধরে দেখতে হয়েছিল দৃশ্যটা। আর্মিদের হুকুমে সেভাবেই ঝুলছিল বুড়োমানুষটার লাশ।

চেয়ারম্যান মনসুর সাহেব-৬১

রাজাকাররা কাজদিয়ার চেয়ারম্যান মনসুরুল হককে মেরে ফেলল। তিনি ছিলেন মুসলিম লীগ নেতা। দেশভাগের আগেমুসলিম লীগ নেতা খান সবুরের আহ্বানে সরকারি চাকরি ছেড়ে তিনি মুসলিম লীগের রাজনীতিতে সক্রিয় হন। পরবর্তী দুই যুগে মুসলিম লীগ ও খান সবুরের খোল নালচেআমূল পাল্টে গেছে, কিন্তু মনসুর সাহেব বদলান নি। মুসলিম লীগ ও নীতিবোধ কোনটাই ছাড়েননি। একাত্তরে যখন মুসলিম লীগ ও জামাত হানাদার আর্মির মদদে দেশ থেকে হিন্দু ও আওয়ামী লীগ বিতাড়নে ব্যস্ত, মনসুর সাহেব তখন নিজ এলাকায় তাদের আশ্রয় দিয়ে রেখেছিলেন। এটা তাদের গাত্রদাহের কারণ হয়।

বাগেরহাটের রাজাকার কমান্ডার দুধর্ষ রজব আলী আগেও একবার তাকে মারার জন্য বাহিনী নিয়ে ফকিরহাটে এসেছিল। কিন্তু থানার ওসি নদীর ওপারে ভোটপুরে তাদের আটকে দেন এবং গোপনে খবর পাঠিয়ে মনসুর সাহেবকে সতর্ক করেন। ফিরে যাওয়ার আগে রজব আলী বলে যায়, মনসুরের আয়ু কদিন বেড়ে গেল। কিন্তু কদিন ?

মনসুর সাহেবেরএলাকায় ছিন্নমূল হিন্দুরাবিভিন্ন জায়গা থেকে এসে আশ্রয় নিয়েছিল। এতে মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ তার উপর খুবই অসন্তুষ্ট হয় এবং হিন্দুদের তাড়িয়ে দিতে বলে।তিনি অস্বীকার করলে বাগেরহাটের মুসলিম লীগ নেতা মোজাম ডাক্তার তার সাথে দেখা করেন। তিনি বিস্মিত হয়ে বলেন, তোমার এলাকায় তো একটা ঘরও পোড়েনি দেখছি, হিন্দুরা বেশ বহাল তবিয়তেই আছে। বহু হিন্দুর চলে যাওয়া ঠেকিয়ে তাদের আশ্রয়ও দিয়ে রেখেছ। আঠারোবেকি নদী থেকে চাল, গম বোঝাই নৌকা লুট করে এনে তাদের খাওয়াচ্ছো। রাজাকার বাহিনী না করে, গ্রাম কমিটি করেছো, তাতে আবার গাদ্দারদেরও ঢুকিয়েছ। তোমার উদ্দেশ্য নিয়ে সবাই যে চিন্তিত সেটা আশা করি জানো।

চিন্তিত হওয়ার কোন কারণ নেই, গ্রাম কমিটিতে সব ভাল লোকেরাই আছে। সবাই পাকিস্তানে বিশ্বাসী। '৭০-এ কে কিসে ভোট দিয়েছে ওটা অবশ্য দেখিনি। আর তোমরা ভালই জানো আমি লুটপাটে থাকিনা।

শোনো তেমার ভালর জন্যিই বলি, আর্মিরা যাতে খুশি হয় তাই কর। আমি খালি খালি আসিনি, লীডার পাঠিয়েছেন তাই। এটা ইসলাম আর পাকিস্তানের প্রশ্ন।

আমি কিন্তু ইসলামের অনুশাসনই মানছি, অসহায় মানুষকে আশ্রয় দিয়েছি। আমি তাদের থাকতে বলিনি, চলে যেতেও বলতে পারব না। তারা নিজ ইচ্ছায় যদি যায়, ঠেকাতেও যাব না।

তুমি আমি ইসলামের কি বুঝি। শুধু কোরান হাদিস পড়ে গেলেই হল, এতই সোজা! এর আসল ব্যাখ্যা ইমাম সাহেব, আলেম সাহেবরাই দিতে পারেন। যাক গে তুমি সুরা হাশর পড়ে দেখো কাফেরদের সম্পর্কে কি নির্দেশ আছে।

মোজাম ডাক্তারের সাথে একজন লেবাসধারী ভদ্রলোক ছিলেন, সম্ভবত কোন আলেম, বললেন– হা চেয়ারম্যান সাহেব, কোরান শরীফে আল্লাহপাক বলছেন যে 'কিতাবীদের মধ্যে তিনি মোনাফেকদের সর্বাগ্রে তাদের আবাসস্থল থেকে বের করে দিলেন। তোমরা বুঝতে না যে, তারা সত্যি সত্যি দেশ থেকে বিতাড়িত হবে এবং তারাও ভেবেছিল যে তারা সুরক্ষিত দূর্গে আছে যা তাদের বাঁচাবে। কিন্তু সব মিথ্যে করে তাদের উপর আল্লার গজব নেমে এল। তারা নিজেরা এবং মুমিনরাও তাদের ঘর-বাড়ি ধ্বংস করে দিল। আর তাদের ভাগ্যে যদি নির্বাসন লেখা না থাকত তবে এই জমিনেই তারা নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত।' এটাই হচ্ছে নির্দেশ, আপনি নিজেই সুরা হাশর পড়ে দেখতে পারেন। এখন আপনি যদি তাদের বিতড়িত না করেন তারা হয়তো এখানেই নিশ্চিহ্ন হবে, কোনটা ভাল?

মনসুর সাহেব বললেন, হুজুর আপনার কাছে সামান্য কিছু প্রশ্ন আছে।

বলেন।

হিন্দুরা কি কেতাবী? তারা কি মদিনার ইহুদিদের মত বর্তমান যুদ্ধে পাকিস্তান আর্মিকে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যা তারা ভঙ্গ করে মোনাফেক পদবাচ্য হয়েছে?

না, ঠিক তেমন নয় অবশ্য। তবে সব কিছু কি হুবহু মেলে?

তাহলে সুরা হাসরের বরাতে চুক্তি ভঙ্গ বা মোনাফেকি করার মত অপরাধের দায় এবং দেশ থেকে বিতাড়ন অথবা নিশ্চিহ্ন করার মত এতবড় শাস্তি তাদের উপর চাপাচ্ছেন কেন? পথে কোন বিপদ হলে এতগুলো মানুষের জীবনের দায় কিন্তু আপনাকেই নিতে হবে!

'আল্লাহ্ পাক সর্বজ্ঞ, তিনিই ভাল জানেন'– মাওলানা সাহেব বিড় বিড় করে জিকির করতে করতে গাড়ির দিকে হাঁটতে থাকেন।

জুলাই মাসের মাঝামাঝি কোনো একদিন গ্রাম কমিটির সদস্য ফজলার রহমান সঙ্গীসহ বাজার থেকে ফিরছিলেন। রাস্তা আশ্চর্য রকম ফাঁকা এবং সুনশান দেখে তারা বিস্মিত হলেন। এ সময় হঠাৎবিশ পঁচিশ জন রাজাকার রাইফেল উচিয়ে হৈচৈ করতে করতে তাদের অতিক্রম করে গেল। তারা বলাবলি করছিল– 'ব্যাটা বড় বেশি বেড়ে গেইল।'

কিছুক্ষণ পর তারা লোকজন নিয়ে পথে বেরিয়ে কেষ্ট খার পুকুর পাড়ে দুটো গুলিবিদ্ধ লাশ দেখতে পেলেন। লাশ দুটো এলাকার দীর্ঘ দিনের জনপ্রিয় চেয়ারম্যান মনসুরুল হক এবং তার সাথি আব্দুর রশীদ খানের, তারা হাহাকার করে উঠলেন।

দুর্দিনের আশ্রয়ের খুঁটিটা উপড়ে গেছে। হাজার হাজার আশ্রিত হিন্দু আবার ছিন্নমূল হয়ে পথে নামল। কে মারা পড়ল, কে কোন দিকে ছিটকে গেল কে জানে!

শফিক রাজাকার হল

শনিবার আমাদের হাফ অফিস, ড্রাইভার পঞ্চবীথির মোড়ে নামিয়ে দিয়ে গেছে। রিকশা নেই একটাও। সামান্য পথ, হেঁটে বাড়ি যেতে দশ-বারোমিনিট সময় লাগে।কিন্তুকথায় বলে 'বাঘের দেখা, সাপের লেখা'–আমার ভয় সেখানেই। আমি আর্মি, রাজাকারবা শান্তি কমিটির কারো সামনে পড়তে চাই না। তাই রিকশার বিলাসিতা। হুড তুলে দিলে খানিকটা আড়াল পাওয়া যায়। অথচএকটা রিকশাও নেই। প্রায়ই এমন হয়, রিকশা এখন খুবই বিরল।

দ্রুত পা চালাই। টি.বি. বাউন্ডারি রোড দিয়ে মৌলবীপাড়ায় ঢুকতেই চাপটা হালকা বোধ হয়। গলি টাইপের রাস্তা, বড় রাস্তার চেয়ে অনেক নিরাপদ। কিন্তুকিছুটা অগ্রসর হতেই চমকে উঠি। শফিককে দেখে চমকে ওঠার কথা নয় মোটেও। কিন্তু চমকে দিয়েছে ওর ঘাড়ের থ্রি নট থ্রি রাইফেল এবং পরনের খাকি জামা। দৃষ্টি বুকের দিকে। তখনও জামার সবকটা বোতাম লাগানো শেষ হয়নি। বোঝা যায় ব্যস্ততার সাথে বাড়ি থেকে বেরিয়েছে। সামান্য পেছনেই বাড়ি।

আমাকে দেখে সেও একইভাবে চমকালো। দু'চোখ বিস্ফোরিত, বোতাম হাতে ধরাই থাকল। থমকে দাঁড়িয়ে আমতা আমতা করে বলল– আমার উপায় ছিল না ভাই। বড় ভাইয়ের খবর নেই, বাড়িতে বোনেরা আছে। পাড়ার লোকেরা বলে তোমার ভাই মুক্তিযুদ্ধে গেছে, সবাই জানে। তাকে জলদি হাজির কর, নয়ত আর্মি খবর পেলে গোটা পাড়ায় তুলকালাম কান্ড ঘটাবে। ভাই মুক্তিযুদ্ধে গেছে আমাদের মোটেও বিশ্বাস হয়না। যুদ্ধ করবেকি, ওতো প্রচণ্ড ভিতু? কিন্তু সে আর ফিরল না। কোথায় গেছে, কোথায় আছে জানিনা! বড়চাচা শান্তিকমিটির লোকজনদের ধরলেন। আমরা রক্ষা পেলাম কতকগুলো কারণে– আব্বার চাকরির সুবাদে আমরা দীর্ঘদিন কলকাতায় ছিলাম, রিফিউজি হিসাবে নিজেদের পরিচিত করতে সেটা কাজে লাগল, আমাদের পরিবারে কেউ কেউ এখনো মুসলিম লীগ করে, বাবা চাচারাও উর্দু ভোলেন নি। এক জামাত নেতা কটাক্ষ করলেন– মুরুব্বিরা মুসলিম লীগের, ছেলেরা জয় বাংলার– বাহ চমৎকার! বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা! সাধে কি আর দেশের এই হাল হয়।

বড়চাচা দুঃখ প্রকাশ করলেন– আমাদেরই ভুল হয়েছে। আমরা ছেলেদের দিকে ঠিক মত নজর দেইনি। আসলে এতটা ভাবিওনি কখনো। তিনি কথা দিলেন ভবিষ্যতে এমন ভুল আর হবে না।

ভাই, বুবুদের কথা ভেবে রক্ত হিম হওয়ার অবস্থা। কি আর করতে পারতাম, শান্তিকমিটির হুকুমে রাজাকারের খাতায় নাম লিখিয়েছি। জানিনা ভাগ্যে কি আছে! আমাকে যেতে হবে ভাই, দেরি হয়ে গেছে।

বললাম– শফিক, সবারই একই অবস্থা। আমি চাকরিতে জয়েন করে রাজাকার হওয়ার হাত থেকে বেঁচেছি। যা হোক, তুমি কিন্তু কোথাও আমার কথা বোলো না, ভুলে যাও আমাদের কখনো দেখা হয়েছিল।

শফিক অল্প বয়সী ছেলে, সবে কলেজে ভর্তি হয়েছে। তবে রমিজের চেয়ে তাকে বড় দেখায়। সেটাই তার কাল হয়েছে। রমিজ ডিগ্রীর ছাত্র ছিল। ছাত্রলীগের ছেলেদের সাথে ঘুরত, সামনে পড়লে মিছিল জনসভায় অংশ নিত, তবে জায়গা নিত একেবারে পিছনে। ২৬ ডিসেম্বর আমি তাকে শেষবারের মত দেখি, রাস্তায় বন্ধুদের সাথে ব্যারিকেড দেয়ার কাজে হাত লাগিয়েছে।

আর্মিরা ধীরে ধীরে জাঁকিয়ে বসতে শুরু করেছিল। প্রতিরোধকারীদের দেশের সীমানা ছাড়া করা হয়েছিল। যারা দেশের মধ্যে ছিল তারাও চলে গিয়েছিল দুর্গম বিল-জলা ও জঙ্গলের গভীরে। তবে এই প্রাথমিক সাফল্য পাকিস্তানিদের স্বস্তি দিতে পারেনি। মুক্তিযোদ্ধারা প্রথম দিকে সীমান্ত এলাকায় তাদের তৎপরতা অব্যাহত রাখলেও জুলাইয়ের মধ্যে ভারত থেকে ট্রেনিং এবং অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে দলে দলে দেশের গভীরে ঢুকে পড়ছিল।

আর্মিদের পথ চিনিয়ে দেয়া, কথিত দুষ্কৃতিকারীদের কাউন্টার করা, ব্রীজ কালভার্ট পাহারা দেয়া এবং পাকিস্তান বিরোধী লোকদের চিহ্নিত ও নিশ্চিহ্ন করার জন্য রাজাকার বাহিনীর কলেবর বৃদ্ধির প্রয়োজন দেখা দেয়। তখন পাকিস্তানি ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ লোক সংখ্যা এত বেশি ছিলনা যে স্বেচ্ছায় এই ঘৃন্য বাহিনীতে যোগদানের হিড়িক পড়ে যাবে। যুবকদের বাধ্য করার প্রশ্ন উঠল।

বাবা একদিন এশার নামাজ শেষে ঘরে ফিরছিলেন। একজন প্রতিবেশী গতি শ্লথ করে বাবার পাশাপাশি পিছিয়ে এলেন, ফিস ফিস করে বললেন– খবর শুনেছেন কায়ছার সাহেব, এবার পাড়ার প্রত্যেক বাড়ি থেকে একজন করে ছেলেকে নাকি রাজাকার বাহিনীতে যেতে হবে। শান্তিকমিটি নাকি শিগ্‌গির এই প্রোগ্রাম নিয়ে মাঠে নামছে।

বাবা উদ্বিগ্নভাবে জিজ্ঞাসা করলেন কোথায় পেলেন এ খবর ?

আমাদের আগের কাজের মেয়েটা এবং বস্তির আরো দু তিনটে মেয়ে এখন পাড়ার জামাত নেতার বাড়িতে সকাল সন্ধ্যা গাদা গাদা রুটি বানায়। কোন এক ক্যাম্পে নাকি পাঠায় রুটিগুলো। ঐ বাড়িতে মাঝে মাঝে মিটিং হয়। চা দিতে যেয়ে মেয়েটা শুনে ফেলেছে। তবে তার শোনাটা ভুলও হতে পারে। থাকগে, কাউকে বলবেননা যে কথাটা আমি বলেছি। অনেক বাড়িতে যুবক ছেলেরা আছে তো, তাই বলা আরকি।ভদ্রলোক রাজনীতি করতেন না, কারো সাতে-পাঁচেও থাকতেন না। কেউ জানত না তার আনুগত্য কোন দিকে। আদতে চাকরি, সংসার এবং মসজিদের বাইরে তার কোন চিন্তা থাকতে পারে, কেউ তা কখনো ভাবেনি।

যাহোক আশেপাশের যে সব বাড়ির ছেলেরা যুদ্ধ-ভীতি এবং পিতা-মাতার অশ্রুজলের কাছে নতি স্বীকার করে এযাবৎ বাড়িতে থেকে গিয়েছিল সেসবছাত্র এবং বেকার ছেলেরা এবার পিতা-মাতার দোয়া মাথায় নিয়ে ব্যাপক সংখ্যায় নিঃশব্দে বাড়ি থেকে উধাও হল।তবে পাকিস্তানি দালালদের স্যাটানিক দুর্বুদ্ধি থেমে থাকল না। অনেক এলাকায় তারা লিস্ট তৈরি করল– কে থাকল কে হারালো তার লিস্ট। সন্দেহ সবাইকে কুরে কুরে খেতে থাকলো। কে কখন কার নাম কোথায় ঢুকিয়ে দেয়! বিশেষত যাদের বাড়িতে বয়স্থা মেয়ে আছে তাদের রাতের ঘুম হারাম হয়ে গেল।

লিস্ট ধরে এখানে ওখানে বেশ কয়েকটি বাড়িতে হানাদিল তারা। যে সব বাড়িতে কাংখিত ছেলেদের পাওয়া গেলনা, ধরে নেয়া হল তারা মুক্তিযুদ্ধে গেছে। ওরা অভিভাবকদের হুমকি দিল যেভাবে হোক ছেলেদের ধরে এনে আর্মিদের হাতে তুলে দাও, নইলে তারা বাড়ির যুবতী মেয়েদের ক্যাম্পে ধরে নিয়ে যেতে পারে, তখন কিন্তু আমরাও কিছু করতে পারব না। একটা পরিবারে এরচেয়ে বড় কষ্টের আর কিছু ছিলনা। ক্যাম্পে এ সব হতভাগ্য মেয়েদের কি হাল করা হয় এর বহু দৃষ্টান্ত তখন মুখে মুখে ছড়াতো।তীব্র ঘৃণার মুখে পড়ল এসব দালালরা। চোটপাট দেখাতে যেয়েও তারা বিশেষ সুবিধা করতে পারল না, তাদের নিজেদেরই ঘনিষ্ঠ কিছু পরিবারও একই সমস্যায় জড়িয়ে গিয়েছিল।

আব্দুর রউফ, বাবা এবং জজ সাহেব

বাবা মারা গেলেন একাত্তরে। সেটা এমন একটা সময় যখন জীবন-মৃত্যু অতি সুক্ষ্ম সুতার উপর দোদুল্যমান ছিল। তিনি কার্ডিয়াক অ্যাটাকে মারা গেলেন, তবে তার মৃত্যু নিছক অসুস্থতাজনিত এটা মেনে নেয়া কঠিন। তখন আনোয়ারের পোস্টিং ছিল করাচিতে মসরুর এয়ারবেজে। তার চিঠি পেয়ে বাবা বিচলিত হয়ে পড়েন। সে সেখানে এয়ার ফোর্সের বাঙালি সৈন্যদের হীন ও অনিশ্চিত জীবন সম্পর্কে লিখেছিল। ৩০ জুলাই তার চিঠির জবাবে বাবা লেখেন– 'দুনিয়ার জীবন অসার, পরকালের জীবনই শ্বাশ্বত, যদি মৃত্যু হয় যেন মোমিনের মৃত্যু হয় সেই কামনা কর। এখানেও মানুষকে পাখি মারার মত মারা হচ্ছে। কুকুর বিড়ালকেও মানুষ এভাবে মারে না। কেউ বুঝতেও পারছে না কি তার অপরাধ এবং কেন তাকে মারা হচ্ছে। এখানকার মত অবস্থা, খারাবী দুনিয়ার কোথাও নেই। ...তুমি আল্লাহকে স্মরণ কর, তোমার কর্তব্য কর এবং নিজের ও সকলের হেফাজতের জন্য দোয়া ইউনুস ও আয়তল কুরছি পড়।' পরদিন ৩১ জুলাই বাবা তাকে আবার পোস্টকার্ডে

চিঠি দেন। তখন চিঠি চলাচল অনিশ্চিত ছিল এবং অধিকাংশ চিঠি প্রাপকের হাতে পৌঁছাতো না। বাবার এই শেষ চিঠিটাও আনোয়ারের হাতে পৌঁছায়নি, রি-ডাইরেক্ট হয়ে বাড়িতে ফিরে আসে। তার আগেই ১ আগস্ট সকালে বাবা দুনিয়া ছেড়ে চলে যান।

বাবা ছিলেন জজ কোর্টের হেডক্লার্ক। সে সময় পুরানো কোর্ট বিল্ডিং-এর বারান্দায় দাঁড়ালে সরাসরি সার্কিট হাউস এবং হেলিপোর্টের সবকিছু দেখা যেত। মাঝে দু'শ আড়াই'শ ফুটের মত খোলা মাঠ ও রাস্তার ব্যবধান। সার্কিট হাউস ছিল খুলনায় মোতায়েন ২২-ফ্রন্টিয়ার ফোর্সের হেডকোয়ার্টার এবং পাশের হেলিপোর্ট ও হেলিপোর্ট অফিস ছিল তাদের ইন্ট্রোগেশান ও টর্চার কেন্দ্র। পুরো একাত্তর জুড়ে কর্ণেল শামস-উজ-জামান ও মেজর বাবর প্রমুখের নৃশংসতার বলি কত যে বাঙালি সন্তানের ক্রন্দন, দীর্ঘশ্বাস ও আর্তনাদ এখানকার মাটিতে মিশে আছে তার হিসার নেই। সার্কিট হাউজের এক্সটেনশন ও সৌন্দর্যবৃদ্ধির আড়ালে সেসব চিহ্ন এখন হারিয়ে গেছে।

প্রতিদিন কোথা থেকে তারা অসংখ্য বাঙালি তরুণ, যুবা ও মাঝবয়সীদের ধরে এনে এখানে নির্মম নৃশংসতায় মেরে ফেলে অথবা আধমরা করে সার্কিট হাউজের পিছনে বড়সড় এক গর্তে ফেলে রাখতো। অত্যন্ত নগ্নভাবে কোর্টভর্তী লোকের সামনে হেলিপোর্টে কাঠের ফ্রেমে বেঁধে এবং হেলিপোর্ট অফিসের বারান্দার আড়ায় উল্টোকরে ঝুলিয়ে লোকগুলোকে ঘুষি ও লাথি মেরে, রাইফেলের কুঁদো ও লাঠি দিয়ে পিটিয়ে এবং বেওনেট দিয়ে খুঁচিয়ে অমানুষিকভাবে নির্যাতন করা হত। ক্রমাগত নির্যাতনে তাদের আর্তনাদ ক্ষিণ থেকে ক্ষিণতর হয়ে আসতো এবং যখন মৃতবৎ হয়ে যেত টানতে টানতে নিয়ে সার্কিট হাউসের পিছনের বড় গর্তে ফেলে রাখতো। এরা প্রায় সকলেই ছিল নিরীহ মানুষ, স্বীকারোক্তি দেয়া বা যোগানোর মত তথ্য তাদের কাছে ছিলনা। কিন্তু নিরেট আর্মিদের কাছে এসব হতভাগ্যের একমাত্র পরিচয় ছিল জাসুস (গুপ্তচর) অথবা গাদ্দার (দেশদ্রোহী), ধরার মুহূর্তে যাদের ললাটে চরমদণ্ডের বিধান লেখা হয়ে যেত। সন্ধ্যা নেমে এলে এসব হতভাগ্য লোকগুলোকে গর্ত থেকে উঠিয়ে ফরেস্ট ঘাটে নিয়ে বিহারী জল্লাদের হাতে তুলে দিত জবাই করে পেট চিরে ভৈরবের জলে ফেলে দেয়ার জন্য।

এই দৃশ্য দিনের পর দিন কোর্টের লোকজনকে ক্লান্ত করে তুলছিল। আব্দুর রউফ ছিল বাবাদের অফিসের পিওন, শেষমেষ সইতে না পেরে একদিন বাবাকে বলল– জজ সাহেব তো কর্ণেল সাহেবের সাথে কথা বলে এখানে এসব বন্ধ করতে পারেন। বাবা নিজেও পীড়িত হয়ে পড়েছিলেন, রোজ বাড়ি এসে হতাশায় ভেঙ্গে পড়তেন। জজ সাহেবের নিজের তাগিদও অনেক বেশী তীব্র ছিল। তিনি কর্ণেল সাহেবের সাথে দেখা করেন। কর্ণেল শামস বিস্মিত হয়ে বললেন– আই থিংক পেট্রিওটিক মুসলিম শুড ফিল হ্যাপি অ্যাট দ্য ডেথক্রাই অব হিজ এনিমিজ, বাট ইউ আর সারপ্রাইজিংলি গেটিং হার্ট, হেল ইউ! মাইন্ড ইট, হেন্সফোর্থ উই উইল কিপ অ্যান আই অনইউ পিপল। নাউ গেট অফপ্লিজ।

একাত্তরে এটা ছিল চরম হুমকি। সরল সাদাসিধা নেছার উদ্দিন সাহেব ইতোপূর্বেই মৃতবৎ হয়ে পড়েছিলেন, বাবা এবং কয়েকজন যখনআলোচনার ফলাফল জানতে তার সাথে দেখা করেন, তিনি গভীর হতাশা নিয়ে বলেছিলেন– কায়ছার সাহেব, এ নিয়ে আর কখনো কথা বলবেন না এবং নিজেদের রিস্কি করবেন না, যান কাজে যান।

বাবা বিড় বিড় করে বললেন, চোখের সামনে এসব দেখলে কি ভাবে কাজ করা যায় স্যার!

– দেখেন কেন? দরজা বন্ধ রাখেন।

– দরজা তো বন্ধই থাকে স্যার, কিন্তুআর্তনাদ ঠেকাই কিভাবে।

জজ সাহেব যেন খেপে গেলেন, চিৎকার করে উঠলেন– শুধু আপনারাই শোনেন, আমি শুনিনা? আপনারা কতক্ষণ শোনেন! আমি তো দিনরাত ২৪ ঘণ্টা শুনি!

সার্কিট হাউজের টরচার কেন্দ্র থেকে জজ সাহেবের অফিস ও বাসার দূরত্ব দুশ গজও নয় এবং ফরেস্ট ঘাট বধ্যভূমি থেকে ৫০ গজও নয়। গভীর রাত পর্যন্ত হতভাগ্য মানুষের বিভৎস জবাই চলে সেখানে। রাতের নিঃস্তব্ধতা চিরে হতভাগ্য মানুষের আর্তনাদ ও গোঙানি তার হৃৎপিন্ডকে রক্তাক্তকরে। দিনের পর দিন এসব শুনতে শুনতে তিনি সহ্যের শেষপ্রান্তে পৌঁছে গিয়েছিলেন। ৩০ মে ভাল মানুষটা হঠাৎ করেই দুনিয়া ছেড়ে চলে গেলেন। কয়েকদিন পর স্ট্রোকে মারা যায় পিওন আব্দুর রউফ এবং ১ আগস্ট কার্ডিয়াক অ্যাটাকে বাবা। মাত্র দুমাসের মধ্যে প্রতিবাদী তিন জনের মৃত্যু স্বাভাবিক ঘটনা ছিলনা মোটেও। তারা আর্মির গুলিতে মরেন নি বটে, কিন্তু তাদের কারণেই অকালে স্ট্রোক ও হৃদরোগে জীবন দিয়েছেন।

বাবার খুব আগ্রহ ছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতা দেখার, দেখে যেতে পারেননি। তার অনেক কষ্ট ছিল। অতি শৈশবে তার সাথে আমার অনেক সুখস্মৃতি– তার আঙ্গুল ধরে ঘুরে বেড়ানো, অনর্গল বকে যাওয়া। অথচ বড় হয়ে তাকে এড়িয়ে চলা শুরু করেছি। এক ছাদের নিচে থাকি, দেখা হয়, কথা হয় না। হঠাৎ হঠাৎ হয়ত হয়, দায়সারা দু'চারটে কথা।

বাবার সাথে শেষ কথা হয়েছিল জুলাইতে। একরাতে এশার নামাজ শেষে বাড়ি ফিরে তিনি গভীর হতাশায় ভেঙ্গে পড়েন। তার জানা ইসলামের সাথে খুলনার তারই এক শ্রদ্ধাভাজন মওলানার বয়ানকে তিনি কিছুতেই মিলাতে পারছিলেন না। ভদ্রলোক ছিলেন জামাতে ইসলামীর উচুদরের নেতা। আর্মিদের বিরুদ্ধে সর্বত্র নিরব ঘৃণার মুখে তিনি মসজিদে মসজিদে ঘুরে জেহাদের ব্যাখ্যা করে বেড়াচ্ছিলেন– আমাদের দেশে এখন ইসলামের হেফাজতের জন্য জেহাদ চলছে। পাকিস্তানি সৈন্যরা ইসলাম ও কওমের খাতিরেসুদূর পশ্চিম পাকিস্তানে তাদের স্ত্রী পরিজন ফেলে এখানে জেহাদে শামিল হয়েছেন। আমাদের দুশমন হিন্দুস্থান আমাদের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে নাক গলিয়েছে। ফলে কামিয়াব হতে সময়লাগতে পারে। এমতাবস্থায়, তাদের শারিরীক চাহিদা মেটাতে তাদের জন্য হিন্দু ও আওয়ামী লীগের মেয়েদের ব্যবহার করা জায়েজ আছে। সদরে রিয়াছাত ইয়াহিয়া খান এসব জাসুস ও গাদ্দারদের ইসলাম ও পাকিস্তানের শত্রু ঘোষণা করেছেন। ফলে তারা,তাদের সম্পদ এবং স্ত্রী কন্যারা এখন মাল-এ গণিমত হয়ে গেছে। আমাদের কাছে ভাল মন্দ যেমনই লাগুক না কেন আমাদের তা মানতে হবে, এটা ধর্মের বিধান।

বাবা গভীর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মাকে বললেন, মনোয়ারকে বল বাক্স থেকে মওলানা আজাদের বইটা খুঁজে বের করে দিক।

হয়তো অনুবাদকের বিভ্রান্তি, মওলানা আজাদের বইতেও বিষয়টা স্পষ্ট হয়নি। বাবাকে বললাম– ইসলামের ইতিহাসে আছে খলিফা ওমর (রাঃ) জেহাদে সৈন্যদল পাঠানোর আগে কঠোরভাবে তাদের জানিয়ে দিতেন যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাপ্ত সম্পদ, রাজকোষ, সমর সম্ভার, যুদ্ধবন্দী-এসব মাল এ গনিমত, ধর্মীয় বিধান অনুসারে তার বণ্টন হবে। কিন্তু সে দেশের সাধারণ মানুষ, তাদের স্ত্রী পুত্র কন্যা এবং তাদের সহায় সম্পদে হাত দেয়া যাবে না বরং তা হেফাজতের দায়িত্ব মুসলিম সৈন্যদের। গনিমতের মালের এর চেয়ে প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা আর কি হতে পারে।'

আমি আজো থেকে থেকে যন্ত্রণাবিদ্ধ হই যখন সহসা মনেপড়ে বাবার শেষ কথা আমি উপেক্ষা করেছিলাম। ৩১ জুলাই রাতে বাবা আমাকে তার সাথে খাওয়ার জন্য ডাকলেন। তিনি কি কিছু বলতে চেয়েছিলেন! বু রান্না ঘরে ভাত বাড়ছিল, আমি পিঁড়ি পেতে বসেছিলাম। দ্রুত ভাতের থালা টেনে নিয়ে বু'কে ইশারায় বললাম, বল খেতে বসে গেছি। আমি একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস শুনতে পেয়েছিলাম। তখন তা আমাকে বিশেষ স্পর্শ করেনি। কিন্তু পরদিন দুপুরে শতগুণ হয়ে সেটা শেলের মত বুকে বিদ্ধ হল। বাবা মারা গেলেন।

সেদিন ছিল ১ আগস্ট, রোববার, বন্ধের দিন। বাবার দু'তিন জন সহকর্মী এসেছিলেন পাশের বাড়িতে। আমাদের বাসায় না এসে কেন তারা পাশের বাসায় এসেছিলেন এবং কেনইবা বাবাকে সেখানে ডেকে নিয়েছিলেন বলা কঠিন। কোর্টে আর্মিদের ছত্রছায়ায় বসে তারা পাকিস্তানের পক্ষে গলাবাজি করতেন ঠিকই, কিন্তু সবার শীতল দৃষ্টির সামনে তা মুখ থুবড়ে পড়ত। বাবা মাঝে মাঝে বলতেন–এত যে আল্লা আল্লা করেন, আল্লা তো সর্বজ্ঞ, আমরা না দেখলেও কি ঘটছে না ঘটছে তিনি সবই দেখেন, সবই জানেন। হয়তো এসব কারণে তারা বাবার উপর ভিতরে ভিতরে প্রচণ্ড ক্ষিপ্ত ছিল এবং সেজচাচার সহায়তায় তাকে একহাত নিতে চেয়েছিল। বাবা কিছুক্ষণ পর ঐ বাড়ি থেকে ছিটকে বেরিয়ে আসেন, ক্ষুব্ধকণ্ঠে বারবার বলছিলেন, আপনারা মানুষ না অন্য কিছু!

আমি এইটুকু দেখে বাইরে গিয়েছিলাম, বড়জোর দু'ঘন্টা হবে ফিরে এসে দেখি বাবা নেই। বাবা কখনো বিশেষ তর্কে যেতেন না, যে যাই বলুক চুপচাপ শুনতেন, অসহ্য হলে বড়জোর দু'একটা কথা বলতেন। সেদিন বলেছিলেন– 'এই সব মাসুম বাচ্চাদের আর্মিরা এভাবে হেলিপোর্টে ঝুলিয়ে মারছে, তারাও তো আমাদের মত কারো না কারো সন্তান!' বাবার কলিগরা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিলেন, বলেছিলেন– 'না, আমাদের না, তবে কিছু বেজন্মার বাচ্চা হতে পারে, ওদের টুকরো টুকরো করে কুকুর দিয়ে খাওয়ানো উচিৎ।' বাবার পক্ষে সেখানে তিষ্ঠানো সম্ভব হয়নি। ক্রুদ্ধ ক্ষুব্ধ বাবা ঝড়ের বেগে ঘরে ফিরে কোদাল নিয়ে বাগানেচলে গিয়েছিলেন। ক্ষেতে দু'তিনটে কোপ দিয়েছিলেন, তারপর পশ্চিম মুখে সেজদার ভঙ্গীতে ঢলে পড়েন।

কে জানে বাবা নিজে জীবন দিয়ে আমাদের বাঁচিয়ে গেলেন কিনা, নাকি কাকতালীয় কোন ব্যাপার! জোর বৃষ্টির মধ্যে বাবাকে মাটি দিয়ে ফিরে এলাম। শামিম বলল– 'ভাই আজ দুপুরের আগে ইসলামী ছাত্র সংঘের এক কর্মী আমাদের বাড়িটা দেখিয়ে এক অচেনা লোককে কি যেন বলছিল।'

পরিস্থিতি আমাদের সতর্ক হতে শিক্ষা দিয়েছিল। বললাম– রাতে বোধ হয় কারো বাড়িতে থাকা ঠিক হবে না। সে রাতে পাড়ার কয়েকটা বাড়িতে রেড হল, এসব ছেলেরা ২৬ মার্চ রাস্তায় ব্যারিকেড দেয়ার কাজে অংশ নিয়েছিল। সৌভাগ্য যে হানাদাররা কাউকেই বাড়িতে পায়নি, তবে তারা আমার খালাতো ভাই কাজলকে ধরে নিয়ে যায়। তারা তাকে মুক্তিযোদ্ধা বলে চিহ্নিত করে ভূতের বাড়ি রাজাকার ক্যাম্পে নিয়ে অমানুষিক নির্যাতন করেছিল। তার দুর্ভাগ্য, সে ছেলে মানুষ ছিল এবং আমারবাবাকে মাটি দিতে যেয়েহাতের পিছনে লেগে থাকা কাদামাটিঠিকমত ধুয়ে উঠতে পারেনি। রাজাকাররা এটাকে ক্রলিং-এর আলামত বলে ধরে নিয়েছিল। বাবার মৃত্যুতে শোকাভিভূত ভাই বোনদের ফেলে আমার পক্ষে বাড়ি ছেড়ে সরে যাওয়া সম্ভব ছিলনা। আমি বাড়িতে থেকে গিয়েছিলাম। সে রাতে আমাদের বাড়িটা রেড হয়নি।

বাবার আকস্মিক মৃত্যু সামলে ওঠা আমাদের পক্ষে কঠিন ছিল। সেই দুঃসময়ে মাথার উপর থেকে ছাদটা সরে গেছে। দাদী বার বার আক্ষেপ করে বলছিলেন– সব কাছের মানুষ এবং একমাত্র ছেলের মৃত্যু দেখার জন্য শকুনের মত তিনি এখনো বেঁচে আছেন! '৭১-এ মা সব সময় নামাজ শেষে ছেলে মেয়েদের জন্য দীর্ঘ মোনাজাত করতেন। সেদিন তার ফরিয়াদ মর্মস্পর্শী ছিল। বারবার বলছিলেন– 'আমি তো কখনোতার জন্য প্রার্থনা করিনি, তাই কি তাকে কেড়ে নিয়ে আমাকে এতবড় শাস্তি দিলে খোদা!' গোটা পরিবার জুড়ে অন্তহীন কষ্ট, কে কাকে সান্ত্বনা দেবে! একাত্তরে মৃত্যু এত সস্তা ছিল যে মানুষকে তা কমই স্পর্শ করত, কিন্তু কারো মৃত্যু তার পরিবারকে যেভাবে দুমড়ে মুচড়ে দিয়ে যেত তা বলার নয়!

সারা বাড়ি শোকাভিভূত। আব্বা মারা গেছেন সকাল সাড়ে দশটায়। ব্যস্ততার সাথে বাদ জোহর তার মাটি হয়ে গেল তুমুলঝড় বৃষ্টির মধ্যে। কান্নাকাটি প্রায় থেমে গেছে। এমনিতেই সবাই এখন নামাজ কালাম নিয়ে পড়ে থাকে। আজ আর জায়নামাজের পাটি ছেড়ে উঠছে না কেউ। ওরই মাঝে ফুপিয়ে ফুপিয়ে কেঁদে উঠছে কেউ কেউ। নয় ভাই বোনের সবাই এখন বাড়িতে। শোকে কাতর। বাড়িতে রান্না হয়নি, পাশের বাড়ি থেকে খাবার এসেছে। সৌভাগ্যক্রমে আব্বার অতি ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং ভাগ্নে আজাদ কাগজের চিফ রিপোর্টার সৈয়দ জাফর আলী- আমাদের শ্রদ্ধেয় মুন্না ভাই সে সময় খুলনায় এসেছিলেন এবং সেজচাচার বাড়িতে উঠেছিলেন। খাবারের ব্যবস্থা তিনিই করেন।

বিপদ কখনো একা আসেনা

পর দিন গভীর বিষন্নতা নিয়ে আমরা ঘুম থেকে উঠলাম। বিষন্নতা গভীরতর হল। আলুথালু বেশে হাউমাউ করে কানতে কানতে ছুটে এলেন মেজে খালামা।গত রাতে আর্মী আর রাজাকাররা কাজলকে ধরে নিয়ে গেছে । শামিমকে খুজছিল। শামিম ওর চাচার বাড়ি। তাকে না পেয়ে সারা বাড়ি তছনছ করে ওর ছোট ভাই কাজলকে ধরে নিয়ে গেছে। কাজল অতি সাধাসিধে এক কিশোর। ধীরে ধীরে আরো খবর এলো। পাড়ার আরো কয়েক বাড়িতে রেড হয়েছে গত রাতে। তবে কাউকে বাড়িতে পাওয়া যায় নি। বাড়ি ঘরে ঢুকে তছনছ করেছে ওরা।

কিছু দিন থেকে আমার খালাতো বোন আছে আমাদের বাড়িতে। সন্তান সম্ভবা, খুবই অ্যাডভান্সড স্টেজ। গোলার শব্দ, ভারী গাড়ির শব্দ– সবকিছুতেই তার প্রচণ্ড ভয়। সেজন্য কিছুটা ভেতরে আমাদের বাড়িতে তাকে নিয়ে আসা হয়েছে। কাজল তার ছোট ভাই। কাজলরে– বলে সে ধপ করে মেঝের উপর আছড়ে পড়ে অজ্ঞান হয়ে গেল। তাকে নিয়ে মহিলারা ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

আব্বার মৃত্যু সংবাদ পেয়ে সকালেই যশোর থেকে সেজ খালু এবং ছোট খালু এসেছিলেন খুলনায়। এই দুঃসময়ে বাবার চলে যাওয়া তাদেরকে গভীর দুঃশ্চিন্তায় ফেলেছিল। এর মধ্যে কাজলের ধরে নিয়ে যাওয়ার সংবাদে তারা নির্বাক হয়ে গেলেন। মজিদ মামা ইউনাইটেড ব্যাঙ্কে উচ্চপদে চাকরি করতেন। তিনি তার উর্দ্বতন কর্তৃপক্ষকে ধরলেন। ভদ্রলোকের সাথে আর্মি কর্তৃপক্ষের দহরম মহরম ছিল। ভদ্রলোক সার্কিট হাউজ আর্মি ক্যাম্প থেকে খোঁজ খবর করে জানালেন গত রাতে যাদের ধরা হয়েছে গল্লামারিতে গত রাতেই তাদের এক্সিকিউশান হয়ে গেছে। রায়হান মামা ছিলেন আগাখানিদের শিল্প গ্রুপ আইপিএস-এর কর্মকর্তা। এই গ্রুপের লেবার সাপ্লায়ার ছিলেন ওয়ার্সী। তিনি বিহারীদের নেতৃস্থানীয় ছিলেন। রায়হান মামা তাকে সঙ্গে নিয়ে খুলনার সকল রাজাকার ক্যাম্প তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখলেন। কাজলকে কোথাও পাওয়া গেলনা। বিমর্ষ চিত্তে তারা ফিরে এলেন ভূতের বাড়ি য়দি অন্তত লাশের সন্ধান পাওয়া যায়। তারা ব্যর্থ মনোরথ হয়ে যখন ফিরছিলেন ফিশ ফিশ করে এক রাজাকার রায়হান মামুকে বলল– কাজল আমার ক্লাসমেট, তাকে দোতালায় লুকিয়ে রেখেছি, আপনারা টাকা সাধেন, নইলে আজ রাতেই তাকে মেরে ফেলবে। ওয়ার্সি সাহেবের সহায়তায় সাত শত টাকার বিনিময়ে নিরাপরাধ কিশোর কাজল আধমরা অবস্থায় উদ্ধার পেল।

সকালের দিকে পাশের বাড়িতে দুজন লোক চাপাস্বরে সেজচাচার সাথে কথা বলেছিলেন। একজন পাড়ার লোক, জামাত করেন।আর একজন অপরিচিত, তাকে চাচাও চেনেন না।। চা বিস্কুট খেয়ে তারা বিদায় নিলেন। কিছুক্ষণ পর সেজচাচা এলেন আমাদের বাড়িতে, সাদা থান পরা মাকে এক পাশে ডেকে নিয়ে বললেন তোমাকে এখন আরো শক্ত হতে হবে। বিপদ দেখা যাচ্ছে একা আসে না। মনোয়ারকে কয়েকদিনের জন্য অন্য কোথায় সরিয়ে দাও। এত বড় দুর্ঘটনা না ঘটলে কাল রাতে ওকেও ধরে নিয়ে যেত। আসলে নিবোর্ধের মত কদিন একটু বেশী লাফালাফি করেছে, তোমরা নজর দাওনি। পাকিস্তান কি একই ঠুনকো যে ওরা লাফালাফি করল আর অমনি তার একটা ডানা পট করে ভেঙ্গে গেল। মা শক্ত হাতে দরজার চৌকাঠ ধরে নিজেকে সামলালেন– আপনারা ওকে বাঁচান, মিয়া ভাই।

বাবার মৃত্যুর পরদিনইমা ব্যস্ততার সাথে বাড়িতে দোয়া মহফিলের আয়োজন করেছিলেন,আমি বুঝে উঠতে পারিনি কেন। এই আয়োজন ছিলব্যতিক্রমী। সময়ের অভাবে আত্মীয় স্বজনদের কমই খবর দেয়া গিয়েছিল।বৃষ্টি এবং পথের বিপদের আশংকায় তারাও তেমন কেউ একটা আসতে সমর্থ হন নি। তাছাড়া বাড়িটাও তখন কিছুটা চিহ্নিত হয়ে গিয়েছিল। তবে বাড়িতে লোকের অভাব ছিল না। আমরা যে যা পারি পড়েছিলাম, ছোট ছোট বাচ্চারাও এদিন খেলাধূলা করেনি। মাদুরের উপর ছোলা অথবা তসবিহ নিয়ে লাখকলেমা পড়েছে। অনুষ্ঠানে প্রথামাফিক কোন মওলানা সাহেব ছিলেন না, সুলোলিত কণ্ঠে কোন বয়ানও হয়নি। আমাদের সবার পাঠগুলো পরম ভক্তি ভালবাসায় বক্সে

দিয়েছিলেন মা। তার দু'চোখে অশ্রু, কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ, যতটুকু বলতে পারেন, অনেক বেশী অব্যক্ত থেকে যায়। সবার পাঠগুলো মহানবী এবং অনন্তকাল থেকে মৃত অথবা শহীদ, মাটি পেয়েছে অথবা পায়নি– সবার উপর বকসে দিলেন, খাস করে বাবার উপর। আল্লাহ স্বাক্ষী এর চেয়ে পবিত্র, এমন আন্তরিক দ্বিতীয় কোন দোয়ার মহফিলে আমি কখনো সামিল হইনি।

সেজচাচা এলেন কিছুক্ষণ পর, মাকে একান্তে ডেকে নিয়ে বললেন– দেরি কোরনা।

বু একটা এয়ার ব্যাগ ধরিয়ে দিল আমার হাতে, ওতে জামা কাপড় আছে। আমি বাড়তি ডাইরিটা ব্যাগে ঢুকিয়ে নিলাম। কয়েক দিনের জন্য আমাকে কোথাও সরে যেতে হবে। গতকালই হয়তো গ্রেফতার হয়ে যেতাম, পাড়ায় সৎ এবং স্বচ্ছ মানুষ হিসাবে পরিচিত বাবার অকস্মাৎ মৃত্যুর কারণে সেটা হয়নি।

মা সেজচাচার হাত ধরে কেঁদে ফেললেন, ওকে আপনি বাঁচান সেজভাই।

সেজচাচা বললেন, আমাকে কি তা বলতে হবে? কিন্তু এখন কঠিন সময়, কে কার কথা শোনে বল। ওরা যাহোক কাল তবু কিছুটা মানবতা দেখিয়েছে। আপাতত তো সরে যাক, তারপর দেখি কি করা যায়।

আমাকে বাড়ি ছাড়তে হল। ন'মামা কাজী আবদুল মজিদ ইউনাইটেড ব্যাংকের পদস্থ কর্মকর্তা ছিলেন, ব্যাংকের গাড়ি নিয়ে বিকাল থেকেই আমাদের বাড়িতে আছেন। খালিশপুরে রেল লাইনের ধারে তার কোয়ার্টার, বিহারী বসতির প্রায় কাছে। তার সাথে সে বাড়িতে আশ্রয় নিলাম।

শেখ মুজিবের বিচার

জনশ্রুতি আছে মুজিব আত্মপক্ষ সমর্থন করেন নি, যখন তাকে ডিফেন্ড কাউন্সিল মনোয়নের জন্য বলা হয় তিনি নিরব ছিলেন। পীড়াপিড়ি করা হলে বলেন– আপনারা তো বিচার প্রহসন করে আমাকে হত্যা করতে চান, আমার অনুরোধ আমার দেইটা আপনারা আমার মাতৃভূমি বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেবেন।

বিপন্ন সময়

কাকজপত্র মাটির নিচে, ভরা বর্ষায় কেকে পরিণত হল। স্বাধীনতার পর নির্দিস্ঠ জায়গার মাটি খুড়ে ভিজে কেকের মত হয়েছে যে পাপশ থেকে তোলার চেষ্টা করিকেকের মত ভেঙ্গে ভেজ্ঝ উঠে আষে।

মন্টু ভাই, দায়িত্ব দিলেন

কপোতাক্ষা নদের পথ

রবিউল সাহেব মিলের রিপোর্ট শাখায় কাজ করেন। ধার্মিক মানুষ। কপালের মাঝখানে কালচে গোল চিহ্ন দেখে একদিন তাকে প্রশ্ন করেছিলাম, এটা কি সত্যি যে এই চিহ্ন হাশরের ময়দানে আলোকবর্তিকা হয়ে আপনাকে বেহেস্তের পথ দেখাবে?

জানি না স্যার। ছোট বেলায় ওস্তাদজীর কাছে শুনতাম। ব্যাস। তখন হয়তো নামাজের পাটির উপর জোরে জোরে কপাল ঠুকেছি, দাগ পড়েনি, পরে এমনিতেই পড়েছে।

তিনি আমাদের কলিগ ছিলেন। বাড়ি যশোরের স্বরূপদহা। সেখানে আমার খালামাদের বাড়ি, সেই সুবাদে আমাদের মাঝেভাল সম্পর্ক। তিনি নিজের কাজ ভালই বুঝতেন, বিভিন্ন বিভাগের উৎপাদন রিপোর্ট কম্পাইল করে কর্তৃপক্ষের কাছে উপস্থাপন করতেন। উৎপাদন বিভাগের কর্মকর্তারা প্রায় একেচেটিয়া ভাবে অবাঙালি। তাদের সাথে রবিউল সাহেবের সম্পর্ক স্বভাবতই ভাল ছিল না। রিপোর্ট সংশোধনের

জন্য একজন বাঙালি অফিসসহকারীর কাছে যেতে হবে এটা তাদের গায়ে বিছুটির জ্বালা ধরিয়ে দিত। তবে শীঘ্রই অবস্থার পরিবর্তন ঘটল। কস্ট ও রিপোর্ট শাখায় একজন অবাঙালি কস্ট অ্যাকাউন্টেন্ট যোগ দিলেন। তিনি রবিউল সাহেবকে পরিস্কার বলে দিলেন– ডোন্ট ক্রস ইওর পাওয়ার লাইন রবিউল, য়ু আর নট এম্পাওয়ার্ড টু কল এনি অফিসার টু ইউর টেবিল।

ইয়েস স্যার, হাওএভার উই আর টু সাবমিট প্রডাকশান রিপোর্ট টু ম্যানেজার এভরি ডে বাই টেন থার্টি।

ঠিক হ্যায়, হাম দেখেগা।

পর দিন রিপোর্ট সাবমিটে বিলম্ব হল। ম্যানেজারনূতন কস্ট অ্যাকাউন্টেন্ট জুবায়ের সাহেবকে ডাকলেন। তিনি ডাকলেন রবিউলকে।ম্যানেজার রবার্টসন নেটিভ খ্রিশ্চিয়ান, মৌলবীদের তেমন পছন্দ করতেন না, অথচ রবিউল সাহেবের বহিরাবরণ অনেকটা তেমনি ছিল, বললেন– ইউ পিপল অলওয়েজ চিউয়িং বিটল এন্ড শ্লিপিং অন দা টেবিল। হাউ ইউ উইল প্রিপেয়ার রিপোর্ট টাইমলি!

রবিউল বিনীত ভাবে বললেন, স্যার তিনি পান খান না, এর আগে সর্বদা সময় মত রিপোর্ট দিয়েছেন, এবার সিসটেম বদলেছে, এ কারণেই বিলম্ব। রিপোর্টে অনেক অ্যানামলি থাকে, ম্যানিপুলেশন থাকে। বিভাগ থেকে অফিসাররা এসে ঠিক করে দিয়ে যান। এবার আমাকে পাঁচ-ছয় বিভাগ ঘুরে ঘুরে রিপোর্ট ঠিক করে আনতে হয়েছে। একারণেই দেরি।

ম্যানেজার সাহেব কিছুক্ষণ কুত কুত করে রবিউলের মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন– ওকে, প্রিভিয়াস সিসটেম উইল রান।

সুপারভাইজাররা ক্ষেপে গেল। যুবায়ের সাহেবও ক্ষেপলেন, বিশেষকরে রিপোর্ট সেকশান যখন তার হাত থেকে সরাসরি ম্যানেজারের তত্ত্বাবধানে গেল। এখন মাথার উপর প্রকল্প প্রধান আছেন, এই ক্ষেপার মাত্রা যে কি রবিউল সাহেব তখন অনুধাবন করতে পারেন নি।

২৬ মার্চ সবাই যখন মিল ছাড়ে, রবিউল সাহেব জলবসন্তে আক্রান্ত হয়ে খালিশপুরে ছিলেন। সেখানে দাঙ্গা শুরু হলে দেশের বাড়ি চলে যান। পরে রেডিওতে যখন হুমকি-ধামকিসহ উপর্যুপরি কাজে যোগদানের নির্দেশ আসতে থাকে, তিনি মিলে ফেরার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। তখনই খবর পেলেন প্রডাকশানের লাল মোহম্মদ তাকে হন্যে হয়ে খুঁজছে, তার শকল দেখার জন্য সে কেন জানি খুবই উদগ্রীব হয়ে পড়েছে।

রিপোর্ট শাখায় চারজন হিন্দু স্টাফ জয়েন করেনি, মুসলমান বাদে কাজে যোগদানকারী একমাত্র ব্যক্তি সাইমন সুব্রত সরকার। খ্রিস্টান। তাকে আমরা সুব্রত বলে ডাকতাম। সে রিপোর্ট শাখার টাইপিস্ট ছিল। হাওয়াই শার্টের উপর গলায় ক্রুশ ঝুলিয়ে কাজে আসতো। পরিচিতি পত্রেতার নাম লেখা ছিল সাইমন এস. সরকার। তার অনুরোধ ছিল সুদিন না ফেরা পর্যন্ত তাকে যেন সাইমন নামে ডাকা হয়। সবাই সেটা মেনে চলত।এর মধ্যে হঠাৎ একদিন রবিউল সাহেবকে অফিসে দেখে ভূত দেখার মত চমকে উঠলাম। তিনিও কম চমকান নি! তারপর ভারমুক্ত হয়ে বললেন– আপনি যখন কাজ করতে পারছেন, আমিও পারব আশাকরি।

বললাম আল্লাহ ভরসা, যাহোক লাল মোহাম্মদের ব্যাপারটা শুনেছেননিশ্চয়ই।

শুনেছি স্যার। কিন্তু কি করব, আমার এখন উভয় সংকট। এলাকায় আর্মি গেছে। এদিকে বেতন নেই সংসার চালানো কঠিন। তবু হয়তো মাটি কামড়ে পড়ে থাকতাম। কিন্তু আমাদের ওখানে আর্মি ক্যাম্প বসেছে। কয়েকদিন আগে ওরা চৌগাছা বাজারে সবাইকে ডেকেছিল। আমি চৌগাছায়আপনার খালুর কাপড়ের দোকান টুকটাক কাজ করি। ভয়ে ভয়ে হাজির হলাম। মেজর হুকুম দিল– সবলোগ আপনা কাম ছোড়ো, ওয়াতন কা কাম করো। সে রোডস এন্ড হাই ওয়েজ-এর ইঞ্জিনিয়ারের দিকে তাকিয়ে বলল– উনলোগকো বাতাও কেয়া কাম।

আসলে রাস্তা বানাতে হবে। আমাদের কপোতক্ষ নদের উপর কাঠের ব্রীজ আছে, মানুষ চলাচল করে। গরুর গাড়ি পার হয় জোড়া নৌকায় কাঠের পাটাতন বিছিয়ে। কিন্তু এতে জীপ ট্রাক যেতে পারে না। এখন নদী ভরাট করে তাদের জন্য পথ বানিয়ে দিতে হবে। কপোতাক্ষ নদে স্রোত নেই ঠিকই, কিন্তু নদী প্রশস্ত, গভীরতাও বেশি। একটা প্রায় অসম্ভব একটা কাজ।

কেউ একজন ক্ষীণস্বরে বলার চেষ্টা করল, স্যার এভাবে তো সম্ভব হবে না।

মেজর ঝট করে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল, হু সেস, কাম ফরোয়ার্ড এন্ড স্পিক ক্লিয়ারলি।

কার ঘাড়ে কয়টা মাথা যে সামনে আসে। আমাদের তখুনি কাজে নামতে হল। চৌগাছা বড় মোকাম। আপনার খালুর মত সম্ভ্রান্ত পরিবারের বয়সী ভারি শরীরের অনেক মানুষই আছেন চৌগাছায়। ফর্সা পাজামা পাঞ্জাবী পরে তাদেরও কাজে নামতে হল। তারা কি কায়িক পরিশ্রম করার মানুষ? না করেছেন কখনো? আমরাই বা কবে মাটি কেটেছি, বয়েছি। আমি তো যথেষ্ট বাল্কি, এক কোপ বসাই তো বুকের ভিতর হাতুড়ি পিটতে থাকে। ধপ করে মাটিতে বসে পড়ি। কিন্তু ওদের বোঝায় কার সাধ্য। শুওরের মত ঘোৎ ঘোৎ করে তেড়ে আসে। জানিনা কি

হল, পরদিন সকালে যশোর মুসলিম লীগের সভাপতি এলেন, জামাতের আমির এলেন, শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান এলেন, এক এক্স আর্মি অফিসার এলেন। তারা বুঝিয়ে দিলেন, এদের দ্বারা এক মাসেও এ কাজ শেষ হবে না। তার চেয়ে ওনারা বরং টাকা দিয়ে মাটি কাটার মজুর ঠিক করে দিক। দেখবেন দেখতে দেখতে খাল ভরাট হয়ে যাবে। বিষয়টা এবার বেহেডগুলোর মাথায় ঢুকলো, তাদের ঘোঁৎঘোতানি থামল, বলল– 'ঠিক হ্যায়। যো আদমী রুপিয়া নেহি দেগা উসকা জরুর কাম করনে পড়েগা। ওয়াতন কা কামপর হার আদমিকো কনট্রিবিউশন চাহিয়ে।' স্যার আমাকে তো এখন মাটি কাটতে হয়। নিরুপায় হয়ে অফিসের কাগজপত্র দেখালাম, জরুরী এলানের কথা বললাম এবং ওটাও যে ওয়াতনকা কাম তাও বুঝালাম। শেষ পর্যন্ত ব্যাটারা বুঝল। এখন মিলে না ফিরে উপায় কি ?

মানসিক চাপ ও আতংকেরমধ্যে আঠারো ঘন্টার রেলযাত্রা

আব্বা মারা গেলেন ১ আগস্ট। সেপ্টেম্বরের শেষ দিকে মেজচাচা খুলনায় এলেন। তখন লোকজন পথে বেরোত না বল্লেই চলে। কেউ নিশ্চিত ছিলনা, বাড়ি থেকে বেরিয়ে নির্দিষ্ট গন্তব্যে পৌছাতে পারবে কিনা। যেন ঠগির রাজত্ব!তবু অনেক সময় নিরূপায় হয়ে বেরোতে হয়। মেজচাচা ঢাকায় থাকেন। মা তাকে বাবার মৃত্যুর খবর দেয়ার কথা ভাবেন নি। বাবা এবং মেজচাচার বয়সের ব্যবধান ছিল মাত্র দু'বছর। মা জানতেন, তিনি স্থির থাকতে পারবেন না, খুলনায় আসতে চাইবেন। অথচ পথেঘাটে পদে পদে বিপদের কথা তখন এত বেশি ছড়িয়েছে যে ঢাকা থেকে খুলনায় নিরাপদে পৌছানো সম্ভব এটা বিশ্বাস করা কঠিন ছিল। তবে আমাদের আত্মীয়-স্বজন কম ছিল না। চাচা খবর পেয়ে গেলেন।

আমরা আমাদের দু'পাশের আত্মীয়-স্বজনদের দেখে দেখে বিরক্ত হয়ে পড়েছিলাম। বাঙালি চেতনাবোধের কারণে তারাও আমাদের উপরসমান বিরক্ত ছিলেনএবং এর জন্য বাবাকে দুষতেন। আমাদের চোখের সামনে মেজচাচার চেহারা ভাসত। তিনিও বসিরহাটের লোক। দীর্ঘ সুন্দর চেহারা, ধপধপে সাদা পাজামা পাঞ্জাবি এবং টুপি ছাড়া তাকে কখনো দেখা যেত না। আমরা তার মন-মানসিকতা আমাদের প্রতিবেশী আত্মীয়দের থেকে আলাদাহতে পারেভাবিনি। যাহোক মা তার মৃত স্বামীর কোন সমালোচনা আর মোটেও শুনতে রাজি ছিলেন না। তাকে খবর না দেয়ার এটাও সম্ভবত একটা কারণ ছিল।

ফলে একদিন ছোট হোল্ডঅলসহ মেজচাচাকে আমাদের দরজার সামনে দাঁড়ানো দেখে সবাই হতভম্ব হয়ে গেল। দীর্ঘ ট্রেন যাত্রায় তিনি খুবই ক্লান্ত ছিলেন, গভীর বেদনার সাথে মাকে বললেন– তোমাদের মানসিক অবস্থার কথা বুঝি, তবু আমি তোমার কাছ থেকে সংবাদ আশা করেছিলাম, তুমি জাননা কায়ছার আমার কি ছিল!

মার জবাব দেবার কিছু ছিল না, শুধু বললেন, ভাই জানতাম বিপদ মাথায় করে আপনি ছুটে আসবেন, তাই আপনাকে জানাতে চাইনি।

তখন ট্রেন আসত জগন্নাথগঞ্জ ও সিরাজগঞ্জ ঘাট হয়ে। দীর্ঘ আঠারো-বিশ ঘণ্টা সময় লাগত। সেকালে ট্রেনে ভিড়ের কারণে বসার জায়গা পাওয়া কঠিন ছিল। কিন্তু চাচা এসেছেন প্রায় ফাঁকা ট্রেনে। বললেন– মফস্বলের স্টেশনগুলোতে কিছু লোক ওঠা-নামা করে, কিন্তু জেলা সদরের স্টেশনগুলো ফাঁকা। বাঙালি যাত্রী নেই বললেই চলে।

আমরা চাচার সাথে এশার নামাজ শেষে তার মুখোমুখি বসে সুরা, দোয়া দুরুদ পড়লাম। পাঠ শেষে তিনি বললেন, আমরা যা পাঠ করেছি তা আমাদের নবী, সাহাবী, অলি আওলিয়া, আমাদের আত্মীয়-স্বজন, খাসকরে তোমার আব্বার রুহের উপর বক্সে দেবো, সে পর্যন্ত তোমরা আমার সাথে সামিল থেকো। তারপর এখন কত লোক কতভাবে মারা যাচ্ছে, তাদের নামে তোমাদের যার যেমন ইচ্ছা সেভাবে নিজে নিজে বক্সে দিও।

খেতে বসে চাচাকে ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, লোকে বলে, ট্রেন যাত্রা নাকি নিরাপদ না, কিন্তু আপনি তো ভালভাবেই এলেন।

চাচা বললেন আজ থাক, কাল সকালে বলি। পরদিন আমরা প্রায় সারাদিন চাচার সাথে দোয়া-দরুদ পড়ে কাটালাম। ভোরে ঝুম বৃষ্টি ছিল, আসরের নামাজের পর তার সাথে গোরস্থানে গেলাম। পরদিন চাচা আত্মীয়দের বাড়ি বাড়ি গেলেন দেখা করতে। ফিরে এলেন বারোটার দিকে অশেষ বেদনা এবং বিরক্তি নিয়ে, তারপর আমার উপর বারুদের মত ফেটে পড়লেন– তোমরা কি দেশের খোঁজ খবর কিছুই রাখো না, না রাখতে চাওনা? কোন যামানায় আছ তোমরা? একটা রেডিও পর্যন্ত নেই কারো ঘরে। কিছুদিন আগে কায়সার লিখেছিল তোমরা নাকি দম বন্ধ করা পরিবেশে বাস কর। তোমাদের দেখে তো তা মনে হয় না, মনে হয় দম বন্ধ করা পরিবেশ তোমরা নিজেরাই বেছে নিয়েছ।

আমি ফ্যাল ফ্যাল করে চাচার মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলাম। সাহানা ছুটে এসে বলল, চাচা আমাদের তো রেডিও আছে, ভাই আপনার ভয়েতাড়াতাড়ি সেরে ফেলেছে। গত দু'দিন আপনার ভয়েই তো আমরা চরমপত্র, জল্লাদের দরবার, দেবদুলালের কথিকা কিছুই শুনতে পারিনি। আব্বা রোজই জয়বাংলা, আকাশবাণী, বিবিসির খবর শুনতেন। আমরা সবাই গোল হয়ে রেডিও ঘিরে বসতাম। পুকুর ঘাটের

রানায় বসে খুব আস্তে আস্তে শুনতে হত, পাড়ার লোকজনের ভয়ে। মার শোনা হত না। মা গেটের পাশে চুপচাপ দাঁড়িয়ে পাহারা দিতেন, পাছে কেউ আবার আড়ি পেতে আমাদের নিষিদ্ধ রেডিও শোনার কথা জেনে যায়। তারা আমাদেরকে যাচ্ছেতাই করে বলবে। আবার অনেকে আছে যারা দালাল ও রাজাকারদের খবরও দিতে পারে।

বললাম চাচা, আমরা আপনাকেও আমাদের প্রতিবেশী আত্মীয়দের মত ভেবেছিলাম, তাই রেডিও সেরে রেখেছি। আমি চেয়ারে উঠে দেয়ালের তাকে লেপ কাঁথার আড়াল থেকে আমার তিন ব্যান্ড রেডিওটা বের করে নিয়ে এলাম। বাবা নেই, কিন্তু সন্ধ্যার পর চাচাকে ঘিরে আমাদের ঘাটের আসরটা আবার সেই আগের মত নিঃশব্দে জমজমাট হয়ে উঠল।

প্রায় মাস খানেক হল মেজ চাচা এসেছেন, পথের অনিশ্চয়তার জন্য দূরের আত্মীয়দের কাছে যেতে ভরসা পাননা। আশপাশের আত্মীয়দের সাথে কথা বলতে তার রুচি হয় না। নানা ধরনের মানসিক চাপে তিনি অস্থির হয়ে পড়লেন– বললেন আমি দু'চার দিনের মধ্যে ঢাকা ফিরে যাবো, বুলুর মা। মাএবং আমরা কেউই তাকে এই মুহূর্তে ছাড়তে চাচ্ছিলাম না। চাচা বললেন, এখন বাড়ি-ঘর, পথ-ঘাট কোথায় আমরা নিরাপদ? যাওয়াই ভাল, নইলে পরে অস্থিরতা বাড়লে অনেক বেশি বিপদে পড়ে যাবো। আমাকে যেতে হবে, তবে কিসে যাবো এটা নিয়েই চিন্তিত হয়ে পড়েছি।

মা বললেন– ভাই, যদি যেতেই হয় আপনি বরং বিমানে যান, আমি আচ্চুকে টিকিট কাটতে বলি, ওই আপনাকে ওর ব্যাংকের গাড়িতে যশোর বিমান বন্দরে পৌঁছে দিয়ে আসবে।

মোটেও না, ওখানে আর্মি আর বিহারিতে ভরা। ওরা সাপের মত হীন। কখন কি মতিগতি হয় কিছুই বলা যায়না। খালি খালি আচ্চুকে বিপদে ফেলতে চাইনে।

আমি চাচাকে ট্রেনে আমার এক বন্ধু জহুরের নির্মম হত্যার কথা বললাম, সে এপ্রিলের মাঝামাঝি বাড়ি যাচ্ছিল এবং পথে ট্রেনে যশোর স্টেশনের সামান্য আগে বিহারীরা তাকে জবাই করে পাশের গর্তে ফেলে দিয়েছে।

চাচা বললেন তিনিও ট্রেনে যেতে ভরসা পাচ্ছেন না। আসার পথে ট্রেনে তিনি এমন এক ঘটনার স্বাক্ষী যা তার ঘুম এবং স্বস্তি দুটোই কেড়ে নিয়েছে। তোমরা সেদিন জিজ্ঞাসা করেছিলে ট্রেনে এলাম কিভাবে। আমি জেনেশুনেই পা বাড়িয়ে ছিলাম, পথঘাটে কোথাও আমাদের নিরাপত্তা নেই। কিন্তু ট্রেনযাত্রা যে এত রিস্কি সিরাজগঞ্জ ঘাটের এদিকে আসার আগে সহসা বুঝতে পারিনি। সিরাজগঞ্জে এক মাঝ বয়সী লোক ভীত চকিতভাবে এদিক ওদিক তাকিয়ে আমার পাশে এসে বসে পড়ল। চেহারা দেখে বুঝলাম সে বাঙালি। আমাকে দেখে সে সম্ভবত ভদ্র বিহারী বলে মনে করেছিল এবং আমার কাছে আশ্রয় পেতে পারে বলে ধরে নিয়েছিল। ডুবন্ত মানুষ খড়কুটোকে আশ্রয় করেও বাঁচতে চায়। সে আমাকে সালাম দিয়েছিল এবং পাশে জড়সড় হয়ে চুপচাপ বসেছিল। কম্পার্টমেন্ট একেবারেই ফাঁকা। সর্বসাকুল্যে আমরা মাত্র ছ জন যাত্রী ছিলাম। আমরা দুজন বাদে সবাই বিহারী।

বিহারীরা চাচাকে বাঙালি বলে চিনতে পারেনি, তবে লোকটাকে ঠিকই চিনেছিল। তাদের আলোচনা চাচার কানে পৌঁছায়নি, কিন্তু তাদের দৃষ্টি অশুভ ইঙ্গিত দিচ্ছিল। দু'তিন স্টেশন পর এক স্টেশনে গাড়ি থামার উপক্রম করতেই দুজন বিহারী জায়গা ছেড়ে উঠে এলো, লোকটার সামনে দাঁড়িয়ে ধমকে উঠল– শ্যালে তু গাদ্দার হ্যায় না, হাম তুঝে আচ্ছাকে পহছানলিয়া, বোল শালে কেতনা বিহারীকো কতল কিয়া? বোল।

তারা লোকটাকে হ্যাচকা টান মেরে দাঁড় করালো। সে থর থর করে কাঁপছিল এবং কি যেন বলতে চেষ্টা করল। কিন্তু অস্পষ্ট গোঙ্গানী ছাড়া তার মুখ থেকে কিছুই বেরোলো না। সে চাচার হাত জড়িয়ে ধরল। চাচা তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে বললেন– ভাইলোগ উসকো ছোড় দিজিয়ে, মেহেরবানী করকে উসকা উপর রহম কিজিয়ে। মালুম হোতা হ্যায় উনলোগ বুরা আদমী নেহি হ্যায়, কোই বুরা কাম ভি নেহি কিয়া।

হা চাচা, যব আপ বলতে হে, জরুর ছোড় দুঙ্গা। মাগার পহেলে হামারা কমান্ডার সাব উসছে কুছ সাওয়াল পুছ করেঙ্গে। কমান্ডার সাব পিছে কামরে মে হ্যায়। তারা টেনে হিঁচড়ে লোকটাকে নামিয়ে নিয়ে গেল। তারা কেউই আর ফিরে আসেনি। চাচা বললেন, লোকটার করুণ দৃষ্টিএবং যেভাবে আমার হাতদুটো চেপে ধরেছিল তা আজো ভুলতে পারিনা।

চাচার ঘটনা আমাকে স্মৃতিকাতর করে দিল। জহুর আমার ভাল বন্ধু ছিল। '৫৯ সালে দৌলতপুর কলেজে ভর্তি হয়েছিলাম, সেখানেই প্রথম পরিচয়। টিনশেড হোস্টেলে একটা সীট নিয়ে থাকত। সঠিক মনে নেই পাবনা না কুষ্টিয়া কোথায় তাদের বাড়ি ছিল। সে শ্যামলা, কিছুটা লম্বা এবং ছিপছিপে। আমার মনে হয় অন্য অনেক ছেলেদের থেকেও সে আকর্ষণীয় এবং ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন ছিল। কিন্তু সে তার নাক নিয়ে সব সময় বিব্রত থাকত। তার নাক ছিল তুলনামূলক ভাবে বেশ ছোট। কিন্তু সে জানতো না এটা তার চেহারাকে আলাদা বৈশিষ্ট্য দিয়েছিল। আমরা কয়েক বন্ধু একদিন সিনেমা দেখে নিজাম হোটেলে বসে আড্ডা দিচ্ছিলাম। সে সময়কার বাংলাদেশের বই, পাশ্বচরিত্রে রওশন আরা অভিনয় করেছিলেন। আজম হঠাৎ বলল, খুঁজে দেখ রওশন আরা তোর হারানো বোন বা তুই তার হারানো ভাই কিনা। আমি নিজ চেহারা

নিয়ে সব সময় বিব্রত থাকতাম, বললাম আমি তোকে রহমানের (তৎকালীন সুদর্শন নায়ক) সাথে তুলনা করি আর তুই এভাবে প্রতিদান দিলি। ফারুকসান্তনার ছলে আমার পিঠে থাবা দিতে দিতে বলল, দোস্তো তোমার দুঃখ পাওয়ার কিছু নেই, দুঃখ পেলে বরং রওশান আরা পেতে পারে। সে নাজানি আরো কি বলে বসে, চুপ করে গেলাম। জহুরের নাক নিয়ে কথা উঠল এবং সবাই একমত হল যে, সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের ক্ষুদ্রাকায় নাক তার চেহারার আকর্ষণ বরং বাড়িয়ে দিয়েছে। পরে আমি সেটা তাকে বললাম এবং বললাম নাক নিয়ে সে যেন কখনো আক্ষেপ না করে।

ছাত্র রাজনীতির ঢেউয়ে ভাসতে ভাসতে আমি তখন ল'কলেজে। চাকরি করছি, আবার ছাত্রত্বও বজায় রাখিছ। মাঝে মাঝে নদীর ধারে বেড়াতে যেতাম। আমি ঘাটের সংকীর্ণ কাঠের জেটিতে দাঁড়িয়ে ছিলাম। জেটির মাথায় এম এল রূনরূপা বাধা আছে। বনবিভাগের জাহাজ। দেখতে সুন্দর। এরকম আরো দু'তিনটে জাহাজ আশেপাশে বাধা থাকে, কখনও থাকেনা। অফিসের কাজে সুন্দরবন যায়। জাহাজ থেকে একজন সুবেশা ভদ্রলোক বেরিয়ে এসে আমাকে অতিক্রম করার সময় থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল, মনোয়ার না ? সাত-আট বছর ব্যবধান সত্ত্বেও আকর্ষণীয় নাকের জন্য জহুরের চেহারা ভোলা সম্ভব ছিলনা, বললাম, জহুর!

সে বনবিভাগে চাকরি করে। সুন্দরবন যাচ্ছে অফিসের কাজে। দশটা সাড়ে দশটার দিকে লঞ্চ ছেড়ে যাবে। বলল, চল ঘুরে আসি, বেশী না দু'তিন দিনের মধ্যেই ফেরা যাবে। যখন শুনল আমি আজও সুন্দরবন এবং সমুদ্র দেখিনি, জোর চাপাচাপি করল। বকলাম, যাবো তো, কিন্তু ছুটিতো নেই নি। তবে আমার আসল সমস্যা ছিল ভিন্ন, বাইরে যে যাবো, তেমন জামা-কাপড় আমার ছিল না। মাত্র দু'সেট প্যান্ট-শার্ট নিয়ে কালযাপন করতাম, তাও পুরোনো হয়ে গিয়েছিল। বললাম, আজ থাক জহুর, পরে তো আবার যাবে তখন অবশ্যই সঙ্গী হব।

যাওয়া হয়নি। মাত্র কয়েক মাস পা একাত্তরের কোন একদিন বিকালে অফিস থেকে ফেরার পথে এক কলেজ বন্ধুর সাথে দেখা হল, বলল জহুরের কথা মনে আছে ?আমাদের সাথে পড়ত, নাকটা একটু ছোট ছিল।

বুকটা ধড়াস করে উঠল। আচমকা কারোর প্রসঙ্গ তোলা তখন ভাল কোন সংবাদ বয়ে আনত না। বললাম, কেন কি হয়েছে?

তাকে তো বিহারীরা মেরে ফেলেছে, সেই প্রথম দিকে।

মানে!

বেচারা যদি মার্চের দিকে চলে যেত, ভাল হত। কিন্তু ভাবল এমন তো প্রায়ই হয়, থেমেও যায়। কিন্তু দিনে দিনে যখন সংকট বাড়ল তখন বাড়ি চলে যেতে চেয়েছিল। তখন পথঘাটের অবস্থা বদলে গেছে। ট্রেন চালায় বিহারীরা, বাসও ঠিক মত চলেনা শেষপর্যন্ত সে ট্রেনেই গেল। কিন্তু ট্রেন যে তখন এত বিপদজনক হয়ে উঠেছে কে জানত। ট্রেনে তখন শুধু বিহারীরাই চড়ে, বাঙালিরা কেউ যদি ভুলে চড়ে বসে তার আর গন্তব্যে পৌঁছানো হয় না। জহুরকে ওরা ট্রেনেই জবাই করে যশোরের একটু আগে কোন এক জলা জায়গায় ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল।

রাজাকার কমান্ডারের শব মিছিলে আমরা কিছুক্ষণ

মেজ চাচা চলে যাবেন। তাকে পেয়ে আমরা একমাস অনেকটাই যেন নির্ভার ছিলাম। এখন কেউই তাকে ছাড়তে চায় না। কিন্তু তিনি আর থাকতে চাচ্ছেন না, বললেন– আল্লার উপর ভরসা করে এসেছেন, তার উপর ভরসা রেখেই ফিরে যাবেন। তার অস্থিরতার বড় কারণ আশপাশের আত্মীয়দের সাথে কথা বলতে তার রুচি হয় না। বলেন– এভাবে আত্মা বিকিয়ে দিলে তোমরা! ঢাকায়ও তো পশ্চিম বাংলার কত উদ্বাস্তু আছে, কই তারা তো এমন নয়। মানসিক চাপে তিনি খুবই অস্থির হয়ে পড়লেন, মাকে বললেন বুলুর মা, আমি দু'চার দিনের মধ্যে ঢাকা ফিরে যাবো,বাধা দিও না। এখন বাড়ি-ঘর, পথ-ঘাট কোথায় আমরা নিরাপদ? যাওয়াই ভাল, নইলে পরে হয়তো আরো বেশি সমস্যা হয়ে যাবে।

চাচা ট্রেনে যেতে আর ভরসা পাচ্ছিলেন না। আমরাও সেটা চাইনি। শেষে ঠিক হলো স্টিমারে যাবেন। যদিও শোনা যেত স্টিমারেও বিপদ কম নয়, বিহারীরা লোকদের ধরে জবাই করে পেট চিরে নদীতে ফেলে দেয়। তবু সবারই ধারণা স্টিমার যাত্রা কিছুটা হলেও নিরাপদ। স্টিমারে বা স্টিমার ঘাটে ট্রেন ও রেলস্টেশনের মত বিহারী শ্রমিক কর্মচারি ও যাত্রীদের ছড়াছড়ি নেই।এটা প্লাস পয়েন্ট। রকেট ছাড়বে রাতে। কিন্তু নিরাপত্তার প্রশ্নে চাচা দুপুরের পরপরই ঘাটের উদ্দেশ্যে রওনা দিলেন। স্টিমার সকালের দিকে এসে ডেল্টা ঘাট থেকে মালপত্র তুলে রকেট ঘাটে এসে অপেক্ষা করত। আমি এবং দোলাভাই তাকে স্টিমারে তুলে দিতে গেলাম। আমরা চাপাচাপি করে এক রিকশায় তিনজন বসেছিলাম, চাচার সাথে ছোট একটা বেডিং এবং একটা মগ ছাড়া অতিরিক্ত কিছু ছিলনা।

আমরা যাওয়া আসার জন্য রিকশা ঠিক করে নিয়েছিলাম। তবে ভদ্রতাবশে যাওয়ার ভাড়া পরিশোধ করে চাচাকে রকেটে তুলে দিতে গিয়েছিলাম। রিকশাওয়ালার অন্তত পনের মিনিট অপেক্ষা করার কথা। কিন্তু নির্দিষ্ট সময়ের আগে ফিরেও তাকে পাইনি। সে সম্ভবত ভাল কোন ভাড়া পেয়ে চলে গিয়েছিল, অথবা বৈরি পরিবেশে বেশিক্ষণ থাকতে সাহস পায়নি। আশপাশে কোথাও কোন রিকশা ছিল না। আমরা ঘোর দুঃশ্চিন্তায় পড়লাম।

বিহারী অধ্যুষিত ফেরিঘাট দিয়ে তখন হেঁটে যাবার কথা ভাবাই যেত না। স্টেশন রোডে চলাচলও বিপদজনক ছিল। এই রাস্তায় বেশ কিছু বড় বড় শূন্য গুদামঘর ছিল যেখানে ট্রেন ও স্টিমার যাত্রীরা হঠাৎ হঠাৎ নিখোঁজ হয়ে যেত বলে জোর গুজব ছিল। তবে এসব নাকি ঘটত বৃষ্টির সময় যখন যাত্রী এবং পথচারিরা গুদামঘরের উন্মুক্ত দরোজায় এসে দাঁড়াতো।স্বাধীনতার পর কৌতুহলবশে বহু লোক এসব গুদামের দরজায় ভিড় জমিয়েছে। নিষ্ঠুর বাস্তব সবাইকে শিউরে দিয়েছে– গুদামের দেয়ালজুড়ে রক্তের কালচে দাগ। আমরা বাজারের মধ্য দিয়ে ফেরার চিন্তাও বাদ দিলাম। এ পথে কাকা মিয়ার হোটেল, মুরগিপট্টি ও কসাইখানা। সর্বত্র বিহারীদের দাপট। তখন বৃষ্টি ছিলনা, রাস্তায় কিছু লোকজনও চলাচল করছিল এবং রিকশা পেতে হলে এপথেই পাওয়া সম্ভব- এমন বিবেচনায় আমরা শেষপর্যন্ত স্টেশন রোড বেছে নিলাম।

স্টেশন রোডের সামান্য আগে কদমতলা মোড়ে পৌঁছে আমরা শব মিছিলটাকে দেখতে পেলাম। মিছিলকারীদের কয়েকজনের কোমরে বেমানানভাবে তলোয়ার ও কাঁধে রাইফেল ঝুলছিল। মিছিল থেকে ভ্রমর গুঞ্জনের মত আওয়াজ আসছিল, নিকটবর্তী হতে সেটা কলেমা শাহাদাতের রূপ নিল। আমরা মিছিলে শামিল হওয়ার আমন্ত্রণ পেলাম। একজন শোকার্ত বৃদ্ধ দু'হাত বাড়িয়ে বললেন– আইয়ে ভাইসাব হামারা সাথ শামিল হো যাইয়ে। আমাদের পোষাক ছিল শব মিছিলের উপযোগী। পথে বেরোলে আমরা পাজামা-পাঞ্জাবি এবং টুপি পরে বেরোতাম, পকেটে থাকত তসবিহ্। আমরা কলেমা শাহাদাতের সাথে কণ্ঠ মিলালাম এবং এক ফাকে ব্যাথাতুর কণ্ঠে সামনের বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসা করলাম– চাচাজান, হামারা কোউন ভাইয়া হামলোগকো ছোড় কর আল্লাহ কি পাস যা রাহি হ্যায়?

আপলোগ কমান্ডার আহসান উল্লা ভেইয়াকো বারে মে শুনা নেহি! মুসলিম জাহানকা সীপাহসালার খালিদ বিন ওয়ালিদকা মাফিক বড়ে বীর থা। কওম, ওয়াতন আউর ইসলামকে খাতের মে লড়তে লড়তে শহীদ হো গিয়া। শালে গাদ্দার লোগ চুপাকে উনকো খোলি বরাবর গোলি মার দিয়া। আশহাদো আল লা ইলাহা–

কণ্ঠে বিষাদ ঝরিয়ে বললাম আল্লাহ উনকো লিয়ে জান্নাতুল ফেরদৌস নাসীব করে। আল্লাহ নে উনকি এক খালেছ বান্দাকো উঠা লিয়া, উনকি জাগা পর হাজারো আহসানউল্লা ভেইয়া ইসলাম আউর কওম কি খাতের মে জরুর খাড়া হো জায়েগা।

বৃদ্ধ বললেন– হা ভাই সহি বাত, বহুত আচ্ছা বোলা! ক্লে রোডের মোড় ছাড়িয়ে মিছিলটা ডাকবাংলার দিকে মোড় নিল। আমরা বৃদ্ধ এবং আশেপাশের দু'চার জনের সাথে মুসাফা করে বিদায় নিলাম।

সে দিনের কথা মনে পড়লে আজো শিউরে উঠি– সেই বিষম সময়ে বিষধর সব সাপের সাথে কিছুদুর কিভাবে যে হেঁটেছিলাম! আমরা আমাদের প্রতি আল্লাহর অপার করুণার জন্য অভিভূত ছিলাম। তাদের একজন কমান্ডার নিহত হয়েছিল এবং কাঁধের উপর তার লাশ তাদের উদ্ধত ফনাগুলোকে কিছু সময়ের জন্য হলেও অবনমিত করে দিয়েছিল।

হৃৎপিন্ড খামচে ধরা এক বিমান ছিনতাইয়ের ঘটনা

২০ অগাস্ট, ১৯৭১। দিনটি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে এক অনন্য মাইল ফলক। বীরশ্রেষ্ঠ মতিউর রহমান এদিন জীবনের বিনিময়ে বাঙালিদের জন্য এক গৌরব গাথা সৃষ্টি করেছিলেন। পাকিস্তান বিমান বাহিনীর দর্প ধূলায় মিশিয়ে দিয়ে মুক্তিযুদ্ধকে দ্রুত সাফল্যের পথে এগিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি সেদিন করাচির বুকে বসে এককভাবে এমন এক গভীর ও সুচিন্তিত পরিকলাপনা বাস্তবে পরিণত করেন যা কার্যত পাকিস্তানি বিমান শক্তিকে দীর্ঘ দিনের জন্য পঙ্গু করে দেয় এবং মাত্র চার মাস ব্যবধানে ডিসেম্বরের সর্বাত্মক যুদ্ধে পাকিস্তানের দ্রুত পরাজয় নিশ্চিত করে। এই পরিকল্পনার সাফল্য অথবা ব্যর্থতা পাকিস্তানের জন্য একই পরিণতি ঘটাতে সমর্থ ছিল এবং ঘটিয়েও ছিল।

এদিন পকিস্তান বিমান বাহিনীর ফ্লাইট লেফ্টেন্যান্ট মতিউর রহমান বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহণের জন্য করাচি মসরুর বিমান ঘাঁটি থেকে টি-৩৩ ট্রেনিং বিমান জবরদখল করে ভারতে পালিয়ে যেতে চেষ্টা করেন। এটি ছিল তার দীর্ঘ পরিকল্পনার ফসল। মুক্তিযুদ্ধের সূচনা কালে তিনি ছুটিতে বাংলাদেশে ছিলেন। বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণে অনুপ্রাণিত হয়ে ছুটি শেষ হলেও পাকিস্তানে না ফিরে আর্মি ক্রাকডাউনের পর ভৈরবে মুক্তিযুদ্ধ সংগঠিত করেন। কিন্তু পাকিস্তানি বিমান হামলায় তাদের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। এই ব্যর্থতার পরতিনি ৯ মে করাচিতে তার কর্মস্থলে ফিরে যান। তার ছিল এক বিশেষ পরিকল্পনা।তখন সামরিক বাহিনীতে বাঙালিদের আদৌ বিশ্বাস করা হত না। ফলে বিলম্বের জন্য তাকে কর্তৃপক্ষের কাছে জবাবদিহী করতে হয়। তবে পরিকল্পনা অনুযায়ী স্ত্রী ও শিশু কন্যাদের সাথে নিয়ে চাকরিতে যোগ দেয়ায় সহজে

তাদের আস্থা অর্জন করতে সক্ষম হন। তিনি ছিলেন একজন দক্ষ পাইলট-প্রশিক্ষক। ফলে তাকে গ্রাউন্ডে ফ্লাইট সেফটি অফিসারের দায়িত্ব দেয়া হয়। পাকিস্তানিরা তখন সন্দেহবশে কোন বাঙালি পাইলটকেআকাশে ওড়ার সুযোগ দিতনা, তাদের গ্রাউন্ডেড করে রেখেছিল।

ফ্লা. লে. মতিউর রহমান চেয়েছিলেন একটি জঙ্গী বিমান ছিনতাই করে ভারতে পালিয়ে যাবেন এবং পাকিস্তানি বিমানের মোকাবেলা বিমান দিয়েই করবেন। কিন্তু ওড়ার সুযোগ না থাকায় তাকে বিকল্প ব্যবস্থা নিতে হয়। ২০ অগাস্ট ছিল তার ছাত্র ট্রেনী পাইলট অফিসার রশীদ মিনহাজের একক উড্ডয়ন। মিনহাজ ছিলেন নবীন এবং এটা ছিল তার দ্বিতীয় একক উড্ডয়ন। তিনি মিনহাজের বিমানটি জবরদখল করে ভারতে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। মিনহাজ পাঞ্জাবী বংশোদ্ভুত ও পরিবারে ছয় সন্তানের মধ্যে একমাত্র পুত্র ছিলেন। মতিউর রহমান তাকেও জিম্মি করে পাকিস্তানিদের হাত থেকে তার স্ত্রী ও দুই শিশু কন্যাকে মুক্ত করার কথা ভেবেছিলেন।

মতিউর রহমানের পরিকল্পনা নিশ্চিদ্র ছিলনা। তার যেহেতু উড্ডয়নের সুযোগ ছিলনা, তিনি সঙ্গে প্যারাশূট নিতে পারেন নি। ককপিটে এই প্যারাশূটের উপরবসলে সিট থেকে ১০-১২ ইঞ্চি উচুতে বসা যায়, যা পাশে এবং নিচে দিকে পাইলটের দৃষ্টি ক্ষমতা ও বিমান নিয়ন্ত্রণের সুযোগ বাড়িয়ে দেয়। মতিউর রহমানের জন্য এটা খুবই জরুরী ছিল, কেননা পকিস্তানি র‍্যাডারের শ্যেন দৃষ্টি, ফাইটার বিমান ও মিসাইলের বাধা এড়ানোর জন্য ট্রেনিং বিমানটিকে প্রায় বৃক্ষ-সমতল দিয়ে সর্বোচ্চ গতিতে উড়িয়ে নিয়েযাওয়ার প্রয়োজন ছিল। দুর্ভাগ্যক্রমে, প্যারাশূট ছাড়াই দুঃসাহসী মতিউর রহমানকে সিটের গভীরে বসে কেবল দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা সম্বল করে বিমানটি ঝড়ের বেগে চালিয়ে নিতে হয়। শত ঝুঁকি সত্ত্বেও স্বীয় জীবন এবং প্রিয়জনের মায়া তুচ্ছ করে তিনি দেশের মুক্তির জন্য এই অনন্যসাধারণ পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। তার অবিদিত ছিলনা যে, এই উদ্যোগ সফল অথবা ব্যর্থ যাই হোক না কেন, এর আলটিমেট ফলাফল মুক্তিযুদ্ধের জন্য ইতিবাচক হতে বাধ্য ছিল।

২০ অগাস্ট সকাল সাড়ে ১১ টার দিকে ট্রেনী পাইলট অফিসার রশীদ মিনহাজ তার টি-৩৩ ট্রেনিং বিমানটি নিয়ে রানওয়ের দিকে অগ্রসর হন। এ সময় মতিয়ার রহমান দ্রুত গাড়ি চালিয়ে রানওয়ের প্রবেশের মুখে অবস্থান নেন এবং বিমানটি থামানোর নির্দেশ দেন। ইনস্ট্রাক্টর ও ফ্লাইং সেফটি অফিসারের নির্দেশ মানতে মিনহাজ বাধ্য ছিলেন। তিনি বিমানটি থামিয়ে কথা বলার জন্য ককপিটের ঢাকনা খুলে দেয়া মাত্র মতিউর রহমান বিমানের পাখায় লাফিয়ে উঠে পিছনের সিটে বসে পড়েন এবং মিনহাজের কাছ থেকে বিমানের নিয়ন্ত্রণ কেড়ে নিয়ে দ্রুত রানওয়েতে উঠে পড়েন। বিমানটি উভয় সিট থেকে চালানোর সুযোগ ছিল। বিমান দখলের জন্য স্থানটি ছিল সুবিধাজনক। অনুচ্চ টিলা ও গাছ পালার জন্য এলাকাটি কন্ট্রোল টাওয়ারের দৃষ্টির বাইরে ছিল।

এ সময় মিনহাজ কাঁপ কাঁপা গলায় টাওয়ারকে বিমান হাইজাকের সংবাদ জানান। টাওয়ার থেকে উপর্যুপরি বিমানটি থামানোর নির্দেশ দেয়া হয়, মতিউর রহমান কর্ণপাত করেননি। তিনি ক্লোরোফর্ম প্রয়োগ করে মিনহাজকে অজ্ঞান করে ফেলেন এবং প্রচণ্ড গতিতে আকাশে উধাও হয়ে যান। এর নয় মিনিট পর করাচি থেকে প্রায় চৌষট্টি মাইল এবং ভারত সীমান্ত থেকে মাত্র ত্রিশ মাইল দূরে থাট্টার শাহবন্দরের কাছে বিমানটি বিদ্ধস্ত হয় এবং তিনি শহীদ হন। সম্ভবত টেনশন এবং পাশে ও নিচের দিকে দৃষ্টি-স্বল্পতার মধ্যে বৃক্ষ সমতলে দ্রুত গতিতে উড্ডয়নের কারণে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বালিয়াড়িতে মুখ থুবড়ে পড়ে বিমানটি বিধ্বস্ত হয়।

মসরুর বিমান ঘাঁটির বেজ কমান্ডার নাজির লতিফ ৩১ অগাস্ট প্রেস-ব্রিফিংএ মতিউর রহমানের বিমান ছিনতাই এর ঘটনাকে অ্যাবোর্টিভ্‌বা নিষ্ফল প্রচেষ্টা বলে অভিহিত করেন। কিন্তু এই ঘটনা যে বাংলাদেশের বিজয় অর্জনের পথে কি বিরাট অবদান রেখেছিল তা মাত্র সাড়ে তিন মাস পর তাদেরকে হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করতে হয়। এ ঘটনার প্রভাব ছিল গভীরএবংসুদূরপ্রসারী, যা পাকিস্তান বিমান বাহিনীর শক্তির ভিত একেবারে নড়বড়ে করেদিয়েছিল। তাৎক্ষণিক ভাবে বোঝা না গেলেও, এই একটিমাত্র ঘটনা পাকিস্তান বিমান বাহিনীকে এমনভাবে পঙ্গু করেদিয়েছিল যে তিন ডিসেম্বর সর্বাত্মক যুদ্ধ শুরু হলে মাত্র তিন দিনের মধ্যেই তারা ভূমিশয্যা নিতে বাধ্য হয়। ফলে উভয় ফ্রন্টে পাকিস্তানের আকাশ ভারত ও মিত্রবাহিনীর বিমানের জন্য উন্মুক্ত হয়ে যায়।

বাঙালিদের উপর নৃশংস হামলার পর পাকিস্তানিরা সন্দেহবশে বাঙালি পাইলটদের গ্রাউন্ডেড্ করে রেখেছিল। তারা প্রতিশোধের আশংকা করেছিল এবং বাঙালি পাইলটদের হাতে মূল্যবান যুদ্ধ বিমানের নিরাপত্তা নিয়ে শংকিত ছিল। ফলে পাইলট স্বল্পতায় তাদের বিমান বাহিনীর যুদ্ধ-ক্ষমতা বহুলাংশে কমে যায়। নতুন রিক্রুটমেন্ট ও ট্রেনিং সময়সাপেক্ষ ছিল। এদিকে ভারতের সাথে যুদ্ধ অত্যাসন্ন দেখে তারা সেপ্টেম্বর থেকে বাঙালি পাইলটদের পাকিস্তানি একজন পাইলটের সাথে একত্রে উড্ডয়নের সুযোগ প্রদানের বিষয়টি বিবেচনা করছিল। কিন্তু ২০ অগাস্টের ঘটনায় সে উদ্যোগ নস্যাৎ হয়ে যায় এবং তারা আর পাইলট শূন্যতা কাটিয়ে উঠতে পারেনি।

দ্বিতীয়তঃ, বিমান বাহিনীর রক্ষণাবেক্ষণ, উড্ডয়ন, অপারেশন, নিরাপত্তা, প্রশাসন প্রভৃতি বিভাগে বাঙালি কর্মীর সংখ্যা ৩০ শতাংশেরও বেশী ছিল। তারা এতদিন যথারীতি দায়িত্বে বহাল ছিলেন। মসরুর বিমানবেজেও প্রচুর বাঙালি কর্মী ছিলেন। ২০ অগাস্ট বিমান ছিনতাইয়ের সংবাদ দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। বেজের বাঙালি সদস্যরা মনে প্রাণে মতিউর রহমানের সাফল্যের জন্য উৎকণ্ঠিত ছিলেন তা বলা বাহুল্য। ফলে দুপুরে মেসের ডাইনিং হলে যখন বিমানটি ধ্বংসের কথা ঘোষণা করা হয়, তাদের বেদনা বিধুর প্রতিক্রিয়া আদৌ গোপন ছিলনা। কারো

হাতের গ্রাস আটকে যায়, কারো অবশ হাত প্লেটের উপর আছড়ে পড়ে। এ ঘটনা পাকিস্তানিদের দৃষ্টি এড়ায়নি। বাঙালিদের প্রতি তাদের অবিশ্বাস চরমে ওঠে। ফলে সকল বাঙালি বিমান কর্মীকে দ্রুত দায়িত্ব থেকে প্রত্যাহার করা হয় এবং ব্যারাকে কনফাইণ্ড করা হয়।

এই বিপুল কর্মী শূন্যতা পুরণ পাকিস্তানের জন্য জরুরী ছিল। তারা বাঙালি কর্মীদের পদত্যাগের সুযোগ দেয়। তবে পদত্যাগের জন্য কেবল এই মর্মে কারণ দেখাতে বলা হয় যে 'পূর্ব পাকিস্তানের সাম্প্রতিক পরিস্থিতির কারণে তারা কাজে মনোনিবেশ করতে অক্ষম।' এটা বাঙালিদের মনে কোর্ট মার্শালের সম্মুখীন হওয়ার ভীতি সৃষ্টি করে। আমার ছোটভাই আনোয়ার মসরুর এয়ার বেজে কর্মরত ছিল। ১ আগস্ট বাবা মারা গেছেন। এই দুঃসময়ে সে বাড়ি ফেরার জন্য ব্যাকুল ছিল। বন্ধুদের পরামর্শে সে দুটো কারণ দেখিয়ে পদত্যাগপত্র দাখিল করে।'কম্প্যাশনেট্ গ্রাউন্ডে' তার পদত্যাগ পত্র গৃহীত হয় এবং তার পাওনা মিটিয়ে তাকে জাহাজ যোগে দেশে ফেরার নির্দেশ দেয়া হয়। তবে সমুদ্র পথে যাতায়াত তখন বাঙালিদের জন্য বিপদজনক ছিল। এমন ধারণা প্রচারিত ছিল যে জাহাজ থেকে বাঙালিরা প্রায়শ সমুদ্রে নিখোঁজ হয়ে যায়। আনোয়ার জাহাজ পরিহার করে গোপনে ছাত্র পরিচয়ে বিমানযোগে দেশে ফিরে আসে। সে যখন দুরু দুরু বক্ষে টিকিটের জন্য পিআইএ কাউন্টারে উপস্থিত হয় ছাত্রত্ব প্রমাণে কোন কাগজপত্রই সে দেখাতে সমর্থ হয়নি। সংশ্লিষ্ট কর্মকতা টিকিট ইসু করে গোঁফের তলায় ঈষৎ হেসে বলেন–লুক আনোয়ার, ফির টিকিট ভি খোয়া না যায়!

আমরা উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার মধ্যে আনোয়ারের জন্য দিন গুনতে থাকি। দাদী মা বোনদের পবিত্র কোরান এবং আমাদের কলেমা ও দোয়া-দরুদ পাঠের সম্মিলিত সুলোলিত সুরে বাড়িতে এক অপার্থিব আবহ সৃষ্টি হয়। এর বাইওে সেই দুঃসময়ে আমাদের কিছুই করার ছিলনা, কোথাও কোনো হাত ছিলনা, এমনকি দু পা এগিয়ে তাকে সাদরে বাড়িতে নিয়ে আসার মত ক্ষমতাও ছিলনা। এমন পরিস্থিতিতে যা হয় সবকিছুই আমরা অগতির গতি পরম করুণাময়ের হাতে সঁপে দিয়েছিলাম।

আমরা মতিউর রহমানের বীরত্ব ও করুণ মৃত্যুর কথা রুদ্ধশ্বাষে হৃদয়ে রক্তক্ষরণ নিয়ে শুনেছি। চিনিনা জানিনা তবু আপন জন হারানোর যে কষ্ট তেমনই এক কষ্ট হৃৎপিন্ড খামছে ধরেছে। যন্ত্রণা বার বার তীব্র হয়েছে যখন প্রায় প্রতিটি বেতার একে এবরটিভ বা নিষ্ফলা বলে অভিহিত করেছে। যদিও জানতাম এটাই ছিল সত্য, মতিউর রহমান সফল হতে পারেননি, তিনি শহীদ হয়েছেন। তথাপি তার সাহসিক আত্মদান আমাদের বেঁচে থাকার জন্য ছিল প্রেরণার উৎস।

আনোয়ার এসেছিল অক্টোবরের শেষদিকে। পরদিন অপরাহ্নে আমরা আব্বার কবর জিয়ারত করে ফিরছিলাম। প্রতিবেশিরা মোড়ের মাথায় তাকে ধরে বসল– কি আনোয়ার ওদিককার খবর কি, তোমাদের ঘাটিতে এতবড় একটা ঘটনা ঘটল তোমরা কিছুই টের পেলেনা, গাদ্দারটা আমাদের একটা বিমান ধ্বংস করল! পশ্চিম পাকিস্তানের মাটিতে কিভাবে ঘটতে পারল এটা? আমরা আগেই আনোয়ারকে সতর্ক করেছিলাম সবাই এখন নিশ্চুপ থাকে, যারা কথা বলে তাদের সম্পর্কে সতর্ক হতে হবে।

আনোয়ার বলতে চেয়েছিল তাহলে বুঝুন বাঙালি কি চীজ! কিন্তু বলল তার দলে তো আর কেউ ছিলনা, সেজন্য জানাজানি হয়নি। আর অমন দুচারটে বিমান তো ট্রেনিং কালে এমনিতেই ধ্বংস হয়, ওটা তেমন একটা ক্ষতি না। তারা গোলাবী খোয়াব নিয়ে ফিরে গেল। ঘরে এসে আনোয়ার বলল ভাই তুমি যে বলছিলে ডিসেম্বরের মধ্যে যুদ্ধ বাধতে পারে এটা কি ঠিক?

তাই তো শুনি।

তাহলে পাকিস্তানের কপালে বিস্তর খারাবী আছে। এখন মনে হচ্ছে মতিউর রহমান এক বিরাট কাজ করেছেন, বিমান ছিনতাইয়ের ঘটনা মোটেও এবরটিভ না। এর একটা সুদূরপ্রসারী ফল আছে, যুদ্ধ বাধলে বোঝা যাবে। তিনি আসলে পাকিস্তান বিমান বাহিনীকে ধ্বসিয়ে দিয়ে গেছেন।

মানে?

শোন বিমান বাহিনীতে বাঙালিদের সংখ্যা অন্য বাহিনীর তুলনায় কিছু বেশি। ওরা আমাদের কখনই বিশ্বাস করত না, এখন তো একেবারেই করে না। মতিউর রহমানের ঘটনার পর সবাইকে দায়িত্ব থেকে সরিয়ে ব্যারাকে ফিরিয়ে নিয়েছে এবং পোস্ট খালি করার জন্য পদত্যাগের সুযোগ দিয়েছে। আমরাতো প্রায় সবাই পদত্যাগ করেছি। ফলে বিমান বাহিনীতে অপারেশন, উড্ডয়ন, রক্ষণাবেক্ষণ, নিরাপত্তা, প্রশাসন সব ক্ষেত্রে এখন বড় রকম শূন্যতা। এই শূন্যতা পূরণ অনেক সময়ের ব্যাপার। আবার এই ক্ষতি উপেক্ষা করার মত বিশাল বিমান শক্তিও পাকিস্তানের নেই। ফলে কাছাকাছি সময়ে যুদ্ধ বাধলে বিমান সাপোর্টের অভাবে তাদের দ্রুত পরাজয় ঘটতে পারে।

আনোয়ার খানিকটা উন্মনা হয়ে গেল। সাগতোক্তির মত বলল পাকিস্তানি জেনারেলরা প্রকাশ্যে স্বীকার করুক আর নাই করুক ওদের বিমান বাহিনী গেছে। এ জন্যই ভাবি ওরা এত উন্মত্ত আচরণ কেন করছিল। আমাদের তো গরু-ছাগলের মত কর্মক্ষেত্র থেকে খেদানো হয়। দুঃসাহসী মতিউর রহমানকে তারা ডেয়ার ডেভিল বলে ডাকত, অথচ মৃত্যুর পর তার প্রতি কিভাবেই না নিষ্ঠুর প্রতিশোধপরায়ণ আচরণ

করেছিল। ওরা তাকে গাদ্দার বলে ঘোষণা করে, বিমানঘাঁটির প্রবেশ পথে তার ছবি টাঙ্গিয়ে ছবিটিকে অসম্মান করার জন্য বিমান সেনাদের বাধ্য করে এবং তার মরদেহ অসম্মানের সাথে চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের গোরস্থানে মাটি চাপা দেয়।

আমি অভিভূত হয়ে গিয়েছিলাম। এই অদেখা মানুষটিকে মনে হল কত চেনা, কত আপন। শ্রদ্ধায় মাথা আপনা থেকেই অবনত হয়ে এলো।

শেখ মুজিবের বিচার প্রহসন

আমাদের জন্য সবচেয়ে অস্বস্তিকর সংবাদ ছিল যখন ইয়াহিয়া খান সামরিক আদালতে শেখ মুজিবের বিচারের কথা ঘোষণা করলেন।

নুরু এবং তার কোরানে হাফেজ মা

পঞ্চবীথির মোড়ে অফিসের বাস আমাদের নামিয়ে দিয়ে যেতো। বিকালের দিকে রিকশা পাওয়া কঠিন ছিল। প্রায় দিনই বাড়ি ফিরতে হত হেঁটে। সেদিন একটা রিকশা পাওয়া গেল। চাহিদা বেশি। তবে তার ডেরা মিয়াপাড়ার কাছাকাছি। আমি সওয়ার হওয়ার সুযোগ পেলাম। রিকশাওয়ালা প্যাডেল চেপে কয়েক পা গিয়েছে মাত্র, একটা সাইকেল প্রায় একসিডেন্ট করতে করতে রিকশার পথ রোধ করে দাঁড়াল। চমকে উঠলাম– টুকু ডিআইবি। সেও সম্ভবত বেশ অবাক হয়েছিল এবং পাশে পা নামিয়ে কোনমতে পতন ঠেকাল। অস্ফুট স্বরে বলল– আপনি আছেন ভাবতেও পারিনি!যাহোক অনেকদিন থেকে আপনার অ্যাকটিভিটিজ নেই, থাকেন আল্লার নাম করে। সে দ্রুত চলে গেল।

এ এক সমস্যা। দুঃশ্চিন্তা সহসা দূর হয় না। টুকু ডিআইবিকে আমরা বিলক্ষণ চিনি। '৬৯-এর আন্দোলনের সময় রাতে ছেলেরা কয়লাঘাট কালিবাড়ির মোড়ে রাস্তার উপর শেখ মুজিবের মুক্তি, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার, বাঙালির বঁচার দাবী ৬-দফা, আইয়ুবশাহী নিপাত যাক– প্রভৃতি শ্লোগান লিখছিল। এ সময় টুকু ডিআইবির কাজ অনেক বেড়ে গিয়েছিল, প্রায় সময় তাকে সাইকেলনিয়ে পথে টো টো করে ঘুরতে দেখা যেতো। লেখা তখন মাঝপথে, সে ঘটনাস্থলে পৌঁছে গেল। ছেলেরা জানত এখন একটাই করণীয় আছে– সেটা হল সাইকেলের দু'চাকার পাম্প ছেড়ে দিয়ে দ্রুত লেখা শেষ করে সরে পড়া। দীর্ঘ অভিজ্ঞতা থেকে সে বোধ হয় ছেলেদের মনের কথা পড়তে সমর্থ ছিল, চেহারায় দার্শনিকের সারল্য ফুটিয়ে বলল– 'লেখেন, না লিখে উপায় কি, আমাদের তো একেবারেই শেষ করে দিচ্ছে। নেহাত চাকরি করি তাই, নইলে আমিও তো বাঙালি।'

কথাগুলো টাচি ছিল। সেই মুহূর্তে তাকে অবিশ্বাস করার কারণ ঘটেনি। সে সাইকেল নিয়ে নির্বিঘ্নে চলে গেল। ছেলেরা গল্পে কথায় মশগুল,শৈল্পিক উৎকর্ষ দিয়ে লেখাটা এগিয়ে নিয়ে গেল। নিঃশব্দে হেড লাইট নিবিয়ে দু'পাশ থেকে দুটো পুলিশ ভ্যানের এগিয়ে আসা তারা টের পায় একেবারে শেষ মুহূর্তে। পুলিশের জন্য এটা ছিল একটা বড় শিকার। ছাত্রলীগের জেলা ও শহর শাখার সভাপতি, সাধারণ সম্পাদকসহ সাত আটজন ধরা খেল।

আমি ভাবছিলাম এই ডিইবিকে কতখানি বিশ্বাস করা যায়। আল্লার নামে থাকেন বলে চলে গেল, কিন্তু রাতে বাড়িতে রেইড হবে নাতো!টুকু ডিআইবির সাথে আমার নিজেরই একটা বড় সমস্যা ছিল, যা আমাকে বেশ ভাবাচ্ছিল। আমরা একবার শেরেবাংলা এ. কে. ফজলুল হকের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে আলোচনার আয়োজন করেছিলাম। দুর্ভাগ্যক্রমে সেদিন বিকাল থেকে মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হল। থামার লক্ষণ নেই। জাহিদ, কামরুজ্জামান টুকু, বিনয় ও ইউসুফসহ আমরা মাত্র পাঁচজন ইকবালনগর কমুনিটি সেন্টারে আলোচনায় উপস্থিত হতে পেরেছিলাম। আলোচনা সভার জন্য এর অতিরিক্ত আর মাত্র দুজন লোক সেখানে উপস্থিত ছিল–মাইক্রোফোন সেটসহ মাইকম্যান এবং নিজের অকৃত্রিম সাইকেলসহ টুকু ডিআইবি। আমরা চা এবং রিকশার জন্য মাইকম্যানকে যৎসামান্য পয়সা দিয়ে বিদায় করলাম। টুকু ডিআইবি বলল তাহলে আপনাদের আলোচনা আজ আর হচ্ছেনা।

কেন? কামরুজ্জামান টুকু বলল, আমরা পঁচজন আছি, আলোচনা তো হবেই।

টুকু ডিআইবি হলের মধ্যে এসে জাঁকিয়ে বসল। আমি তাকে হল ছেড়ে বাইরে যেতে বললাম।

স্যার আপনারা মাইক ছেড়ে দিলেন, এই বৃষ্টির মধ্যে বাইরে থেকে আমি তো কোন কথাই শুনতে পবো না, অথচ আমাকে মিটিং সম্পর্কে নিপোর্ট করার জন্য পাঠানো হয়েছে।

বেশ রেগেই বললাম–রিপোর্ট করতে কে নিষেধ করছে, কিন্তু আমাদের সভায় বসে নয়। জাহিদ বলল ঠিক আছে টুকু সাহেব, আপনি বাইরে যান। আমরা মাত্র এই কজনা, আলোচনা আর কি হবে, পরে না হয় আপনাকে ব্রিফ করবো। টুকু ডিআইবি আমার উদ্দেশ্যে বেশ রেগেই বললেন– স্যার, কথাটা আমার মনে থাকবে।

এক ঘন্টা ধরে ঘরোয়া পরিবেশে আমাদের আলোচনা হল, আমরা চেয়ার টেনে গোল হয়ে বসেছিলাম। সবাই বক্তা সবাই শ্রোতা। আলোচনা খুবই চমৎকার ছিল এবং আমি বেশ অনুপ্রাণিত হয়েছিলাম। রাতে বাড়িতে যেয়ে একটা রিপোর্ট তৈরি করে ঢাকার পূর্বদেশ পত্রিকায় পাঠিয়ে দিলাম। ইয়োলো জার্নালিজম এইটুকু ছিল যে, আমি হলের কথা বলেছি কিন্তু জনসমাগম সম্পর্কে কিছু বলা হয়নি। কাগজে দেড় কলাম ব্যাপী রিপোর্ট প্রকাশিত হল, কামরুজ্জামান টুকুর বক্তৃতার অংশবিশেষ শিরোনাম করে– 'যে জাতি নিজের অতীতকে শ্রদ্ধা করতে জানেনা সে জাতির মুক্তি সুদূর পরাহত।' তখন আমি ইত্তেফাক, পূর্বদেশ কাগজে মাঝে মাঝে এ ধরনের লেখা পাঠাতাম, ছাপাও হত।

পরদিন বিকেলে টুকু ডিআইবি সুইটহাউজে ছুটে এসে বলল– আপনাদের কথা শুনে আমি অফিসে যেনতেন একটা রিপোর্ট দিয়েছি, আর কাগজে এসব কি বেরিয়েছে! অফিসে আমাকে যাচ্ছেতাই কথা শুনতে হল– আমি নাকি বৃষ্টিতে বউ নিয়ে বাসায় নাক ডেকে ঘুমিয়েছি আর কর্তৃপক্ষকে মনগড়া রিপোর্ট দিয়ে বিভ্রান্ত করেছি। আপনি কাজটা মোটেও ভাল করলেন না মনোয়ার সাহেব!

রিকশা এর মধ্যে বাড়ির গেটে পৌঁছে গিয়েছিল। রিকশাওয়ালা বলল, স্যার অন্যায় হলি মাপ করি দিয়েন, লোকটা কে আছিল? মনে কয় আপনেরে চেনে।

হ্যা, টুকু ডিআইবি, আমাকে ভালই চেনে।

আল্লা মালিক। আমরা ছোট মানুষ, স্যার তবু কই একটু সাবধানে থাইকেন। এখন দিনকাল খারাপ। সে রিকশা নিয়ে দ্রুত চলে গেল।

আমি নিশ্চিত ঘটনাটা টুকু ডিআইবির মনে আছে। আমি ঘরের পেছনের বেড়া ভালভাবে আলগা করে ঘুমোতে গেলাম এবং রাতভোর দুঃস্বপ্ন দ্বারা তাড়িত হলাম।

পরদিন বাস থেকে নেমে সেই রিকশাওয়ালাকে দেখে বিস্মিত হই, চিন্তিতও হই। এর উদ্দেশ্যই বা কি ! কিছুদুর এগিয়ে সে কথা বলা শুরু করল– আসলে স্যার আপনি ঠিক আছেন কিনা দেখার জন্যি খুব অস্থির আছিলাম। আমি স্যার শহরে পলাইয়া আইছি, রাজাকারদের ভয়ে। আপনি মনে হয় রাজনীতি করেন?

না, ছাত্র রাজনীতি করতাম একসময়, অনেক দিন হল ছেড়ে দিয়েছি। সে সময় এদের চিনতাম। তোমার ব্যাপারটা কি?

স্যার, আমাগো বাড়ি হোগলাবুনিয়ায়। আমরা আমলীগ করি। আমাদের পাশের গ্রামে খাঁ গুষ্টিরা থাকে।বাহের খাঁ লোকটাসুবিধের না।নদীর ওপারে বড় বাদুরা হিন্দু গ্রাম, পয়সা-কড়ি আছে। বাহের খাঁ দলবল লইয়াবড় বাদুরা লুট করতে চাইছিল। আমরা বাধা দিছি। সেই থন আমাগোর উপর ক্ষ্যাপা। ইদিকেসন্ন্যাসি বাজারে শান্তি কমিটি হইছে, রাজাকার ক্যাম্প বসছে, শান্তি শ্যাষ। বড় বাদুরার গেরস্ত হিন্দুরা দেশে থাকতে সাহস পায়নাই, তারা আঁধার রাইতে নৌকায়ভারতে পাড়ি দিছে। স্যার দলে দলে নৌকা যায়, ভেতরে কান্নার রোল। সে দৃশ্য যে দেখছে, মানুষ হইলে চোখে জল ঠেকাইতে পারে এমুন সাধ্যি কারো নাই। কিন্তু আমরা কিছু করতে পারি নাই।

শ্রাবণ মাসের শ্যাষ দিকেবাহের খাঁ গানবোটে আর্মিগো পথ দেখাইয়া বড় বাদুরায় আনছে, লগে তাররাজাকারের দলও আছিল। তখনো গ্রামে অনেক হিন্দু ছেল। তারা কয়জনরে মারে, ঘর-বাড়ি সব জ্বালায়ে দেয়। ঘটনা দেইখা আমরা ভয়ে গ্রাম ছাড়ছি। কিন্তু বাবা-চাচারা বুড়া মানুষ, যায় নাই। আর্মিরা বড় বাদুরা জ্বালাইয়া পেড়াইয়া নদী পার হইয়াএপারে আমাগো গ্রামেও হামলা করে। ছাগল হাঁস-মুরগি সামনে যা পাইছে, লুট করছে। আমাগো নাপইয়া বাপ-চাচারে রাজাকার ক্যাম্পে লইছে, কয় পোলারে সারেন্ডার করাও। আর ম্যালা টেকা মুক্তিপণ চায়। মায় অত টেকা কই পাইবে। জালেমগুলা বুড়া মানুষগুলারে এমুন মার মারছে যে মর মর অবস্থা। আমরা তক্কে তক্কে আছি, একদিন বাগে পাইয়া বাহের খাঁরে আচ্ছামত পিঠাইয়া আধমরা করছি, কইছি বুড়া মানুষগুলারে ছাইড়া দিবি, নয়তো শ্যাষ খাবার খাইয়া লইবি, আমরা তর আশেপাশেই আছি। তারপর গ্রাম ছাড়ছি। কেউ কেউ বাদায় যাইয়া জিয়া ভাই, মধু ভাইয়ের মুক্তিগো দলে যোগ দিচ্ছে, আমি খুলনায় খালার বাড়িতে আইয়া উঠছি। হে একখান ডান্ডি কার্ড বানায়া দিছে, অহন রিকশা চালাই।

নুরু রিকশাওয়ালাকে এরপর অনেক দিন দেখিনি। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরবাহাত্তরের প্রথম দিকেএকদিন সে হঠাৎ আমাদের বাড়িতে এসে হাজির। রিকশায় ঝাঁকা ভরা তরিতরকারি। তখন চাল, আটা, তরি-তরকারি, কাপড়-চোপড়ের খুব ক্রাইসিস। উৎসাহের সাথে বলল– এসব আনাজ-পাতি নিজের ক্ষ্যাতে ফলাইছি সাহেব। মানুষ বইসা নাই। শ্যাখ সাহেবের ডাকে মানসে পথের দু'ধারে, নালার মইদ্যে, যে যেহানে পারে ধান ফলাইছে। দ্যাখলে প্রাণ জুড়ায়।যাউক স্যার, আপনে ভাল আছেন দেইখ্যা বড় আরাম পাইলাম।

কিন্তু তোমার এ হাল হল কি ভাবে?

তার এক চোখ নষ্ট হয়ে গেছে। বলল– এহানে ভাল লাগতেছিল না স্যার। দ্যাশে গেলাম। চাচা ছাড়া পাইয়া মুক্তিগো লগে যোগ দিছিলেন, কইলেন– বাহের খা তর উপর খুব খ্যাপছে, তুই এহানে বাঁচতে পারবিনা, আমার লগে সুন্দরবন ক্যাম্পে চল। একদিন নাও বাইয়াক্যাম্পে ফিরতাছি, হঠাৎ নদীতে গানবোটের শব্দ। পড়িমরি করি লগি ঠেইল্যা নদীর এক ঘোঁচে নাও ঢুকাইলাম। গানবোটগুলা দ্যাখতে দ্যাখতে ঘাড়ের উপর আইয়া পড়ে, সুময় দেয় না। তখন কোন দিকে দ্যাখবার ফুরসত আছিলনা, শণের একগোছা শক্তডগা কেউ হাঁসুয়া দিয়া আগে কাইটা রাখছিল,উয়ার একখান আচমকা চোক্ষুর মইদ্যেহান্দাইয়া গেল। দুই হাতে চক্ষু চাইপ্যা নাওয়ের খোলে লুটাইয়া পড়লাম, রক্তে একাকার। ছোটখাটো চিকিৎসে ক্যাম্পেই হইত, কিন্তু চোখের চিকিৎসে ক্যামনে হইবে। মার সামান্য গয়না লইয়া আবার খুলনায়আইলাম। ক্ষত সারলো বটে, কিন্তু দৃষ্টি হারাইলাম। ডাক্তার কইছিল ম্যালা টেকা দরকার। অত টেকা কই পামু! মা কত ছোটাছুটি করল, কিন্তু কিছুই হইল না। বেবাক মানষের অবস্থাই তখন খারাপ আছিল স্যার।

সে চায়ের কাপে একটা লম্বা চুমুক দিয়ে বলল– স্যার আপনেরে মার কথা কইছি না, কোরানে হাফিজ। ওনার মত মানুষ হয় না। আমাগের যখন এই অবস্থা মায়ের কাছে তখন কিন্তু এক কলস গয়না আছিল। প্রিয়নাথ কাকা দেশ ছাড়ার আগে রাইতে মুখ বাঁধা একটা কাঁসারকলস মার কাছে থুইয়া গেছিল, কইছিল– এইটা রাখো দিদি, যদি ভগমানের দয়ায় বাঁইচা ফিরি তহন ফেরত দিও।আমরা কেউই জানতাম না,কাক পক্ষীও ট্যার পায় নাই। তয় মা পেরথমে থুইতে চায় নাই, কইছিল– আমাগো নিজেগেরই অহন ঠিকঠিকানা নাই, এসব আমি কনে থুমু। কাকা কইছিলেন– সে তো জানি দিদি, যদি যায় সে আমাগো কপাল, তার জন্যি তুমি ক্যান দায়ী হইবা? তয় তুমি ছাড়া আর কার কাছে এগুলো থুইতে পারি কও।

স্যার, প্রিয়নাথ কাকার ভিটেমাটি তখন শ্মশান। দ্যশ স্বাধীনের পর একদিন কাকাবউ আর বাচ্চা-কাচ্চালইয়া কাচুমাচু মুখে জোড় হাতে মার সামনে আইয়া খাড়াইছে। এক্কেরে ভাঙাচোরা দশা। আমি মার লগে বইয়া আছি। কিন্তু হে যা কইল তাতে আমার মাথা গরম হওয়ার যোগাড়– দিদি তোমার কাছে একটা গয়নার কলস থুইয়া গেছিলাম, অহন ফেরত পাইলে বড় উপকার হইত...।

মা কিছু কওনের আগে আমি কইলাম– এ আপনি কেমুন কথা কচ্ছেন কাকা! আপনি আমাগো কাছে কবে আবার গয়নার কলস থোলেন? আপনের কোথাও ভুল হতিছে বোধহয়।স্যার, প্রিয়নাথ কাকার মুখটা সাথে সাথে আঁধার হইয়া গেল। কিন্তু মা আমারে থামাইয়া দিয়া কল– যাও বাবা শাবলখান লইয়া আসো। তিনি জায়নামাজের পাটি একপাশে সরায়ে কলেন– এহানে খোড়ো। লেপা পোছা মাটির পোতাহাত খানেকখুড়তেইকাঁসারকলসপাইলাম। এমুন অবাক হইছিলাম কওনের মত না। মা কলসটা প্রিয়নাথ কাকার হাতে দিয়া কল– তোমার আমানত তুমি ফিরাইয়া লও, যে ভাবে থুইয়া গেছ সেভাবেই আছে, তবু দেইখ্যা লও, আল্লার কাছে হাজার শোকর এতদিনে তিনিআমারে ভারমুক্ত করলেন। স্যার, প্রিয়নাথ কাকার সেকি কান্না, বার বার কন আমরা তো ধনে প্রাণে শেষ হইয়া গেছিলাম। দিদি, তুমি আবার আমাগো দাঁড়ানোর ব্যবস্থা কইরা দেলে, ভগবান তোমারে শতগুন দেউক।

স্যার প্রিয়নাথ কাকা গেলে পর মারে কইলাম কয়টা টেকার জন্য রাজাকাররা বাপেরে এমুনভাবে পিটাইল, টেকা না পাইয়া চিকিৎসার অভাবে আমি একটা চক্ষু হারাইলাম, অথচ সে সুমায় তোমার কাছে এক কলস গয়না! তহন দু চারটা গয়না ব্যাঁচলে কি এমুন হইতো!

নারে বাপ, এ তো আমানতের গয়না। খেয়ানত করা কঠিন গোনা। আর একবার খেয়ানত শুরু হইলে থামা যাইতো না। মাইনষের অভাবের কি শ্যাষ আছে বাবা!

পাটকেলঘাটা ব্রীজ

মজিদ মামা খুলনার জনতা ব্যাংকে উচ্চপদে চকরি করতেন। তাদের বাড়ি সাতক্ষীরায়। মামা প্রায় সপ্তাহে ছুটির দিনটা মার সাথে কাটিয়ে আসতেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে সেটা বন্ধহল। সেপ্টেম্বারের এক শুক্রবারে মামা আমাদের বাড়ি এসে বললেন– বু, মার শরীরটা বোধ হয় ভাল যাচ্ছে না। কাল দুপুরের পর সাতক্ষীরায় যাচ্ছি দোয়া করবেন যেন ভালই ভালই ফিরতে পারি। আমি এর আগে পনেরো দিন খালিশপুরে মামার কোয়ার্টারে কাটিয়ে এসেছি। বললাম, মা আমিও যাই নানীকে দেখে আসি। আসলে আমার কাছে জীবনটা তখন একেবারে একঘেয়ে অর্থহীন হয়ে পড়েছিল। কেন জানি, মা আপত্তি করলেন না। যাত্রার প্রাক্কালে মা দাদী ভাই বোনেরা আমাদের সাথে সাথে গাড়ি পর্যন্ত এলেন, কতবার যে আয়তাল কুরছি, সূরা এখলাস, দোয়া-দরুদ পড়ে আমাদের গায়ে মাথায় ফু দিয়ে দিলেন তার হিসাব নেই। গাড়িতে আমরা তিন জন। মামা ড্রাইভ করছেন, আমি তার পাশে। পেছনের সিটে মামি কিছুক্ষণের মধ্যে উল-কাঁটা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

গাড়িতে খুলনা থেকে সাতক্ষীরা যেতে হলে তখন যশোরের উপকণ্ঠে রাজারহাট হয়ে যেতে হত। প্রায় ৭০-৭৫ মাইল পথ। কমকরে হলেও তিন ঘন্টা সাড়ে তিনঘন্টা সময় লেগে যেত। মামা আমাকে বলে দিলেন আইডেনটিটি কার্ড নিতে যেন ভুল হয় না। তবে ওরা 'ডান্ডিকার্ড' দেখতে চাইবে এবং ওটা দেখালেই চলবে। বস্তুত এ নিয়ে আমরা আড়ালে হাসাহাসি করতাম। পথে পদে পদে বিপদ। কথায় বলে বাঘের দেখা আর সাপের লেখা। গোটা পথে অনেকগুলো আর্মি ও রাজাকার ক্যাম্প, টহলদারী তো আছেই। ঐ সাথে আছে সাপের মত কুটিলতা নিয়ে বিহারী এবং কুলাঙ্গার বাঙালি দালালরা। তাদের নজরে পড়লে বেঁচে ফেরা দায়। সর্বত্র যেন বর্গির রাজত্ব।

পলাশপোলে যখন পৌঁছালাম তখন প্রায় সন্ধ্যা। শহরের প্রবেশ মুখে আর্মি ক্যাম্প। ওরা হুইসেল বাজিয়ে আমাদের গাড়ি থামালো, মুহূর্তের মধ্যে চার পাঁচ সৈন্য রাইফেল বাগিয়ে গাড়িটা ঘিরে ফেললো। তাদের হাবভাব দেখে আমাদের উৎকণ্ঠা বাড়লো। আমরা গাড়ি থেকে নামলাম এবং তাদের একটানা প্রশ্নের জবাব দিয়ে গেলাম। মামার আইডেনটিটি কার্ড এবং আমাদের উর্দু জবান অফিসারটিকে দ্রুত নমনীয় করল। সে গাড়ির আপাদমস্তক অনুসন্ধান রত আর্মিদের নিবৃত করল এবং মামার উদ্দেশ্যে বলল, ঠিক হ্যায়, যাইয়ে ম্যানেজার সাব।

কিছু দূর এসে মামা বললেন, এই ব্যাংকের চাকরিটার জন্যই এভাবে বাইরে বেরোতে সাহস পাই। ব্যাটারা ব্যংকের কর্মকর্তাদের কিছুটা সমীহ করে বলেই মনে হয়। আমরা প্রতিদিনই এদের হ্যান্ডসাম এমাউন্ট, উৎস অনুসন্ধান ছাড়াই, পশ্চিম পাকিস্থানে রেমিট করে যাচ্ছি। কিভাবে যে লুটপাট চালাচ্ছে জানোয়ার গুলো!

আমরা সন্ধ্যার মুখে পলাশপোল পৌঁছালাম। মামাতো বোনটা ছুটে এসে উৎফুল্লভাবে বলল, জানেন কাকু আজ সারাদিন সাতক্ষীরা টাউন খুবই গরম। গতরাতে কারা যেন তুফান কোম্পানির বাড়ি উড়িয়ে দিয়েছে। বড় মামার কাছে কড়া ধমক খেয়ে সে ভ্যাবাচেকা খেয়ে গেল। পরদিন সকালে আমরা তুফান কোম্পানির বাড়িটা দেখতে গেলাম। দ্বিতল বাড়িটার উত্তর পশ্চিমের একটা অংশ বিদ্ধস্ত হয়েছে। বাড়ির সামনে বেশ কিছু কৌতুহলী লোকের ভীড়। বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে এক মাঝবয়সী ভদ্রলোক তারা যে কত বড় দেশপ্রেমিক, সে জন্য যে তাদেরকে এভাবে ক্ষতির সম্মুখীন হতে হল সেটা আবেগ দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করছেন। ভাবলেশহীন মুখে আমরা তার কাহিনী শুনলাম।

সাতক্ষীরায় মামা খুবই পরিচিত। তার নিজের এলাকা, তদুপরি এখানে ব্যাংক ব্যবস্থার উদ্বোধন হয় তার হাতে এবং দীর্ঘ দিন তিনি ইউনাইটেড ব্যাংকের ম্যানেজার ছিলেন। তার আগে লোকেরা টাকা জমাতো সিন্দুকে অথবা মাটির নিচে পিতলের কলসিতে। এক ভদ্রলোক মামাকে তার নব নির্মিত মসজিদ দেখাতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। ওফাতের পরে যাতে তার পূণ্যার্জন প্রক্রিয়া জারি থাকে সে জন্য চমৎকার মসজিদটি বানিয়েছেন। মসজিদ গাত্রে আরবিতে আমার পাঠের অসাধ্য কিছু লেখা। তার বাড়ি মেইন রাস্তা থেকে প্রায় একশ ফুট ভিতরে। বাড়ির সামনে প্রশস্ত একটা রাস্তা রেখে ভদ্রলোক দু পাশে স্থাপনা গড়েছেন। এক পাশে মেইন রাস্তা পর্যন্ত মসজিদ আর একপাশে চার রূমের দোকানঘর, যার আয় থেকে মসজিদের ব্যায় নির্বাহ হবে। ভদ্রলোক বললেন পাশেই বাস স্টান্ড, লোকজনের ভীড় লেগেই থাকে, অথচ আশেপাশে মসজিদ নেই। মামা হেসে ফেললেন।

পড়ন্ত বেলায় আমরা খুলনা ফিরছিলাম। মামা বললেন, ভদ্রলোকের রাস্তা পর্যন্ত জমি দখলের এত দিনের চেষ্টা এই মওকায় সফল হল। মসজিদ বানিয়ে সরকারি জায়গা হালাল করে ফেলেছেন। তারপর হঠাৎ আমার দিকে ফিরে জিজ্ঞাসা করলেন, বলত মসজিদটা কি থাকবে ?

বললাম, আমি বরং আর একটা ঘটনার কথা বলি। আহসান আহমেদ রোডের অরবিন্দ আশ্রমে তো দেখেছেন। আমাদের পাড়ায় এক ওঁছা ফকির ওটা দখল করে মসজিদ বানিয়েছে। আশ্রমের দেয়ালের সংস্কৃত শ্লোকগুলো হাতুড়ি ছেনি দিয়ে ভেঙ্গে সেখানে আল্লা রসূলের নাম ও কলেমা খোদাই করেছে। এক বৃদ্ধ ভদ্রলোকর পাশাপাশি হাঁটছিলাম, অস্ফুট স্বরে উচ্চারণ করলেন, প্রকৃত মুসলমানের জন্য দু দফা কষ্টের কারণ হল- যখন আশ্রমের বেদের শ্লোক হাতুড়ি পিটিয়ে ভাঙ্গা হয়েছিল এবং আবার যখন আল্লার কলেমা হাতুরি পিটিয়ে ভাঙ্গা হবে।

আমরা কথার মধ্যেছিলাম। খেয়ালই করিনি যখন পাটকেলঘাটা ব্রিজের উপর উঠে পড়েছি। সাতক্ষীরা থেকে আট মাইল দূরে এই শক্তপোক্ত ব্রিজ। এখানে শক্তিশালী আর্মি চেকপোস্ট আছে।এখানে চেকিংয়ের জন্য গাড়ি থামাতে হয়। কথায় ব্যস্ড় মামা গাড়ি থামান না। হঠাৎ মনে হল উপর্যুপরি হুইসেল বাজছে। বললাম মামা, ওরা থামার সংকেত দিচ্ছে বোধহয়, আমরা খেয়ালই করিনি। মামা চমকে উঠলেন এবং সজোলে ব্রেক কসলেন। গাড়িটা স্কীড করে ব্রীজের ওপর প্রলম্বিত কালো দাগ ফেলে প্রায় মাঝামাঝি জায়গায় যেয়ে দাড়িয়ে পড়ল। দু পাশের রেলিং ঘেষে একগাদা তারের সাথে কাপড়ে জড়ানো সম্ভবত ডিনামাইট জাতীয় কিছু ফিট করা। দু দিক থেকে দু জন আর্মি গাড়ির দিকে ছুটে এলো, গো ব্যাক গো ব্যাক বলে পিছিয়ে যেতে ইশারা করল। মামা ধীরে ধীরে গাড়িটি পিছিয়ে এনে ব্রিজের প্রান্তে দাঁড় করলেন।

কর্কশ কণ্ঠে একজন চিৎকার করে উঠল– উতরো।

আমরা নামতে নামতে দেখলাম ঢালের নিচে একটা টিনশেড ঘর থেকে সুঠাম দেহী একজন অফিসার দু জন আর্মি স্কর্টসহ উপরে উঠে এলেন, চোখে মুখে ক্রোধের ছাপ। আমরা একযোগে তাকে সালাম জানালাম। তিনি জবাবের ধার দিয়েও গেলেন না, চিৎকার করে উঠলেন– হেয়াই য়ু ডিড'ন্ট ওবে মাই অর্ডার। হেয়াই য়ু ডিড'ন্ট স্টপ দ্য কার অ্যাট দ্য প্রপার প্লেস? হোয়াই?

তার স্বরগ্রাম উত্তরোত্তর চড়ছিল। মামা বললেন, উই আর ভেরি সরি, উই মেড বিগ মিসটেক। সাচ মিসটেক উইল নট অকার ইন ফিউচার স্যার। উই অ্যাশিওর ইউ উই উইল বি কেয়ারফুল।

মাগার কিউ কিয়া গলতি? আইডেনটিটি কার্ড নিকালো, কোন হো তোমলোগ, হামারা অর্ডার ভায়লেট কিয়া ! কিয়া তোম জানতা নেহী ইয়ে ব্রীজ কা মালিক হাম হ্যায়! সে তার লোকদের উদ্দেশ্যে বলল– গাড়ি সার্চ করো।

সরি ক্যাপ্টেন স্যার, গলতি হো গিয়া, মাপ কর দিজিয়ে। মামার দীর্ঘ দেহ, ব্যক্তিত্বপূর্ণ চেহারা এবং আইডেনটিটি কার্ড সম্ভবত তাকে কিছুটা নমনীয় করে ফেলল, আপ ব্যাংক ম্যানেজার হ্যায় ! ইধার কাহা গিয়া থা ?

সাতক্ষীরা টাউন। ওহা হামারা মাকান হ্যায়। আম্মিকো তবিয়ত আচ্ছি নেহি থা, ইস লিয়ে গিয়া থা।

ঠিক হ্যায়। আপ যা সাকতে হে। মাগার কাভি এয়ছা গলতি মাত করনা। আদায় ওয়াইজ উধায় দেখিয়ে, আপ তো ফিনিশ হো গিয়া থা।

আমরা পিছনে ফিরে বালির বস্তা দিয়ে ঘেরা একটা গোল ছাউনি দেখতে পেলাম, কল্কেমুখ ভায়াল দর্শন মেশিনগান আমাদের দিকে তাক করা, পিছনে ভয়ংকর থমথমেমুখ এক আর্মি, চোখে খুনির দৃষ্টি। শিউরে উঠলাম। বাকি দীর্ঘ পথ আমাদের প্রায় নিঃশব্দে কাটল।

গোশের কেজী আট আনা

আগস্টের এক বিকালে আব্বাস ড্রাইভার আমাদের ডাকবাংলার মোড়ে নামিয়ে দিল। ক'দিন আগে পাশেই ডাকবাংলোতে গ্রেনেড চার্জে বিহারীদের নেতা মতিউল্লা সর্দার নিহত হয়েছিল। তারা এখনো ক্ষেপা কুত্তার মত হয়ে আছে, মুক্তি খুঁজে বেড়াচ্ছে। সে ছিল গুন্ডা সর্দার এবং বিভিষিকা বিশেষ। আমরা পারতপক্ষে এই এলাকা এড়িয়ে চলতে চাইতাম। কিন্তু আব্বাস আমাদের অনুরোধের তোয়াক্কা করত না, শীতল কণ্ঠে বলত জলদি উৎরিয়ে সাব, মুঝে ওয়াপস যানা হ্যায়।

সেদিন ডাকবাংলোর সামনে কি কারণে যেন বিহারী এবং রাজাকারদের উত্তেজিত ভিড় ছিল, স্বভাবতই ডাকবাংলা ছিল প্রায় জনশূন্য, মোড়ে একটা রিকশাও ছিল না। আমরা দ্রুত সেমিট্রি রোডের দিকে পা বাড়ালাম। রিকশা পেলাম এপিসি স্কুলের গলিতে। কিছুটা নিরাপদ দূরত্বে আসার পর জিজ্ঞাসা করলাম, কি হয়েছে ওখানে।

কেডা কবে সাহেব, পালের গোদাটা মরছে, আর এহন হালারপুতগো মাথার ঠিক আছে নি। রিকশাওয়ালা হঠাৎ থতমত খেয়ে চুপ করে গেল। বললাম তুমি ঠিকই বলেছ তবে কিছুটা সাবধানে থাকা ভাল। তোমার বাড়ি কোথায়?

সেপ্টেম্বরের শেষদিকে এক অপরাহ্নে আব্বাস ড্রাইভার গাড়িটা সোজা চালিয়ে আমাদের ডাক বাংলার মোড়ে এনে নামিয়ে দিল। সে তার খেয়াল খুশি মত কাজ করত। আমরা পারত পক্ষে তার সাথে কথা বলা ছেড়ে দিয়েছিলাম। সাব্বির ইসমাইলিয়া কমুনিটির লোক। সে আমাদের সমস্যা ভালই বুঝত, বলল– আব্বাস ভাই, ইধার কিউ আয়া। শান্তিধামমে যাইয়ে প্লিজ, হামারা সব আদমিকা ঘর ওহাছে নজদিক হ্যায়।

নেহি যা সাকেগা স্যার। অর্ডার নেহি।

ফারুক তো হররোজ যাতা হ্যায়। আাপলোগ ভি যাতা হ্যায়, আউর আজ বলতা হ্যায় অর্ডার নেহি।

আজ নেহি যা সাকেগা, টাইম নেহি, হামকো জলদি ওয়াপাছ যানে কি লিয়ে বোল দিয়া।

কোন যুক্তিই তাকে টলাতে পারল না। অফিস থেকে জলদি ফিরতে বলেছে, বাস, সে আমাদের ডাক বাংলার মোড়ে নামিয়ে দেবে, পাঁচ মিনিটও বাঁচাতে পারবে কিনা সন্দেহ। অথচ এই মোড়টাকে বাঙালিরা পারতপক্ষে এড়িয়ে থাকতে চায়, মোড়ে বিহারীদের উপদ্রব। পাশেই ডাক বাংলো- শান্তি কমিটির অফিস। সুযোগ সন্ধানী লোকজনের ভিড় লেগে থাকে। নানা দেনদরবার নিয়ে বিহারীরাই আসে বেশী। নিরূপায় হয়ে আমরা গাড়ি থেকে নেমে আসি। কোন রিকশা নেই। ডান দিকে ঘুরে সিমেট্রি রোডে ঢুকব, হঠাৎ এক গাট্টা গোট্টা বিহারী দুহাত মেলে পথ রোধ করে দাড়ায়। চমকে উঠি। তবে তার চোখের দৃষ্টি ও কণ্ঠস্বর ভিন্ন ধারণা দেয়– জনাব, মেহেরবানী করকে থোড়া গোস্ত লে যাইয়ে, বড়ি আচ্ছি গোস্ত সাব।

তার দৃষ্টি অনুসরণ করে পথের ওপাশে দু তিনটে ছোট ছোট গরুর মাংসের দোকানের উপর আমাদের চোখ পড়ে। দেকানগুলো আগে ছিলনা, কোন রকমে ছাপড়া তুলে নতুন বানানো হয়েছে। প্রতিটা দোকানে এই বিকেলেও রান মাথা সহ বেশ কিছু মাংস ঝুলছে। দোকানের কসাইগুলোর চোখে মুখে, প্রচলিত ধারণার বাইরে, অনুনয় আমন্ত্রণ।

গোশ নিয়ে যাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ এ ব্যাপারে আমাদের কারো মনে দ্বিধা ছিলনা। আফতাফ চুপচাপ স্বভাবের মানুষ, যখন কথা বলতো তার রসবোধ সবাইকে মাতিয়ে যেতো। মৃদু স্বরে বলল চলেন স্যার, মাংস হওয়ার চোখে মাংস কেনাই ভাল। কসাইগুলোর হাতে ভয়ংকর চাপাতি এবং ভোজালী, তাদের ব্যবসার মধ্যে ব্যস্ত রাখা নিঃসন্দেহে উত্তম।

আমরা যে যা মাংস চাইলাম, ওরা তার ডবল ওজন করে খবরের কাগজে মুড়ে দিল। আমরা ভেইয়া ভেইয়া এতনা নেহী, এতনা নেহী করেও ওদের নিবৃত করতে সমর্থ হলাম না। দাম কত হচ্ছে তা নিয়ে দুশ্চিন্তা ছিল। একজন সাহস করে বলল এতনা পয়সা তো নেহি হ্যায় মেরা পাস ভেইয়া।

আরে লে যাইয়ে না, কিম্মৎ তো জেয়াদা নেহী, আপকা দো সের, এক রুপিয়া হুয়া সাব।

আমি বেকার মত ফ্যাল ফ্যাল করে লোকটার মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলাম। সবারই একই হাল। মাস দেড়েক আগেও দাম ছিল দু'টাকা আড়াই টাকা সের। এখন আট আনা মাত্র! কে জানে পানির দামে কেনা, না কেড়ে আনা, না লাওয়ারিশ! এখন গরুর দাম নেই। হিন্দু হোক মুসলমান হোক তার একটা নিরাপদ আশ্রয় আছে সীমান্তের ওপারে। গরু গুলোর নেই। মাঠে ছেড়ে যাওয়া বেওয়ারিশ গরু- তা হিন্দুর হোক আর মুসলমানের হোক, তারা এখন কসাইদের, যে প্রথম গরুগুলোর গলায় দড়ি পরাবে তার। কসাইরা শতভাগ বিহারী, কার ঘাড়ে দুটো মাথা যে গরুগুলো ছাড়তে আসবে।

সবাই একটা বিষন্নতা নিয়ে ফিরে এলাম। চেহারা সবার মনের কথা বলে দিচ্ছিল। সবাইকে পিড়ীত করছিল একই প্রশ্ন, গোশটা খাওয়া হালাল হবে তো! অথচ আমাদের কষ্টের পয়সায় কেনা।

শহীদ ইলিয়াস আহমদ

সুবেদার ইলিয়াস স্টার জুট মিলের অ্যাসিসট্যান্ট সিকিউরিটি অফিসার ছিলেন। স্টার জুট মিলে যোগদানের পর তিনি যখন হিসাব ইনচার্জের সাথে পরিচিতহতে এসেছিলেন স্যার তাকে জিজ্ঞাসা করেন, এর চেয়ে ইপিআর-এর চাকরি ভাল ছিল না?

ছিল স্যার।

ছেড়ে এলেন যে!

তিনি ঈষৎ হেসে নিরব থাকলেন।

আপত্তি থাকলে বলার দরকার নেই, বাঙালিরা সশস্ত্র বাহিনীতে টিকছে না এ নিয়ে নানা গসিপ শুনিতো তাই, ওকে লিভ ইট।

না স্যার, আপত্তি কি। আমি যে বাঙালি এবং শেখ মুজিবের ভক্ত তা কখনো গোপন করিনি। একবার প্রমোশন হয়েছিল। কয়েক দিন পর কর্নেল বশির বিষয়টা জানতে পারে এবং রেগে যায়, বলে ট্রেটর'স ফলোয়ারের জন্য কিসের প্রমোশন? চাকরিই থাকা উচিৎ না। সে আমাদের কয়েকজনকে ডিমোশন দেয় এবং ব্যাজ খুলে দিতে বলে। আমি স্যার শুধু ব্যাজ নয়, পোশাকটাই খুলে দিয়ে এসেছি।

ইলিয়াস আহমেদ বিএসসি পাশ ছিলেন, অল্প দিনের মধ্যে স্টার ছেড়ে ক্রিসেন্ট জুট মিলে ওভারসিয়র পদে যোগ দেন। আমার এই ট্রেটর'স ফলোয়ার সম্পর্কে বেশ কৌতুহল ছিল, কিন্তু তিনি হঠাৎ করে ক্রিসেন্টে চলে যাওয়ায় আর যোগাযোগ ঘটেনি। একাত্তরের মার্চের উন্মাতাল দিনগুলিতে আবার তার খবর পাই ক্রিসেন্ট জুট মিলের মাঠে স্বেচ্ছা সেবকদের সামরিক ট্রেনিং দিচ্ছেন। আমি ২৫ মার্চের পর অফিসে যাইনি। পরে পালিয়ে আসা সহকর্মীদের কাছে শুনেছি, তিনি স্টার জুট মিলের অবাঙ্গালী ম্যানেজারের রাইফেল সহ মিলের ক্যাশরুমের কয়েকটি রাইফেল, বন্দুক ও গুলি নিয়ে দলছুট পুলিশ ইপিয়ার ও শ্রমিকদের সঙ্গবদ্ধ করেন এবং খালিশপুরে ফিরে যেয়ে বেশ কিছু বাঙালিকে উদ্ধার করে সেনহাটিতে নিয়ে আসেন। পরে তিনি অস্ত্রগুলি ফিরিয়ে দিয়েছিলেন।

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৮০ সালে আমি ক্রিসেন্ট জুট মিলে বদলি হই। বেশ কিছুদিন পর উৎপাদন বিভাগের এক কর্মকর্তার কাছে ইলিয়াস সাহেবের খোঁজ করি। তিনি বলেন–'তাকে আর কোথায় পাবেন! তার পারবর্তে তার স্ত্রী সাইদা বেগম কাজ করেন মিলের প্রশাসন বিভাগে। আপনি যদি কথা বলেন তিনি খুশি হবেন, তাদের কথা এখন কে পোঁছে বলেন!'

প্রশাসন বিভাগ ছিল আমাদের অফিসের পাশে একই ফ্লোরে। একদিন টিফিন পিরিওডে সাইদা বেগমের কাছে ইলিয়াস সাহেবের অনেক কথাই শুনি। তার জীবন ইতিহাস অভিভূত হওয়ার মত। শহীদ ইলিয়াস প্রথমে পুলিশের এসআই ছিলেন, পরে ইপিআর বাহিনীতে যোগ দেন। তাকে ট্রেনিংয়ের জন্য কোয়েটায় পাঠানো হয়। ইনস্ট্রাক্টর মেজর মঞ্জুর ছিলেন পাঞ্জাবী, বাঙালিদের বিষদৃষ্টিতে দেখতেন।ট্রেনিংয়ে ইলিয়াসের সর্বোচ্চ সাফল্যে তিনিবিরক্তহন, বলেন তোমার ফাইনাল ট্রেনিং এখনো বাকি।

ইলিয়াস জানতে চায়, সেটা কবে স্যার?

যে কোন দিন, শুধু মনে রেখো তোমাকে হঠাৎই ধরা হবে।

মেজর মঞ্জুর একদিন ইলিয়াসকে টিলার উপরে নিয়ে যান। হাঁটতে হাঁটতেএকপর্যায়ে তারা টিলার প্রায় কিনারে চলে আসেন, মঞ্জুর আচমকা তার পায়ের পাতার উপর বুটের গোড়ালি দিয়ে সজোরে আঘাত করেন। অসহ্য যন্ত্রণায় ইলিয়াস গড়িয়ে নিচে পড়ে যান, তার গোড়ালির জয়েন্ট নড়ে যায়। তাকে একমাস কোয়েটা এবং পরে ঢাকা পিলখানা ইপিআর হাসপাতালে চিকিৎসা দেয়া হয়। সুস্থ্য হয়ে আবার ইপিআর-এ জয়েন করেন। এরপর যথেষ্ট দক্ষতা দেখালেও তাকে প্রমোশন দেয়া হত না। তিনি ক্ষোভের সাথে বলতেন 'কলম চেপে যারা সই দেয় তাদের প্রমোশন হয় শুধু অবাঙ্গালী বলে, আর আমরা শিক্ষিত, ভাল পারফর্ম করি,আমাদের প্রমোশন নেই।'

এরপরযদিওবাপ্রমোশন হয়, কয়েক মাস না যেতেই একদিন অবাক হয়ে তাকে শুধু গেঞ্জী গায়ে কোয়ার্টারে ফিরতে দেখি। ক্ষুব্ধকণ্ঠে তিনি বললেন মুজিবের অনুচর বলে ওরা আমাকে ডিমোশন দিয়েছে এবং ব্যাজ খুলে দিতে বলেছে। আমি পুরো ইউনিফর্ম খুলে দিয়ে এসেছি, দিনের পর দিন এভাবে অপমান সহ্য করে চাকরি করা যায় না।

আমার মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়ার অবস্থা হল। আমাদের তখন ছোট ছোট দুটো মেয়ে, ছোট মেয়েটার বয়স দু'মাস। তবে আল্লা সহায় ছিলেন, ইলিয়াস স্টার জুট মিলে চাকরি পেয়ে যায়, সেখান থেকে ক্রিসেন্ট জুট মিল। তবে আমরা থাকতামচন্দনীমহলে। এসময় তিনি রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়েন। বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণের পর অসহযোগ আন্দোলনে মিল অচল হয়ে যায়। কিন্তু তার কাজ বাড়ে। তিনি ছাত্র, শ্রমিক ও সাধারণ মানুষকে সামরিক ট্রেনিং দেয়া শুরু করেন। তিনি স্থানীয় আওয়ামী লীগের সহায়তার দুটো থ্রিনটথ্রি রাইফেল সংগ্রহ করেছিলেন। এসময় ভিতরে ভিতরে সংঘতের আশংকা ঘনীভূত হয়ে উঠেছিল। তিনি আমাকে বাচ্চাদের নিয়ে গ্রামের বাড়িতে চলে যেতে বলেন। আমি যেতে রাজি হইনি। তবে শেষপর্যন্ত ২৫ মার্চ আমাকে লোহাগড়ায় ধলইতলা গ্রামে বাবার কাছে চলে যেতে হয়।

৩ জুন সন্ধ্যার পর তিনি হঠাৎ গ্রামে আসেন। গায়ে কাদা মাখা, শীর্ণ ক্লান্ত। গভীর রাতে আমাকে ডেকে তুলে বলেন, তোমাকে একটা কথা বলব বলে এসেছি। তাকে ভিন্ন মানুষ বলে মনে হচ্ছিল। বললেন আমরা ভারতে চলে যাচ্ছি। দেশ মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত ফিরব না, হয়তো আদৌ ফিরব না, যুদ্ধে তো কত কিছুই ঘটতে পারে। কিন্তু বাচ্চাদের চিন্তা আমাকে পাগল করে দিচ্ছে। তুমি কথা দাও ওদের ফেলে কখনো কোথাও চলে যাবে না।

ছোট বাচ্চাটার বয়স তখন দুই মাস। বললাম, কিন্তু আমাদের কি হবে?

জানি না, এ প্রশ্নের উত্তর নেই। বাংলাদেশের ঘরে ঘরে এখন এই একই প্রশ্ন।

আমি আকাশ পাতাল কি যে ভাবছিলাম। আমার হাত দুটো ধরে গভীর উৎকণ্ঠা নিয়ে মুখের দিকে তাকিয়ে বলল– কই, কথা দাও, আমাকে শান্তিতে যেতে দাও।

আমি কথা দিলাম। কি বা হত কড়ার করিয়ে না নিলে, মা কি কখনো বাচ্চাদের ফেলে যেতে পারে! ভোর রাতে তিনি আমার ও বাচ্চাদের মাথায় হাত রেখে বেরিয়ে গেলেন। বড় মেয়েটা হঠাৎ জেগে উঠলো, বলল আমার জন্য লাল জামা এনো বাবা।

শুনেছি তিনি ৯ নম্বর সেক্টরে প্রথমে টাকি পরে হিঙ্গলগঞ্জ ক্যাম্পে ছিলেন। সেখান থেকে দেশে ঢুকে পাকিস্তান আর্মির উপর একের পর এক চোরা-গোপ্তা হামলা চালিয়ে আবার হিঙ্গলগঞ্জ ক্যাম্পে ফিরে যেতেন। এরপর তাদেরকে দেশের অভ্যন্তরে স্থায়ী ঘাটি করার জন্য শ্যামনগর থানা দখল করার নির্দেশ দেয়া হয়। ১৭ আগস্ট রাতে লেফটেন্যান্ট বেগের নেতৃত্বে তারা আর্মি ও রাজাকারদের হটিয়ে থানা দখল করে নেন। তাদের সাথে প্রায় ৫০০ মুক্তিযোদ্ধা ছিল, তারা অধিকাংশই ছিল ছাত্র। পরে ক্যাপ্টেন হুদার নেতৃত্বে আরো কিছু মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্পে আসে। ক্যাপ্টেন হুদা কয়েকজন দক্ষ যোদ্ধাকে সাথে নিয়ে কোথাও অপারেশনে যান, বাকিরা ক্যাম্পে থেকে যায়। ক্যাম্প ভরা যোদ্ধা, কিন্তু

তারা ছিল বিভিন্ন গ্রুপের। শৃঙ্খলার ঘাটতি ছিল, শিথিলতাও ছিল। ২০ আগস্ট অনেক্ষণ গল্পগুজব করে তারা গভীর রাতে ঘুমাতে যায়। ইলিয়াসের সাথে দু'একজন পাহারায় থাকে।

রাত তখন প্রায় আড়াইটা, সবাই গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। হঠাৎ দূরে গোপালপুর-শ্যামনগর পথের উপর মাটির কাছাকাছি সবুজাভ দুটো আলো দেখে ইলিয়াস চমকে ওঠে। অভিজ্ঞতা থেকে তার বুঝতে বাকি থাকেনা যে কোনো জিপ আর্মি কনভয়ের নেতৃত্ব দিয়ে এগিয়ে আসছে। সাথে সাথে হুইসেল বাজিয়ে তিনি সকলকে সতর্ক করেন এবং চিৎকার করে পজিশন নেয়ার জন্য বলেন। কাঁচা ঘুম ভেঙ্গে মুক্তিযোদ্ধারা সবাই দিশাহারা হয়ে পড়ে। রাতটাও ছিল কৃষ্ণপক্ষের ঘোর অন্ধকার রাত। কে কোথায় পজিশান নেবে কিছুই বুঝে উঠতে পারছিল না। পাকিস্তানি কনভয় ইতোমধ্যে অনেকটা এগিয়ে এসেছে এবং পথের উপর পজিশন নিয়ে গোলা বর্ষণ শুরু করেছে।কেউ কেউ রাস্তার কালভার্টের পেছনে, কেউ দীঘির পাড়ে পজিশন নেয়। বেশিরভাগই পালিয়ে যায় পিছন দিয়ে।

শতশত তরুণ শিক্ষনবিশ মুক্তিযোদ্ধাকে বাঁচানোর তাগিদে ইলিয়াস ও তার কয়েকজন সহযোদ্ধা গোপালপুর দীঘির পাড়ে পজিশন নিয়ে কভারিং ফাইট দিতে থাকেন। তারা সকাল পর্যন্ত পাকিস্তানি হানাদারদের ঠেকিয়ে রাখেন।কিন্তু ভোরের আলো ফুটে ওঠার সাথে সাথে তাদের পজিশান উন্মুক্ত হয়ে পড়ে। বৃষ্টির মত গুলি হতে থাকে। একে একে আবুল কালাম আজাদ ও আবুল কাশেম শহীদ হন। ইলিয়াসের গুলিও ফুরিয়ে আসে। একজন মুক্তিযোদ্ধা গুলি সরবরাহ দিয়ে পজিশনে ফিরে যাওয়ার পথে শহীদ হন। ইলিয়াস মরিয়াভাবে ব্রাশ ফায়ার করতে থাকেন, তিনি জীবীত ধরা পড়তে চাননি। এমন সময় অদূরে পাশ থেকে হঠাৎ জয় বাংলা শ্লোগান শুনে সামান্য উচু হয়ে ঘাড় ফেরানোর সাথে সাথে তার বুক গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে যায়। আসলেএরা ছিল রাজাকার। ইলিয়াসের পাশে ছিলেন ইপিআর সদস্য কেরামত, তিনি চিৎকার দিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরেজ্ঞান হারান। ইলিয়াসের রক্তে কেরামতের শরীর রক্তাক্ত হয় যা সেই সংকটময় মুহূর্তেতাকেবাঁচিয়ে দিয়েছিল।

আর্মিরা স্থানীয় থানার ওসিকে সাথে নিয়ে এসেছিল। ওসি পরে বলেছিলেন, গোলাগুলি থেমে গেলে আর্মিরা ক্রলিং করে এগিয়ে যায়। তারা নিশ্চিত হয় যে এখানে কেউ জীবীত নেই। এই যুদ্ধে পাকিস্তানিদের নেতৃত্ব দেয় মেজর মঞ্জুর। সে এগিয়ে আসে এবং ইলিয়াসকে দেখে বিস্মিত হয়, বলে–'তাকে আমি চিনি, সে আমার আন্ডারে ছিল, আগে জানলে তাকে মারতাম না, ধরে নিয়ে যেতাম। হাউএভার হি ওয়াজ এ ব্রেভ সোলজার।' এই মঞ্জুরই ছিল কোয়েটা ক্যাম্পের ইনস্ট্রাক্টর। তারা ফিরে যায়, ওসিকে বলে–'ঠিক হ্যায়, দাফন করদো।'

আমি তখন বাবার বাড়িতে। সেপ্টেম্বর মাসের মাঝামাঝি বাবা একদিন বাজার থেকে ফিরে এসে চুপচাপ শুয়ে পড়েন।বললেন শরীরটা ভাল নেই। শেষ রাতে তাহাজ্জতের নামাজ পড়ে খুব কান্নাকাটি করেন। কিন্তু কাউকে কিছু বলেন নি। পরদিন সকালে আমার চাচাতো ভাই মন্টুকে ভারতের টাকি ক্যাম্পে পাঠিয়ে দেন। আমার তখন খুব অস্থির লাগছিল, আমি তার হাতে একটা চিঠি লিখে দিই।

টাকি ক্যাম্পে মেজর জলিল, মেজর জয়নাল আবেদিন ও লেফটেন্যান্ট বেগ ছিলেন। মেজর জলিল বললেন, চিঠিটা দিন, তাকে পৌঁছে দেব। চিঠিটা হাতে নিয়ে তিনি হঠাৎ ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠেন, বলেন এ চিঠি আমি কাকে দেব! তিনি নিজে একটা জবাব লিখে মন্টুর হাতে দিলেন, ঐ সাথে ২০০০ টাকা এবং একটা লাল জামা। বললেন এই জামা সে বাচ্চার জন্য কিনে রেখেছিল, একবার দেশে যেতে চেয়েছিল।

চিঠিটা পেয়ে আমি মন্টুকে বললাম– 'একি! এ তো তার হাতের লেখা নয়!' আমার চোখের সামনে গোটা দুনিয়া আঁধার হয়ে গেল।

সাহিদা বেগম বললেন ওর কথা শেষ করার আগে আমাকে আর একজনের কথা বলতে হবে। নবী করিম একবার সাহাবীদের কাছে জিজ্ঞাসা করেছিলেন তোমরা কি জানো পৃথিবীতে সবচেয়ে ভারি বস্তু কি? নিজেই তার জবাব দিয়েছিলেন–'পিতার কাঁধে পুত্রের লাশ।'

বাংলাদেশ তখন স্বাধীন। ইলিয়াস আহমদের বৃদ্ধ পিতা মোবারক আলী একমাত্র পুত্রের কবর জিয়ারত করতে শ্যামনগর গিয়েছিলেন। শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের সমহিত করেন শ্যামনগরের মেহেরউল্লা গাইন। তার বাড়িতে বসে তিনি সেদিনের ঘটনা শুনছিলেন, সহ্য করতে পারেন নি,ওখানেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। তার আর পুত্রের কবর জিয়ারত করা হয় না, পুত্রের পাশে তার কবর হয়। সেই তীর্থ ভূমিতে পাশাপাশি পাঁচটি কবর আজো একাত্তরের বেদনা ও গৌরবের স্মৃতি স্মরণ করিয়ে দেয়।

ওরা নূর মোহম্মদকে উঠিয়ে নিয়েগেল

নুর মোহম্মদ মিলের ওয়ার্কশপে কাজ করত। নোয়াখালি বা সন্দীপ কোথাও বাড়ি। তবে তাকে বাঙালি বলে চেনা কঠিন ছিল। অনর্গল উর্দু বলতে পারত। ফলে বিহারী অধুষিত ওয়ার্কশপে ভালই টিকে গিয়েছিল।

নদী পারাপারের জন্য মিলে একটা ছোট লঞ্চ ছিল। সারেং-এর অনুপস্থিতিতে এগুলো চালানোর দায়িত্ব তার উপর পড়ত। তবে এপ্রিল থেকে এটা তার নিত্যকার দায়িত্ব হয়ে দাঁড়ায়। কেননা বৃদ্ধপ্রায় সারেং 'গন্ডগোলের' শুরুতেই সন্দীপের কোথাও তার বাড়িতে চলে গিয়েছিল। ফেরেনি।

খুলনা নদীমাতৃক জেলা। বড় বড় থানা, গঞ্জ এবং লোকালয়গুলো সবই প্রায় নদীর পাড়ে। খুলনা খালিশপুরের মাঝামাঝি চরেরহাটে পাকিস্তানি নৌ ঘাঁটি আছে। তবে পর্যাপ্ত গানবোট নেই যে নদীমাতৃক জেলাটিকে কব্জায় রাখবে। টার্মিনালের আশেপাশে কয়েকটা যাত্রীবাহী লঞ্চ বাঁধা আছে বটে, সারেং সুখানি নেই। ওরা এ সমস্যার দ্রুত সমাধান করে ফেলল, একদিন মিল ঘাটে গানবোট এসে নুর মোহম্মদকে উঠিয়ে নিয়ে গেল। সাম্প্রতিক সময়ে যদিও নুর মোহম্মদ মিলের একজন অপরিহার্য কর্মী, তথাপি মিল কর্তৃপক্ষ আপত্তি করেনি। কার ঘাড়ে কয়টা মাথা যে আপত্তি করবে! আড়ালে-আবডালে আপত্তি যা করার নুর মোহম্মদই করল। কিন্তু নেভী অফিসারের কথার প্রতিধ্বনি করে কওম ও ইসলামের খেদমতে মিল কর্তৃপক্ষ তাকে আর্মিদের হাতে তুলে দিলেন, বললেন চোখ মোছ নুর মোহম্মদ, মাত্র এক সপ্তাহের তো ব্যাপার, দেখতে দেখতে কেটে যাবে। তারপর ওরাই তোমাকে ফিরিয়ে দিয়ে যাবেন।

মিলের প্রশাসনিক কর্মকর্তা বাঙালি। পাকিস্তান অন্তপ্রাণ। বললেন, তুমি তো ভালো উর্দু জানো। তোমার ভয় কি। তবে বলার দরকার নেই যে তুমি বাঙালি, যদি জানাজানি হয়েই যায় বলবে ক্যালকেশিয়ান, কলকাত্তাকি মোহাজির! মনোযোগ দিয়ে কাজ কোরো তারা যা বলে, যে ভাবে বলে, তামিল করে যেও। তর্ক করতে যেও না, তোমার তো এই স্বভাবটা আছে। তারা কি করছে না করছে দেখতেও যেও না।

লঞ্চগুলো ঘাটে বাধা আছে বেশ কিছুদিন। যন্ত্রপাতি অলস থাকলে সমস্যা হয়। কিন্তু নুর মোহম্মদ বুঝল মালিকের লোকেরা লঞ্চ ছেড়ে যাওয়ার আগে ছোটখাটো যন্ত্রপাতি যতটা পারে খুলে নিয়ে গেছে, ইঞ্জিন থেকে শুরু করে লঞ্চের হাল- সবকিছু অকেজো করে রেখে গেছে।

একজন শসস্ত্র আর্মি পাশে দাঁড়িয়ে নুর মোহম্মদের কাজ তদারক করছিল। তাকে কি বলে সম্বোধন করা উচিৎ অনেক ভেবেচিন্তে সে বহু প্রচারিত গুরুগম্ভীর মেজর শব্দটি বেছে নিল।

মেজর সাব, ইঞ্জিন তো বহোত গড়বড় হ্যায়। বহোত মাল সামান লাগেগা। মেহেরবানী করকে এক আদমী দিজিয়ে, লিষ্ট বানানা পড়ে গা, মুঝে লেখাই পড়হাই নেহি আতি। অউর স্যার, লঞ্চ চালানে কি লিয়ে জেয়াদা আদমী জরুরৎ হোগা।

ফিকর মাৎ করো। উসকা এনতেজাম হো রাহা হ্যায়। তোম তোমহারা কাম করো।

অল্পক্ষণের মধ্যে একটা আর্মি ভ্যান হুড়মুড় করে ঘাটে এসে থামল। মোটাসোটা এক ভদ্রলোক গলদঘর্ম হয়ে নেমে এলেন। পেছনে তিন চার জন লোক, হয়তো লঞ্চেরই ক্রু, হাতে ভারি বস্তা। সবাই ভয়ার্ত। নুর মোহম্মদ বুঝলেন এদেরও তার মত রাইফেলের নলের মুখে তুলে আনা হয়েছে। নুর মোহম্মদ অবশ্য ভদ্রলোককে চেনেন, লঞ্চ মালিক, মুসলিম লীগ করেন। তিনি নুর মোহম্মদ এবং তার লোকদের উপর খানিকটা হম্বি-তম্বি করে আর্মিদের জনে জনে সালাম দিয়ে বিদায় নিলেন।

এক সপ্তাহ নয়, নুর মোহম্মদ ফিরে এলো প্রায় দু মাস পর। তার চেহারায় আগেকার জৌলুস নেই। সেখানে বুড়োটে ভাব। শুকিয়ে কাহিল হয়ে গেছে শরীর। সে হিসাব বিভাগে এলো তার বকেয়া বেতন বুঝে নিতে। আকবর সাহেব তাকে দেখেই ডাকলেন, আরে এসো এসো নুর মোহম্মদ। ছাড়া পেলে কবে?

গতকাল বিকালে স্যার।

তোমার এ হাল কেন? নদীর বাতাস, পোলাও গোস পরোটা খেয়ে তোমার তো ফুলে ফেঁপে ওঠার কথা।

সে একটা বিশ্রী গাল দিতে যাচ্ছিল, হঠাৎ নসরুল্লার দিকে চোখ পড়তেই থমকে গেল। নসরুল্লা চিরাচরিত নিয়মে আকবর সাহেবের টেবিলের এক কোণে চুপচাপ বসে ছিল। আগেকার হিসাবরক্ষক এস.আই. খান বিদায় নিতে বাধ্য হয়েছেন। কাজী গোলাম আকবর ভারপ্রাপ্ত হিসাব রক্ষক, তিনিও বাঙালি। তবে তার ধারণা বাঙালি অপেক্ষা তিনি অনেক বেশি পাঠান যা নাকি একদা তার কোন পূর্বপুরুষ ছিলেন বলে তিনি শুনেছেন। নসরুল্লা ওয়ার্কশপের চার্জহ্যান্ড, তবে কাজ করেনা, লীডার। প্রায় সময় বিভিন্ন অফিসে ফ্যানের তলায় বসে বসে দেনদরবার করে। এখন অতি ভয়ংকর এক লোক। নুর মোহম্মদ সহাস্যে হাত বাড়িয়ে বলল– 'আরে নসরুল্লাহ ভেইয়া, আপ এঁহা বয়ঠা হ্যায়, হামতো সারে ডিপার্টমেন্টমে আপকো বহোত ঢুঁড়া, শুনা হ্যায় আপ সৈয়দপুরসে ছহি সালামত ওয়াপাস আয়া। আল্লাহ কি মেহেরবাণী, কেয়া ম্যাসাকার হো গিয়া ওঁহা! আপকো লিয়ে হামলোগ সব বহোত পেরেশানি মে থা।' তারপর আকবর সাহেবের দিকে ফিরে বলল, কিয়া কহু স্যার, হাম তো খানেওয়ালা আদমী হ্যায়, আর্মি ভেইয়াকো সাথ খানাপিনা থোড়াছা জেয়াদা হো গিয়া। পেট্‌মে কুছ গড়বড় হুয়া।

কোথায় কোথায় গেলে, কি করলে শোনাও দেখি।

বহোত জায়গা স্যার– যাহা যাহা মিসক্রিয়েন্টকা খবর মিলা ওহি পর গিয়া। বহোত গুলি-গালা হুয়া। শালে ইয়ে হিন্দুস্থানী জাসুস হামারা বাহাদুর জোয়ানকো সাথ ক্যায়সে লড়েগা। সব শালে খতম হো চুকা, উসকা সারে ক্যাম্প ভি তাবা হো গিয়া। আভি পুরা খুলনা হামারা কব্‌জে মে হ্যায়।

নসরুল্লা হঠাৎ মুখ খুলল– শুনা হ্যায় আর্মি যাহা যাহা যাতা হ্যায় বেকসুর আদমীকো– ইয়া বুঢ্‌ঢা হো, বাচ্চা হো আউর আওরাতভি হো সবকো খতম কর দেতা হ্যায়, মাকান-উকানমে আগ লাগা দেতা হ্যায়, মাল সামান লুট লেতা হ্যায়, আওরাত লোগকো ভি বেইজ্জত করতা হ্যায়।

নুর মোহম্মদ যেন তোলবেগুনে জ্বলে উঠল, কোন শালে বোলা! বিলকুল ঝুটা হ্যায়। কেয়া হুয়া আউর কেয়া নেহি হুয়া হাম খুদ আখুসে দেখা।

নসরুল্লা কথাটা লুফে নিল। বলল শুনিয়ে আকবর সাব, শুনিয়ে। নুর মোহম্মদ তো এক মাহিনা সে জেয়দা টাইম আর্মিকো সাথ থা, আপনা আখুছে সবকুছ দেখা। উও কেয়া বলতা হ্যায় শুনিয়ে স্যার।

আকবর সাহেব বললেন– আরে বাদ দাও ওসব ছেদো কথা। হিন্দুস্থানী দালালরা তো অমন বলবেই।

নুর মোহম্মদ একদিন দুপুরে এলো আমাদের অফিসে। তখন টিফিন টাইম। আমার রুমে সন্তর্পনে ঢুকে বলল স্যার, দেখবেন যেন পিএফ লোনটা আজই পেয়ে যাই। আমি আর একদন্ডও এখানে থাকতে চাইনা, সব সময় ভয়ে ভয়ে থাকি কখন আবার হারামজাদারা ডেকে বসে।

পিএফ লোন তো আমি দেখিনা নূর মোহম্মদ মিয়া। তবে ইউনুস সাহেব এলে অবশ্যই তোমার কথা বলব বলব।

জানি স্যার। আপনার সাথে কিছু কথা বলতাম। দশ দিন ছুটি নিয়েছি, কবে ফিরব, আদৌ ফিরব কিনা জানিনা। বেজন্মাগুলোরে বিশ্বাস নেই, লঞ্চ চালানোর জন্য আবার হয়তো উঠিয়ে নিয়ে যেতে পারে। তারপর ফিস ফিস করে সে যা বলল তা যেমন লোমহর্ষক তেমনই করুণ।

স্যার আমি সেদিন নাসরুল্লাহকে দেখে কথা ঘুরিয়ে দিয়েছি। পরে মনে হয়েছে, ভালই হয়েছে ওখানে তো আকবর সাহেবও ছিলেন। জানিনা তাকে কতখানি বিশ্বাস করা যায়। কিন্তু স্যার আমি দু'একজনের কাছে আপনার কথা শুনেছি তাই বলতে আসা।

দেশে যাচ্ছেন কিসে?

গোয়ালপাড়ায় অয়েল ট্যাংকার এসেছে তেল নামাতে। ওরা কাল ফিরবে। ট্যাংকারের লোকেরা প্রায় সবাই আমাদের ওদিকের লোক। কাছাকাছি কোথাও নামিয়ে দেবে। স্যার আর্মিরা এই দু মাসে কমপক্ষে দশ-বারোটা অপারেশন করেছে। পথ দেখিয়েছে লেবাসধারী কিছু কুলাঙ্গার। স্যার, ওরা আমার পাশেই বসে থাকে, সারাক্ষণ আঙ্গুল তুলে নদী– তস্য নদী দেখিয়ে দেয়। আমার গা ঘিন ঘিন করতে থাকে। আর্মিদের সাহস কম, প্রথমে গ্রামে গঞ্জে নামে না। লঞ্চের ছাদে বালির বস্তার আড়ালে বসে গ্রামের দিকে ঠা ঠা করে মেশিনগান চালায় ঝাড়া পাঁচ-দশ মিনিট। তারপর মর্টারের গোলা ছোঁড়ে। বুম বুম শব্দে ওগুলো ফাটে, কানে তালা লাগিয়ে দেয়। চারদিকে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। লোকজনের মধ্যে হুড়োহুড়ি পড়ে যায়, ওরা তখনই কেবল গ্রামে নামে। কোন প্রতিরোধ আসেনা। অথচ মুক্তি আছে একথা বলেই আর্মি আনা হয়েছে। একবার শুধু এক জায়গা থেকে ছেলেরা টাশ টাশ করে কিছু গুলি ছুঁড়ে জবাব দিয়েছিল। ওরা মুক্তি ছিল এবং ভেড়িবাঁধের আড়ালে পজিশন নিয়েছিল। কিন্তু ওতে কারো কোন ক্ষতি হয়নি। কিন্তু স্যার একটা ছেলে, চোখেমুখে কি ক্রোধ, ভেড়ির উপর হঠাৎ সোজা দাঁড়িয়ে লঞ্চের ছাদে ঠা ঠা করে গুলি ছোড়া শুরু করল। একেবারে মোক্ষম আঘাত। খান সেনা কজন মরল বা আহত হল আমরা দেখিনি, ওদিকে আমাদের যাওয়ার সুযোগ ছিলনা, লেবাসধারীদেরও না। আমরা শুধু ওদের আর্তনাদ, ছোটাছুটি আর ক্রুদ্ধ চিল্লাপাল্লা শুনেছি। আর স্যার সেই কচি ছেলেটা, কি তেজ, বুকে চাইনিজ রাইফেলের আট-দশটা রক্তাক্ত ক্ষত চিহ্ন নিয়ে ছিটকে পড়ল ভেড়ির ওপাশে। তারপর স্যার, পাড়ে নেমে আর্মিরা প্রতিহিংসার চূড়ান্ত করে ছাড়ল। যাকে সামনে পেল বেওনেট দিয়ে এফোড় ওফোড় করল, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা নারী শিশু কেউ বাদ গেল না। পলায়নপর যাদের দেখতে পেল গুলি করে মারল। জিনিসপত্র যা মনে ধরল লুটে নিয়ে এলো, তারপর আগুন জ্বালিয়ে গোটা গ্রাম ভস্মীভূত করে দিল।

ওরা তিনটে মেয়েকে ধরে এনেছিল। একটা মেয়ে খুবই কাকুতি-মিনতি করছিল। সে আর্মিদের পা জড়িয়ে ধরে তাকে তার বাচ্চার কাছে যেতে দেয়ার জন্য অনুনয় বিনয় করছিল। কিন্তু বিশ্রী মুখ খিস্তি করে ক্রুর আর্মিটা তার চুলের মুঠি ধরে হিড় হিড় করে টানতে টানতে লঞ্চের খোলের মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দিল।

স্যার প্রথম প্রথম অপারেশনে ওরা বেশি লোক মারতে পারত না, মেয়েও বেশি পেতনা। লঞ্চের শব্দ পেলেই টাকা-পয়সা সোনাদানা নিয়ে সবাই জঙ্গলের দিকে পালিয়ে যেত। এদের আবার জঙ্গলে ঢুকতে ভয় পাছে মুক্তিদের চোরাগোপ্তা হামলার মুখে পড়ে। এরপর থেকে ওরা

খুব ভোরে অপারেশনে নামতো। লোকালয় থেকে দূরে লঞ্চ থামাতো এবং পায়ে হেঁটে অথবা নৌকায় আচমকা গ্রামে হানা দিত। স্যার এসব এলাকায় তখন নরক ভেঙ্গে পড়ত। হৈচৈ কান্না-কাটি গুলি আর পোড়া বাঁশের গিরো ফাঁটার শব্দ। এরা যখন কিশোরী আর যুবতী মেয়েদের ধরে আনত, স্যার ধরামাত্র ওদের এমন হাল করত যে তাদের দিকে তাকানো যেত না। শাড়ি ব্লাউজ ফালা ফালা করে ছেড়া, কাপড় লুটাচ্ছে মাটিতে, নগ্ন বুক, খামচে ক্ষত-বিক্ষত করা, সর্বত্র আঁচড় কামড়ের দাগ। মেয়েগুলোকে টেনে হিঁচড়ে লঞ্চে তোলামাত্র জানোয়ারগুলো নেড়ি কুত্তার মত হামলে পড়ত ওদের উপর। এতটুকু আড়াল নেই, হায়া শরমের বালাই নেই। এরা নাকি আবার ইসলামের জন্য যুদ্ধ করছে!

স্যার এসব দেখেশুনে গা গুলিয়ে উঠত আমার, খাওয়া-দাওয়া মাথায় উঠে গিয়েছিল। মর্মান্তিক ঘটনা ঘটল একদিন। এক মাঝি তার ছোট ডিঙ্গিতে দু'জন সওয়ারি নিয়ে দ্রুত পাশের এক সরু খালে ঢুকে পড়তে চেষ্টা করল, কিন্তু শেষ রক্ষা হল না। ঘটনাগুলো আমাদের চোখের সামনে ছবির মত ঘটে গেল। নৌকার সাওয়ারি ছিল এক অল্পবয়সী দম্পতি। জামাকাপড় দেখলেই বোঝা যায় ভদ্র ঘরের লোক। গাঁয়ে আর্মি নামতে দেখে বোধহয় পালাচ্ছিল। কিন্তু ধারণাও করতে পারেনি আর্মি লঞ্চটা এখানে থাকবে।

লঞ্চের ছাদ থেকে একজন সেপাই বিজাতীয় স্বরে চিৎকার করে উঠল হল্ট– রোখ যাও! এসব শব্দ হয়তো মাঝির কাছে অপরিচিত ছিল অথবা সে হয়তো শোনেও নি। মুহূর্তে পিঠে গুলি খেয়ে সে নদীতে ছিটকে পড়ল। ভীত যুবকটা গানপয়েন্টে লগি ঠেলে ডিঙ্গিটা লঞ্চের গায়ে ভিড়ালো। মেয়েটা থর থর করে কাঁপছিল। ওদেরকে টেনে হিচড়ে লঞ্চের ডেকে উঠিয়ে নিল আর্মিরা। ভাটির টানে ডিঙ্গিটা ধীরে ধীরে ভেসে গেল। ক্যাপ্টেন এক টানে মেয়েটার মুখের নেকাব ছিঁড়ে ফেলল। ঢলঢলে কচি মুখ, ভয়ে আমসি হয়ে আছে। স্যার শুওরের কচুক্ষেত দেখার মত ঘোৎ ঘোৎ করে উঠল ক্যাপ্টেন– লেড়কিকো কেবিন মে লে যাও।

মেয়েটা তার স্বামীর হাত সজোরে আঁকড়ে ধরল। লোকটা হাত জোড় করে বলল, স্যার, আমরা সাচ্চা মুসলমান, পাকিস্তানি।ইনি আমার বিবি, খানদানী লেড়কি, আমরা পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ি স্যার, কুরআন শরিফ তেলাওয়াৎ করি এবং মুনাজাতে পাকিস্তান এবং আপনাদের কামিয়াবির জন্য দোয়া করি স্যার। মেহেরবাণী করে আমাদের ছেড়ে দিন।

নেহি তোমলোগ শালে মুক্তি হ্যায়। হামারা পাস পাক্কা ইনফরমেশন হ্যায় এহা গাদ্দার লোগ এক জবরদস্ত ফৌজি ক্যাম্প বানায়া। বাতাও ক্যাম্প কাঁহা, মুক্তি কাহা, আর্মস কাহা। বাতাও তোমলোগ শালে কেতনা পাকিস্তানিকো মার ডালা।

না স্যার, আমরা কাউকে মারিনি।আমরা পাকিস্তানি, কেন পাকিস্তানিদের মারব! আল্লাহর ওয়াস্তে আমাদের উপর রহম করুন স্যার।

আচ্ছা, তো ঠিক হ্যায়, যাও তোমাকো ছোড় দিয়া। চালে যাও। নদী মে জাম্প করো, জলদি কর। লোকটা দুরে ভাসমান নৌকার দিকে তাকিয়ে স্ত্রীকে এক হাতে জড়িয়ে ধরে বলল আল্লাকে ডাকো, আমাদের সাঁতরাতে হবে।

আরে নেহি নেহি, উও ক্যায়ছে যায়েগা, তুম একেলা যাও। উও লেড়কিকো হাম উসকিওয়ালেদকা ঘরপেছোড় দুঙ্গা। মুঝে পুরা একিন হ্যায়, ইয়ে তোমহারা বিবি নেহি, তোম ইসকো ইলোপ কিয়া। যাও জাম্প করো জলদি, আদারওয়াইজ আই মে চেঞ্জ মাই ডিসিশন।

ভীত মেয়েটা কাঁপতে কাঁপতে তার স্বামীকে সজোরে আঁকড়ে ধরল। কি বলব স্যার, লোকটা এতক্ষণ ক্যাপ্টেনের কাছে করুণা ভিক্ষা করছিল, হঠাৎ তার দেহটা ধনুকের ছিলার মত টান টান হয়ে গেল, ক্যাপ্টেনের চোখের দিকে ঠায় তাকিয়ে বলল- ও আমার স্ত্রী স্যার, আমরা একসাথে যাব, নয়তো একসাথে মরব।

আচ্ছা! ক্যাপ্টেনের কণ্ঠে শ্লেষ। আমি আচমকা গুলির শব্দে চমকে উঠলাম। লোকটার চোখে শানিত দৃষ্টির বদলে একটা অন্ধকার গর্ত। সে টলতে টলতে দু'পা পিছিয়ে ডেক থেকে নদীতে ছিটকে পড়ল।

আমরা তখন ফিরছিলাম। নদীতে ভাটির টান। এর আগে আমি বহুক্ষণ ধরে পিছনের কেবিনে মেয়েটার কাকুতি-মিনতি, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্না এবং বিলাপ শুনতে পাচ্ছিলাম। ক্যাপ্টেনের চাপা ক্রুদ্ধ কণ্ঠস্বরও শুনেছি– জেয়াদা চেসটিটি মৎ দেখাও লেড়কি। মেরা গোস্‌সা আযায় তো তোমকো নিচে ডালকুত্তাকো বিচ মে ছোড় দুঙ্গা, কেয়া হালাৎ হোগা কুছ মালুম হ্যায়!

কেবিনটা এখন নিস্তব্ধ। ক্যাপ্টেন সিগারেট ধরিয়ে রেলিংয়ের ধারে দাঁড়িয়ে শূন্যে একের পর এক ধোঁয়ার রিং গড়তে চেষ্টা করছিল। ঝোড়ো বাতাসে বারবারই তা ভেঙ্গে খান খান হয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎই তার মদালস কণ্ঠ ভেসে এলো–আহ্ কেয়া গ্রান্ড ডিনার!

আমি চড়ায় আটকে যাওয়া একটা লাশ আগেই দেখেছিলাম, শকুন ও সারমেয়র দল টানা ছেড়া করছে। স্যার, আমি জানিনা সেই লোকটা কিনা, তবু ক্যাপ্টেনের কথায় চমকে উঠলাম! একটু আগেও আমি পিছনের কেবিনে কন্যাসম হতভাগী মেয়েটাকে নিয়ে শয়তানের ভোগ আমার হৃদয়ে রক্তক্ষরণ ঘটিয়েছে, এখন কি তারই হতভাগ্য স্বামীকে নিয়ে শকুন সারমেয়র ভোজ পর্ব দেখতে হল!

পাশে বসে শয়তানের চ্যালাটা বলল এত কি ভাবছেন সারেং সাহেব। এরা গাদ্দার, মালাউনের অধম। এদের এই পরিণতি আল্লার বিধান। গণিমতের মাল হিসাবে ওদের বৌ মেয়েছেলেদের ভোগ করা যায়েজ আছে। আমরা এসলাম ধর্ম সম্পর্কে কম জানি, আমাদের মনও দুর্বল, এজন্য নানা দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভুগি।

আমি স্যার কতকিছু দিবাস্বপ্ন দেখছিলাম–নদীতে উপড়ে পড়ে থাকা একটা নারকেল গাছের উপর সজোরে লঞ্চটা তুলে দিয়ে সব কিছু ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়েছি, ইবলিশগুলো পানিতে পড়ে হাবুডুবু খাচ্ছে। কিন্তু স্যার, আমি তো ঠিকই নারকেল গাছটাকে পাশ কাটিয়ে লঞ্চ নিয়ে বেরিয়ে এলাম। সেই থেকে ভাবছিলাম যে ভাবেই হোক এদের কবল থেকে উদ্ধার পেতে হবে। শরীরটা ক্রমেই খারাপ হয়ে যাচ্ছিল। ভাবলাম এটাই সুযোগ। তবে ওদের ডাক্তার মাত্র দশদিন ছুটি দিয়েছে। বেঁচে থাকি তো ইনশাআল্লা একদিন না একদিন আবার দেখা হবে।

পাড়ায় মিলিশিয়া রাজাকার ক্যাম্প

সে সময় আমাদের বাড়িতে উজ্জ্বলশ্যাম বর্ণের এক মহিলা ঠিকে কাজ করত। বয়স পয়ত্রিশ চল্লিশ হবে। একদিন সকালে কাজে এসে মাকে বলল– চাচি, আমার আর কাম করা হইবে না, অহনি দ্যাশে চইলা যাইতেছি। আমাগো বস্তি পেরায় উজাড়, কেউরে যে বদলী দিমু তারও উপায় নাই। মা আকাশ থেকে পড়লেন, বললেন কেন রে রহিমা? আবার কি হল, কবে আসবি?

মনে অয় না আওন যাইব, পাড়ায় মেলেটারি রাজাকাররা আইছে। থাকবো যে সাহসে কুলায় না।

সে তো বেশ কিছুদিন হল এসেছে, তাতে তোদের আবার কি অসুবিধা হল। ভয় তো জোয়ান ছেলে মেয়েদের নিয়ে। তোরা যাবি কেন?

আর কোয়েন না বুবু, এই কদিনে পাঁচ- ছয়টা পরিবার বস্তি ছাইড়া হাটা দিছে। ক্যান যায় পেরথম পেরথম বুঝি নাই। পরশু এক ঘটনা ঘটছে। আমাগের বস্তিতে মালিকের যে লোকটা ভাড়া উঠায়- জব্বার, ক্যাম্পের আর্মিগো লগে হ্যার ভাল খাতির। হে বস্তির বৌ মাইয়াগো ক্যাম্পে ঠিকা কাম যোগাড় কইরা দেয়। অভাব তো হক্কলডেরই চাচি। হ্যারা খাওন দেয়, ভাল পায়সাও দেয়। এই আর্মিগুলান নাকি ভাল। আমাগো বস্তিতে একজন ঘাড়ত্যাড়া মজনু আছে। হে কয় হের বইন যাইবে না। পাড়ার দুতিনজন হুজুর আমাগো প্রায়ই পরদা-পুশিদার মধ্যে থাকবার কয়, তারা মজনুরে কইছে তুমি বোনডারে কামে পাঠাইতে চাওনা, হেইটা ঠিক আছে। তয় পাঠাইলেও ক্ষেতি নাই, পরদা-পুশিদার খেলাপ হইবেনা। এনারা এছলামী ঝান্ডা উচা রাখার জন্য জ্বেহাদ করতেছেন। সব সময় ইয়াদ রাখবা জ্বেহাদী ভাইরা দুনিয়াবি ধান্ধায় থাকে না। তাদের নামে নাহক দোষ দেয়া শক্ত গুনাহ। চাচী আজ বিহানে বস্তির লোকজনে জব্বাইরারে বিলকাঁন্দা থন বেহুশ অবস্থায় উদ্ধার করছে, কারা জানি বেদম পিটাইছে। হুজুররা খুব খ্যাপছে, তারা ক্যাম্পে খবর দেতে যাইবে। কে আর থাকপে কন। আমরাও কাজের কথা কইয়া সইরা পড়ছি।

বেলায়েত সাহেব, মোস্তাক এবং আজমল আলী

আমাদের হিসাব বিভাগে মোস্তাক ছিল সর্বকনিষ্ঠ স্টাফ। সে মকসুদ সাহেবের ছোট ভাই। সব সময় হাসিখুশি থাকে, তার কথা বলার ভঙ্গীও চমৎকার।তারা যখন পশ্চিম বাংলা থেকে চলে আসে তাদের দু'তিনটে পরিবার মহেশ্বরপাশায় বাড়ি বদল করে নিয়েছিল। তার খালুর একটা মান্ধাতা আমলের ঢাউস রেডিও ছিল। সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে মোস্তাকের কাজ ছিল রেডিও অন করে একের পর এক পছন্দসই সেন্টারগুলো শুনে যাওয়া। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র, আকাশ বাণী ও বিবিসির ভাষ্যগুলো পবিত্র বাণীর মতই সে বিশ্বাস করত এবং পরদিন অফিসে সংগোপণে সেগুলো প্রচার না করা পর্যন্ত স্বস্তি পেতনা। সে সময় খুব কম লোকেরই রেডিও ছিল। তবে সকালে অফিস শুরুর অল্পক্ষণের মধ্যেই আমাদের বিভাগের প্রায় সবারই সংবাদগুলো জানা হয়ে যেত।

তার প্রচার মিশন কিছুটা ব্যহত হল যখন বেলায়েত সাহেব তাকে ডেকে নিয়ে সতর্ক করে দিলেন– কই আপনার বড়ভাই তো এত ফড় ফড় করে না, আপনি করেন কেন? আপনি হয়তো জানেন না অফিসে পাকিস্তানি চর আছে, কোন্‌দিন বিপদে পড়ে যাবেন।

মোস্তাক ভয়ে আমসি হয়ে গেল। সেও আমাদের সাথে টিফিন প্রিয়ড্‌টা অফিসেই কাটাতো। মকসুদ সাহেব তাকে নিয়ে আমার রুমে এলেন, বললেন, মনোয়ার সাহেব অফিসে যে টুকটাক কথা বলি তাতো বন্ধ হয়ে গেল। অফিসে নাকি আর্মিদের চর আছে। কে হতে পারে!

এক সপ্তাহও যেতে পারেনি, আর্মির চরটাকে আমরা চিনে ফেললাম। সেদিন অফিস গেটে যেন আচমকা বোমা ফাটল। বারো-চৌদ্দজনের মত বিহারী বাঙালির একটা দল চুড়িদার পাজামা, শেরওয়ানী, জিন্নাটুপি ও পুষ্পমাল্য শোভিত বেলায়েত সাহেবকে সামনে নিয়ে গলার রগ

ফুলিয়ে শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান জিন্দাবাদ, পাকিস্তান জিন্দাবাদ, সদরে রিয়াসাত ইয়াহিয়া খান জিন্দাবাদ, টিক্কা খান জিন্দাবাদ দিতে দিতে তাকে তার অফিসের চেয়ারে বসিয়ে দিল। ঘটনার আকস্মিকতায় আমরা কয়েক সেকেন্ডের জন্য হতবাক হয়ে গিয়েছিলাম, পর মুহূর্তে কেউ কেউ সম্ভবত সিক্সথ্ সেন্সের তাড়নায় হুড়মুড় করে যার যার চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। অনেকেই তার সাথে মুসাফা করে এল। বেলায়েত সাহেব মাত্র কয়েক মিনিট অফিসে ছিলেন, তারপর যেভাবে এসেছিলেন সেভাবেইদ্রুত দলবল নিয়ে বেরিয়ে গেলেন।

ঐ দিনই অফিসে ছোটখাটো কিছু পরিবর্তন ঘটল। বেলায়েত সাহেবের হাফ সেক্রেটারিয়েট টেবিল ও হাতল বিহীন চেয়ার সরে যেয়ে সেখানে কোথা থেকে পুরানো ফুল সেক্রেটারিয়েট টেবিল এবং গদি ও হাতলযুক্ত চেয়ার বসানো হল। বেলায়েত সাহেব ফিরে এসে তার মধ্যে সেঁধিয়ে গেলেন। অলক্ষে আরো একটা পরিবর্তন ঘটে গেল, তার সহকারী বেচারাবদরুদ্দোজার দুর্বল কাঁধে ঐ মুহূর্ত থেকে দু'জনের কাজের বোঝা চাপল।

আমরা অফিসের কর্তৃত্ব হারালাম। আমাদের মনোকষ্ট বাড়ল। এর মধ্যেও মহিউদ্দিন, কুষ্টিয়ায় বাড়ি, টিপ্পনি কাটতে ছাড়ল না– যাক এখন থেকে আমাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত হল। বেলায়েত সাহেব একই সুরে জবাব দিলেন– হা যদি আপনারা সেভাবে চলেন।

আমরা কিছুটা সতর্ক হলাম বটে, তবে যতটা ভেবেছিলাম ততটা অসুবিধা হল না। বেলায়েত সাহেবের উপর এখন গোটা কওমের গুরুদায়িত্ব। সে দায়িত্ব দিনেদিনে বাড়ছিল, আমরা তেমনই শুনতাম, তার তুচ্ছ অফিস করার সময়ও ততই কমছিল। মোশতাক ধাক্কা সামলিয়ে আবার স্বরূপে আত্মপ্রকাশ করল।

কদিন যেতে পারেনি একদিন হঠাৎ আবার মুখ আঁধার করে আমার রুমে এসে বলল, ভাই আমাকে বাঁচান। অনেকেই জানে আমাদের বাড়িতে রেডিও আছে। কয়েকজন গতরাতের খবর শুনতে চেয়েছিল, বলছিলাম। দরজার ওপাশে দাঁড়িয়ে আজমল সাহেব চুপিচুপি আমাদের কথা শুনছে বুঝতে পারিনি। হঠাৎ মুখ বাড়িয়ে বলল– সব শুনেছি,বুঝলে মোস্তাক, সবই শুনেছি! মিথ্যে প্রপাগান্ডা চলছে! নিষিদ্ধ রেডিও শোনা! গাদ্দারী! ভেবনা আমরা মরে গেছি। জায়গা মত ঠিকই খবর চলে যাবে। অনেক হাতে পায়ে ধরেছি, শেনেনি, হয়তো সত্যি রিপোর্ট করে দেবে।

ষৈয়দ আজমল আলী মজুরি শাখায় কাজ করতেন, আমার দূর সম্পর্কের আত্নীয়। একজন মুসলিমের সাথে দু'দণ্ড আলাপ করলেই আপনি একাধিক সূত্রে তার সাথে আপনার বহুমুখী আত্মীয়তা খুঁজেপাবেন। তবে তার সাথে আমার ঘনিষ্ঠতা রিফিউজি সূত্রে, তারও বাড়ি বসিরহাট। এই সম্পর্কের উপরই তিনি বিশেষ জোর দিতেন। '৭০-এর শেষ দিকে তখন সর্বত্র নির্বাচনী ডামাডোল, অফিসে বসে ভোটার লিস্ট কপি করছিলাম। আমার ইমিডিয়েট বস ইউনুস সাহেব হাতে কয়েকটা শিট ধরিয়ে দিয়ে বললেন, আপনার হাতের লেখা ভাল, দিনতো কয়েক শিট কপি করে।

কাদের জন্য স্যার?

কাদের জন্য আবার! নৌকা।

আজমল সাহেব আমার টেবিলের উপর ঝুঁকে পড়ে শিটগুলো ক্ষণিক দেখে বললেন– ইউনুস সাহেব দিয়েছে না? তা আপনিও যে এতবড় নালায়েক তা আগে কখনো বুঝিনি। ভুলে গেছেন হিন্দুদের তাড়া খেয়ে ঘরবাড়ি জমিদারী সব ফেলে পাকিস্তানে পালিয়ে এসেছেন। এবার তাড়া খেয়ে কোথায় যাবেন, বঙ্গোপসাগরে?

আমাদের জমিদরি ছিলনা। তবে তাদের নাকি ছিল এবং সেটা অতিক্রম করতে মার্টিন কোম্পানির ট্রেনের আধঘন্টা সময় লেগে যেত। এ ধরনের গল্প দিয়ে তিনি সর্বত্র হাসির পাত্রে পরিণত হয়েছিলেন। বললাম তাড়া খেতে হবে কেন ? আমরাও তো বাঙালি।

না, আপনি মুসলমান এবং পাকিস্তানি।

বাঙালি ও মুসলমানে পার্থক্য কি?

পার্থক্য নেই! বাঙালি মানে হিন্দুধর্ম ঘেষা এক জাত, আর আপনি একজন বোগদাদী মুসলমান।

এসব ছাড়ুন আজমল সাহেব। পাঁচ শ বছরেরও বেশি সময় ধরে বাংলার মাটিতে বসবাস করছেন, কেবল আদি পুরুষ বোগদাদী, আদি নারী তো এদেশেরই মানুষ, তারপরেও এখনো বাগদাদের খেজুর বাগানের খোশবুতে বুদ হয়ে আছেন! কবে যে আপনাদের বোধোদয় হবে!

নির্বাচনের পর থেকে ২৫ মার্চ পর্যন্ত আজমল সাহেব বেশ ম্রিয়মান ছিলেন, যদিও মাঝে মাঝে বলতেন– পাকিস্তান আর্মিকে তো চেনেন না, চিনবেন, সময় হলে ঠিকই চিনবেন।

এপ্রিলের শেষ দিকে তার সাথে আবার দেখা হল। বাঁকা চোখে তাকালেন, মনে করিয়ে দিলেন ভোটার লিস্ট কপি করেছি, গাদ্দার মুজিবের পক্ষে তর্ক করেছি, পাকিস্তানি সৈন্যদের আন্ডারএস্টিমেট করেছি। সেই সাথে আমার কমজোরী ইমান নিয়ে বেশ কথা শুনালেন এবং সাচ্চা পাকিস্তানি হওয়ার উপদেশ খয়রাত করলেন। কথায় বলে হাতি হাবড়ে পড়লে ব্যাঙেও লাথি মারে। আমার কথা বাদ দিন, আমার বস ইউনুস সাহেবও অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলেন, একদিন বললেন আপনার এই আত্মীয় নির্বেধের মত বড় বেশি বাড়াবাড়ি করছে মনোয়ার সাহেব।

মোস্তাকের ব্যাপারটা আমাকে ভাবিয়ে তুলল। তার ধারণা যেহেতু আত্মীয়, আমি বললে আজমল হয়তো নিবৃত হবে। কিন্তু আজমলকে এখন আমার অন্য রকম মনে হয়। মনে হয় সে অনেক কিছুই করতে পারে,ইদানিং বিহারী নেতাদের সাথে তার দরহর মহরম বেড়েছে। চকিতে একটা কথা মনে পড়ল। আমি যখন স্টার জুট মিলে যোগ দিই কয়েক দিন পর সে আমার সাথে পরিচিত হতে এসেছিল। তার দীর্ঘ দেহ, ফর্সা চেহারা এবং ততোধিক ফর্সা জামা কাপড় সমীহ জাগানোর মত ছিল। সে আমাকে বলেছিল, আপনার সম্পর্কে খোঁজ নিয়েছি আপনি আমার নিকট আত্মীয়, আপনিও বসিরহাট থেকে এসেছেন। আমরা রিফিউজি।

মনে পড়ল সে রিফিউজি কথাটার উপর সে বেশ জোর দিয়েছিল। মোস্তাকও পশ্চিম বাংলার উদ্বাস্তু। তাকে বললাম, চিন্তা কোরোনা, ঠিক হয়ে যাবে আশা করি। তবে তুমি কিছুদিন চুপচাপ থাকো। সময়টা মোটেও ভাল নয়।

আজমলকে ডেকে বললাম মোশতাককে খামখা ভয় দেখাচ্ছেন কেন। ছেলে মানুষ। কিনা কি বলেছে।

আপনি ওকে ছেলে মানুষ বলেন। ওকে চেনেন না স্যার, আস্তো বিষটোপ একটা। একরাশ লোকের সামনে আমাকে পর্যন্ত অপমান করে।

মোশতাককে চিনি বইকি, বিলক্ষণ চিনি। আজমলের একটা অভ্যাস আছে, দু'চার জনকে এক সাথে পেলেই নিজের অতীত নিয়ে এক আষাঢ়ে গল্প ফেঁদে বসে। সে এখন কেরানিগিরি করে বটে, কিন্তু বসিরহাটে তাদের খানদানের বিশাল জমিদারি, এত বিশাল যে অতিক্রম করতে মার্টিন কোম্পানির ট্রেনের আধাঘণ্টার বেশি সময় লেগে যায়। তারা সব ছেড়ে এসেছে, কিন্তু আবার ফিরে পাবে। আর একটা যুদ্ধ বাধলে গোটা ভারত পাকিস্তান হয়ে যাবে। শ্রোতারা মুখ টিপে হাসত, কিন্তু সে সেটা বুঝতে অক্ষম ছিল। একবার এ ধরনের গালগল্পের সময় মোশতাক উপস্থিত ছিল। শ্রোতাদের কেউ কেউ জানত মোশতাকও পশ্চিমবঙ্গের লোক। একজন প্রশ্ন করে বসল, তা মোশতাক মুর্শিদাবাদে তোমাদের কি ছিল– ইয়াবড়া জমিনদারী না নবাবী!

মোশতাক হাসতে হাসতে জবাব দিল, হা ভাই, ওহা হামারা পুদিনা কি ক্ষেতি থা, একঠো ভঁইষ থা, উসকি বাচ্চা ভি থা, মাগার নবাবী-টবাবী নেহি থা। বিহারীরা কয়েক জন একসাথে হলে স্মৃতি রোমন্থন করে প্রায়ই এ ধরনের কথা বলত। মোশতাক তার অনুকরণ করেছে। তার কথায় সবাই হেসে উঠল। আজমল এবার ঠিকই বুঝল যে মোশতাক তাকে বিদ্রুপ করেছে। সে মকসুদ সাহেবের কাছে নালিশ করল। মকসুদ সাহেব আগুনে ঘৃতাহুতি দিলেন, উল্টো পাঁচের মত মুখ করে বললেন– ঠিকই তো বলছে মোশতাক, দেশেআমাদের নবাবী-টবাবী কিছু ছিল না।

বুঝলাম আজমল এবার প্রতিশোধ নিতে পারে। সে সরাসরি বলল মুর্শিদাবাদে দু'ধরনের লোক আছে– নবাবের লোক আর মির্জাফরের লোক। এরা মির্জাফরের দলে। গাদ্দারীটা ভাল বোঝে। এদের খতম হওয়া দরকার।

বললাম দাঁড়ান। এত গড় গড় করে সব বলে যাবেন না। মোশতাক কোথাকার লোক? আপনার আমার মত ওপারেরই তো। এপারে খুব ভাল হালে নেই আমরা। তার মধ্যেও যদি নিজেরা নিজেদের পায়ে কুড়াল মারি কোথায় যেয়ে দাঁড়াবো বলুন তো ? আপনি নিজেই ওকে ধমকে দিন, কিন্তু কোথাও নালিশ করতে যাবেন না।

বেশ, আপনিই ওকে মানা করে দিন, আমার কথা শুনবে বলে মনে হয় না। ও খুব বেড়ে গিয়েছে বুঝলেন। এইটুকু ছেলে, গাল টিপলে দুধ বেরোয়। সবসময় পাকিস্তানের বিরুদ্ধে গুজুর গুজুর, ফুসুর ফুসুর করছে।

ঠিক আছে ওকে আমি দেখছি। আসলে এখন আমাদের সকলেরই সতর্ক থাকা দরকার। আচ্ছা বলুন তো এই যুদ্ধের রেজাল্ট কি হতে পারে, কারা জিতবে ?

যুদ্ধ! যুদ্ধ কোথায় দেখলেন আপনি? দু'চারজন মিসক্রিয়েন্ট এখানে ওখানে দু'চারটে ঠুস ঠাসকরল, আর সেটা যুদ্ধ হয়ে গেল? কি যে বলেন!

শুনি তো এরা নাকি ছদ্মবেশী হিন্দুস্থানী সৈন্য। তারাই নাকি এসব করে বেড়াচ্ছে। তাই ভাবছি আলটিমেটলী যুদ্ধ তো বেধেও যেতে পারে।

যুদ্ধ হলে পাকিস্তান অবশ্যই জিতবে। পাকিস্তানি সৈন্যদের সাথে পারে, এমন শক্তি আজো পৃথিবীতে জন্মায় নি।

অতটা নিশ্চিত হওয়া বোধ হয় ঠিক না। হাজার মাইল দূরের এত বৈরি পরিবেশে যত শক্তিশালীই হোক জয়ের সম্ভাবনা কমই থাকে। যাক গে, এটা তো বোঝেন একবার উদ্বাস্তু হয়ে এসেছি, আবার উদ্বাস্তু হলে যাবো কোথায়? ওর চেয়ে জনতার সাথে মিশে যাওয়া ভাল। না পারলে চুপ থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ। আমি এখন সেটাই চেষ্টা করছি। এদিক ওদিক কোন দিকেই থাকতে চাইনা। আমরা আদার ব্যাপারী, জাহাজের খবর দিয়ে কাজ কি!

প্লাটিনাম গেটে তল্লাশি

টয়োটা ল্যন্ড ক্রুজারটা নদীর ঘাট থেকে আমাদেরনিয়ে ৪-৫ মিনিটের মাথায় প্লাটিনাম জুট মিলের গেটে এসে থমকে দাঁড়ালো। এটা ছিল অস্বাভাবিক ব্যাপার। গেটের কাছাকাছি এসে ড্রাইভার গাড়ির গতি শ্লথ করত ঠিকই, তবে দারোয়ানইতোমধ্যে বিরাট লোহার গেটের একটা কপাট খুলে দিত। জিপ গাড়িটা ধীর গতিতে বেরিয়ে যেত। আজ গেট খোলার কোন তাড়া দেখা গেল না। ফারুক উৎসুক দৃষ্টিতে দারোয়ানের দিকে তাকিয়ে বলল– কা বে গেট খুলেগা নেহি? তারা পরস্পরের বন্ধু ছিল।

শালপ্রাংশু জমাদার ঠাণ্ডাস্বরে বলল, তালাশি হোগা।

কেয়া! ফারুকের কণ্ঠে বিস্ময়।

কুছ ইনফরমেশন তো হ্যায় না! দারোয়ানের কণ্ঠে গাদ্দার জাসুস ধরার আমেজ।

আমি সব সময় টেনশনে থাকতাম, সেটা বাড়ল। যথাসম্ভব স্বাভাবিক থাকার চেষ্টা করলাম। সে ঘুরে সুনির্দিষ্টভাবে আমার সিটের সাইডে জানালার ধারে এসে দাঁড়ালো। বলল, আপকা পাছ মাল সামান কুচ হ্যায়? আমি বোকার মত তাকিয়ে থাকলাম। মাল সামান খানিকটা বুঝি বটে, কিন্তু ও চাইছে কি ঠিক বোধগম্য হল না।

ফারুক বলল, আরে ইয়ার কিউ ঝামেলা করতা হ্যায়। মানোয়ার সাব বহুত আচ্ছা আদমী হ্যায়, উসকি পাস ক্যায়সে মাল সামান রাহেগা। তু কিয়া পুছা, উনহে সামাঝায়া ভি নেহী।

তু চুপ কর ফারুক! বাতাইয়ে আপকা পাস মাল সামান কেয়া হ্যায়।

ফারুক ইস্টিয়ারিং ছেড়ে পিছন ফিরে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, স্যার আপকা পাস বোমা, পিস্তল, ড্যাগার অ্যায়ছা কুছ হ্যায়?

আরে নেহী নেহী!

ঠিক হ্যায়, আপ বাহার আইয়ে। দারোয়ানের কণ্ঠে ঝাঁঝ।

সে সময় এভাবে কাউকে ডেকে নেয়ার অর্থ ছিল তাকে শেষপর্যন্ত আর্মি ক্যাম্পে ধরে নিয়ে যাওয়া। সেখানে সহ্যের অতীত নানা ডিগ্রির নির্যাতন তো ছিলই, প্রাণটাও ঝুলে যেত জীবন-মৃত্যুর সুক্ষ সুতোয়। আমি সাহায্যের আশায় গেটের পাশে সিকিউরিটি অফিসের দিকে তাকালাম। সিকিউরিটি অফিসার ছিলেন বাঙালি, আমাকে কিছুটা চিনতেন। তিনি টেবিলের উপর মাথা ঝুঁকিয়ে বসেছিলেন। সে সময় বাঙালিমাত্র সবারই ছিল ইয়ানাফসি অবস্থা। বুঝতে বাকি রইল না এখানে কিছু ঘটলে তাতে তার কিছুই করার থাকবে না। গাড়িতে আমার সহকর্মীদের মাথা গুলোও নিশ্চলভাবে বুকের উপর নুয়ে আছে। আমি একজন বিহারী দারোয়ানের হুকুম মত বাইরে এসে আমার প্যান্ট শার্টের সবকটা পকেট উল্টে বের করে দেখলাম।

ফারুক ক্রুদ্ধভাবে তার সিট ছেড়ে বেরিয়ে এল– তু কিউ খামোখা এক শরিফ আদমিকো তং করতা? তু হামারা গাড়িছে এক অফিসারকো উৎরায়া, মগার সার্চ অর্ডার নেহি দেখায়া। শুন ইয়ার, ইয়াদ রাখ এয়স্যা দিন নাহি রাহেগা।

দারোয়ান আমাকে ছেড়ে দিল বটে কিন্তু ফারুকের উপর রাগে ফেটে পড়ল, তুঝকো ভি হ্যাম জরুর এক দিন ফাঁসায়গা।

গাড়িটা আমাদের পঞ্চবিথীর মোড়ে নামিয়ে দিত। নামার আগে সবার অলক্ষে সিটের গদির ফাঁক থেকে সরু কাগজের ফালিটা তুলে নিলাম। এটা ছিল হাতে আঁকা ম্যাপ, সেখানে বয়বা, চরেরহাট, সার্কিট হাউজ এবং কখনো কখনো মংলাবন্দরের আর্মি ও নেভির আনুমানিক সংখ্যা, অবস্থান, তাদের গাড়ি ও পোষাকের মার্কা, অস্ত্রশস্ত্র প্রভৃতির বিবরণ থাকত। যাওয়ার আসার পথে যা দেখা যেত শুধু সেটুকু বিবরণই দেয়ার নির্দেশ ছিল আমার উপর। দু সপ্তাহ অন্তর কাগজটা নিয়ে যেতেন আর্মির প্রাক্তন সদস্য নজরুল সাহেব। তাকে আমি আগে চিনতাম না,

যদিও তিনি ছিলেন আমার ভগ্নিপতি দৌলতপুর বি.এল কলেজের অধ্যাপক মোহম্মদ জাফর ইমামের ঘনিষ্ট আত্মীয়-মন্টু ভাই। '৭১-এর প্রথম দিকে জাফর ভাই তাকে আমাদের বাড়িতে নিয়ে এসে আমার সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। কাজের দায়িত্বের পাশাপাশি তিনি আমাকে আরো দুটো জিনিষ দিতে চেয়েছিলেন– আমার নিরাপত্তার জন্য রাইফেল এবং যুদ্ধশেষে মুক্তিযোদ্ধা সনদপত্র। আমি দুটোই নিতে অস্বীকার করেছিলাম। আমি জানতাম ধরা পড়লে রাইফেল আমার নিরাপত্তা দিতে পারবেনা, বরং আমাকে আরো রিস্কের মধ্যে ফেলে দেবে। আর যেখানে আমার সরাসরি যুদ্ধে যাওয়ার কথা তাতে ব্যর্থ হওয়ায় মুক্তিযোদ্ধা সনদপত্র নিতে আমি বিব্রত বোধ করেছিলাম।তবে এজন্য আমার কোন অনুশোচনা নেই।

সিকিউরিটি গার্ড নিঃসন্দেহে এই কাগজটাই খুঁজছিল। তবে কি খুঁজছে সে সম্ভবত অতটা নিশ্চিত ছিলনা। আমার এখন হাত পা সবই বাঁধা। বাবা থাকলে হয়তো ভারতের পথ ধরতাম, কিন্তু পরদিন যথারীতি অফিসের গাড়ি ধরলাম। সুব্রত ছিল নেটিভ খ্রীস্টান, সে আমাদের সাথে গাড়িতে যাতায়াত করত এবং এসব ব্যাপারে আমাকে সহযোগিতা করত। প্রতি পক্ষকাল অন্তর গলায় ক্রুশ ঝুলিয়ে গ্রামের বাড়ি যেতো এবং মংলা বন্দরের খবরা খবর এনে দিত। তাকে জিজ্ঞসা করলাম কাউকে ভুলে বা বিশ্বাস করে কিছু বলছে কিনা?

না স্যার। আপনি সতর্ক করেছেন। কি ভাবে বলতে পারি! ক্ষণিক ভেবে সে হঠাৎ বলল, আজমল সাহেব বোধ হয় কিছুটা অনুমান করতে পারে, আপনাকে দেবো বলে নোট করছিলাম পাশে এসে দাঁড়লো, আপনার আত্মীয় তাই গোপন করার খুব একটা চেষ্টা করিনি, বলেছিলাম আপনার কাজ।

ওহ্ কি মারাত্মক ভুল! এখানে বাবা মা আত্মীয় বলে কিছু নেই। আর আপনি এই পাঁড় পাকিস্তানি চরটাকে চেনেন না!

দু তিন দিন পর খয়রাতি সাহেব কিছু কাগজপত্র নিয়ে হিসাব ইনচার্জের অফিসে এলেন। যাওয়ার পথে বললেন, কেয়া ইউনুস সাহেব সব ঠিক হ্যায় তো।

জি স্যার। তব মনোয়ার সাব মালুম হোতা হ্যায় কুছ ঝামেলা মে ফাঁস যাতা হ্যায় কি নেহী।

কিউ? কিস লিয়ে?

সেদিনের ঘটনা তাকে বললাম।

গব শুনে গম্ভীরভাবে বললেন, ইমানছে বলিয়ে তো মনোয়ার সাব আব ঠিক হ্যায় তো? গাদ্দারী উদ্দারী তো নেহি কিয়া।

নেহি স্যার, আপ একিন রাখিয়ে।

ঠিক হ্যায়, হ্যাম দেখেগা।

রবিউল সাহেব ও তার থ্রি ব্যান্ড রেডিও

একাত্তরের কঠিন দিনগুলোতে ওদের একমাত্র বিলাসিতা ছিল রেডিও শোনা। রবিউল হোসেনের থ্রিব্যান্ড ট্রানজিস্টর ছিল। তিনি আগে থেকেই স্টাফ মেসের দোতালায় একা একটা রুম নিয়ে থাকতেন। ধার্মিক ছিলেন, কিছুটা সৌখিনও ছিলেন। বাকি রুমগুলিতে অন্য স্টাফরা ভাগাভাগি করে থাকত। একাত্তরে নিরাপত্তার প্রশ্ন গুরুত্বপূর্ণ ছিল এবং রাস্তা থেকে বেশ দূরে হওয়ায় মেস বাড়িটা নিরাপদ ছিল। বাড়িটা বহু পুরানো, ফাটলযুক্ত এবং আশপাশে বিষাক্ত সাপের উপদ্রব থাকায় আগে তেমন বোর্ডার ছিলনা। এখন পরিস্থিতি ভিন্ন। দূর দূরান্ত থেকে এসে যারা কাজে যোগ দিয়েছিল তারা নিরাপত্তার খাতিরে মেসবাড়ি জাঁকিয়ে বসল। অনেককে এখন ফ্লোরিংও করতে হয়। বোর্ডারের সংখ্যা এখন বিশ পঁচিশ জনের কম হবেনা। কিন্তু বাইরে থেকে সেটা সহসা বোঝা যায় না। একাত্তরে সর্বত্রই কবরের নিস্তব্ধতা বিরাজ করত।

রবিউলের সাহেবের রূমের এক পাশে চৌকি, আলমারি ও চেয়ার টেবিল, টেবিলের উপর কিছু ধর্মীয় পুস্তক। অবসর সময়ে নিজে পড়তেন, অন্যদের পড়তে উৎসাহিত করতেন। রুমের বাকি অংশে ফরাস পাতা, ফলে রুমে ঢুকতে হত খালি পায়ে। তিনি মিশুক ছিলেন, কিন্তু গৃহসজ্জার কারণে কলিগরা তার রুমে কমই যেতেন। একাত্তরে অবশ্য রবিউল সাহেবের রুমটা হঠাৎ সকলের কাছে খুব প্রিয় হয়ে উঠল। বিকালে অফিস ছুটি হলে হাত মুখ ধুয়ে অজু করে সবাই একে একে এসে তার রুমে ফরাসের উপর জমায়েত হয়। আছর থেকে এশা পর্যন্ত এখানে রবিউল সাহেবের ইমামতিতে জামাত হত। বলা বাহুল্য এ সময় প্রায় সবাই ধর্মকর্মে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিল। মানুষের জীবন যখন অনিশ্চিত হয় অদৃষ্টের উপর নির্ভরশীলতা বাড়ে। ক্রয় বিভাগের মাহতাব সাহেব বামপন্থী শ্রমিক সংগঠনের সাথে যুক্ত ছিলেন, আল্লা রসুলে বিশ্বাস করতেন না, তিনিও এসময় নামাজে সামিল হতেন। রবিউল সাহেব তাকে চলার মত তালিম দিয়ে নিয়েছিলেন।

তবে নামাজে সামিল হওয়া ছিল উপলক্ষ মাত্র। রবিউল সাহেবের ঘরের প্রকৃত আকর্ষণ ছিল তার তিন ব্যান্ড রেডিও। তখন কেবল মুষ্টিমেয় ভাগ্যবান লোকের কাছেই রেডিও থাকা সম্ভব ছিল। কিন্তু রেডিও শোনার আগ্রহ ছিল সবার। স্বাধীন বাংলা বেতার, আকাশ বাণী, বিবিসি শোনার জন্য মানুষ পাগলপারা ছিল। রেডিও শুনতে হত খুবই লো ভয়েসে যাতে বাইরে বিন্দুমাত্র শব্দ না যায়। কেননা এসব কেন্দ্র শোনা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ছিল এবং ধরা পড়ার শাস্তি ছিল ভয়ংকর। ফলে সতর্কতার জন্য রবিউল সাহেব মাঝে মাঝে কাউকে না কাউকে ঘরের চারদিকটা দেখে আসতে পাঠাতেন।

সবাই ট্রানজিস্টরটা মাঝখানে রেখে ফরাসের উপর চারদিকে গোল হয়ে বসে অস্ফুট স্বরে বেজে চলা সংবাদ বজ্রকণ্ঠ কথিকা চরমপত্র জল্লাদের দরবার এসব অনুষ্ঠান গভীর আগ্রহ নিয়ে শুনতো। চরম হতাশার মধ্যে সবার জন্য এটা ছিল প্রেরণা।

আমি খুলনায় থাকতাম। রবিউল সাহেবদের একাত্তরের জীবনধারার এই চ্যাপ্টার হয়ত আমার অজানাই থেকে যেত। কেননা তখন রেডিও শোনা এবং তা চাউড় করে বেড়ানো মোটেও নিরাপদ ছিল না। মেসের বেশ কিছু বোর্ডার ছিল আমাদের বিভাগের, কিন্তু কেউ ঘুণাক্ষরে অফিসে কখনো এ নিয়ে কথা বলেনি। রবিউল সাহেব সবাইকে বলে দিয়েছিলেন, রেডিও শোনার কথা যদি বাইরে যায়, জানতে পারা মাত্র রেডিও শোনা বন্ধ হয়ে যাবে। তাদের কাছে রেডিও শোনা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণছিল এবং তারা বিশ্বস্ততার সাথে কমিটমেন্ট রক্ষা করেছিল।

অক্টোবরের প্রথম দিকে এক সোমবারে দুপুরে টিফিন টাইমে রবিউল সাহেব মেসে না যেয়ে আমার রুমে এলেন। আমি দুপুরে অফিসেই টিফিন করতাম। তিনি বললেন, আপনার আত্মীয় আমাদের সাথে এতবড় বেইমানি করবে ভাবতেও পারিনি। কিন্তু রাখে আল্লা, মারে কে! তাই প্রাণটা এখনো টিকে আছে। নইলে ভৈরবে আমাদের লাশ দেখতে পেতেন।

আমি বোকার মত তাকিয়ে থাকলাম।

আপনার ভাই না কি যেন হয় আজমল, তার কথা বলছি। আমরা আছরের নামাজ পড়ে খুব লো ভয়েসে রেডিও শুনি। কিছু দিন হল আজমলও আমাদের সাথে মেসে থাকছে, সেও শোনে। আপনার ভাই, সন্দেহের কোন কারণ ঘটেনি, যদিও তার অনেক মন্তব্য সবার পছন্দ হত না। রেডিওতে হয়তো বলল, দশজন পাকিস্তানি সৈন্য খতম করে দিয়েছে আমাদের বিচ্ছুরা। সত্য হোক মিথ্যা হোক সবাই খুশি। কিন্তু তার বিশ্বাস হয় না। সে হঠাৎ বলে বসল, ওরা সামনা সামনি পাকিস্তানি সৈন্য দেখেছে কখনো, এক এক জনের কি দশাসই শরীর, ওদের মারবে এই পুচকে ছোড়ারা! আসলে নিজেরাই মরে, উল্টে পাকিস্তানি সৈন্যদের মারার বাহাদুরি নেয়।

কেউ জবাব দেয় না, পরিস্থিতি তাদের নিরব থাকতে শিখিয়েছে।

আজমল বলতে থাকে, কি জানেন রবিউল সাহেব, জিততে হলে আমাদের খাস দেলে আল্লার কাছে বেশি বেশি করে কান্নাকাটি করতে হবে। তার অসাধ্য কিছু নেই। কিন্তু আমাদের কজনের সে ইমান আছে বলেন? সবাই তো 'ভারত আসেনা কেন, ভারত আসেনা কেন' বলে হা পিত্যেশ করে মরে! ভারত কি চিজ এরা জানেনা, আমরা জানি, আমরা যারা রিফিউজি তারা ওদের হাড়ে হাড়ে চিনি।

রবিউল সাহেবের সন্দেহ হতে হতে হয় না। আজমল আসরের এক কোণে ঘাপটি মেরে বসে থাকার সুযোগ নেয়।

মনোয়ার সাহেব, ঐ যে বললাম না, রাখে আল্লা মারে কে! শনিবার আছরের নামাজ শেষে সবাই গোল হয়ে বসেছি। কি মনে হল, বললাম– আজ আর রেডিও শুনব না, এত নিরপরাধ লোক মারা যাচ্ছে, কত লোকের মাটি হচ্ছে না, সৎকার হচ্ছে না, কত অসহায় মেয়েদের ইজ্জত সম্ভ্রম যাচ্ছে। অথচ দেখেন গতকাল জুম্মার নামাজের আগে বয়ানে তাদের সম্পর্কে কি আজে বাজে কথাই না বলা হল। আজ বরং রেডিও না শুনে আসুন আমরা মিলাদ পড়ে তাদের সকলের মাগফেরাতের জন্য দোয়া খয়ের করি, সকলের হেফাজত ও মুক্তিযুদ্ধে বিজয়ের জন্য আল্লার কাছে কান্নাকাটি করি।

সবাই এক বাক্যে সায় দিল, পকেটে ঢুকিয়ে ফেলা টুপিগুলো আবার বের করে যে যার মাথায় পরে ফেলল। আমরা তখন সুরা দোয়া দরুদ পড়ছি, হঠাৎ সিঁড়িতে ভারি বুটের শব্দ শোনা গেল। এ শব্দ সবারই চেনা, বুঝতে বাকি থাকল না কারা আসছে। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে দরজায় এসে দাঁড়াল যমদূতের মত এক বিশালদেশী খানসেনা। হাতে ভয় ধরানো চাইনিজ রাইফেল আমাদের দিকে তাক করা। পাশে পিছনে ক্রুদ্ধ লোলুপ আর্মি, মিলিশিয়া ও রাজাকারদের ভারি একটা দল। দরজার মুখে দঁড়ানো সৈন্যটা কর্কশ স্বরে জিজ্ঞাসা করল, কেয়া হোতা হ্যায় এহা, ঘরমে এতনা আদমী কিউ ? কিসকা ঘর? রবিউল সাহেব উঠে দাঁড়িয়ে সালাম দিলেন, তাজিমের সাথে বললেন, বৈঠিয়ে হুজুর।

যো পুছা উসকো জবাব দো। তার স্বর কিছুটা নরম, সম্ভবত আল্লার কালাম শুনে থমকে গেছে।

হুজুর, হাম সব সাচ্চা মুসলিম আউর পাকিস্তানি হ্যায়। হুজুর আপলোক ইসলাম, কওম আউর পাকিস্তান কি খাতের মে আপকা বিবি বাল বাচ্চা, মুলক মাকান ছোড়কর এতনা দূর লড় রাহে হ্যায়, জানভি দেতা হ্যায়। হামলোগ আপকো লিয়ে, পাকিস্তান আউর ইসলামকি হেফাজতকি লিয়ে আল্লাহ রাব্বুল আল আমিন কি পাস দোয়া আউর কামিয়াবি মাংতা হু।

তোমহারা পাস রেডিও হ্যায় ?

জ্বি, হুজুর।

কাঁহা হ্যায়, লাও হামারা পাস।

সবার মুখ তখন ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। গতকাল জয়বাংলা শুনে রেডিও বন্ধ করা হয়েছে, এখন খোলামাত্র ধরা খেতে হবে এটাই সবাইকে আতংকিত করে তুলেছে। রবিউল সাহেব পিছন ফিরে আলমারির দিকে হাত বাড়ান। হঠাৎ চিৎকার শুনে থমকে যান– অ্যায় ঠ্যায়রো, তোম নেহী, মুঝে দেখাও রেডিও কাঁহা হ্যায়।

রবিউল সাহেব আলমারির পাল্লা খুলে দেন। আর্মিটা ফরাসের উপর নোংরা বুটের দু'তিনটে ছাপ ফেলে আলমারি থেকে রেডিওটা ছিনিয়ে আনে। রেডিওটা সবার কাছে অসম্ভব প্রিয় ছিল, এখন ভয়াবহ শত্রু মনে হয়। পকেট থেকে রুমাল বের করে মুখের ঘাম মোছে কেউ কেউ। সবার মাথাগুলো বুকের উপর ঝুকে পড়ে। তারা এমনকি মনে মনে দোয়া ইউনুস পড়তে যেয়েও বারবার ভুল করতে থাকে। অসম্ভব চাপের মধ্যে সৈন্যটা রেডিও অন করে। বিস্ময় বুকের ভিতর হাতুড়ি পিটতে থাকে। কি যে স্বস্তি- রেডিওতে কওমি তারানা ঝংকার দিয়ে ওঠে– পাকিস্তানের উৎস কি ভাই, হক লাইলাহা ইল্লালাহ।–

আর্মিটা ক্রোধের সাথে রেডিও বন্ধ করে রবিউল সাহেবের হাতে ফিরিয়ে দেয়, জিজ্ঞাসা করে আজমোল কৌন? সবার দৃষ্টিগুলো বিশেষ কোণের দিকে চলে যায়। আশ্চর্য জায়গাটা ফাঁকা। এতক্ষণ কারো খেয়াল হয়নি যে সে নেই।

আর্মিরা ফিরে যায়। রবিউল সাহেব তার অসমাপ্ত মিলাদ, মুনাজাত শেষ করেন। বলেন, হে আল্লাহ তোমার কুদরতের শেষ নেই। তুমি রাখলে কারো সাধ্য নেই যে মারে, তুমি আমাদের, আমাদের মুক্তিযোদ্ধা ভাইদের হেফাজত কর, সাফল্য দাও আল্লাহ।

বললাম, আজমল এতদূর নেমেছে! আর আশ্চর্য, আপনাদের বেঁচে যাওয়া!

রবিউল সাহেব বললেন, ওরাও সবাই অবাক হয়ে গিয়েছিল এটা কিভাবে সম্ভব যখন আমরা আকাশ বাণী, বিবিসি, জয় বাংলা শুনে রেডিও বন্ধ করি, সেখানে ঢাকা আসে কোত্থেকে!

রবিউল সাহেব বললেন, স্যার, রেডিও আমার, সতর্ক তো থাকতেই হয়, রেডিও শোনা শেষ হলে রোজই স্টেশন ঘুরিয়ে করাচি বা ঢাকায় দিয়ে রাখি।

প্রায় এক সপ্তাহ আজমলের খোঁজ নেই। একদিন বেলায়েত বললেন, রিফুজিটাকে সতর্ক করে দেবেন। কোন মতে ছাড়িয়ে এনেছি। দেখলে চিনতে পারবেন না। আরে সে তো আমাদের বলতে পারত, সরাসরি আর্মি ডেকে নিয়ে এলো কেন?

দেখলাম সত্যি চেনা দুষ্কর, দাঁড়কাকে পাতিকাকের মাংস খেয়েছে।

ট্রেঞ্চে নগ্ন নারী, জুট অফিসার ইকবাল ফাহমি দেশ ছাড়লেন

নভেম্বরের শেষে যশোরের মহেশপুর সীমান্তে যুদ্ধাবস্থার উদ্ভব হয়। ভারতীয় মর্টার ও কামানের গোলার ছত্রছায়ায় মুক্তিবাহিনী পাকিস্তান সেনাবাহিনীর উপর চাপ তীব্রতর করে। তবে তখনো তেমন সাফল্য দৃশ্যমান হয়নি। আমরা এসব সংবাদ পেতাম ইকবাল সাহেবের কল্যাণে। আকবর সাহেবের অফিসে বসে তিনি এ ধরনের অনেক গল্পই করতেন। কাঁচের হাফ পার্টিশানের এপাশে আমাদের ক্ষুদ্র অফিস থেকে তার কণ্ঠস্বর ভালই শোনা যেত। এক শনিবার সকালে মহা উৎসাহে বললেন–'আকবর সাহেব, টুডে ইভনিং উই আর গোয়িং টু যশোর ফ্রন্ট।'

আকবর সাহেব বিস্মিত হয়ে বললেন– কি ব্যাপার! এখন সিভিলিয়ানদেরও যুদ্ধে ডাক পড়ল নাকি!

আরে নেহি নেহি, ওহা যো কমান্ডিং অফিসার হ্যায় না, মেরা জিগরি দোস্ত। আপকা ভাবি সাহাবকো ইনভাইট কিয়া টু টেক ইন্টারভিউঅব আওয়ার হিরোজ। আগার মওকা মিল যায়ে, ওয়ার কি তসবির ভি খিচুঙ্গা হাম।

পরের সোমবার সকালে বিভাগীয় প্রধানদের মিটিং শেষ হতেই তিনি আকবর সাহেবের সাথে তার চেম্বারে ঢুকে পড়লেন। একটা চেয়ার টেনে নিয়েচুপচাপ এককাপ চায়ের সাথে সিগারেটের পর সিগারেট পুড়িয়ে চললেন।

কিয়া বাত ইকবাল সাব, খামুশ কিউ, ফটো খিচা?

হাঁ খিচা, মাগার ওয়ার কা নেহি, থ্রি উইমেন কা ফটো, ফুললি নেকেড। আই স দেম সিটিং ইন ওয়ান আর্মি ট্রেঞ্চ, সো পেল, সো পুওর! আই অ্যাম হ্যাপি মাই ওয়াইফ ওয়াজ নট উইথ মি অ্যাট দ্য টাইম, বাট আই অ্যাম অ্যাফ্রেড উই আর গোয়িং টু ফেস দ্য সেম ফেট দ্যাট দ্য ইজিপশিয়ান মুসলিমস্ মেট ইন সিনাই।

এ আপনিউল্টাপাল্টা কি সব বলছেন!

ঠিকই বলছি আকবর সাব। মনসুর, আউর এককাপ চা লাও ভাই। আচ্ছা আকবর সাব, কেয়া আপ জানতে হে হোয়াট হ্যাপেন্ড হোয়েন দ্য ইজরাইলী ট্রুপস সাডেনলি এনটার্ড ইনটু দ্য টেন্ট অব ওয়ান ইজিপশিয়ানকমান্ডারঅ্যাট সিনাই ওয়র ফিল্ড? হি ওয়াজ এ কর্ণেল এন্ড ওয়াজ কমান্ডিং দ্য মুসলিম ফোর্স এগেন্স্ট দ্য ইজরাইলিজ।

আকবর সাহেব মাথা নাড়িয়ে বললেন– সরি, আই ডোন্ট নো।

নো ম্যাটার। লিসেন, দি কর্নেল হ্যাড নো টাইম টু লুক ফর হিজ রিভলভার। হি ওয়াজ দেন লুকিংফর হিজ ট্রাউজার্স! বাই দি ওয়ে, দেয়ার ওয়াজঅলসো এ বিউটিফুল উইম্যানফুল্লি নেকেডইন দ্য টেন্ট। ইহুদি হোগা জরুর!

হাউএভার আই হ্যাভ এ সুভেনির অভ ওয়ার,হুইচ আই হ্যাভ পিকড্ আপ ফ্রম দ্য ওয়ার ফিল্ড। তিনি একটা ৭-৮ ইঞ্চি খালি মর্টার শেল ঠকাস করে আকবর সাহেবের টেবিলের উপর রাখেন। আকবর সাহেব শেলটা হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে আবার টেবিলের উপর রেখে দিলেন। ওটা পকেটে পুরতে পুরতে উঠে দাঁড়িয়ে ইকবাল সাহেব বিষন্নভাবে বললেন– সো লং মাই ফ্রেন্ডস, আই অ্যাম এনাফ লাকি টু হ্যাভ এয়ার টিকেটস্ ফর করাচি।

ভদ্রলোক চলে গেলে আকবর সাহেব টেনে টেনে উচ্চারণ করলেন– পাকিস্তানের হালহকিকতটা কিকিছু বুঝলে ইউনুস সাহেব? ব্যাটা আর এক মুহূর্তও দেরি করেনি, টিকিট ভি কেটে ফেলেছে!

বেলায়েত সাহেব মাঝে মাঝে ইউনুস সাহেবের টেবিলে এসে বসেন। তিনি স্টার জুট মিল শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান। ইউনুছ সাহেবের কি মতি হল কে জানে, হঠাৎ বলে বসলেন– ইকবাল সাহেব তো চাকরি ছেড়ে দিল।

কেন, পাটের ব্যবসা করবে নাকি?

নাহ্, করাচী চলে যাচ্ছে। ফ্রন্টে গিয়েছিল, ঠিক আশা রাখতে পারছে না।

কি আশা রাখতে পারছে না?

ইউনুস সাহেবের মতিভ্রম ঘটল, বললেন– একটা বড় ট্রেঞ্চের মধ্যে নাকি তিনজন মেয়ে মানুষ দেখেছে, উলঙ্গ। তাদের ছবিও নাকি তুলে এনেছে।

বেলায়েত সাহেব কটমট করে তাকিয়ে বললেন– এসব আপনি বিশ্বাস করেন?

ইউনুস সাহেব বুঝলেন, এই নভেম্বরের শেষে এসে পাকিস্তানি সৈন্যদের চরিত্র মাহাত্ম সম্পর্কে এমন মন্তব্য করে খুব বড় বেকামী করে ফেলেছেন। কথা ঘুরিয়ে নিলেন– আরে না না, তবে ব্যাটা ইকবাল কেন যে এসব বলছে আপনার একটু দেখা দরকার।

সে দেখা যাবে। কিন্তু আপনি কি জানেন, পাকিস্তানি জোয়ানরা আমাদের সীমান্তের অতন্দ্র প্রহরী। তাদের ঘুম নাওয়া খাওয়া সবই ঐ ট্রেঞ্চে। কেবল গাজী হয়েই তারা ট্রেঞ্চ ছাড়ে, নয়তো শহীদ হয়। চারিত্রিক দৃঢ়তা আছে বলেই তারা এমন মনোবল দেখাতে পারে।

ইউনুস সাহেব জানবেন না তাকি হয়! মাথা দুলিয়ে জোরালো সমর্থন জানালেন- কেন জানব না? জানি বলেই তো বিষয়টা আপনাকে দেখতে বলছি, এ ধরনের কথা ক্ষতির কারণ হতে পারে।

জুটের দায়িত্বে আছে তো, দেখেনগে এই কদিন প্রচুর মালকড়ি কমিয়ে ফেলেছে ইকবাল। ধরা পড়ার ভয়ে এখন পালাচ্ছে। এরা হল ঘরের শত্রু বিভিষণ, সব সময় আখের গোছানোর তালে থাকে।

বেলায়েত সাহেব সে ধরনের বাঙালি যারা পাকিস্তানি সৈন্যদের সম্পর্কে সামান্যতম অপবাদও সহ্য করতে নারাজ। ভাবলেন ইউনুস সাহেবের মুখ বন্ধ করা প্রয়োজন। কাঁচাপাকা দাড়ির অগ্রভাগ দাতে কামড়ে কয়েক সেকেন্ড চুপ থাকলেন, তারপর মুখ খুললেন– আমি আসলে যে কথা বলতে এসেছিলাম–

ইউনুস সাহেবের অস্বস্থি বাড়ে। আমার ভিতরেও সেটা সংক্রামিত হয়। বেলায়েত সাহেব দাড়ির আগ্রভাগ দাঁতে চেপে নিরবে সেকেন্ডর পর সেকেন্ড পার করেন। অপেক্ষার মুহূর্তগুলো আমাদের তলপেটে এক অসহনীয় অস্বস্তির জন্ম দেয়। বেলায়েত সাহেব অকস্মাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বলেন– একটু সাবধানে থাকবেন, একটা নতুন লিষ্ট হয়েছে। তারপর আমার দিকে ফেরেন, আপনিও। আমরা অসাড় হয়ে বসে থাকি।

ইউনুস সাহেব বললেন– আমি গাড়ি রিকুইজিশন দিয়ে ব্যাংকে যাচ্ছি। আপনাকে বলে যাই আর ফিরব না। শেষ মুহূর্তে এসে বেঘোরে প্রাণ হারানোর ইচ্ছে নেই।

আমি কি করব স্যার, আমাকে তো ব্যাংকে যাওয়ার অনুমতি দেবে না।

সবারই এখন ইয়ানফ্‌সি অবস্থা মনোয়ার সাহেব, আপনি আকবর সাহেবকে বলেন, খয়রাতিকেও বলতে পারেন।

স্যার এক কাজ করলে কেমন হয়। খয়রাতি সাহেবকে ডেকে পাঠান, বলেন তার পিএফ লোন রেডি।

মাথা খারাপ মনোয়ার সাহেব, এখন খয়রাতিকে লোন দিলে অন্তত ৬০ জন বিহারীকে লোন দিতে হবে। এত টাকা কোথায়?

স্যার, খয়রাতি সাহেব আর ৬০ জন বিহারীর মধ্যে বিস্তর ফারাক।

খয়রাতি সাহেব অসম্ভব খুশী হলেন– বহুত শুকরিয়া ইউনুস সাহেব। সবকো বোলাউ।

নেহি নেহি স্যার, আউর কিসিকো বোলানা নাহি, রুপিয়া কাহা!

খয়রাতি সাহেব গম্ভীর হয়ে গেলেন– এটলিস্ট রহমতউল্লাকো লোন দেনে পড়েগা ইউনুস সাহাব। উসকা বহু হাররোজ মুঝে পেরেশান কর রাহি হ্যায়। হাম বহোত পেরেশানি মে হ্যায় ভাইয়া।

কোশেশ করুঙ্গা স্যার, মাগার আপ আউর কিসিকো মৎ বলিয়ে।

খয়রাতি যখন উঠতে যাবেন ইউনুস সাহেব বললেন– স্যার, মালুম হোতা হামলোগ এনিলংগার এহাঁ নকরি নেহি কর সাকেগা।

কিউ?

শুনা হ্যায় এক নয়া লিস্ট হুয়া, হামলোগ তো কোই গলতি নেহি কিয়া।

তো আপকা কিয়া প্রবলেম! আপ খামোখা ঘাবড়াতে কিউ?ছোড়িয়ে তো।

মনোয়ার সাহেবও তো বহুত পেরেশানিতে আছে স্যার।

তিনি সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে আমাকে মাপেন, আপ কুছ গড়বড় নেহী কিয়া তো মনোয়ার সাব?

জি নেহী স্যার, ম্যায়ভি কুছ নেহী কিয়া।

তো ফির? কেয়া ম্যায় আপকো জামিনদার হু না! ব্যাস্ ঘাবড়াইয়ে মৎ।

গোয়ালপাড়া-৪

রফি সিদ্দিক নভেম্বরের মাঝামাঝি একদিন ডেকে বললেন আপনার কাছে টাকা আছে ডাক্তার সাহেব?

আছে স্যার, কত?

কত বেশী টাকা আছে?

স্যার পাঁচ হাজারের মত হবে, কিন্তু সেতো ব্যাংক এবং ব্যাংকটা এখনপিপলস মোড় থেকে চরের হাট নেডাল বেসের কাছে সরিয়ে নেয়া হয়েছে।

আমি গাড়ি দিচ্ছি, যত বেশী সম্ভব তুলে নিয়ে আসুন। আমি টাকা এনে তাকে দিতে গেলে বলবেন, আমার না আপনার নিজের প্রয়োজন হতে পারে, কাছে রাখুন।

রফি সিদ্দিক ছিলেন ব্যবসায়িক হাড়ঙাবাদের লোক। নভেম্বরের শেষ দিকে একদিন বললেন আপনি আমাকে একটা আনফিট সার্টিফিকেট দেন। বলরাম এটা তো সিভিল সার্জনই কেবল দিতে পারেন। আপনি এই যা হোক একটা দেন। তিনি ভাল লোক ছিলেন, অনেকেই তার জন্য বেঁচে গিয়েছিল। লিখে দিলাম তার হার্টের সমস্যা আছে, খুবই দুর্বল, মানসিক ভাবেও ভেঙ্গে পড়েছেন। তার বেশ কিছুদিন বিশ্রাম প্রয়োজন। চলে গেলেন।

যাবার আগে ডেকে বলে গেলেন, শীঘ্রই একদিন আপনাদের দেশ স্বাধীন হয়ে যাবে, তবে যতদুর সম্ভব সাবধানে থাকবেন, কোথাও ডাকলে না যাওয়াটাই ভাল। দোলাভাই অর্থ বুঝতে পারলেন না।

ফেরিঘাট মোড়ে আর্মি পোস্ট আমাদের চমকে দিল

৭ ডিসেম্বর ১৯৭১। নিত্যকার মত অফিসে চলেছি। শান্তিধামের মোড়ে যখন টয়োটা ল্যান্ডক্রুজারে উঠি আব্বাস ড্রাইভারের ব্যাজার মুখ দেখে মেজাজটাই খিচড়ে গেল। সে বিহারী, পারতপক্ষে আমাদের সাথে কথা বলত না। যদি বলত, সেদিন অফিসে যাওয়া নিয়ে আমরা হয়তো ভিন্ন চিন্তা করতাম। গাড়িটা ফেরীঘাটের মোড়ে আসতেই যে দৃশ্য আমাদের চোখে ধরা পড়ল তা যেমন অস্বাভাবিক তেমনই ভয় ধরানো। সামনে লোয়ার যশোর রোডের দুই লেনের মাঝে সবুজ ঘাসে ঢাকা আইল্যান্ডে ভোজবাজীর মত উদয় হয়েছে ফ্লাইং সসার আকৃতির এক বাংকার। রাস্তার দিকে মুখ করে বাংকারের খোলা মুখ দিয়ে উকি দিচ্ছে ভয়াল দর্শন মেসিনগানের নল। সৈন্যরা রাস্তার পাশে বিশৃঙ্খলভাবে হাঁটছে, কেউ ফুটপাতে বসে আছে, কেউ দাঁড়িয়ে রাইফেলের কুদো মাটিতে ঠেকিয়ে হাতের মুঠোয় নলটা ধরে শরীরের ভর সামলানোর চেষ্টা করছে। জামা কাপড়ে ধুলোর আস্তরণ। হেলমেটগুলো ঝুলছে পিঠের উপর। চোখে মুখে রাজ্যের ক্লান্তি। মাত্র নয় মাসের মধ্যে পাকিস্তানি বীরবাহুদের এমন বিধ্বস্ত হাল কল্পনায় আনাও কঠিন।

আমরা অবনত এবং দুঃশ্চিন্তা মগ্ন ছিলাম, ওদের দিকে বেশি তাকানোর সাহস ছিলনা। আমরা ভেবে পাচ্ছিলাম না এরা কোথা থেকে এলো। কে ভাবতে পারে যে তারা যেযশোর ক্যান্টনমেন্ট ছেড়ে খুলনায় পিছিয়ে এসেছে। যশোর ক্যান্টমেন্টকে তখন সুরক্ষিত দূর্গ ভাবা হত। আমাদের চিন্তা এবং ভয় হতচ্ছাড়া যুদ্ধটা চলে এল একেবারে জনাকীর্ণ শহরের উপর। এখানে যুদ্ধ হলে জানমালের যে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হবে তাতে সন্দেহ নেই।

ফেরিঘাট মোড় থেকে ধীর গতিতে গাড়িটাবাম দিকে টার্ন নিতেই আমাদের আশংকা শতগুণ বেড়ে গেল। যতদূর দৃষ্টি যায় পথজুড়ে একই দৃশ্য। আর্মিদের মধ্য দিয়ে গাড়িটা ধীরে ধীরে চালিয়ে নিয়ে এল আব্বাস। জোড়াগেটের কাছে এসে মনে হল কি যেন এক পরিবর্তন, কি যেন ঘটে গেছে এখানে। হঠাৎ খেয়াল হল তাইতো বোপঝাড় জঙ্গলের পরিমান অনেকবেড়ে গেছে এবং তার ফাঁক দিয়ে উঁকি দিচ্ছে জলপাই রংয়ের ছোট ছোট সাঁজোয়া যান, ভারী ট্রাক। ধুলো কাদা মাখা শরীর। নিশ্চিত, রিট্রিট করে এসেছে ওরা।

খুলনা শহর তখন যথেষ্ট জনবহুল। শিল্প, বাণিজ্য ও বন্দর নগরী এবং বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র হওয়ায় আর্মিরা শহরটাকে উপরে উপরে শান্ত রাখতে চেষ্টা করে এসেছে। তারা এখানে প্রকাশ্যে বড় ধরনের অপারেশনে যেত না। এখানে কাজ পাওয়া যেত সহজে। ফলে বহু লোক আশ্রয় নিয়েছিল শহরে। এখানে এখন গোলাগুলি শুরু হলে কি যে হবে তা অচিন্তনীয়। ইচ্ছা হল, গাড়ি থেকে নেমে বাড়ি ছুটে যাই। মা ভাই বোন সবাইকে নিয়ে শহর থেকে দূরে নিরাপদ কোথাও আশ্রয় নিই। কিন্তু সেটা এখন একেবারেই অসম্ভব। কেননা ফিরতে হবে পায়ে

হেটে আর্মিদের মধ্য দিয়ে। এরা এখন চাকভাঙ্গা মৌমাছির মত ক্রুদ্ধ হয়ে আছে। তার উপর শেখপাড়ার মোড় থেকে ডাকবাংলা অথবা পঞ্চবিথির দিকে কয়েক'শ গজ যেতে হবে বিহারী বসতির মধ্য দিয়ে, কোনো পাগলেও এই রিক্স নেবে না। এখন আমার উদ্বেগাকুল প্রতীক্ষা, যত দ্রুত সম্ভব অফিসে পৌঁছানো এবং পাশের বাড়িতে টেলিফোন করে সবাইকে সতর্ক করা।

অফিসে ঢুকে আকবর সাহেব চলে গেলেন জিএম সাহেবের অফিসে বিভাগীয় প্রধানদের প্রাত্যহিক সভায়। আমি এই সুযোগটা কাজে লাগাবো ভেবে রেখেছিলাম। দ্রুত তার চেম্বারে ঢুকে টেলিফোন তুলে পাশের বাড়ি বড় ভাইয়ের নম্বারে রিং করলাম। পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করে বললাম সবাইকে নিয়ে দূরে কোথাও সরে যেতে অথবা লোক ডেকে বাড়িতে গভীর করে ট্রেঞ্চ খোড়ার ব্যবস্থা নিতে।

আমি দুটো ব্যাপারে ভীত ছিলাম– বড়ভাইকে আমার কথা বিশ্বাস করানোখুবই কঠিন, আবার আমার কথাগুলো অফিসের এমন কেউ যেননা শুনে ফেলে যা আমার জন্য বিপদ ডেকে আনতে পারে। তবে কথায় বলে 'যেখানে বাঘের ভয়, সেখানেই সন্ধ্যা হয়।' কথার মাঝখানে মিল শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান সহকর্মী বেলায়েত সাহেব আচমকা অফিসে ঢুকে পড়লেন। আমি কি করব সহসা ভেবে পেলাম না। বেলায়েত সাহেব ঝাঁঝের সাথে বললেন– তাড়াতাড়ি কথা শেষ করেন, আমার রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ কাজ আছে। ভয়ে ভয়ে আধাখেচড়াভাবে কথা শেষ করে বেরিয়ে এলাম।

অল্প পরে বেলায়েত সাহেবও বেরিয়ে এলেন। মুখটা থমথমে, কালো মুখে কে যেন আরো এক পোঁচ কালি মাখিয়ে দিয়েছে। আমি ঐ মুহূর্তে তার চোখে পড়তে চাচ্ছিলাম না, তিনিও আমার দিকে তাকান নি। তবে আমাকে অতিক্রম করার পর তার গম্ভীর কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম– এদিকে আসেন।

এ যেন তীরে এসে তরি ডোবার মত অবস্থা। সূর্যোদয়ের প্রতীক্ষা যখন সমাগতপ্রায়, ঠিক তখনই কি সংকটেই না পড়া গেল! বেলায়েত সাহেব তার টেবিলে আমাকে ডাকার অধিকারী ছিলেন না। কিন্তু ওসব ভাবার সময় তখন কোথায়? প্রায় অসাড় পা নিয়ে আমি তার সামনে যেয়ে দাঁড়ালাম। তিনি তখন দাঁত দিয়ে দাঁড়ির অগ্রভাগ চিবাচ্ছিলেন। থু থু করে কর্তিত অংশ মেঝের উপর ফেলে বললেন– 'বসুন, এবার বলুন দেখি তখন টেলিফোনে কাকে রিট্রিট ফিট্রিট কি সব শোনাচ্ছিলেন!'

আমি কোনভাবে কথাকটা বলতেই বলায়েত সাহেব গর্জে উঠলেন–'আপনি যা জানেন তা ভুল! কালরাতে মগরেবি পাকিস্তান থেকে কয়েক হাজার সৈন্য, কামান এবং ট্যাংক রুজভেল্ট জেটিতে নেমেছে সে খবর রাখেন?আপনি ফেরিঘাট, যশোর রোড ও জোড়গেটে যাদের দেখে এসেছেন এরা তারাই।'

আমাকে স্বীকার করতেই হয় নিতান্ড়ই ছাপোষা মানুষ আমি, এসব খবরাখবর কোথায় পাবো বলুন! আপনারা বললে তবেই না–

তিনি বোধহয় কিছুটা নমনীয় হন, বলেন– আসলে আপনারা গোমরাহির মধ্যে আছেন, বুঝতেই চান না যে মুজাহিদ সিপাহী গুলির সামনে সিনা পেতে দেয়, পালায় না।

আমি দারুণ সন্তোষ বোধ করি এবং সেটা প্রকাশ করার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ি। আমি 'সুবহান আলাহ্' বলে প্রায় উঠেও পড়েছিলাম। তবে সম্ভবত ইবলিসেরই কারসাজি, অনেক ক্রুশিয়াল মুহূর্তে যেটা বলা উচিৎ, কেন জানি, প্রায়ই তার উল্টোটা মুখ ফসকে বেরিয়ে যায়। আমার ক্ষেত্রে সেটাই ঘটল, বলে বসলাম– কিন্তু ওদের জামা কাপড় সব যে ধুলো মাটি মাখা, চোখগুলো–।

বেলায়েত সাহেব ভাঁটার মত চোখ তুলে আমাকে থামিয়ে দিলেন– আপনি এসবের কি বুঝবেন, এটা ক্যামোফ্লাজ! যাকগে, আপনি ভাল মানুষ, তবে আপনার ইমানের জোর কম। আর আধ ঘন্টার মধ্যেই শুনবেন ওদিকে দিল্লি আর এদিকে কলকাতা দখল হয়ে গেছে।' মনে মনে ভাবি আর ভুল করা চলবেনা। মোসাহের মত মাথা দুলিয়ে 'তা ঠিক, তা ঠিক' বলে বলে বেলায়েত সাহেবের বক্তব্যকে আরো জব্দ করে দিতে সচেষ্ট হই।

আশ্চর্য! এদিকে সমান্তরালে এক প্রতিরোধের ভাষা কখন যে মহাবেগে উত্থিত হচ্ছিল কেউই তা জানতে পারেনি। তারা সবাই নিজ নিজ টেবিলে হতাশভাবে মাথা ঝুঁকিয়ে বসে শাপদের মুখে পড়া তাদের এক অসহায় সহকর্মীর ভাগ্যের গতিধারা অনুমান করতে চেষ্টা করছিল। ফলে অতি নিরীহ ছাপোষা মহিউদ্দিন সাহেব, যুদ্ধের প্রথম দিকে কুষ্টিয়ায় বউ ছেলে মেয়েদের দেখতে যেয়ে এক পরব্রতা কুকুরের আত্মোৎসর্গের বিনিময়ে আর্মিদের হাত থেকে কোনমতে প্রাণ বাঁচিয়ে ফিরে আসতে পারার দুঃসহ স্মৃতিভার নিয়ে গত সাত মাস নিরবে কলম পিষে এসেছেন, আগ্নেয়গিরির মত হঠাৎ ফুঁসে উঠলেন–'থামেন বেলায়েত সাহেব, যথেষ্ট হয়েছে!' সবাই চমকে উঠলেন। মহিউদ্দিন কঠিন কণ্ঠে বললেন–'অনেক শুনেছি বেলায়েত সাহেব, আর না! ভুল মনোয়ার সাহেবের না, ভুল আপনার, আপনার অজেয় বাহিনী পালিয়ে এসেছে। ওদের এখন ইয়ানাফসি অবস্থা! আর ভাওতা দেবেন না, সময় থাকতে থামুন, থেমে যান প্লি-জ! আপনার মগরেবি হুজুরেআলারা একে একে সব উধাও হয়ে যাচ্ছে, আপনি খেয়াল করেন না!'

আমি হতচকিত হয়ে পড়েছিলাম। আমরা এখনো বেহেড আর্মি, রাজাকার, শান্তি কমিটির হিংস্র থাবার নিচে আছি, অথচ স্বাধীনতা দেখার কি যে স্পৃহা! প্রচণ্ড ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম, হয়তো এখনই দুর্ঘটনা ঘটে যাবে এবং আমরা সবাই ফেঁসে যাব, দ্রুত তাকে ঠেকানো চেষ্টা করলাম– একি বলছেন মহিউদ্দিন সাহেব! আপনার মাথা খারাপ হল নাকি?

মহিউদ্দিন ধীরে ধীরে বললেন– খারাপ হয়েছে স্যার, তবে এখন না পরশুদিন। আপনি জানেন না, ঐ বেলায়েত সাহেব রোববার সকালে বিহারী আর রাজাকারদের নিয়ে মিলের ভিতর মিছিল করেছিল। আমি তখন মেসে দোতালার বারান্দায় বসে শেভ করছি। সবে একপাশের খোঁচা খোঁচা দাঁড়ি কেটেছি, আর একপাশে তখনও সাবান লাগানো। হৈ চৈ শুনে উঠে দাঁড়িয়ে রাস্তার দিকে তাকিয়েছি। বেলায়েত সাহেবের সাথে চোখাচোখি হল। আমরা দীর্ঘদিনের সহকর্মী, বন্ধুত্ব ও শ্রদ্ধার সম্পর্ক তো আছেই। তা সত্ত্বেও গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে উঠলেন–'নেমে আয় শালা!' বিহারিদের হাতে তলোয়ার, সড়কি, ছোরা-ছুরি। সেগুলো উচিয়ে তারাও সমানে চিৎকার দিতে থাকল–'আ জা শালে, উতার জলদি।'

কি বলব স্যার, ভয়ে প্রাণ উড়ে গেল! আমি এখন সপ্তাহে একবার শেভ করি, দাড়ি গোফ খোঁচা খোঁচা হয়ে যায়। ঐ অবস্থায় সাবান মুছে সঙয়ের মত একপাশে ক্লিন শেভ অন্যপাশে খোঁচা খোঁচা দাড়ি নিয়ে ছুটে এলাম। বেলায়েত সাহেব একজনের হাত থেকে অশালীনভাবে বাঁশবিদ্ধ ইন্দিরা গান্ধীর কুশপুত্তলিকা কেড়ে নিয়ে আমার হাতে ধরিয়ে দিলেন। তার হুকুমে আমি আমার সমস্ত ভক্তি শ্রদ্ধা ভালবাসা জলাঞ্জলী দিয়ে ইন্দিরা গান্ধী, শেখ মুজিব ও মুক্তিবাহিনীর বিরুদ্ধে গলা ফাটিয়ে শ্লোগান দিয়েছি শুধু প্রাণের ভয়ে। আমি রাজনীতি করিনা। কিন্তু ঐ সময় থেকে খুবই খারাপ লাগছে, নিজেকে অপবিত্র বিশ্বাসঘাতক মনে হচ্ছে!

বেলায়েত সাহেব স্তব্ধ হয়ে তার চেয়ারে বসে রইলেন। ইসমাইলিয়া সম্প্রদায়ের সাব্বির ছিল অফিসে। কিছুটা ভয়ে ভয়ে অনেকেই তার দিকে তাকালো। সে বাঙালিদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিল, বলল– 'বেলায়েত সাব, আপ তো বহুত গলতি কিয়া ভাই!তারপর মহিউদ্দিনের দিকে ফিরে বলল হাউএভার উই নো হি ডিড নট কমিট এনি সিরিয়াস মিসডিড্। উই আর অল ওয়েল বাই দি গ্রেস অব অলমাইটি আল্লাহ। প্লিজ ভুল যাইয়ে মহিউদ্দিন সাব, মনোয়ার সাব প্লিজ!'

দীর্ঘ পশ্চাদপসরণ

মূলা ক্ষেত সাবার করল আর্মিরা।

ঘটনাবহুল ১০ ডিসেম্বর

১০ ডিসেম্বর শুক্রবার। যুদ্ধ এখন অনেক কাছিয়ে এসেছে, কেউ নিশ্চিত নয় ঠিক কোথায়। আটরা শিরোমনি থেকে লোকজন দূরে সরে গেছে, ওসব এলাকা থেকে যারা অফিস করত তারা অফিসে আসা ছেড়ে দিয়েছে। কামানের গোলার শব্দ এখন আরো জোরাল। আমাদের বৃটিশ জেনারেল ম্যানেজার ডিজি র‍্যামজে এখনও নির্লিপ্ত, আশ্চর্য রকম পাকিস্তানপন্থী, আড়ালে আবডালে বাঙালিরা বলে 'খ্রিশ্চিয়ান্ মোর দ্যান পোপ।' শোনা যায় বৃটিশ দূতাবাস তাকে নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য আগেই ঢাকা চলে যেতে বলেছিল, কিন্তু সিচুয়েশন নরম্যাল জানিয়ে সে সেটা উপেক্ষা করেছে।

সকালে মিলে এসেছি একরাশ দুঃশ্চিন্তা নিয়ে। পঞ্চবিথীর মোড়ে গাড়িতে ড্রাইভার আব্বাসকে দেখে মনটা দমে গেল। তাকে আমাদের পছন্দ ছিল না। খুলনা থেকে যারা যাই সবাইকে গাড়িতে দেখে কিছুটা স্বস্তি পেলাম। এরপর কটন মিলের সামনে থেকে আমাদের দুই বস আকবর সাহেব ও ইউনুস সাহেবকে নিতে হবে। তারা দুই ভাই। গাড়ি বাড়ির সামনে থামতেই আকবর সাহেব লুঙ্গি পরে বেরিয়ে এলেন। ল্যান্ড ক্রুজারের পিছনে উঁকি দিয়ে বললেন, বাহ্! আপনারা সবাই আছেন দেখছি, ঠিক আছে কি আর করা। আব্বাস, দো মিনিট ঠায়রো, আতা হ্যায়। বুঝা গেল আজ কেন জানি সবাই আমরা একই লাইনে ভেবেছি। কারো অফিসে যাওয়ার ইচ্ছা নেই, কিন্তু সবাই সবাইকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছি। কেন তা ভবিতব্যই বলতে পারে!

আব্বাস গাড়ির ফ্রন্ট সীটে বসা প্রশাসনিক কর্মকর্তার সামনেই গজ গজ করে উঠল, আজ এডমিন সাবকে লিয়ে পাঁচ মিলাট লেট হুয়া, আপকা কেতনা টাইম লাগেনা কোন জানে? খন্দকার সাহেব এবং আকবর সাহেব শুনেও শুনলেন না।

অফিসটা খুবই গ্লুমি মনে হল। অফিসের ভিতরে বিহারীদের নানা ধরনের পেমেন্টের দাবীতে আগের মত ছোটাছুটি নেই। বেলায়েত সাহেব তার চেয়ারের ভিতর সেধিয়ে ক্রমাগত দাড়ির আগা চিবিয়ে যাচ্ছেন।স্টাফ ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট এলেন আমাদের অফিসে, বিস্মিত হয়ে বললেন– বাহ! আপনাদের অফিস দেখি একেবারে জমজমাট! আমাদের মিলতো অর্ধেক বন্ধ। গতকাল বিমান হামলায় নৌকা আর পাট গুদামে কয়েকজন মারা গেছে। এরপর কেউ থাকে? রাতেই শ্রমিকরা ভেগেছে। মহিউদ্দিন বলল, জিএমকে বলে আজ হাফ ডে ছুটি করিয়ে দিন না। দেশে চলে যাই। আমাদের এলাকা নিয়ে নানা উল্টাপাল্টা কথা শুনি। বৌ বাচ্চারা কেমন আছে, কোথায় আছে কে জানে। প্রেসিডেন্টবেলায়েত সাহেবের উদ্দেশ্যে হাঁক ছাড়েন, চলেন আমরা দুই প্রেসিডেন্ট-চেয়ারম্যান জিএম সাহেবের সাথে কথা বলে দেখি। তারপর গলা নামিয়ে মহিউদ্দিনকে বললেন দেখি কাল বিমান হামলার পর ব্যাটার 'এভরি থিং নরম্যাল' বুলি গেছে না আছে।

কিছুক্ষণ পর ওরা ফিরে এলেন। বললেন, কেল্লা ফতে, আজবারোটা পর্যন্ত অফিস, তারপর ছুটি। বেলায়েত সাহেব নিজের সীটে না যেয়ে আমার টেবিলের সামনে এসে বসলেন, বললেন মহিউদ্দিনকে একটু ডাকেন। সেদিন কিছু ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে, আসলে তো আমরা সবাই কলিগ, দীর্ঘদিন থেকে এক সাথে কাজ করছি, ভাল সম্পর্ক। মহিউদ্দিন আসতেই খপ করে তার হাত ধরে বসলেন।

মহিউদ্দিন সরল মানুষ, বন্ধু বৎসল। বেলায়েত সাহেবকে কিছুই বলতে হলনা। যা বলার মহিউদ্দিনই বললেন– না না বেলায়েত সাহেব, কিছুই মনে রাখিনি। ভুলে যান সব। আসলে আমরা–

কিছুক্ষণ মাথা হেট করে থেকে বেলায়েত সাহেব বললেন, বলেন তো আমাদের কি হবে ? এই যে ইয়াহিয়া খান আর তার সাঙ্গোপাঙ্গরা আমাদের এভাবে নাচালো, কত গালভরা বুলি, কত আস্ফালন, কোথায় গেল? তারা তো পালাবে। কিন্তু আমাদের অবস্থা কি হবে।

আমি বলতে চেয়েছিলাম, তা আপনারা নাচলেন কেন? যেখানে নাদান একটা বাচ্চাও বুঝতে পারে এ ধরনের যুদ্ধের ফল কি হয়, তবুও আপনারা ওদের কথায় নাচলেন। আপনাদের বুদ্ধি বিবেচনা কি সব হাঁটুর নিচে নেমে গিয়েছিল। বলা হলনা। ভব্যতায় বাধল। ভয়ও হল, স্বাধীনতা আসতে এখনো বাকি।

অফিস থেকে বেরতেই তীব্র কাঁপা কাঁপা শব্দে সাইরেন বেজে উঠল। আমরা অফিসের দেয়াল ঘেষে দাঁড়িয়ে পড়লাম। সামনে ট্রেঞ্চ কাটা ছিল কিন্তু তার ভিতর নামতে কারোর আগ্রহ দেখা গেলনা। দূর আকাশে দুটো বিমান ছন্দবদ্ধভাবে ডাইভ দিচ্ছে। হঠাৎ ট্যাট্যাট্যা করে গুলিবর্ষণ শুরু হল। সিকিউরিটি গার্ড ভয়ার্তভাবে চিৎকার করে উঠল- আন্দার আ যাইয়ে স্যার, জলদি আন্দার আ যাইয়ে, প্লেন সে গোলি হোতা হ্যায়। সিকিউরিটি অফিসার তাকে ধমক দিয়ে থামিয়ে দিলেন– আরে বেওকুফ, ইয়ে অ্যান্টি এয়ারক্রাফট গান কা গোলি। প্লেন বরাবর ফায়ার কিয়া যাতা হ্যায়, মাগার প্লেন মে হিট করনা বহোত ডিফিক্যাল্ট হ্যায়। একটু পরেই ফট ফট শব্দে নীল আকাশে পেঁজা তুলার মত সাদা ধোয়া ছড়িয়ে পড়ে ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল। সবার কাছে এটা ছিল নতুন অভিজ্ঞতা। সিকিউরিটি অফিসার বললেন এগুলো অ্যান্টি এয়ারক্রাফট গানের গুলি। প্লেনের বডিতে লাগার সাথে সাথে বার্স্ট করে প্লেন ধ্বংস করে দেয়। প্লেনে না লাগলে আপনা থেকেই আকাশে বার্স্ট করে। এখন সেটাই ঘটছে।

প্রশাসনিক কর্মকর্তা জিজ্ঞাসা করলেন, কোথা থেকে ছুড়ছে এগুলো।

হোগা গোয়ালপাড়া পাওয়ার স্টেশনছে। ফির চরেরহাট নেভাল বেজ্‌ছে ভি হো সাকতা।মাগার প্লেনমে লাগানা বহুত মুসিবত হ্যায়।

বিমান দুটো ধীরে ধীরে দিগন্তে মিলিয়ে গেল।

আমরা মিলের ছোট লঞ্চে নদী পার হলাম। ফারুক তাড়া দিল জলদি কিজিয়ে সাব, জুম্মাবার হ্যায়, মুঝে টাইমলি ওয়াপস আনা পড়েগা। আমরা হুড়মুড় করে গাড়িতে উঠে পড়লাম। স্টার্ট দেয়ার মুহূর্তে হঠাৎ কাঁপা কাঁপা ভয়ার্ত স্বরে আবার সাইরেন বেজে উঠল। ফারুক ভ্রুক্ষেপ করেনা। কিন্তু দারোয়ান ভারি লোহার গেট আটকে গাড়ির পথ রোধ করে দাঁড়ায়, বলে কা হুয়া ফারুক, কালা হো গিয়া কেয়া, সাইরেন শুনা নেহী? যা, গড়ি সাইড কর্। তারপর আমাদের দিকে ফিরে বলে, স্যার আপলোগ চাহেতো ড্রেনমে যা সাকতে হে, নোহি তো শেড মে চলা যাইয়ে জলদি।

মানুষপ্রমাণ গভীর পাকা ড্রেন, উপরে কংক্রিটের ঢালাই। দুর্ভেদ্য। মাঝে একটা স্লাবআলগা করা আছে, সেখানে ছোট লোহার মই নামানো।ভাল একটা শেলটার। একমাত্র অসুবিধা ড্রেনের তলায় সর্বক্ষণ ঝির ঝির করে সরু পানির ধারা বইছে, অসতর্ক হলে জুতা প্যান্ট ভিজে যাওয়ার আশংকা। অনেকেইছুটে ঝপাঝপ ড্রেনের মধ্যে ঢুকে গেল, আমরা দেয়ালের পাশে শেডের নিচে আশ্রয় নিলাম। জায়গাটা কতখানি নিরাপদ নিশ্চিত হতে না পেরে একজন অফিসার দ্রুত ছুটে জেটিতে অবস্থানরত ভারি ক্রেনের বক্সে যেয়ে আশ্রয় নিলেন। পৌঢ়

দারোয়ান, সম্ভবত এক্স আর্মিম্যান, চিৎকার করে বলল– স্যার, বোমা পড়লে আগে ক্রেনের উপরই পড়বে, আকাশ থেকে ওটাকে নিশ্চয় কামানের মতো দেখায়। তিনি আরো দ্রুত ছুটে বেরিয়ে এলেন এবং নিরাপদ ড্রেনের ভিতর অদৃশ্য হলেন।

থেকে থেকে দূরাগত কামানের গোলার শব্দ আমাদের জানান দিত যে আমরা যুদ্ধের মধ্যে আছি। শব্দের ফ্রিকোয়েন্সি ও স্বরগ্রাম ক্রমেই বাড়ছিল এবং আমাদের বুকের উপর ভার হয়ে চেপে বসছিল, যদিও গোলাগুলির শব্দ ছাড়া আমরা যুদ্ধের তাপ কখনও অনুভব করিনি। প্রত্যক্ষ যুদ্ধ দেখলাম বিমান যুদ্ধ শুরু হবার পর। এটা ৬ ডিসেম্বর শুরু হয়েছিল। সাইরেনের ভয় ধরানো কাঁপা কাঁপা শব্দে আমরা তখন ভীতচকিত হয়ে এদিক ওদিক ছোটাছুটি শুরু করতাম। পরে সবাই বুঝে গেল এটা ট্রেঞ্চ বা ঘরের মধ্যে না ঢুকে ছাদে এবং উঠানে দাঁড়িয়ে উপভোগ করার মতই যুদ্ধ- নিতান্তই একতরফা। তবে আজ ছোটাছুটি করার কারণ সম্ভবত গতকালের বিমান হামলায় কিছু লোকের মৃত্যুর প্রভাব।

আমরা শেডের নিচে দাঁড়িয়ে ছিলাম। আমাদের সাথে বিহার ও ইউপির বেশ কিছু স্টাফ অফিসারও ছিল। কেউ স্বাক্ষ্য দেবে নাযে তারা ছোটাছুটিতে বাঙালিদের থেকে পিছিয়েছিল। আমরা দুবার দূরে পূবের আকাশে পরপর দুটো বিমানকে একই সমান্তরালে উড়ে যেতে দেখেছি। ডগফাইটের জন্য কোন বিমান আসেনি, গোলাগুলি হয়নি, বোমাও পড়েনি। আমরা তখন নিরাপত্তার স্বাদ অনুভব করছি, ইউপির এক অফিসার এতক্ষণে আমাদের বোকামো, তার চেয়েও বেশী ইমানের কমজোর নিয়ে কটাক্ষ শুরু করল–'আপকো ক্যায়ছে মালুম, ইয়ে হিন্দুস্তানী প্লেন হ্যায়? হন্দুস্থানী প্লেন ক্যায়ছে হামারা মুলক কা এতনা আন্দার ঘুসেগা? আপলোগকা কিউ বিশওয়াস নেহী হোতা যে ইয়ে হামারা আপনা প্লেন হ্যায়?' সে কেন জানি ইউনুস সাহেবের মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্নগুলো করল। একটা জবাব দিতে হয়, ইউনুস সাহেব বললেন- 'আপ তো বিলকুল সহি বোলা ভাই, মগার হাম সামাঝতা নেহিইয়ে ওয়ার্নিং সাইরেন কিউ দিয়া!' আকরাম সাহেব দু-লাইন যোগ করলেন, 'হামারা প্লেন হামলোগকো ইয়ে দেখানে কি লিয়ে আয়া থা কি হাম হ্যায়, তোম ডর মৎ!' আমরা অতিকষ্টে হাসি সামলালাম। আমাদের হাসির সময় এখনো আসেনি, আমরা এখনও তাদের কব্জায়।

তখনো ক্লিয়ারেন্স সাইরেন হয়নি। শেডের তলায় আমরা অনেকেই দাঁড়িয়ে ছিলাম। এসব ক্ষেত্রে চেহারা ছাড়াও অবাঙ্গালীদের আলাদাভাবে চেনা যেত। তারা থাকতো উচ্চকিত, অমরা নিশ্চুপ। হাশেমি ছিল প্রডাকশন সুপারভাইজার,কলকাতার উদ্বাস্তু, বলল– আকবর সাহেব, শিখ পাইলটদের এফিসিয়েন্সি নিয়ে জোকগুলো কি আপনি জানেন, না শোনাব?

আকবর সাহেব অ্যাসিসট্যান্ট অ্যাকাউটেন্ট, তবে প্রায় ছ'মাস ধরে হিসাব বিভাগের চার্জে আছেন। নানা রকম পেমেন্টের আবদারে বাঙালি বিহারী সবাই তাকে খানিকটা সমীহ করে চলে। তার উপর কোন এক পাঠান পূর্ব পুরুষের কারণে তার আনুগত্য কখনো পাকিস্তান কখনো বাংলাদেশের দিকে ঝোঁলাঝুলি করে। এই মুহূর্তে ঝোঁকটাকোন দিকে বেশিবলা কঠিন। তবে অবাঙ্গালীরা তাকে নিজেদের লোক বলেই মনে করে। বললেন, শেডের তলায় দাঁড়িয়ে একতরফা গেম দেখার চেয়ে আপনার গল্প শোনা ভাল।

সিক্সটি ফাইভ কা ওয়ার মে দো হিন্দুস্থানি প্লেন সারগোদা এয়ারফিল্ড পর বহুত বোম্বিং কিয়া। মগার এয়ারফিল্ডকা কোই নোকসান নেহি হুয়া। অফিসার নে পুছা ইয়ে ক্যায়সে হো সাকতা? তোম কাঁহা বোম ফেঁকা?

টার্গেট বরাবর স্যার, শিখ পাইলট জবাব দিল, মুঝে কেয়া মালুম কিউ রানওয়ে পর হিট নেহি কিয়া। মেরা রিডিং ক্যালকুলেশন সব কুছ তো বরাবর থা।

তো ?

পাইলটকো আভি মালুম হুয়া কি উসকো কোই না কোই কংক্রিট রিজন দেখানে পড়েগা। সে বলা শুরু করল স্যার, হো সাকতা ব্যাকডেটেড প্লেন কা ফ্লাইট স্পীড শ্লো থা, টাইমলি টার্গেট মে পোঁহুছা নেহী, হো সাকতা ফোর্সফুল উইন্ড বোম্বকো পিছে উড়া লে গিয়া, হো সাকতা বোম্বকা আন্দার মাল-মেটিরিয়াল কুছ নেহি থা, হো সাকতা–

এই রুখ! অফিসার ধমকে উঠলেন, মুঝে লিখনে দে!–

হাসেমি নিজের রসিকতায় হো হো করে হেসে উঠল– উসকো টার্গেট প্রাকটিস এয়সাই হ্যায় কি মারতা এহা তো গিরতা দো'মাইল ফারাক, ড্রেনকা আন্দার যানা কেয়া জরুরত?

আকবর সাহেব বললেন, তা তো হল। কিন্তু ইন্ডিয়ান প্লেন তো আমাদের এই গুটি কয়েক গোবেচারা সার্ভিসহোল্ডারকে টার্গেট করবে না? টার্গেট করবে মাইল খানেক দূরের গোয়ালপাড়া পাওয়ার প্লান্টে। তাদের টার্গেট অ্যাকিউরেসি নিয়ে যা বললেন, তাতে ওখানে মারা বোম্বটা যদি এখানে পড়ে বার্স্ট করে, তখন?

ছোড়িয়ে আকবর সাব, আউর এক জোক শুনিয়ে। ইন্ডিয়ান অফিসারনে দো পাইলটকো জরুরী তলব কিয়া– তোমলোগকো লিয়ে এক ভেরি স্পেশাল মিশন হ্যায়, টপ সিক্রেট, সারগোদা এয়ার বেজমে বোম্বিং করনে পড়েগা। শুনো, এয়ছা মওকা দো'বার নেহি আতি। হামারা পাস পাক্কা ইনফরমেশন হ্যায়, কোই পাকিস্তানি ফাইটার তোমকো ইন্টারসেপ্ট নেহি করেগা, উসকা এন্টায়ার প্লেন গ্রাউন্ডেড হো গিয়া। যাও আভি ফ্লাই করো– জয়হিন্দ্। দেড়-দো ঘন্টে বাদ দোনো পাইলট ওয়াপাস আ গিয়া। অফিসারনে বহুত খোশ হুয়া আউর বোলা– হাম কাঁহাথা না কোই এনিমি প্লেন তোমকো ইন্টাসেপ্ট নেহি করেগা....।

উও তো বিলকুল সহি বাত থা স্যার। মগার হাম ওয়াপাস আয়া শ্রিফ আপছে দুসরা এক বাত পুঁছনে কি লিয়ে। স্যার আপ তো অ্যাকঅ্যাক গানাকা বারে মে কুচ বাতায়া নেহি। আট দশটো অ্যাকঅ্যাক গান এয়ারফিল্ড কাভার করকে র‍্যানডম গোলি চালানে লাগা। তো আভি কিয়া করু? এয়ারফিল্ডকা উপর যাউ স্যার?.....

কেন জানি আকাশে দীর্ঘ বৃত্ত একে প্লেন দুটো একের পর এক চক্কর দিয়ে যাচ্ছে। গাছপালার আড়ালে অদৃশ্য হওয়া মাত্রআশে পাশের বিহারীরা গিরাইস গিরাইস বলে চিৎকার করছিল। প্লেনের গায়ে আলো ছায়ার খেলা–উত্ত যো কালাওয়ালা প্লেন হ্যায় না উত্ত দুশমনকি প্লেন, আউর পিছে যো সাদাওয়ালা প্লেন উত্ত হামারা হ্যায়। দেখ্ দেখ্, হামারা প্লেন ক্যায়সে কালাওয়ালাকো ধাওয়া দেতা হ্যায়। তবে তারা বেশিক্ষণ কালো সাদার খেই ধরে রাখতে পারে না। গাছপালা মেঘ রোদ্দুরের লুকোচুরি খেলায় বিমানগুলো ক্ষণে ক্ষণে রং পাল্টায়। তাদের চিৎকারেকান ঝালাপালাহওয়ার যোগাড়। হাশেমি তাদের দিকে দৃষ্টি ফেরালো– আরে ভাই তোম সামাঝনে কি কোশেষ করো উও দোনো প্লেন হিন্দুস্তানি হ্যায়। হামারা প্লেন বহুত পহেলে ফিনিশ হো চুকা।

তারা অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে তাকায়, ভয়ার্ত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করে তব আভি হামারা কেয়া হোগা?

যো হোগা, হোগা! মনজুরে মত্তলা যো নসিবমে লিখ্খা হ্যায় ওহি হোগা! হামারা এন্টি এয়ারক্রাফট গান হায়, উও ভি দুশমনকি প্লেনকো মিট্টিমে ডাল দে সাকতা হ্যায়।

তো দেতা নেহি কিউ ?

আরে ভাই কোশেষ তো করতা হ্যায়, মাগার অ্যাক অ্যাক গানছে প্লেন গিরানা বহুত ডিফিক্যাল্ট হ্যায়।

আকবর সাহেব বললেন– কি ব্যাপার হাসেমি সাহেব!

হাশেমি হতাশভাবে বললেন ম্যায় তো সামাঝ লিয়া ম্যায় ধোকা খা গিয়া, মাগার ইয়ে লোগ কব সামঝে গা স্যার!

আমরা যখন অফিস থেকে বেরিয়ে আসি ভাবিনি পাকিস্তানে এটাই আমাদের শেষ অফিস। টানা সাইরেনের শব্দে আমরা ঝপাঝপ গাড়িতে উঠে বসলাম। ফারুক ঝড়ের বেগে গাড়ি ছুটিয়ে দিল। আমরা উষ্মা প্রকাশ করতে বলল, কুছ নেহি হোগা স্যার, আজ জুম্মাবার হ্যায় না! আমরা কাস্টমস্ অফিস ছাড়িয়ে কিছু দূর আসতেই আবার কাঁপা কাঁপা শব্দে সাইরেন বেজে উঠল। পথের পাশে এক ঝাকড়া বাদাম গাছের তলায় গাড়িটা রাখতে বলা হল। ফারুক বলল– ঘাবড়াতা কিউ স্যার, ইন্ডিয়ান প্লেন আজ পাঁচ দিন দফা সে দফা খুলনামে হামলা চালায়া হ্যায়। শুনা কাভি কোই সিভিলিয়নকা উপর বোম্বিং কিয়া?। আপ চিন্তা মৎ কিজিয়ে। সে ঝড়ের বেগে গাড়ি চালিয়ে জোড়াগেটে পৌছালো।

আমাদের হুশ হল, আমরা খুব খারাপ জায়গায় এসে পড়েছি। এখান থেকে দক্ষিণে ফেরিঘাট এবং উত্তরে শিরোমনি পর্যন্ত সামরিক এলাকা– মিত্রবাহিনীর অগ্রাভিযানের মুখে যশোর ক্যান্টমেন্ট ছেড়ে ক্রমাগত পিছু হটে আসা ব্রিগেডিয়ার হায়াতের অন্তিম ঘাঁটি। সন্দেহ নেই ভারতীয় বিমানের অতি পছন্দসই টার্গেট। পিছিয়ে আসার কারণে প্রতিটা সৈন্য যেন তেঁতে আছে, দাঁতমুখ খিচিয়ে একজন চিৎকার করে উঠল, হল্ট!

এবার আমরাই চাচ্ছিলাম ফাঁক গলে ফারুক যেন কোনভাবে গাড়িটা নিয়ে রেললাইন ক্রস করে ছিটকে বেরিয়ে যায়। কিন্তু পথ এবং ঘেসো মাটির উপর স্কিড করে গাড়িটা জলার পাড়ে শিরিষ গাছের নিচে দাঁড়িয়ে পড়ল। বিশ্রী গালিগালাজ করে আর্মিরা গাড়িটা ঘিরে ফেলল। ফারুক এবং আমাদের গাড়ি থেকে টেনে হিঁচড়ে নামিয়ে রাইফেলের নল দিয়ে গুতোতে গুতোতে বাংকারের ধারে নিয়ে গেল, চিৎকার করে বলল–উতরো শালে। একে একে ঝটপট করে ট্রেঞ্চের মধ্যে লাফিয়ে পড়ল সবাই। হঠাৎ ভিতরেচোখ গেল, সেখানেঅশুভ দর্শন দু জন খান সেনা। কেন জানি মনে হল এটাই আমার শেষ দিন, ট্রেঞ্চের ভিতর বোমা পড়ে ঐ খান সেনাদের সাথে আমার রক্ত মাংস মিশে একাকার হয়ে যাচ্ছে! গা গুলিয়ে উঠল। যে সৈন্যটা সবাইকে ট্রেঞ্চে নামাচ্ছিল তাকে বললাম–স্যার, হাম উধার যাতা হ্যায়। বলেই সামনের দিকে দৌড় দিলাম। আমার লক্ষ্য রেললাইন পার হয়ে লাইনসম্যানের লাল ইটের ছোট্ট যে ঘর, ওরই টিনশেড বারান্দা।

এক দৌড়ে ওপারে পৌঁছে গেলাম। এখানেও তিন-চারজন সৈন্য সাইরেনের শব্দে আশ্রয় নিয়েছে। তবে সিভিলিয়ান বেশী। একজন সৈন্য দু পা এগিয়ে এসে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে এক হ্যাঁচকা টানে আমাকে শেডের তলায় নিয়ে ফেলল। পিছনদিকে ইশারা করে বলল, দেখ শালে,

আভিতো গয়া থা! তাকিয়ে দেখি পিছনের সৈন্যটা দুচোখে খুনির দৃষ্টি নিয়ে আমার পিঠের দিকে রাইফেল তাক করে দাঁড়িয়ে আছে। শিউরে উঠলাম, এইমাত্র জীবন-মৃত্যুর অতি সূক্ষ্ম সুতাটা কিভাবে যেন পার হয়ে এসেছি।

আমরা পূব আকাশে দুটো বিমান দেখছিলাম, অনেকটা জায়গা নিয়ে চক্কর দিচ্ছে। আশে পাশে অ্যাক অ্যাক গানের গোলাও ফাটছে নিষ্ফলভাবে। এলাকাটা আর্মিদের। সম্ভবত সে কারণে সবাই আশ্চর্যরকম নিরব। এর মধ্যে একজন আর্মি মেজাজ ধরে রাখতে ব্যর্থ হল– 'শালে বাহিনচোত' বলে চিৎকার দিয়ে হাতের চাইনীজ রাইফেল উচিয়ে বহু দূরের বিমান দুটোর উদ্দেশ্যে পুরো ম্যাগাজিন খালি করে ফেলল। পাশ থেকে একজন সৈন্য খেকিয়ে উঠল–শালে নালায়েক, গোলি বন্দ কর! আভি তো সব কুছ তাবা হো যায়েগা। একটু আগেও বিমান দুটো দূর আকাশেদৃশ্যমান ছিল, মুহূর্তে গাছপালার আড়ালে উধাও হয়ে গেল।

আমরা আবার বিমান দুটোকে পূব আকাশে দেখতে পেলাম, দক্ষিণ দিক থেকে নিঃশব্দে ভেসে এসে আগের মতই ডাইভ দিয়ে একেবারেই উধাও হয়ে গেল। এবার যা ঘটল তা ছিল অচিন্তনীয়। আমরা একের পর এক গোলা ফাটার গগন বিদারী শব্দে হতভম্ভ হয়ে গেলাম, ঐ সাথে আকাশ জুড়ে আতস বাজীর মত ছোট বড় অসংখ্য জ্বলন্ত পিন্ডের ছোটাছুটি সবার মনে প্রচণ্ড ভয় ধরিয়ে দিল।

বিস্ময়ের ব্যাপার আর্মি ও বিহারীদের প্রতিক্রিয়া ছিল একেবারে উল্টো। তারা সবাইকে জড়িয়ে ধরে নাচানাচি শুরু করল এবং আমাদেরকে তাতে সামিল হওয়ার আহ্বান জানালো। তাদের সহজ হিসাব তাদের বাহাদূর গানার দোনো প্লেনকো গিরা দিয়া আউর উসমে যো গোলি বারুদ থা, উও সব ফাট রাহা হ্যায়। অতএব, তোমরা ফুর্তি করো, নাচো, গাও। আমাদের তলপেটে অস্বস্তি, ভেতরে কোথায় যেন যন্ত্রণা, তথাপি মুখে কাষ্ঠ হাসি ঝুলিয়ে বিদায় নিলাম এবং ঝপাঝপ গাড়িতে উঠে বসলাম।

আত্মঘাতী বিমান হামলাঃ রূপসায় ভয়াবহ গানবোট বিস্ফোরণ

আমরা এতদিন উত্তর থেকে কামানের গোলার আওয়াজ শুনে এসেছি। কিন্তু এখন পুব দিক থেকেও প্রচন্ড গুলিগোলা শুরু হয়েছে। ভয়ংকর সব বিচিত্র শব্দের মধ্যে গোলার গণগনে টুকরোগুলো একের পর এক শহরের উপর দিয়ে ছুটছে, অথচ আমরা সেদিকেই যাবো। আব্বাস হলে কিছুতেই আমাদের এগিয়ে দিত না, জোড়াগেট থেকেই ফিরে যেত। কিন্তু ফারুকের দায়িত্ববোধ প্রখর ছিল। গাড়িতে আমরা কেউই কথা বলছিলাম না, ভীত-সন্ত্রস্তভাবে জুবুথুবু হয়ে বসেছিলাম। ফেরিঘাটের বিহারী মহল্লায় বন্য উল্লাস চলছে। আজমল আগে থেকেই উসখুস করছিল, এখন মাজায় জোর পেল, বলল দেখলেন তো, আপনারা যা ভাবছেন তা হবে না, চাকা ঘুরে যাচ্ছে।

খন্দকার সাহেব কিছুদিন থেকে আমাদের সাথে যাচ্ছিলেন, তিনি পাকিস্তানপন্থী মানুষ, কিছুদিন আগে মিলের কোয়াটার ছেড়ে দিয়েছিলেন, ধমকে উঠলেন থামুন তো। দুটো শত্রু জাহাজ ধ্বংস করেছে আমাদের বিমান! জাহাজ দুটো এত ভিতরে এলো কিভাবে, সেটা আপনার বাহাদূর সৈন্যদের জিজ্ঞাসা করলে পারতেন!

আমরা যখন পঞ্চবিথীতে নামলাম তখনো সমানে আগুনের গোলা ছুটছে, বিক্ষিপ্ত ভাবে এখানে ওখানে পড়ছে। খন্দকার সাহেব বললেন কাল আমার জন্য অপেক্ষা করার দরকার নেই, আমি দেশের বাড়ি যাচ্ছি।আকবর সাহেব, ইউনুস সাহেবও বয়ড়ার মোড়ে নেমে যাওয়ার আগে একই কথা বলে গেছেন মনোয়ার সাহেব, কাল হাফ বেলা অফিস কোনভাবে চালিয়ে নিয়েন আরকি। আমাদের শেষ স্টপেজ শান্তিধামের মোড়। এ ওর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে বলল– স্যার, বেঁচেবত্তে থাকলে পরে দেখা হবে ইনশাআল্লাহ। বললাম ফারুক, আগামী কাল খালি খালি কষ্ট করার দরকার নেই।

সে বিষন্ন ভাবে বলল, ফি আমানিল্লা স্যার। তারপর একটু থেমে বলল– 'হামারা বিবি বাল বাচচাকে লিয়ে থোড়া দোয়া কিজিয়ে স্যার।' তার গলা ভারী হয়ে এলো।

শহর ছিল জনশূন্য। রাস্তাঘাট শুনশান। একটা রিকশাও নেই। মানুষ তো দূরের কথা, একটা সারমেয় পর্যন্ত রাস্তায় দৃশ্যমান নয়। আমরা যে যার বাড়ির দিকে রওনা দিলাম। দ্রুত খানজাহান আলী রোড ছেড়ে মৌলভী পাড়া লেনের মধ্যে ঢুকলাম। এই পথটা অপেক্ষাকৃত নিরাপদ। গোলার টুকরোগুলো উত্তর দক্ষিণে বিস্তৃত গলিতে সরাসরি আঘাত হানতে সমর্থ ছিল না, কেননা সেগুলো পূব দিক থেকে পশ্চিমে ছুটছিল। তবু পদে পদে বিপদ। আমার খুব কাছেই নারকেল গাছে কিছু একটা পড়ে খানিকটা বাকল থেতলে দিয়ে গেল। আমি পথের পূব ধারের বাড়ির আড়াল নিয়ে চলতে থাকলাম। মনে হল কোন একটা বাড়িতে ঢুকে পড়তে পারলে ভালো হত। কিন্তু সব বাড়ির দরজা জানালা বন্ধ, ভেতরে প্রাণের চিহ্ন আছে বলে মনে হয় না। আমি বিড় বিড় করে দোয়া দরুদ পড়তে পড়তে জোর পায়ে হেঁটে কখনো দৌড়ে এক সময় বাড়িতে পৌঁছে গেলাম।

মা আমাকে দেখে চোখ মোটা মোটা করে পায়ের উপর ভর হারিয়ে ধপ করে তক্তপোষের কোণায় বসে পড়লেন– তুই বাবা এত গোলাগুলির মধ্যে এলি!

জীবনের ভয় কেটে গেছে, এখন বিমান দুটোর ভাগ্য নিয়ে দুঃশ্চিন্তা আমাকে তাড়িত করা শুরু করল। আনোয়ার কিছু দিন আগে বিমান বাহিনী থেকে রিজাইন দিয়ে করাচি থেকে বাড়ি চলে এসেছিল। ভেবেছিলাম গোলাগুলির উৎস সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞাসা করব। উল্টে সেই আমাকে প্রশ্ন করে বসল কি ঘটছে সে সম্পর্কে কিছু জানি কিনা। আর্মিরা যা বলেছিল তাই বললাম, ওরা বিমান দুটো গুলি করে ফেলে দিয়েছে, তারই গোলাগুলি ফাটছে।

বাজে কথা, বিমানে ভারি বোমা ও মেশিনগান থাকে। এত বিচিত্র গোলাগুলি থাকেনা। মনে হচ্ছে যেন মর্টার শেল, রকেট লাঞ্চারের গোলা, গ্রেনেড, রাইফেল, মেশিনগানের গুলি সব একসাথে ফাটছে। কোন আর্মস ডিপোতে বিস্ফোরণ ঘটলে এমন হতে পারে।

এর সাথে কি বিমানও ধ্বংস হতে পারে?

পারে, যদি ডাইভ দিয়ে বোমা মেরে উঠে যাওয়ার আগেই বিস্ফোরিত বোমার স্প্লিন্টার বিমানে আঘাত করে বসে। তবে চিন্তা নেই, এখানে তা হয় নি। সেটা হলে ভয়াবহ আগুন আর বিস্ফোরণের শব্দ শুনতে পেতে।

আমি চুপ করে গেলাম। বিমান দুটোকে উঠতে দেখিনি, খেয়াল করেও দেখতে পাইনি। তারপরই তো আচমকা আকাশ জুড়ে বিস্ফোরণ। বুকটা হঠাৎ কিসে জানি খামচে ধরল।

প্রকৃত ঘটনা জানতে পারি স্বাধীনতার পর। বাংলাদেশের ভাগ্যাহত দুটো নেভী গানশিপ বিস্ফোরণের ঘটনা ছিল এটা। ভারতীয় যুদ্ধ জাহাজ 'পানভেলের' নেতৃত্বে ভারতের চিত্রাঙ্গদা এবং বাংলাদেশের পদ্মা ও পলাশ মংলা বন্দর দখলের জন্য হিঙ্গলগঞ্জ ছেড়ে আসে। তাদের দায়িত্ব ছিল মংলা বন্দর দখল করে সমুদ্র পথে পাকিস্তানি সৈন্যদের পালানোর পথ রুদ্ধ করা। নৌবহরটি দশ ডিসেম্বর মংলায় পৌঁছে যায়।তবে তার আগেই মংলায় পাকিস্তানি অবস্থান ভেঙ্গে পড়েছিল। পাকিস্তানি নৌঘাটি-পিএনএস তিতুমীরের অবস্থান ছিল খুলনার চরেরহাটে,কমান্ডিং অফিসার ছিলেন গুলজেরিন খান। অতি নিষ্ঠুর ও দুশ্চরিত্র এই অফিসার বাঙালিদের প্রতিশোধের ভয়ে অস্থির ছিলেন। ৬ ডিসেম্বর মার্কিন নৌবহর ইউএস এন্টারপ্রাইজের জন্য মংলা বন্দরের মুখ উন্মুক্ত রাখার অজুহাত দেখিয়েগানবোট নিয়ে হিরন পয়েন্টের উদ্দেশ্যে রওনা দেন এবং সেখান থেকে সমুদ্র পথে শ্রীলংকায় পালিয়ে যান। তার পলায়নের সংবাদ প্রকাশ হয়ে পড়লে মংলা বন্দরে পাকিস্তানি অবস্থান ভেঙ্গে পড়ে এবং সৈন্যরা ছত্রভঙ্গ হয়ে খুলনায় পালিয়ে যায়।

এভাবে মংলা বন্দর অনায়াসে কব্জায় এসে যাওয়ার মিত্রবাহিনীর নৌবহরটি কর্তৃপক্ষের আদেশ মত মংলায় অপেক্ষা না করে তিতুমীর নৌঘাঁটি ও খুলনা শহর দখলের উচ্চাভিলাসী পরিকল্পনা নিয়ে খুলনার উদ্দেশ্যে অগ্রসর হয়। তারা চিত্রাঙ্গদাকে চালনায় নদীপথের পাহারায় রেখে খুলনা শিপইয়ার্ড অতিক্রম করে আসে। সম্ভবত এটা ছিল তাদের নিজস্ব ও তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত। তারা ব্রিগেডিয়ার হায়াতের খুলনায় নতুন করে গড়ে তোলা শক্ত ঘাঁটি সম্পর্কে ওয়াকেফহাল ছিলেন বলে মনে হয় না। খুলনায় ভারতীয় বিমানের ক্রমাগত অভিযানকেও তারা আমলে নেননি। ফলে সমন্বয়হীনতার কারণে এই অভিযান একটি দুর্ভাগ্যজনক অভিযানে পর্যবসিত হয়।

রূপসা ও ভৈরবের নৌপথ পাহারার জন্য ব্রিগেডিয়ার হায়াত শহরের দিকে বিহারী অধ্যুষিত শক্তিশালী আল-শামস্ বাহিনীকে মোতায়েন করেন। এরা ব্রিগেডিয়ার হায়াতের নিয়ন্ত্রণে ছিল। নদীর ওপারে মোতায়েন করা হয়কুখ্যাত 'রাজাকার মেজর' রজব আলী ফকিরের অনুগত রাজাকার বাহিনীকে। ১০ ডিসেম্বর ভারতীয় বিমান রোজকার মত খুলনার আকাশে অভিযান চালায়। নদীতে অগ্রসরমান গানবোট দেখে তারা এগুলো পাকিস্তানি গানবোট বলেই ধরে নেয়। কেননা ১০ ডিসেম্বর খুলনার এত কাছে নিজেদের গানবোটেরউপস্থিতিরকথা তাদের ধারণায় আসেনি। বিমান থেকো গানবোটগুলোর উপর বোমা বর্ষণ করা হয়। নৌ বহরের কমান্ডে ছিলেন ক্যাপ্টেন সামন্ত। প্রথমে ধারণা করা হয় আক্রমণকারী বিমানগুলো পাকিস্তানি বিমান। পদ্মা ও পলাশ থেকে বিমানগুলোর উদ্দেশ্যে গুলি বর্ষণের অনুমতি চাওয়া হয়। কিন্তু ক্যাপ্টেন সামন্ত জানতেন যে ৬ ডিসেম্বর থেকে পাকিস্তানি বিমান সম্পূর্ণভাবে গ্রাউন্ডেড্ হয়ে গেছে। এগুলো ভারতীয় বিমান হওয়াই সম্ভব। ফলে সেমসাইড হওয়ার আশঙ্কায় তিনি পদ্মা ও পলাশকে গুলি ছুড়তে নিষেধ করে সবাইকে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মরক্ষা করার নির্দেশ দেন। জাহাজ দুটি ইতোমধ্যে আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছিল।

তিনি দ্রুত জাহাজ ঘুরিয়ে পশ্চাদপসরণ করেন। কিন্তু পলাশের অর্টিফিশার রুহুল আমিন দায়িত্ববোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত জাহাজ ত্যাগ করেন নি। তিনি গুলি ছোড়া অব্যাহত রাখেন। ইতোমধ্যে বোমার আঘাতে জাহাজে আগুন ধরে গেলে একের পর এক গোলাবারুদ বিস্ফোরিত হতে থাকে। রুহুল আমিন মারাত্মক আহত অবস্থায় নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়েন। তাদের দুর্ভাগ্য তিনি এবং নৌসেনা মহিবুল্লাহ সাঁতরে রূপসার পূব তীরে ওঠেন। তখন ঘোষিত যুদ্ধকাল, কিন্তু বেহেড রাজাকাররা যুদ্ধনীতির ধার ধারেনি। তারা আহত মুক্তিযোদ্ধাদের প্রচণ্ড আক্রোশে নির্মমভাবে বেওনেট দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে হত্যা করে। তাদের উভয়ের মরদেহ রূপসার পূব তীরে সমাধীস্ত আছে। যুদ্ধে

প্রকৃত নৌ সেনার মত সাহসীকতা দেখানোর জন্য আর্টিফিশার রুহুল আমিনকে বীরশ্রেষ্ঠ খেতাবে ভূষিত করা হয়। পলাশের ক্যাপ্টেন সেনসহ কয়েকজন নৌ সেনা পশ্চিম তীরে উঠে আল শামস বাহিনীর হাতে ধরা পড়েন। তারা প্রত্যক্ষভাবে আর্মি নিয়ন্ত্রণে ছিল। তারা ধৃতদের স্পটে হত্যা না করে যুদ্ধবন্দী হিসাবে খুলনা জেলে পাঠিয়ে দেয়। স্বাধীনতার পর তারা সসম্মানে মুক্ত হন।

সারেন্ডার

মূল শহরের একেবারে কোল ঘেষে মিয়াপাড়া। তখন না শহর না গ্রাম। পাকারাস্ড়া বিদ্যুৎ বাতি যেমন আছে, কাঁচা ঘর, ছোট ছোট মাঠ, ঝোপ ঝাড়ে ভরা বাগানও তেমন আছে। আমাদের বাড়িতে এসে হঠাৎ করে শেষ হয়ে গেছে লোকালয়। তারপর বিল। দক্ষিণে যতদূর দৃষ্টি যায়, একটানা বিল।বিলে এবার ধান চাষ হয়নি। হওয়ার উপায় ছিল না। হিন্দুরা প্রাণভরে দেশ ছেড়েছে। মুসলমান চাষীর সংখ্যাও বেশী। তাদের ভয়ও বেশী। পাকিস্ড়ানী ইসলামের খগড় হিন্দু মুসলমান বাছবিচার করেনা। বিলে তাই সবুজ ধানের সমারোহ নেই। আছে পানি। কচুরা পানি ও জলজ আগাছায় ঝোপ ঝাড় হরিণটানা খাল বেয়ে আসা জোয়ারের টাইটুম্বুর হয়ে আছে বিল। তার উপর মৃদু বাতাস ও খেলা। এ দৃশ্য এখন আর দেখা যায় না। সকালে দেয়া ইউনুস পড়তে পড়তে অফিসে যাই। সন্ধ্যায় ফিরি। অবশিষ্ট সময় স্বল্পালোকিত গৃহকোণে সময় কাটে স্বেচ্ছা বান্দীর মত হয়ে থাকা। প্রতি মুহূর্তের শঙ্কা, এই বুঝি রাজাকার পাকিস্ড়ানী হায়েনারা হামলে পড়ে।

এরকম দীর্ঘদিন আগে কখনো আসেনি। শুধু এক দিন নয়, দিনের পর দিন। একদন্ড সন্ড়ি নেই। সময় কাটে উৎকণ্ঠের মধ্যে হয়তো কখনো বেশী, কখনো কম। এখন আবার মাঝে মাঝে পথের উপর ভারী বুটের শব্দ শোনা যায়। কদম মিলিয়ে একলয়ে হেঁটে যাচ্ছে কয়েক জোড়া বুট। দেখার হয় না প্রয়োজন। সাহসও হয় না। শব্দের আগে আগে বন্ধ হয়ে যায়। বুটের শব্দের ধরণ বলে দেয় ওরা কারা , দরজা জানালা দোকানের ধরে বোজে ঝাপ নিঃশব্দে বন্ধ হয়ে যায়। জানালার ফাঁক গলে তাকারো সে সাহসও নেই। কি জানি, এতটুকু ভুলের কারণে যদি মৃত্যুবান ছুটে আসে। বুটের শব্দগুলো তাই অশরীরীই থেকে যায়।

তবু কেউ না কেউ দেখে। কানাকানি হয়। খাকি এবং কালো পোশাক পরা আর্মি, মিলিশিয়া এবং রাজাকাররা টহল দিয়ে বেড়ায়। চারদিকে গুজব, কারা যেন গভীর রাতে ডিঙ্গি নৌকায় বিলভেঙ্গে এপারে ডাঙ্গায় নামে। রাত বিরাতে নেমেছে। ঘোরাঘুরি করে কৌতুহল হয়, কারা নামতে পারে, কোথায় নামতে পারে, সত্যি কি বিচ্ছুরা ঢুকেছে! কে জবাব দেবে? পা পা করে বিল পাড়ে এগিয়ে যাই। আমাদের ভিটের প্রান্ড় ওটা। অপরাহ্নের ম্রিয়মান রোদে বিলের পানি মেঘলা হয়ে আছে। নিস্ড়রঙ্গ ডিঙ্গি ডোঙ্গাও কিছুই নেই। ধীরে ধীরে গা ভার হয়ে আসে। জলীয় বাতাসে কিছূক্ষণ দাড়িয়ে থাকলে এমন হয়। কিন্তু আরো যে কারণ থাকতে সহসা মনে হয় নি। বাম দিকে চোখ পড়তেই স্থানুষৎ হয়ে যাই। মিয়াপাড়ার রাস্ড়াটা পূর্বদক্ষিণে বাঁক নিয়ে কবেয় বাজারের দিকে চলে গেছে ওটা এখন পাইনের মোড়। বাকের ঐবাক রেখেকয়েক কদম এগিয়ে ডাইনে সর" গলিলাউ ডোগার মত লকলক করে বেড়ে উঠছে। কিন্তু ২৬শে মার্চ থেকে থম্‌কে আছে।

আমাদের ভিটে থেকে বড়জোর একশ গজ হবে। ওরই দোতলার গরাদ কপাটহীন জানালায় যমের মত দাড়িয়ে আছে একজন সৈন্য। চোখে ক্রুদ্ধ দৃষ্টি। ততোধিক ক্রুদ্ধ রাইফেলের নল এ দিকে তাক্‌করা। বাড়ির এত কাছে আর্মি পোস্ট ভাবতেই পারিনি।

ঘাড়ের কাছ টার কাছে শিরশির করে ওঠে। সামান্যতম ভুল করার সুযোগ নেই। ফিরে আসার পথে প্রতিমুহূর্তে পিঠে গুলিবদ্ধ হওয়ার আশাংকা বুকের ভিতরটা কুরে কুরে খায়। কিন্তু কিছুই হয় না। হাপ ছেড়ে বাচি। সে শুধু কয়েক মুহূর্তের জন্য বিপদ আসে অন্য দিক থেকে। বাড়িতে ঢোকার পর পরই রাজপথ থেকে ভারী বুটের শব্দ আমাদের ভিটের উপর নেমে আসে। আশেপাশের বাড়ি ঘরের দরজা জানালা ঝপাঝপ বন্ধ হয়ে যায়। নিজেকে খুবই নিঃসঙ্গ লাগে। বোনেরা ভিতরে কোরআন শরীফ বুকে জড়িয়ে তরথর করে কাপতে থাকে। মা শার্টের হাতা খামচে ধরেন। ধীরে ধীরে হাত ছাড়িয়ে বাইরে আসি। দোর গোড়ায় তিনজন অবৈর্ধ আর্মি এবং রাজাকার। আকস্মিৎ নিজেকে নির্ভার মনে হয়।রাজাকারটা খেকিয়ে ওঠে, বিল কানায় কে গেছিল? তার সাথে কথা বলার প্রবৃত্তি হয় না, অর্থও নেই। আর্মিরাও তাকে ধর্তব্যে নেয় না। অপেক্ষাকৃত বয়স্ক আর্মিটাকে বিনীত ভাবে জানাই, 'ওখানে আমিই ছিলাম। কোন উদ্দেশ্য নয়, এমনি ঘুরছিলাম। উর্দু জবান শুনে ওরা অনেকটা আশ্বস্ড় হয়। ঘোলাটে চোখ নরম হয়ে আসে। তবু আর্মিরা গম্ভির ভাবে বলে 'ডান্ডি কার্ড লাও'। অফিসের আইডেনটিটি কার্ডটা এনে বাড়িয়ে ধরি। উল্টে পাল্টে দেখে সন্তুষ্ট হয়। শুধায় তোমহারা ঘর মে মুক্তি আতা হ্যায়, জ্বি নেহী। কই কিসতি হইয়া দেখা জ্বি নেহি। ঠিকছে বাতানা হ্যায়। সাছা পাকিস্ড়ানী হু ম্যায় কালকাত্তা কা বাহনে ওয়ালা যা বাসিরহাটকে কলকাতা বানিয়ে দেই। তবু সতর্ক করতে ছাড়েনা। ঠিক হ্যায়, ইস্ টাইম ছোড় দেতা। মাগার ইধার উঠার ঘুমনা নেহি। বেশী সময় লাগে না। দিনে দিনে সুস্পষ্ট হয় পট পরিবর্তন আসন্ন। বিচ্ছুরা কাজ প্রায় এগিয়ে এনেছে। দার"ন একটা ডিসেম্বর আসে। পতীক্ষার পালা শেষ হয়। সবাই আবার যেন বাঁচার অর্থ খুঁজে পায়। অবশ্য তখনও পুরোদমে যুদ্ধ চলেছে। তবে কেউ আর সাইরেনের কাঁপা কাঁপা শব্দে গর্তে লুকায় না। খোলা মাঠে, ছাদে দাড়িয়ে বিমান যুদ্ধ দেখে। আমিও দেখি। তার চেয়ে বেশী ভাবি, কিভাবে বেঁচে ছিলাম। একদিন হঠাৎ দক্ষিণের অসমাপ্ত বাড়িটার সেই গবাদ

কর্পাটহীন খোলা জানালায় চোখ আটকে যায়। একটা আর্মির ভগ্ন প্রায় কাটামো স্টিল ছবির মত ঝুলে আছে। রাইফেলের নল নিচের মেঝের উপর ঝুকানে। কুদোর উপর বিল রেখাময় শিথিল হাত। অবসন্ন বিষন্ন দৃষ্টিতে মিত্র বাহিনীর একতরফা বিমানযুদ্ধ দেখছে।

তমিজউদ্দিন মওলবী

চৌগাছার সীমান্ড়গ্রাম তমিজউদ্দিন মৌলবী ভগ্যানেশনে এখানে এসেছিলেন। সেই এই সালে। ভাষা আন্দোলনের বছর কিন্তু এই আজ গ্রামে তার কোন তাপ উত্তাপ লাগেনি। ধারে কাছে স্কুল ছিল না। শীঘ্রই দোচালা একটি মসজিদ কাম মক্তব প্রতিষ্ঠত হল। গ্রামের মানুষ এই প্রথম বাড়ির পাশে পাঁচ ওয়াক্ত আজানের ধ্বনি শুনে পুলোকিত হল। বছর খানেক পর গ্রামের কুবারা পুলকিত হলতাদের সমবয়সী মৌলবীর স্ত্রীকে দেখে। নোয়াখালি থেকে তার খালাতো বোনকে বিয়ে করে এনেছিল, খুবই সুন্দরী। তাদের আকর্ষনের আরো কারণ ছিল। কৈশরের চাপল্যে সে বিশেষ রাখ ঢাক করে চলতো না এবং তার কথা যার একবর্ণও কেউ বুঝতো না। তমিজউদ্দিনের জন্য এটা ছিল খুবই মনঃকষ্ঠের। ফলে সে গ্রামের মুর"ব্বি জসীম আলীর স্মরণাপন্ন হল। এবং একদিন অপরাহ্নে শীঘ্রই জসীম আলীর নিকালো উঠানে খেজুর পাতার চাটাইএ বসে সুলোলিত কণ্ঠে সমবেত গ্রামবাসীর উদ্দেশ্যে পাঠ করল এবং তার অর্থ ও শালে নজুল ব্যাখ্যা করল, একদিন এক সাহসী হজাতের ঘরে বিবি আয়েশাকে দেখে বললেন, ইয়া রাসুল আপনার ওফাতের পর আমি তাকে সাদী করব, কেননা এই সুন্দরী বালিকার বৈধব্য আমার সহ্য হবে না। রাসুল মনঃকষ্ট পেলেন এবং তখন এই ওহি নাজিল হল, হে রাসুল আপনি জানিয়ে দিন নবীগনের স্ত্রী অন্য কাহারো জন্য হালাল নহে। হাজেরানে মজলিশ আপনারা জানেন পৃথিবীতে নবী আলাহ পাকের প্রতিনিধি,এবং মসজিদের ইমাম গনও তাদের জামানার রাসুলের প্রতিনিধি করেন।

তমিজউদ্দিন মৌরবীর ব্যাখ্যা কতটা সঠিক তা বিচার করার সামর্থ বৃদ্ধ জসীম আলীরও ছিল না। তিনি অভিভূক্ত হলেন এবং গটগট করে হেটে যেয়ে তার নীতির ঘাড় ধরে টেনে তুললেন, হারামজাদা আমি তোকে ঐ বাড়ির পাশে ঘুর ঘুর করতে দেখেছি। আর যদি দেখি থড়ম পেটা করে ছাড়বো।

অতঃপর তমিজউদ্দিন মৌলবী প্রায় নিরবিচ্ছিন্ন শান্ড়ি ও স্মৃদ্ধিতে সংসার করছেন। দু মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন, ছোট মেয়ের বিয়েও ঠিকঠাক। মুশকিল বাধিয়েছে একাত্তরের গন্ডগোল। হবু জামাই জ্বিহাদে গেছে। তিনি তাকে বলেছিলেন আওলাদে রাসুল হয়রত কাশেমও তো কারবালার জ্বেহাদের আগে সকিনা বিবিকে শাদি করেছিলেন। কিন্তু মাদরাসা পড়ুয়া ছেলে।

যত মুক্তিযোদ্ধারা ধরা খেয়েছে অধিকাংশ ক্ষেত্রে কারণ একটাই তারা মার সাথে দেখা করতে গিয়েছিল।

আফজাল

আফজাল কে ধরে নিয়ে এলো। পিছ মোড়া করে হাত বাধা বাধন খুলে ধাক্কামেরে তাকে প্রায় অন্ধকার ঘরে ঠেলে দেয়া হল। আরো কয়েকজন আনা হয়েছে। প্রত্যেকে হতবাক চোখে মুখে অনিশ্চায়তা। আফজালের এক চিলতে বিষন্ন হাসে উপহার দিয়ে এককোনে বসে হাত ভালতে লাগল। আফজাল তার টিপিক্যাল বিষন্ন হাসি ও সকলের প্রতি বোকারমত একটা ভালবাসার জন্য প্রিয় পাত্র ছিল। বিশাল দশাসই শরীর রাগঝাল ছিল না। পাড়ার উক্তি বয়সের মেয়েরা ক্ষেপাত বেনী টেনে দেখা। আহত শিভালরী নিয়ে পাড়ারই এক ছেলে আফজালের পেটে ঘুনি- চোয়াল পর্যন্ড় পৌছানের ক্ষমতা তার ছিল। তাকে ছুড়ে ফেলে দেওয়ার ক্ষমতা ছিল। কিন্তু হাতটা ধরে বিনা কারণে মারে।

হাত ভলা শেষ হলে আমাদের দিকে তার চোখ পড়ে। তোরাও এসে গেছিস, ঘারন্ড্রসনে দেখবি ঠিকই ছাড়া পেয়ে যাব সবাই- অন্যগত করিনি। আমি দুদিন থেকে আছি আশা ভুলে গেছি। জানি অন্ড্রহীন- অসম্ভাব। তবু যেন এক ঝলক আশার আলো দেখি। একপলক ফুপিয়ে কান্না থামিয়ে কেউ কেউ তাকায় আফজালের দিকে। একজন জায়গা তেকে উঠে আসে, বাইরে শুনেছেন কিছু- সত্যি আমাদের ছেড়ে দেবে। আরে দেবে নাতো কি আলাহরে ডাকেন, সুরা ইউনুস পড়েন- দেখবেন বালামুছিবত দূর হয়ে গেছে। আফজাল নিজেই অনুচ্চ স্বরে পড়তে থাকেন মিনাজ জলেমিন।

খাবার দাবার কখন। দেয় একবার র"টি- বাইরে তালা খোলার শব্দে সবাই চুপ হয়ে যায়। র"টি আসার সময় অনেকে উদগ্রীব হয়। কিন্তু আফজালের ক্ষেত্রে বিষয়টা সতঃসারিত।

তার চোখে আফজালের উপর নিবদ্ধ হয়। ক্রমশয় সর" হয়। আবরি সুরা আফজালের জন্য কোন ভাল ভাগ্য আনতে পারে না। রাইফেলের কুদোর বাড়িতে হাত থেকে র"টি গুলো ছিটকে যায়- আচ্ছা তুম হামলোগকা জালেম সামাঝ লিয়া, ঠিক হ্যায় চলো ক্যাপ্টেন সাবকা পাস। উঠার সুয়োগ না দিয়ে তারা আফজালের বিশাল শরীলটা টেনে হিচরে বেরকরে নিয়ে যায়। পিছন ফিরে সেই একটু করে বিষন্ন হাসি উপহার দিয়ে চলে যায়। আমরা প্রতিক্ষায় থাকি। এই হয়তো ফিরে আসবে আফজাল- প্রতিক্ষার সেকেন্ডকে মনে হয় মিনিট। আফজাল ফেরে না ফিরে আসে এক ঝাক গুলির শব্দ।

অবরুদ্ধ বাংলাদেশে সর্বক্ষণ আতঙ্ক ও ক্লেশের মধ্যে আমাদের বসবাস। প্রার্থনা পাঠে রক্ষাকবচ সদা ব্যস্ত থাকে সবাই। শিশুরাও বাদ যায়না। সে সময়কার সদা পঠিত প্রার্থনা 'লা ইলাহা ইল্লা আন্তা ইন্নি কুন্তু মিনাজ জলেমিন' – জালেমদের হাত থেকে আমাদের রক্ষা কর প্রভু। তবে পড়তে হত নিরবে। উচ্চারণ অনেক ক্ষেত্রে ঘোর বিপদ ডেকে আনতো। সব আর্মি নিরেট ছিল না, কেউ কেউ অর্থ বুঝতো– শালে বহিনচোত্ তু মুঝে জালেম সামঝায়া। পাশাপাশি সবারই আক্ষেপ ছিল– ভারত কেন এখনো সৈন্য পাঠায় না, আমাদের উদ্ধারে কেন এগিয়ে আসেনা!

৩ ডিসেম্বর পাকিস্তান নির্বোধ খ্যাপাটের মত ভারতের উপর হামলে পড়ে। রাত ১২টার পর জাতির উদ্দেশ্যে বেতার ভাষণে ইন্দিরা গান্ধী বলেন 'বাংলাদেশের যুদ্ধ এখন ভারতের উপর যুদ্ধে পর্যবসিত হয়েছে। আমরা পাকিস্তানের এই নগ্ন হামলার সমুচিত জবাব দেব।'

প্রত্যক্ষদর্শী

১১ ডিসেম্বর শনিবার সূর্য তখন পশ্চিমে অনেকটা হেলে পড়েছে। দূরাগত গোলার শব্দ সত্ত্বেও দিনটা শান্তই বলতে হবে। আজ খুলনার আকাশ সীমায় কোন বিমান দেখা যায়নি। যদিও ভয় ধরানো কাঁপা কাঁপা স্বরে তিন দফা সাইরেনের শব্দ শোনা গেছে। বার। এতদিনের জীবমৃত প্রাণগুলি এখন আশায় উদ্বেল– বিশ্বাস করতে শুরু করেছে মুক্তির দিন সমাগত। তারপরও একএকটা দিনকে মনে হয় অসম্ভব দীর্ঘ। শঙ্কাও সহজে কাটেনা। নতুন নতুন উপসর্গ কাঁটার মত হৃৎপিণ্ডে বিধতে থাকে।

চীন-মার্কিন অশুভ আঁতাত এখনো হাল ছাড়েনি। তারা ইয়াহিয়ার দু কাঁধে মাথা রেখে ক্রমাগত শ্বাদন্ত দেখিয়ে যাচ্ছে। জোর গুজব উত্তর থেকে পীত এবং দক্ষিণ থেকে সাদারা আসছে যুদ্ধের গতি ঘুরিয়ে দিতে। আলামত দেখে আমাদের প্রাণ উড়ে যায়। যুদ্ধকবলিত পূর্ববঙ্গের গুটি কয়েক মার্কিন নাগরিককে সরিয়ে নিতে তারা এক আস্ত নৌবহর পাঠিয়েছে বঙ্গোপসাগরের প্রবেশমুখ মালাক্কা প্রণালীতে! আবার কিছুটা সুবাতাসও পাই সোভিয়েট নৌবহরের এগিয়ে আসার সংবাদে। পরাজয়ের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তারা এখন আমাদের আলোচনার টেবিলে নিতে চায়। গত এক সপ্তাহে তারা তিনবার নিরাপত্তা পরিষদে যুদ্ধ বিরতির প্রস্তাব তুলেছে। আমরা ভয়ে মরি। টেবিল টকে যে স্বাধীনতা আসে না তা পাগোলেও বোঝে। আবারও সোভিয়েট ভেটো আমাদের বঁচিয়েছে। কিন্তু তারা আর কতবার ভেটো দিতে পারবে! দিনে দিনে দুর্বল হয়ে পড়া আমাদের স্নায়ুতন্ত্রের উপর চাপ বেড়েই চলে।

এর মধ্যে এক সন্ধ্যায় হঠাৎ অবিশ্রান্ত গুলির শব্দ এবং জিন্দাবাদ ধ্বনিতে সবাই সচকিত হয়ে উঠে। কেউ কেউ এক খোলা ট্রাকে মিলিশিয়া ও রাজাকারদের উল্লাস করতে করতে মিয়াপাড়া দিয়ে বেনেখামারের দিকে যেতে দেখেছে। মসজিদের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েও পাশের বাড়ির চাচা ঘরে ফিরে এলেন। পাড়ার পাকিস্তানপন্থীদের উপর তার বিশেষ প্রভাব, তবু হয়তো ভাবলেন সাবধানের মার নেই। মগরেবের পর হঠাৎ তাদের বাড়িতে আমার ডাক পড়ল। ঘরে ঢুকে বিস্মিত হলাম। চেনা অচেনা লোকে ঘরভর্তী। সকালে দেখা চাচার মলিন মুখে নয়া দীপ্তি, বললেন– তুমি তো কিছুই বিশ্বাস কর না, এখন প্রত্যক্ষদর্শীর বয়ান শোনো। একজন ঢ্যাঙ্গা চোয়াড়ে লোক চেয়ার ঠেলে লাফিয়ে উঠল–কি, কি বিশ্বাস করেন না উনি? চাচা তাকে নিবৃত করলেন– আরে তুমি থামোতো, ও আমার ভাইপো।

আমি খুবই ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। তীরে এসে তরি ডুবুক আদৌ তা চাইনা। মুখে কাষ্ঠহাসি ঝুলিয়ে মাথা দুলিয়ে প্রত্যক্ষদর্শীর বয়ান শুনলাম। 'প্রত্যক্ষদর্শী' কেননা সে শুনেছে ট্রাকের উপর উল্লাসমত্ত মিলিশিয়াদের কাছ থেকে। দুটো আত্মঘাতী বিমান বোমাসহ বিক্রান্ত জাহাজের উপর আছড়ে পড়ে জাহাজটা তাবা করে দিয়েছে। আর ফুলতলায় পাকিস্তান আর্মি পিছিয়ে আসার ভান করে তিন হাজার ইন্ডিয়ান সৈন্যকে ট্রাপে ফেলে নিশ্চিহ্ন করেছে। বিশ্বাস হওয়ার নয়, তবু সংবাদ দুটো বুকে শেলের মত আঘাত হানলো। ভারতীয় বিমানবাহী জাহাজ বিক্রান্ত আমাদের দক্ষিণের জল সীমায় মোতায়েন ছিল। মূলত এই জাহাজ থেকেই শত্রুর ফর্মেশনগুলির উপর বিমান হামলা চালানো হত। ঘরে এসে রেডিওর উপর হুমড়ি খেয়ে পড়লাম। বিক্রান্তের খবর নেই। তবে বিবিসি নতুন করে বাঁচার প্রেরণা যোগালো ভিজাগাপত্তমের কাছে পাকিস্তানি সাবমেরিন 'গাজী' ভারতীয় নৌসেনাদের ডেপথ্ চার্জে সম্ভবত বিধ্বস্ত হয়েছে। এই সাবমেরিন নিয়ে পাকিস্তানিদের কত গর্ব, কত মিথ!

২. গাজি ছিল পাকিস্তানি সাবমেরিন। সাব মেরিনার ট্রেনিংয়ের জন্য আমেরিকা এটা পাকিস্তানকে দিয়েছিল। ১৯৬৫ সালে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধে ভারতের দ্বারকা বন্দর আক্রমণে পাকিস্তান সাবমেরিনটিকে ব্যবহার করে। অতঃপর পাকিস্তান স্বভাবসুলভভাবে এই সাবমেরিনটিকে ঘিরে একটা মিথ গড়ে তোলে যে সাবমেরিনটি অজেয়।

আশা নিরাশার মধ্যে দিনগুলো ইলাস্টিকের মত দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হচ্ছিল। ১১ ডিসেম্বর উত্তর আকাশে একটা বিমানের অবয়ব ধীরে ধীরে স্পষ্ট হল। পূব থেকে ধীরলয়ে ভেসে আসছে। খুলনার আকাশে একটা চক্কর দিয়ে কয়েক দফা আবিরের মত কি যেন ছড়িয়ে আবার ধীর লয়ে পূব আকাশে মিলিয়ে গেল।

একতরফা বিমান যুদ্ধ যা একদিন আমাদের চাঙ্গা করে রেখেছিল, তাও এখন বন্ধ। চার ডিসেম্বর যখন প্রথম বিমান আক্রমণ শুরু হয় সাইরেনের কাঁপা কাঁপা শব্দে পড়ি মরি করে আমরা ট্রেঞ্চ ঢুকেছি। দু এক দিন যেতে না যেতেই সবাই লোকচক্ষু এড়িয়ে বাড়ির উঠানে বা ছাদে দাঁড়িয়ে তাদের একতরফা ডাইভ, স্ট্রাপিং বোম্বিং দেখে আনন্দ পেতে থাকলো। কেউ আর ভারতীয় পাইলটদের নিয়ে পাকিস্তানিদের বানানো মিথ 'মারে ইধার তো গিরে উধার' জাতীয় মিথ আর বিশ্বাস করেনা। নিশ্চিন্তে মিত্র বাহিনীর একতরফা বিমানযুদ্ধ দেখতে থাকে। সেটা না থাকায় আমরা অনেকটা ম্রিয়মান।

অবরুদ্ধ বাংলাদেশে সর্বক্ষণ আতঙ্ক ও ক্লেশের মধ্যে আমাদের বসবাস। প্রার্থনা পাঠে রক্ষাকবচ সদা ব্যস্ত থাকে সবাই। শিশুরাও বাদ যায়না। সে সময়কার সদা পঠিত প্রার্থনা 'লা ইলাহা ইল্লা আন্তা ইন্নি কুন্তু মিনাজ জলেমিন' – জালেমদের হাত থেকে আমাদের রক্ষা কর প্রভু। তবে পড়তে হত নিরবে। উচ্চারণ অনেক ক্ষেত্রে ঘোর বিপদ ডেকে আনতো। সব আর্মি নিরেট ছিল না, কেউ কেউ অর্থ বুঝতো– শালে বহিনচোত্ তু মুঝে জালেম সামঝায়া। পাশাপাশি সবারই আক্ষেপ ছিল– ভারত কেন এখনো সৈন্য পাঠায় না, আমাদের উদ্ধারে কেন এগিয়ে আসেনা!

৩ ডিসেম্বর পাকিস্তান নির্বোধ খ্যাপাটের মত ভারতের উপর হামলে পড়ে। রাত ১২টার পর জাতির উদ্দেশ্যে বেতার ভাষণে ইন্দিরা গান্ধী বলেন 'বাংলাদেশের যুদ্ধ এখন ভারতের উপর যুদ্ধে পর্যবসিত হয়েছে। আমরা পাকিস্তানের এই নগ্ন হামলার সমুচিত জবাব দেব।'

১১ ডিসেম্বর শনিবার সূর্য তখন পশ্চিমে অনেকটা হেলে পড়েছে। দূরাগত গোলার শব্দ সত্ত্বেও দিনটা শান্তই বলতে হবে। আজ খুলনার আকাশ সীমায় কোন বিমান দেখা যায়নি। যদিও ভয় ধরানো কাঁপা কাঁপা স্বরে তিন দফা সাইরেনের শব্দ শোনা গেছে। বার। এতদিনের জীবমৃত প্রাণগুলি এখন আশায় উদ্বেল– বিশ্বাস করতে শুরু করেছে মুক্তির দিন সমাগত। তারপরও একএকটা দিনকে মনে হয় অসম্ভব দীর্ঘ। শঙ্কাও সহজে কাটেনা। নতুন নতুন উপসর্গ কাঁটার মত হৃৎপিণ্ডে বিধতে থাকে।

চীন-মার্কিন অশুভ আঁতাত এখনো হাল ছাড়েনি। তারা ইয়াহিয়ার দু কাঁধে মাথা রেখে ক্রমাগত শ্বাদন্ত দেখিয়ে যাচ্ছে। জোর গুজব উত্তর থেকে পীত এবং দক্ষিণ থেকে সাদারা আসছে যুদ্ধের গতি ঘুরিয়ে দিতে। আলামত দেখে আমাদের প্রাণ উড়ে যায়। যুদ্ধকবলিত পূর্ববঙ্গের গুটি কয়েক মার্কিন নাগরিককে সরিয়ে নিতে তারা এক আস্ত নৌবহর পাঠিয়েছে বঙ্গোপসাগরের প্রবেশমুখ মালাক্কা প্রণালীতে! আবার কিছুটা সুবাতাসও পাই সোভিয়েট নৌবহরের এগিয়ে আসার সংবাদে। পরাজয়ের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তারা এখন আমাদের আলোচনার টেবিলে নিতে চায়। গত এক সপ্তাহে তারা তিনবার নিরাপত্তা পরিষদে যুদ্ধ বিরতির প্রস্তাব তুলেছে। আমরা ভয়ে মরি। টেবিল টকে যে স্বাধীনতা আসে না তা পাগোলেও বোঝে। আবারও সোভিয়েট ভেটো আমাদের বঁচিয়েছে। কিন্তু তারা আর কতবার ভেটো দিতে পারবে! দিনে দিনে দুর্বল হয়ে পড়া আমাদের স্নায়ুতন্ত্রের উপর চাপ বেড়েই চলে।

এর মধ্যে এক সন্ধ্যায় হঠাৎ অবিশ্রান্ত গুলির শব্দ এবং জিন্দাবাদ ধ্বনিতে সবাই সচকিত হয়ে উঠে। কেউ কেউ এক খোলা ট্রাকে মিলিশিয়া ও রাজাকারদের উল্লাস করতে করতে মিয়াপাড়া দিয়ে বেনেখামারের দিকে যেতে দেখেছে। মসজিদের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েও পাশের বাড়ির চাচা ঘরে ফিরে এলেন। পাড়ার পাকিস্তানপন্থীদের উপর তার বিশেষ প্রভাব, তবু হয়তো ভাবলেন সাবধানের মার নেই। মগরেবের পর হঠাৎ তাদের বাড়িতে আমার ডাক পড়ল। ঘরে ঢুকে বিস্মিত হলাম। চেনা অচেনা লোকে ঘরভর্তী। সকালে দেখা চাচার মলিন মুখে নয়া দীপ্তি, বললেন– তুমি তো কিছুই বিশ্বাস কর না, এখন প্রত্যক্ষদর্শীর বয়ান শোনো। একজন ঢ্যাঙ্গা চোয়াড়ে লোক চেয়ার ঠেলে লাফিয়ে উঠল–কি, কি বিশ্বাস করেন না উনি? চাচা তাকে নিবৃত করলেন– থামো, ও আমার ভাইপো।

৩. দাঁতের ডাক্তার আব্দুল মালেক পাকিস্তানি দখলদারিত্বে বাংলাদেশের শেষ গভর্নর ছিলেন। মধ্য ডিসেম্বরের কনকনে ঠান্ডায় তার দাঁত ঠক ঠক করে বাড়ি খাচ্ছে একথা ভাবতে পারলে তিনি খুশি হতেন। কিন্তু শুধু দাঁত নয়, তার হাত হাটু কোন কিছুর উপরই এখন তার নিয়ন্ত্রন নেই, সেগুলোও ঠক ঠক করে কাঁপছে। গভর্নর হাউজের উপর মিত্র বাহিনীর বিমান হামলা তাকে আতংকের শেষ সীমায় নিয়ে গেছে। জীবন

বাঁচাতে আশ্রয় নিয়েছেন গভর্নর হাউজের তলদেশে সুরক্ষিত বাংকারে। তার পরেও কাঁপুনি থামছেনা। তার সাথে আছেন মার্কিন সাংবাদিক ...। তার হাতে পদত্যাগ পত্র দিয়ে পাকিস্তানের সাথে যাবতীয় সম্পর্ক ছিন্ন করে তিনি জাতিসংঘের নিরপেক্ষ জোন হোটেল ইন্টার কন্টিনেন্টালে আশ্রয় নিতে চান এজন্যই তাকে টেনে এনেছেন বাংকারে। কিন্তু এই মুহূর্তে তিনি পদত্যাগ পত্র লেখার মত কোন কাগজ খুঁজে পাচ্ছেন না। তার সুসজ্জিত অফিসে কাগজের কোন অভাব নেই। কিন্তু এই মুহূর্তে কেউ তাকে এক টুকরো কাগজ দিতে পারছে না।। এটাকে তাকে মৃত্যুর কারণ হবে। তিনি কলিয়ের হাত চেপে ধরেন

আমি খুবই ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। তীরে এসে তরি ডুবুক আদৌ তা চাইনা। মুখে কাষ্ঠহাসি ঝুলিয়ে মাথা দুলিয়ে প্রত্যক্ষদর্শীর বয়ান শুনলাম। 'প্রত্যক্ষদর্শী' কেননা সে শুনেছে ট্রাকের উপর উল্লাসমত্ত মিলিশিয়াদের কাছ থেকে। দুটো আত্মঘাতী বিমান বোমাসহ বিক্রান্ত জাহাজের উপর আছড়ে পড়ে জাহাজটা তাবা করে দিয়েছে। আর ফুলতলায় পাকিস্তান আর্মি পিছিয়ে আসার ভান করে তিন হাজার ইন্ডিয়ান সৈন্যকে ট্রাপে ফেলে নিশ্চিহ্ন করেছে। বিশ্বাস হওয়ার নয়, তবু সংবাদ দুটো বুকে শেলের মত আঘাত হানলো। ভারতীয় বিমানবাহী জাহাজ বিক্রান্ত আমাদের দক্ষিণের জল সীমায় মোতায়েন ছিল। মূলত এই জাহাজ থেকেই শত্রুর ফর্মেশনগুলির উপর বিমান হামলা চালানো হত। ঘরে এসে রেডিওর উপর হুমড়ি খেয়ে পড়লাম। বিক্রান্তের খবর নেই। তবে বিবিসি নতুন করে বাঁচার প্রেরণা যোগালো ভিজাগাপত্তমের কাছে পাকিস্তানি সাবমেরিন 'গাজী' ভারতীয় নৌসেনাদের ডেপথ্ চার্জে সম্ভবত বিধ্বস্ত হয়েছে। এই সাবমেরিন নিয়ে পাকিস্তানিদের কত মিথ!

আশা নিরাশার মধ্যে দিনগুলো ইলাস্টিকের মত দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হচ্ছিল। ১১ ডিসেম্বর উত্তর আকাশে একটা বিমানের অবয়ব ধীরে ধীরে স্পষ্ট হল। পূব থেকে ধীরলয়ে ভেসে আসছে। খুলনার আকাশে একটা চক্কর দিয়ে কয়েক দফা আবিরের মত কি যেন ছড়িয়ে আবার ধীর লয়ে পূব আকাশে মিলিয়ে গেল।

একতরফা বিমান যুদ্ধ যা একদিন আমাদের চাঙ্গা করে রেখেছিল, তাও এখন বন্ধ। চার ডিসেম্বর যখন প্রথম বিমান আক্রমণ শুরু হয় সাইরেনের কাঁপা কাঁপা শব্দে পড়ি মরি করে আমরা ট্রেঞ্চ ঢুকেছি। দু এক দিন যেতে না যেতেই সবাই লোকচক্ষু এড়িয়ে বাড়ির উঠানে বা ছাদে দাঁড়িয়ে তাদের একতরফা ডাইভ, স্ট্রাপিং বোম্বিং দেখে আনন্দ পেতে থাকলো। কেউ আর ভারতীয় পাইলটদের নিয়ে পাকিস্তানিদের বানানো মিথ 'মারে ইধার তো গিরে উধার' জাতীয় মিথ আর বিশ্বাস করেনা। নিশ্চিন্তে মিত্র বাহিনীর একতরফা বিমানযুদ্ধ দেখতে থাকে। সেটা না থাকায় আমরা অনেকটা ম্রিয়মান।

স.ম. রেজওয়ান একদিন কলারোয়া ক্যাম্পের সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন। ভারতীয় রাজপুত রেজিমেন্টের দুটো কোম্পানী বেনাপোল-কলারোয়া হয়ে তখন খুলনার দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। এদের কমান্ডার ছিলেন মেজর মহেন্দ্র সিং এবং মেজর গেনি। তারা খুলনার পথ প্রদর্শকের সন্ধানে ছিলেন। করারোয়া মুক্তিবাহিনীর ক্যাম্পের সামনে তারা হঠাৎ রেজওয়ান আলীকে দেখেন। রেজওয়ান ট্রেনিংকালে ৪নং পাটুন কমান্ডার ছিলেন। এই পাটুন চাকুলিয়া ট্রেনিং ক্যাম্পে মেজর মহেন্দ্র সিং এর কাছে ট্রেনিং নিয়েছিল। মহেন্দ্র সিং পথপ্রদর্শক হিসাবে তাদের ভারতীয় বাহিনীর সঙ্গী হতে অনুরোধ করেন। রেজওয়ান আলী সানন্দে এই প্রস্তাবে রাজি হন এবং নিয়ম মাফিক ক্যাম্পের কোথ ইনচার্জের কাছে অস্ত্র জমা দিয়ে তারা চারজন– রেজওয়ান, আলকাস, গনি এবং কুদ্দুস বেডিংপত্র নিয়ে ভারতীয় বাহিনীর সঙ্গী হন। তাদের কনভয় চুকনগর–রাজারহাট হয়ে ফুলতলার এক মাইল উত্তরে ১৪ মাইল নামক স্থানে পৌঁছায়। বস্তুত ভারতীয় বাহিনীর মূল অবস্থান ছিল তখনো নওয়াপাড়ায়। সেটা ছাড়িয়ে তারা ফুলতলার কাছাকাছি ১৪ মাইলে অবস্থান নেন। তারা ফুলতলা পর্যন্ত রেকি করেন, সেখানে কোন পাকিস্তানী সৈন্য ছিল না। আরো দু'মাইল দক্ষিণে ইস্টার্ন জুট মিল এলাকা থেকে দু'দিন আগে পাকিস্তানীদের গোলাগুলি বন্ধ রয়েছে। কিন্তু পাকিস্তানীরা সেখানে আছে কিনা এমন কোন তথ্য ফুলতলার সাধারণ মানুষের কাছে নেই। বস্তুত সে সময় সাধারণ মানুষজন পাকিস্তানী আর্মিদের ছায়া মাড়াতে আগ্রহী ছিল না, সাহসীও ছিল না। ফলে মেজর মহেন্দ্র সিং ও মেজর গেনি যথেষ্ট তথ্য ছাড়াই এগিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। কেউ কেউ ভালভাবে রেকি করার কথা বললে তারা বললেন, 'আরে ছোড়ো, দো'দিন বয়ঠা হ্যায়, গোলি নেহি হুয়া!' বস্তুত তাদের ২৮টা সৈন্য বোঝাই সামরিক যান এরপর ইস্টার্ন ও আলীম জুট মিল পার হয়ে শ্রেফ মৃত্যুর ফাঁদে যেয়ে পড়ল। পাকিস্তানী অ্যামবুশের মুখে তাদের জন্য কোন আড়াল পর্যন্ত ছিল না, একটি মাত্র গাড়ি কেবল মেজর মহেন্দ্র সিং ও কয়েকজন সৈন্যকে নিয়ে ফিরে আসতে সমর্থ হয়। শীঘ্রই অবশ্য ভারতীয় বিমান বাহিনী এর ভয়াবহ প্রতিশোধ নিয়েছিল।

পাকিস্তান আর্মির হতাবশেষ তাদের অবস্থান ছেড়ে আরো পিছিয়ে যায়। রেজওয়ান আলী এবং তার সঙ্গীরা খবর নিয়ে জানতে পারেন ভৈরবের পূব পাড়ের বিস্তীর্ণ এলাকা তখন সম্পূর্ন মুক্ত। এলাকাগুলো মুক্তিবাহিনীর দখলে। ভারতীয় সেনাবাহিনী দ্রুত ইস্টার্ন জুট মিলের পাশ দিয়ে ভৈরবের উপর গাবতলা-আমতলা বেলিব্রীজ নির্মাণ করেন। আরো একটা বেলিব্রীজ নির্মাণ করা হয় চারাঘাটের গাং-এর উপর। ভারতীয় বাহিনী পথপ্রদর্শকের সহায়তায় দ্রুত আর্মড কার নিয়ে নদীর ওপারে পাকিস্তানী অবস্থানের পূব পাশে চলে আসে যা পাকিস্তানীরা কল্পনাও করতে পারনি। এদিকে ১৭ তারিখ ভোরে ৮ নং সেক্টর কমান্ডার মেজর মঞ্জুরের পরামর্শ ও নেতৃত্বে ভারতীয় ট্যাংক মাইন সঙ্কুল মূল রাস্তা ছেড়ে রাস্তার পার্শ্ববর্তী কাঁচা মাটির উপর দিয়ে দক্ষিণে খুলনার দিকে অগ্রসর হয়। ট্যাংকের নিরাপত্তার জন্য আত্মত্যাগে উদ্বুদ্ধ এক দল

মুক্তিযোদ্ধা ট্যাংকের আগে আগে হাঁটতে থাকেন। পাকিস্তানী আর্মি চারদিক থেকে ঘেরাও হয়ে যায়। এই সাঁড়াশি আক্রমণে পাকিস্তানীরা সম্পূর্ন হতাশ হয়ে পড়ে এবং ১৭ ডিসেম্বর আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়।

মেজর মঞ্জুর পাকিস্তানী সৈন্যদের ব্যাজ খুলে ফেলার নির্দেশ দেন। অফিসাররা পরস্পরের ব্যাজ খুলে মিত্রবাহিনীর হাতে সমর্পণ করেন। এসময় সাধারণ সৈন্যরা নিজ নিজ ব্যাজ খুলতে যেয়ে তাদের অফিসারদের উপর চরম ক্ষোভ এবং ক্রোধে ফেটে পড়ে। তারা চিৎকার করে বলতে থাকে, আমাদের হিন্দুদের বির“দ্ধে যুদ্ধের কথা বলে এখানে আনা হয়েছে, কিন্তু এখানে এসে আমরা এতদিন মুসলমানদের মোকাবেলা করেছি, তাই আমাদের এই পরিনতি। তারা হাউ মাউ করে কানতে থাকে।

তিনি আত্মসমর্পণ করলেন

দূরাগত মর্টারের গোলার আওয়াজ শুনতে শুনতে আরো একটা বিষণ্ন শীত সন্ধ্যা পার হল। এ যেন কনডেমন্ড্ সেলের মধ্যে বসে দিন গোনা। আমরা এক এক করে দিন গুনি-বেঁচে থাকার দিন, আর প্রতি দিনই এক এক করে কত লোকই না শেষ হয়ে যায়, কোন হিসাব থাকে না। আজ সকালেও সামনের রাস্ড়া দিয়ে একটা অলিভ গ্রীন আর্মি ভ্যান ক্রুদ্ধ গর্জন তুলে পশ্চিমে বেনেখামারের দিকে গেছে। এর একটাই অর্থ হয়– নতুন করে হতভাগ্য কোন মায়ের কোল খালি হওয়া। যদিও সবাই জানে পাকিস্ড়ানি হানাদারগুলোর উপর মুক্তিযোদ্ধাদের চাপ দিনে দিনে বাড়ছে, ওদের আয়ু ফুরিয়েছে। কিন্তু আসলেই আর কত দিন? আগে সবাই জানতো জুলাই আগস্টের ভরা বর্ষায় হানাদারগুলো কাহিল হয়ে পড়বে, ভারতও আমাদের পক্ষে যুদ্ধে নামবে, অতএব ওদের মৃত্যুঘন্টা বাজার বিশেষ একটা বিলম্ব নেই। কিন্তু জুলাই আগস্ট গেছে। তারপর কানাঘুষায় শুনে এসেছি নভেম্বরের কথা। সে নভেম্বরও গেছে। যুদ্ধের দেখা নেই। এখানে ওখানে যুদ্ধ অবশ্য চলছে–গেরিলা যুদ্ধ। সে যুদ্ধের থিয়োরি আলাদা–আঘাত কর এবং পালাও। সে যুদ্ধে শত্র“ দিনে দিনে দুর্বল হয় বটে, কিন্তু সাফল্য দূরঅস্ড়, সেটা কত দূর কারো জানা নেই। ভিয়েৎনাম যুদ্ধের দৃষ্টান্ড় তো চোখের সামনেই আছে।

ধৈর্য এবং অপেক্ষার কথা এখন আর কেউ তেমন শুনতেও চায় না। মানুষ জেরবার হয়ে গেছে। দিনের পর দিন জীবম্মৃত দেহটাকে কোনমতে বয়ে বেড়ানোই সার। চোখের সামনে সোনার টুকরো ছেলেমেয়েদের মৃত্যু অথবা নিখোঁজ হয়ে যাওয়া, মা বোনেদের লাঞ্ছনা, খা“বদাহন– এসব দেখতে দেখতে সবাই এখন ক্লান্ড়। তারা দ্র“ত এস্পার ওস্পার কিছু একটা চায়, প্রলয়ংকর যুদ্ধ চায়–জলে স্থলে অন্ড়রীক্ষে ভয়ংকর এক যুদ্ধ! ভারতের অংশ গ্রহণ ছাড়া এমন যুদ্ধ যে সম্ভব নয় সবাই তা জানে। বলতে দ্বিধা নেই, আমরা তখন ভারতের স্বীকৃতি এবং যুদ্ধে নেমে পড়ার জন্য যারপরনাই উদ্গ্রীব হয়ে উঠেছিলাম। এমন নয় যে, এ ধরনের যুদ্ধের ভয়াবহতা সম্পর্কে আমাদের কোন ধারণা ছিলনা। বিশেষতঃ আমেরিকা ও চীন সে সময় আমাদের নিয়ে ইঁদুর-বিড়াল খেলায় মেতেছিল। তারা সত্যি সত্যি তাদের একান্ড় বশংবদ পাকিস্ড়ানের পক্ষে যুদ্ধে নেমে পড়লে সে যুদ্ধ আমাদের কোথায় নিতে পারে তা ভালই জানা ছিল। কিন্তু আমরা স্নায়ুপীড়ন ও সহ্যশক্তির শেষ সীমায় পৌঁছে গিয়েছিলাম।

অবশ্য ৩ ডিসেম্বরের সেই রাতটা, আমরা প্রথমে যেমন ভেবেছিলাম, শেষপর্যন্ড় তেমন গতানুগতিক হয়নি মোটেও। আমরা প্রতিদিনকারমত লো-ভলিউমে রেডিও শুনছিলাম। আমাদের হৃদয়কাড়া স্টেশন ছিলা জয়বাংলা, আকাশবাণী এবং বিবিসি'র মত নিষিদ্ধ সব স্টেশন। অতএব রেডিও ঘিরে কাছাকাছি গোল হয়ে বসে অত্যন্ড় লো-ভলিউমে শোনা ছাড়া উপায় ছিল না। আমরা চরমপত্র শুনতাম, বজ্রকণ্ঠ এবং মুক্তিযোদ্ধাদের বিজয়গাথা শুনতাম, দেবদুলাল শুনতাম, বিবিসি নিউজ শুনতাম। সারা দিনের মধ্যে এই সময়টা ছিল আমাদের। আমরা বাঁচার স্বপ্ন দেখতাম–আকাশছোঁয়া স্বপ্ন। নইলে কনডেমন্ড্ সেলের বাসিন্দাদের সাথে সে সময় আমাদের আর কি বা পার্থক্য ছিল! আমার সঠিক মনে নেই, সম্ভবত আমরা তখন বিবিসি শুনছিলাম, ঠিকমত শিরোনাম শুনেছিলাম কি শুনিনি, পাগলের মত চিৎকার দিয়ে 'সনিও' রেডিওটার উপর হুমড়ি খেয়ে পড়লাম। কেন জানিনা একরাশ ভয় এবং শিহরণের মধ্যে কাঁপতে কাঁপতে বুঝলাম আমরা প্রতীক্ষিত যুদ্ধের মধ্যে চলে গেছি, অতএব মুক্তি অথবা মৃত্যু নিকটে–খুবই নিকটে। আসলে পাকিস্ড়ান নিয়ে তখন আর আমাদের মোটেও চিন্ড়া ছিল না, আমাদের যত ভয় আমেরিকা এবং চীনকে নিয়ে।

আমাদের ভালই জানা ছিল, নয় মাসে পাকিস্ড়ানি হানাদারদের অবস্থা দিনে দিনে কর“ণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাদের অবস্থা ছিল গর্তের মধ্যে ক্রমাগত খোঁচা খাওয়া সাপের মত। তারা হতাশা এবং আক্রোশে ফুঁসছিল। আক্রোশটা শূধু বাঙালিদের উপর নয়, তারা সেটা ভালই দেখাতে পারতো, তাদের প্রচ“ আক্রোশ ছিল ভারতের উপর। ভারত মুক্তিযোদ্ধাদের ট্রেনিং, শেল্টার এবং অস্ত্রপাতি দিয়ে হানাদারদের জন্য পরিস্থিতি কঠিন করে তুলেছিল। বিচ্ছুদের হাতে হরদম মার খেতে খেতে তারা অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল–এ যুদ্ধের ধারা তারা ঠিকমত বুঝে উঠতে পারে না, মোকাবেলার পথ পায় না, মুক্তিদের ধরা যায় না–মারে আর পালায়, অথচ ঘুন পোকার মত কুরে কুরে তাদের পুরো কাঠামোটাই বরবাদ করে দিচ্ছে! নিয়াজি উন্মত্তের মত সাঙ্গোপাঙ্গোদের নিয়ে খুঁটোয় বাঁধা মেড়ার মত কুঁদ্তে থাকে–শুধু হুকুমের অপেক্ষা! হুকুম পেলেই সীমানা পেরিয়ে দু'দিনেই কলকাতা কেড়ে নেবে, মুক্তি এবং হিন্দুস্থানের যুদ্ধ স্বাদ চিরতরে মিষ্টিতে মিশিয়ে দেবে। তার খুঁটোও

কম যান না; তারও বড় বড় খুঁটো আছে। সেই জোরে তিনি দিলী কেড়ে নেবার স্বপ্ন দেখেন। তবে সে স্বপ্নে কাঁটাও আছে। তার খুঁটোদের মতিগতি বোঝা ভার। তার মধ্যেও তিনি আশায় বুক বাঁধেন, শুর" করে দিলে খুঁটোরা কি আর পাশে এসে দাঁড়াবে না! এর বেশি চিন্ড়ার মত স্পেস তার নিরেট মস্তিষ্কে নেই। অতএব, ৩ ডিসেম্বর তিনি দমাদম বোমা মেরে এলেন সীমান্ড়বর্তী ভারতীয় বিমানঘাটিগুলোতে, সরাসরি ভারতকে যুদ্ধে টেনে নিয়ে এলেন। আমাদের গেরিলা যুদ্ধ একলহমায় নিয়মিত যুদ্ধে পৌঁছে গেল–জলে স্থলে অন্ড়রীক্ষের সেই ভয়ংকর যুদ্ধ যার জন্য আমরা এতদিন ক্ষণ গুনেছি।

খুলনায় যুদ্ধটা অবশ্য আমাদের কাছে ৭ ডিসেম্বর পর্যন্ড় কেবল রেডিও সংবাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকে গেল। যেটুকু উত্তাপ তা আমাদের তিন ব্যান্ডের 'সনিও' রেডিওটা ঘিরেই। ছোট একটা ব্যতিক্রম অবশ্য ছিল, আগের দিন দুটো যুদ্ধ বিমান চড় চড় শব্দে খুব নিচু দিয়ে খুলনার আকাশ চিরে উড়ে গেছে। তারা যখন ফিরতি পথে তখন হঠাৎ সাইরেনের বিলম্বিত কাঁপা কাঁপা শব্দ জানান দিয়েছে আমরা যুদ্ধের মধ্যে আছি, তবে দূরে আছি। বিমান দুটো কোন্ পক্ষের তাও ঠিকমত বুঝে উঠতে পারেনি কেউ। আমার এক ভাই, বিমান বাহিনীতে ছিল, বলল–ওগুলো ভারতীয় বিমান, পাকিস্ড়ানিরা চিনতে ভুল করেছে, তাই সাইরেন দিতে দেরী করে ফেলেছে। যাদের ভিন্ন ধারণা তারা জোর গলায় বলল, পাকিস্ড়ানি বিমানতো বটেই, আকাশে টহল দিচ্ছে যাতে ভারতীয় বিমান ঢুকতে না পারে। তখনো সর্বত্র পাকিস্ড়ানিদের শক্ত কব্জা, বিতর্কে কে যায়? তবে আমরা অনেকটাই নিশ্চিত হয়ে গেলাম যে জয় অত্যাসন্ন এবং খুলনার কানা গলিতে যুদ্ধ সম্ভবত হচ্ছেনা। যদিও নিত্যকার মত সেই দুর্ভোগগুলো তখনো একইভাবে আমাদের ক্লান্ড় করে তুলছিল। রাতের নিস্ড্ধতা নেমে এলে দূরাগত কামানের গোলার ভোতা আওয়াজ ৭ তারিখ রাতেও সমানভাবে আমাদের স্নায়ুর উপর পীড়ন চালিয়েছে, রাজাকার আলবদর শান্ড়িকমিটির কুলাঙ্গারদের উৎপাত তখনো সমানতালে অব্যাহত আছে। আমাদের রেডিও শুনতে হত সেই একই লো-ভলিউমে এবং কেউ আড়ি পেতে আছে কিনা তা দেখার জন্য মাঝে মাঝে উঠে ঘরের চারপাশ ঘুরে আসতে হত। এতসব যন্ত্রণার মধ্যেও ৭ তারিখ রাতে আমাদের জন্য উদ্বেলিত হওয়ার মত একটা বড় সুসংবাদও ছিল, তবে সেটা বিশ্বাস করাও কঠিন ছিল। কিভাবে বিশ্বাস করা যাবে যে, যুদ্ধের মাত্র তিন দিনের মাথায় যশোর ক্যান্টনমেন্টের মত দুর্ভেদ্য দুর্গের পতন ঘটেছে এবং পাঞ্জাবী ললনাদের আইডল সেইসব মহাবীর 'মেরা মাহি কর্নেল্নি জার্নেল্নি'রা লেজ গুটিয়ে পালিয়েছে।

তবে যত অবিশ্বাস্যই হোক, সেই কঠিন দিনে এমন ধরনের সংবাদ ছিল আমাদের জন্য একঝলক সুবাতাসের মত। আমি ভোরের প্রতীক্ষায় ছিলাম, কখন চুপি চুপি এ আনন্দবার্তা সবার মাঝে ছড়িয়ে দেয়া যাবে। ৮ ডিসেম্বর সকালে অনেকটা প্রফুল মেজাজে অফিসে রওনা দিলাম। আমরা চাকরি করতাম স্টার জুট মিলে। সেখানে যেতে হত বিহারী অধ্যুষিত খালিশপুরের উপর দিয়ে। ভয়ংকর পথ, তবে আমাদের আনা নেয়ার জন্য মিলের টয়োটা ল্যান্ডক্রুজার ছিল। দু'জন বিহারী ড্রাইভার পালাক্রমে সকালে বিকালে ডিউটি করতো। আব্বাস ছিল জাত বিহারী, তার ভাবলেশহীন মুখের দিকে তাকিয়ে মনের গতি-প্রকৃতি আঁচ করা কঠিন ছিল। আমরা পারতপক্ষে তাকে এড়িয়ে চলতাম। তবে অল্পবয়সী ফার"ক ছিল বন্ধুভাবাপন্ন। সেদিন সকালে আব্বাসের ডিউটি ছিল, থমথমে মুখে ফেরিঘাটের মোড়ে এসে গাড়ির গতি শথ করে কফজড়ানো ঘড়ঘড়ে গলায় কর্তৃত্বের সুরে বলল, 'কর্নাল সাহাবকো সেলাম দিজিয়ে স্যার।' তাইতো, সে বলে না দিলে আমরা অতি আবশ্যকীয় এই দায়িত্বটা পালন করতে শ্রেফ ভুলেই যেতাম! আমাদের সামনে তখন যে দৃশ্য তা দেখার কথা কেউ স্বপ্নেও ভাবিনি। একেবারে বোকা বনে গিয়েছিলাম এবং স্থাণুবৎ হয়ে সামনে পাশে সর্বত্র বিধ্বস্ড়দশা আর্মিদের দেখছিলাম–চোখ রক্তবর্ণ, কাঁধে অথবা হাতে ক্লান্ড়ভাবে ঝোলানো রাইফেল, পরনের খাকি পোশাকগুলো জৌলুসহীন ধুলো কাদা মাখা, হেলমেটগুলো পিঠের উপর ঝুলছে, চুল উস্কোখুস্কো। ফেরিঘাট রোড যেখানে যশোর রোডে মিশেছে সেই তে-মাথার গোলাকার আইল্যান্ডে কচ্ছপের পিঠের মত বড়সড় বাংকার, ব্যাদান করা মুখের ভিতর দিয়ে মেশিনগানের ধাতব নল রাস্ড়ার দিকে মুখ করে বেরিয়ে আছে। কাকে ফেলে কাকে সালাম দেবো! আমাদের হাতগুলো যান্ত্রিকভাবে ক্রমাগত ওঠানামা করছিল। তবে ওরা আমাদের জন্য ভাল মন্দ কোন মুডেই ছিল না, সালামের জবাবও দিল না, কেবল হাত ইশারায় দ্র"ত স্থান ত্যাগের নির্দেশ দিল।

ফেরিঘাট থেকে জোড়াগেট, জোড়াগেট থেকে যশোর রোড বরাবর যতদূর চোখ যায় পথের দু'পাশে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা সৈন্য, সাঁজোয়া গাড়ি, ডালপালায় ঢাকা কামান, তাবু, বাংকার, বালির বস্ড়ার স্তুপ দেখতে দেখতে আমরা ডানে খালিশপুরের দিকে টার্ন নিলাম। মনে হল এতক্ষণ বোধহয় যুদ্ধক্ষেত্রে ছিলাম–সিনেমা হলের নিরাপদ আশ্রয়ে বসে দেখা কোন যুদ্ধক্ষেত্র নয়, একেবারে জান্ড়ব। গভীর উদ্বেগ নিয়ে উপলব্ধি করলাম যুদ্ধটা এবার বোধহয় ঘাড়ের উপর এসে পড়েছে। ল্যান্ডক্রুজারটা প্রিজন ভ্যানের মত আমাদের নিয়ে পাটিনাম জুট মিলের ঘাটে নামিয়ে দিল। আমরা সবাই একই ভাবনায় পিড়ীত ছিলাম–কিভাবে ঘরে ফেরা যায়। আব্বাস অবশ্য আগেই সাফ জনিয়ে দিয়েছে–'ওয়াপাস যানে কা হুকুম নেহি, আপ চাহে তো উতার যাইয়ে।' কিন্তু কে নামবে মাঝপথে, পথ তো ঐ একটাই, সেখানে আর্মি গিজগিজ করছে, রিকশা স্কুটার চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে। আমরা ভারি পা টেনে টেনে ভৈরবের ঘাটে বাঁধা মিলের ছোট স্টিল-পান্ট ফেরিতে উঠে বসলাম।

আমি প্যান ঠিক করে নিয়েছিলাম, আমাদের নতুন বস মিলের কোয়ার্টারে থাকেন। তখন প্রশাসনিক কঠোরতার পারদ অনেকটাই নেমে গিয়েছিল, তিনি বিলম্বে অফিসে আসতেন। আমি এই সুযোগটা কাজে লাগাবার কথা ভেবে রেখেছিলাম। দ্র"ত তার চেম্বারে ঢুকে টেলিফোন তুলে প্রতিবেশী এক আত্মীয়কে বললাম, আর্মিরা বোধহয় পিছিয়ে এসেছে এবং ফেরিঘাটে অবস্থান নিয়েছে। গোলাগুলি এড়াতে আমাদের

এখন রূপসার ওপারে কোথাও সরে যাওয়া প্রয়োজন, তিনি যেন জরুরীভাবে ব্যবস্থা নেন। আমাদের বাড়িতেও খবরটা পৌঁছে দিতে বললাম। ভদ্রলোক ডাইহার্ড পাকিস্তানি, আজাদের সাংবাদিক, তাকে বিশ্বাস করানো কঠিন ছিল, ফলে ভয়ে ভয়ে খানিকটা বিস্তারিত বলে ছিলাম বোধহয়।

বলতে দ্বিধা নেই, আমার দুর্ভাগ্য যে, যেখানে বাঘের ভয় ঠিক সেখানেই আমার জন্য সাঁঝ ঘনিয়ে আসে। অনেকবার ভয়ের সাথে এটা আমি উপলব্ধি করেছি। বলাবাহুল্য, আজো তার ব্যতিক্রম হল না। খান বেলাত আলী সাহেব, আমরা আগে কখনো জানতাম না তার নামের আগে খান আছে, হাতে একগাদা কাগজ নিয়ে চেম্বারে ঢুকলেন। তিনি আমাদের অফিস সহকারী, তবে সে পরিচয় ছাপিয়ে তার শিরোপায় তখন যে পরিচয়টা কোহিনূরের মত জ্বলজ্বল করে জ্বলছিল তা স্থানীয় শান্তিকমিটির চেয়ারম্যানের পরিচয়। তিনি সব কিছুই তখন বাঁকা দৃষ্টিতে দেখতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন। কয়েক সেকেন্ড থম হয়ে থাকার পর কঠিনভাবে বললেন, 'কথা সংক্ষেপ করেন, আমার রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ কাজ আছে।' জ্বি হা, জ্বি হা করে টেলিফোন রেখে দিলাম।

আমি ভয়ে ভয়ে ছিলাম এবং সেটা অমূলক ছিল না। মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যে পিওন এসে খবর দিল, চেয়ারম্যান স্যার আপনাকে এত্তেলা দিয়েছেন। আমাদের চেনা বেলাত আলী সাহেব চেয়ারম্যান হওয়ার পর যে বেলাত আলী স্যার হয়েছেন তা জানা ছিল, কিন্তু অফিসের শৃঙ্খলা কখনো ভেঙ্গেছেন বলে মনে পড়েনা। দরকার পড়লে তিনি সিনিয়রদের কাছে আসতেন, প্রয়োজনে সিনিয়ররা তাকে ডেকে পাঠাতেন, নিজের ইচ্ছায় তারা মাঝে মাঝে তার টেবিলে যেতেনও বটে। কিন্তু সিনিয়রদের ডেকে পাঠানোর অধিকার তার ছিলনা, এটা অফিস ডিসিপি-নের প্রশ্ন। তবে এতসব ভাবার অবকাশ তখন কোথায়? কে চায় তীরে এসে তরি ডুবুক! আমি বাঁচতে চাই, অন্তত একবার হলেও মুক্ত স্বাধীন বাংলার মাটিতে প্রাণভরে নিঃশ্বাস নিতে চাই। অতএব, দ্রুত কাচুমাচু হয়ে তার ডেস্কের সামনে যেয়ে দাঁড়ালাম।

খানিকটা রূঢ়ভাবে তিনি বললেন, বসেন। তারপর কাঁচাপাকা দাড়ির অগ্রভাগ দাঁতে চেপে নির্নিমেষ আমার দিকে কতক্ষণ চেয়ে প্রশ্ন করলেন, 'কি যেন বলছিলেন তখন, পাকিস্তানি জওয়ানরা পালিয়ে এসেছে না কি যেন?'

– আমি বোধহয় ঘামছিলাম, গলাও খানিকটা শুকিয়ে গিয়েছিল, ফ্যাসফেসে গলায় বললাম–না না, ঠিক তা নয়, আসলে আমি–

– থামেন! জানেন না, টেলিফোনে আড়িপাতা হয়, আর এ জন্য আপনার পরিণতি কি হতে পারে, বোঝেন কিছু?'

– আমার বুঝতে বাকি থাকে না, আড়িপাতার কাজটা তো ভালমতই ঘটে গেছে, আমার পরিণতি পুরোটাই এখন খান বেলাত আলী স্যারের মর্জির উপর দোদুল্যমান। আমি সামনের কুরসিতে কখনো বেলাত আলী সাহেব কখনো বা আজরাইল সাদৃশ্য ভয়ংকর কোন অবয়ব দেখতে থাকি। এটা কিসের আলামত কে জানে! মরিয়া হয়ে বলি–না মানে, আমি ঠিক সেভাবে বলিনি। আসলে ফেরিঘাটের মোড়ে অনেক আর্মি দেখলাম তো, তাই।

– তাতে কি হল? ওনারা কাল রাতে সমুদ্রপথে এসে রুজভেল্ট জেটিতে নেমেছেন, সে খবর রাখেন?

– আমাকে স্বীকার করতেই হল, নিতান্তই ছাপোষা মানুষ আমি, এসব খবরাখবর রাখার যোগ্যতা কোথায়! বাসা এবং অফিস ভিন্ন অন্য কোনো খবর কোথায় পাবো বলুন! আপনারা বললে তবেই না–

– তিনি বোধহয় কিছুটা নমনীয় হন, বলেন– আসলে আপনারা গোমরাহির মধ্যে আছেন, বুঝতেই চান না যে মুজাহিদ সিপাহী গুলির সামনে সিনা পেতে দেয়, পালায় না।

আমি হলফ করে বলতে পারি, এই মুহূর্তে পরিস্থিতি যথেষ্ট অনুকূল ছিল, আমি চেয়েছিলাম বিষয়টা এখানেই শেষ হোক, 'সুবহান আলাহ্' বলে প্রায় উঠেও পড়েছিলাম। তবে! আমি নিশ্চিত, এটা ইবলিসেরই কারসাজি, সে অষ্টপ্রহর আমাকে উল্টো পথে টানতে চায়, ফসকরে মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল–'কিন্তু ওদের জামা কাপড় যে ধূলো কাদা মাখা, খোলে পড়া চোখ- দেখে মনে হয় কতকাল যেন ঘুমায় নি–।' হঠাৎ খেয়াল হল এক জোড়া শীতল চোখ ময়াল সাপের মত স্থির দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে আছে। সেটা রাগে বিকৃত হয়ে গেল এবং বারুদের মত ফেটে পড়ল–'ওটা ক্যামোফ্লাজ!'

আমি চুপসে যাই, বুঝতে কষ্ট হয় না মুক্ত বাতাসে শ্বাস নেয়ার ভাগ্য আমার নেই। হিস্টিরিয়াগ্রস্তের মত 'তা ঠিক, তা ঠিক' বলে ভয়ংকরভাবে তোতলাতে থাকি। নিজেকে আস্ত বেকুফের মত মনে হয়।

আশ্চর্য! এদিকে সমান্তরালে এক প্রতিরোধের ভাষা কখন যে মহাবেগে উত্থিত হচ্ছিল আমি জানতেও পারিনি। অতি নিরীহ ছাপোষা মহিউদ্দিন সাহেব, যুদ্ধের প্রথম দিকে কুষ্টিয়ায় বউ ছেলে মেয়েদের দেখতে যেয়ে এক পরব্রতা কুকুরের আত্মোৎসর্গের বিনিময়ে আর্মিদের হাত থেকে কোনমতে প্রাণ বাঁচিয়ে ফিরে আসতে পারার দুঃসহ স্মৃতিভার নিয়ে গত আট মাস নিরবে কলম পিষে এসেছেন, আগ্নেয়গিরির

মত হঠাৎ ফুঁসে উঠলেন–'থামেন বেলাত আলী সাহেব, যথেষ্ট হয়েছে! এতদিন অনেক বলেছেন, অনেক করেছেন, এবার থামেন দয়া করে! কাকে কি বলছেন আপনি, আপনার নিজেরই তো এখন ইয়া নফ্ছি ইয়া নফ্ছি করার কথা!'

আমি হতবাক হয়ে মহিউদ্দিনকে দেখি। সবাই দেখে। তাকে যেন কথায় পেয়ে বসে–স্যার, গত রোববারে মেসের বারান্দায় বসে দাঁড়ি কাটছি, যুদ্ধের পর থেকে সপ্তাহে ঐ একদিনই কাটি, দাঁড়ি খোঁচা খোঁচা হয়ে যায়। হঠাৎ হৈ চৈ শুনে রেলিং-এর ধারে এসে দেখি বেলাত আলী সাহেব মিছিল নিয়ে যাচ্ছেন। সবাই জানে তার সাথে কোন দিন আমার অশ্রদ্ধার সম্পর্ক ছিল না। অথচ সেদিন চোখাচোখি হতেই খিঁচিয়ে উঠলেন, 'নেমে আয় শালা গাদ্দার, মিছিলে আয়।' মিছিলে স্যার, বেশিরভাগই বিহারী, তারা ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে পড়ে। অনেকেরই কারবালার মহরমের যুদ্ধ সাজ আমার তখন মুখের একপাশ শেভ করা অন্যপাশে খোঁচা খোঁচা দাঁড়ি, সাবানের ফেনা। ঐ অবস্থায় প্রাণভয়ে কোনমতে মুখটা মুছে সং-এর মত নিচে ছুটে আসি, ঐ বেলাত আলী সাহেব আমার হাতে বাঁশের আগা ঢুকানো ইন্দিরা দেবীর কুশপুত্তলিকা ধরিয়ে দিয়ে বলেন, শোগান দে হারামজাদা। আমি 'গাদ্দার মুজিব' বলে শোগান দিতে বাধ্য হয়েছিলাম স্যার!

ক্ষোভে দুঃখে তার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসে। অফিসসুদ্ধ সবার নিরব দৃষ্টি পরম সান্ত্বনা হয়ে তার উপর ঝরতে থাকে। আমার নিজেকে হঠাৎ যেন নির্ভার মনে হয়। তখনও স্বাধীনতা আসতে আট-নয় দিন বাকি, আমরা তখনো হানাদারদের হিংস্র থাবার পুরো কব্জায়। তথাপি হানাদারদের পেয়ারে চেয়ারম্যান খান বেলাত আলী একেবারে হীন, হাড়গোড়হীন থলথলে মাংসের মত তার কুরছির মধ্যে সেঁধিয়ে যান।

পাকিস্তানীদের ধারনা ছিল যে ভোর হওয়ার আগেই ভারতীয় বিমান বাহিনী মুখ থুবড়ে পড়বে এবং ভারতীয় নৌ বাহিনী ভিত্তি বিক্রান্ত। চমৎকার সময় মা মুরগী রাজধানী থেকে হাজার মাইল দূরে কলকাতায় বাংলাদেশের দলছুট আন্ডাবাচ্চাডের সান্ত্বনা দিচ্ছে দেশরক্ষা মন্ত্রী জগজ্জীবন রাস বিহারের পাটনার। নিজে ছানা পোনা নিয়ে চিকচিক করে দিলী আধিকার করবে। অন্তত বাড়তি ১২ ঘন্টা সময় পাচ্ছি। ওদের যুদ্ধ শক্তি টবসিয়ে দেয়ার মত। ভারতীয় ড্রেস্টযার রাজপূত এবং সোনার সিসটেম ভিশাখা পাওনাম এর কাছে সাবমেরিনের আস্তিত্ব ধরা পড়ে। ডেপথ চার্জ করা হয়।

রাও ফারমান জামশেদকে– চল নিয়াজীর সাথে এ ব্যাপারে কথা বলি।

কিন্তু আগে তো কখনো বলিনি।

বলিনি, কিন্তু এখন পরিস্থিতি কিছুটা ভিন্ন।

নিয়াজী অন্যমনস্ক ভাব শোনেন। এখন সব সময় দুঃশ্চিন্তা এবং চাপ তাকে আচ্ছন্ন করে রাখে, বললেন– আমার সাথে আলোচনা কেন। এটা তো সাময়িক বিষয় নয়।

রাও ফরমান– জেনারেল এটা ঠিক আমরা হারতে যাচ্ছি। কিন্তু এখন থেকে যুদ্ধের দ্বিতীয় ফেজ শুরু হচ্ছে। আমাদের নেকস্ট মিশন এখন অ্যাক্টিভেটকরতে হবে। এখানে সেটা এগিয়ে নেয়ার লোকের অভাব হবেনা। শুধু পথটা খানিকটা মসৃন করে দিয়ে যাব আমরা।

নিযাজী– হা বূঝলাম, তবে এটা সিভিল অ্যাফেয়ার্স রিলেটেড।আই মিন ইট ইজ ইওর পাঁঠা, তুমি কিভাবে কাটবে- ল্যাজে না মুড়োয়দ্যাট ইউ নো বেটার। ওকে, ডু ইওর জব এন্ড লেট মি ডু মাইন।

১৪.মাদকাসক্ত কণ্ঠে প্রেসিডেন্ট বক্তৃতা দিলেন। এটা তার পুরোনো অভ্যাস। যখন ২৬ মার্চ সন্ধ্যায় ভাষণ দিয়েছি তখনও তাই ছিল তবে কম। ১৭ ডিসেম্বার এটা মাত্রাছাড়া বেশি। মনে হয় তিনি মদের বাটিতে মুখ থুবড়ে আছেন। পেছনে দন্ডায়মান কেউ একজন মাঝে মাঝে তার চুল খামচে ধরে মুখটা মাইক্রোফোনের সামনে উচু করে ধরছে এবং তিনি গমগমে মাদকাসক্ত কণ্ঠে বলছেন– এক জাগে পর হাম হার গেয়ী, ইসকা মতলব ইয়ে নেহি হ্যায় কি ম্যায় হার গেয়ী, জং জারী হ্যা-য়-য়- য় - -!

আপনারা কি কেউ ইয়াহিয়ার বক্তৃতাটা শুনেছিলেন। আমি নিঃসন্দেহ গ্লাস নয় গামলায় মুখ ডুবিয়ে মদ গিলছিলেন তিনি। চুল খামচে ধরে তার মুখটা মাঝে মাঝে মাইক্রোফোনের সামনে তুলে ধরছিলেন কেউ একজন।

ড্রেনে পোতা লাশ

ডিসেম্বরের শেষ দিক, দুপুরে অফিস থেকে বাড়ি ফিরছি। অফিস খুলেছে তবে কাজ হয় না। মিলে গাড়ি আছে, ড্রাইভার নেই। তারা প্রায় সবাই বিহারী ছিল, এখন কোথায় কেউ জানেনা। অনেককে ফারুকের কথা জিজ্ঞাসা করেছি, কেউ বলতে পারেনি। ভাঙ্গাচোরা বিআইডিসি রোড দিয়ে রিকশাটা যখন আলম নগরে পৌছাল, পাশে লোকজনের জটলা। একজন শ্রমিক উত্তেজিতভাবে প্রশ্বস্ত ড্রেনের এক জায়গায় অঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে কি যেন বলছে। ড্রেনটা এখন প্রায় শুকনো চড়া পড়া, একটা ক্ষীণ জলধারা এক পাশ দিয়ে একেবেঁকে বয়ে চলছে। অসম বয়সী তিন-চারজন ছেলে বুড়ো মালকোঁচা মেরে কোদাল হাতে নিয়ে ড্রেনের পেড়ি সরাচ্ছে। রিকশাওয়ালা বলল, সাহেব একটু দাঁড়াই, দেখি কি আছে এখানে।

'৭১ এর শুরুতে যখন এই রাস্তার দু'ধারে বস্তি ও বাড়ি ঘরে লোকজন বাস করত প্রশস্ত ড্রেনটা তখন সর্বদা থিকথিকে নোংরা পানি কাঁদায় ভরে থাকত। লোকটা বলল এখানটায় গাদাইছিল, এই গাছটা নিশানা, আল্লার কসম ভুলি নাই।

হঠাৎ ঠক করে একটা শব্দ হল। 'বাবাগো, ওরে আমার বাপরে'– বলে বুড়ো লোকটা হাতের কোদাল ফেলে দু'হাতে পাগলের মত পেড়িকাদা সরাতে শুরু করল, দেখাদেখি ছেলেরাও হাত দিয়ে প্রাণপণে কাদা সরাতে থাকল। ধীরে ধীরে একটা নর কংকালের টুকরো টুকরো অংশ হাতে হাতে উঠে এল। টুকরোগুলো যতই উঠে আসে বৃদ্ধ এবং ছেলেগুলোর হাহাকার ততই বাড়তে থাকে– কান্না সংক্রামিত হয় জটলার মধ্যে। লোকটা বলে, সেই একাত্তরে বৈশাখ মাসের পেথ্থম দিক রেডুতে এলান কয়, চাকরিতে যোগ দিতি হবে, নইলে চাকরি থাকপে না। এদিকে গেরামে অভাব, শান্তি নাই। দালালেরা দল বাঁধছে, আমাগোর গেরাম থিকাও দু'জন তাতে যোগ দিছে, খালি খোঁচাইতে থাকে ইলান শুন নাই, মিল চালু হইছে, বেবাক শান্ত, কামে যাইতেছ না ক্যান ?

যাইতে মন চায়না। কিন্তু যাইতে হইল, নইলে তো হেন্তালের কান্ড লইয়া ওগো পিছে পিছে পাইক-বরকন্দাজি করতে হয়। দুই বন্ধু লঞ্চে আইয়া খুলনায় নামছি। লোকজনে কয় আল্লাহর নাম লইয়া ভেতরের পথ দিয়া যাও। আমরা নদী বরাবর হাঁইট্টা জংশনের কাছে পুরান্ যশোর রোডে উঠছি। খালিশপুরের মোড়ে হইতে আমাগো ডান দিকে ইপিআইডিসি রোড বরাবর যাইতে হইবে। আইয়া দেখি চারদিক কারবালার লহান খা খা করতেছে। আগে রোডের দক্ষিণ পাশে সারিসারি ঘর দোকানপাট লোকজনে গিজ গিজ করত, অহন বিলকুল সাফ। পোতার ওপর পোড়া বাঁশ, কাঠের দুইচার খান আধপোড়া খুঁটি কেবল দেখা যায়। ভয়ে আমাগো কথা বন্ধ হইয়া গেছে, পেসাবের ভারি ব্যাগ পাইছে। আবুলরে কইলাম, আগাইতে থাক, আমি আইতেছি।

এক ঝোপের আবডালে বসি পড়লাম। আগে আশেপাশে দুই'চারটা আগাছা হয়তো আছিল, খেয়াল করি নাই। অহন ভিটার উপর, আশে পাশে সবখানে বড় বড় আগাছার ঝোপ।

বড়জোর দু মিনিট হইবে, হঠাৎ হৈ চৈ শুনি। সে কি চিক্কুর আর লাফালাফি। একপাল বিহারী কন থে যে আইল! দেহি ছোরা, চাপতি, তলোয়ার, লাঠি সোটা লইয়া আমাগো দিকে ছুটত্যাছে। ছেলে বুড়ারাও ছোটে। মনে হয় য্যান এদ্দিনে শিকার পাইছে। স্যার কি কমু, মুসলমানের পোলা হইয়া আল্লাহো আকবর তকবিরে এমুন ভয় আগে কহনো পাই নাই। তকবির দিয়া এক বিহারী আবুলের মাথায় জোরে কোপ বয়াইল। আর দেখতে পারি নাই। নিজের পেসাবের মইধ্যে মড়ার মত পইড়া রইছি, পাতলুন ভিইজা সারা।

হ্যাগোর কোপই থামেনা, হগলডি কোপায়। কতক্ষণ পর এক বুড়া শয়তান কইল– ফেক দো। দু'তিনজন লাশটারে লইয়া ড্রেনে ফ্যালাইল, তারপর লাঠি সড়কি দিয়া প্যাড়ার মইদ্যে হাঁদাইয়া দিল। স্যার হ্যারা গেলে পর একসুময় উল্টা দিকে অনেকখানি হামাগুড়ি দিয়া তয় উঠছি। হেই যে বাড়ি ফিরছি, চাচাগো লইয়া আজ আইলাম। আবুল ওনার বড় পোলা আছিল।

সৈয়দ মনোয়ার আলী

নিসর্গ, ৩৯- মিয়াপাড়া মেইন রোড, খুলনা

মোবাইল: ০১৭১১ ০৭৪০৬১